উনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলন

ও

বাংলা বিতর্করচনা

ড. অজয়েন্দ্রনাথ সরকার

পরিবেশক :

পুস্তক বিপণি

২৭, বেনিয়াটোলা লেন

কলকাতা-৭০০০০৯

UNISH SATAKER SAMAJSANSKAR ANDALAN O BANGLA BITARKARACHANA

[The Social Reform Movements of the Nineteenth Century Bengal and Bengali Polemical Writings.]

By Dr. AJAYENDRANATH SARKAR

Price : 30·00

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর, ১৯৬৯

প্রচ্ছদ :
শঙ্কর দাস

প্রকাশক :
অঞ্জলিরাণী সরকার
১৯৩, আন্দুল রোড
ব্লক—এল ডি ; ফ্ল্যাট-৫
হাওড়া-৭১১১০৯

মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

মা [সুধাংশুবালা সরকার]

ও

বড়দা [সমরেন্দ্রনাথ সরকার]

॥ প্রাক্‌-কথন ॥

উনিশ শতকীয় নবজাগরণ বাঙালীর পুরনো ধ্যানধারণার মূলে কঠোর আঘাত হেনেছিল। নতুন জীবনবোধের শক্তির পাশে পুরনো জীবনচিন্তার অস্তিত্ব হয়েছিল তাই বিপন্ন। একদিকে নতুন চাইছিল আত্মপ্রতিষ্ঠা; অপরদিকে পুরনো হয়েছিল আত্মরক্ষায় মরিয়া। তারই ফলে সমাজে দেখা দিয়েছিল তর্কের লড়াই। বিতর্করচনা ঐ তর্কযুদ্ধেরই দলিল। বিগত শতকে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, সাহিত্য সর্বক্ষেত্রেই মতামত বিনিময়ের সংগ্রাম প্রবল হয়ে উঠেছিল। সেইজন্যে বিতর্করচনার পরিধিও হয়েছিল বিস্তৃত। তবে বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্যবিষয় অত ব্যাপক নয়। সমাজসংস্কার আন্দোলন ও সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত বিতর্কপুস্তকাদির নানা দিকই শুধু এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

গ্রন্থে আলোচিত পুস্তক-পুস্তিকা বা প্রবন্ধাদির প্রায় সবই দুষ্পাপ্য। কোন কোনটি হয়তো ইতিমধ্যে হারিয়ে বা নষ্ট হয়েও গিয়েছে। এইজন্যে প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রামাণিকতার কথা ভেবে উদ্ধৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য এবং বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থাদির অন্ততঃ কিছু অংশ রক্ষা পাবে ভেবেও ঐ সংখ্যা কমানো হয় নি।

বর্তমান গ্রন্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত গবেষণাপত্রের পরিবর্তিত রূপ। পরীক্ষক ছিলেন শ্রদ্ধাভাজন ড. সুকুমার সেন, ড. ভূদেব চৌধুরী এবং ড. নরেশচন্দ্র জানা। ড. জানার তত্ত্বাবধানে গবেষণাকার্য সম্পন্ন হয়েছে।

গবেষণার কাজে আমাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধেয় ড অমলেন্দু বসু এবং বন্ধুবর ড অভিজিত চক্রবর্তী ও শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী। এঁদের ঋণ অস্বীকার করবার মতো কৃতঘ্নতা বোধ হয় পৃথিবীতে আর নেই।

গ্রন্থপ্রকাশের ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন দিব্যজ্যোতি মজুমদার এবং অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। দিব্যজ্যোতি মজুমদারের প্রযোজনা ভিন্ন এ গ্রন্থের প্রকাশ আদৌ সম্ভবপর হতো না। অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের কাছেও আমি অপরিশোধ্য ঋণে বন্দী। বন্ধুবর শিবেন চট্টোপাধ্যায়, অজিত মণ্ডল এবং আমার ছাত্র প্রবোধগোপাল ধরচক্রবর্তী ও দীপকবিকাশ মিত্রও আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন।

আমার পূজনীয়া মা সুধাংশুবালা সরকার এবং বড়দা সমরেন্দ্রনাথ সরকারের কাছ থেকে সব সময় যে উৎসাহ ও আশীর্বাদ পেয়েছি তা'ও গ্রন্থ প্রকাশে পাথেয় হয়েছে। অঞ্জলিরাণী সরকারও আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন।

বিষয়-সূচী

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

সাহিত্য সব সময়ই সমসাময়িক যুগের সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থার যুগগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক তাই অনস্বীকার্য। বিতর্কমূলক রচনার সম্বন্ধে একথা আবার বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। বস্তুতঃ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থার পটভূমিতে তর্ক-বিতর্কের উদ্দেশ্যে রচিত হয় বলেই বিতর্কমূলক রচনা তার ঐ নাম লাভ করেছে।

সামাজিক জীবনযাপন ও ধ্যান-ধারণা এবং রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার বিশিষ্টতার মাপকাঠিতে মানব-সমাজের যুগ-বিভাগ করার একটি রীতি প্রচলিত রয়েছে। যুগ-বিভাগের এই পদ্ধতি ইতিহাস-সম্মতও বটে—বৈজ্ঞানিকও বটে। দেখা যায়, এক-একটি নির্দিষ্ট কালসীমায় দেশের মানুষের ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় বিশ্বাস-অবিশ্বাস, জীবনবোধ ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যে সাধারণ-ভাবে একটি বিশেষ প্রবণতা বা বিশিষ্টতা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এই বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণযুক্ত এক-একটি কাল সময়কেই সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ইতিহাসে এক-একটি যুগরূপে অভিহিত করা যায়। তবে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এই সব যুগের সময়সীমা কখনও নির্ভুল অঙ্কের নিয়মে বেঁধে দেওয়া যায় না। সে যাই হোক, এই যুগ কিন্তু কখনও পূর্ববর্তী যুগের পরে অবাধে কোথাও আবির্ভূত হতে পারে না। অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েই তার আবির্ভাব। তাই বলা যায়, প্রতিটি যুগের আবির্ভাব সমাজ ও রাষ্ট্রের ঝঞ্ঝার মধ্যে ঘটে থাকে। এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অবস্থার প্রেক্ষাপটেই রচিত হয় বিতর্করচনা। আমাদের দেশেও এই রচনার সূচনা ঘটেছিল উনিশ শতকীয় রেনেসাঁস আলোড়িত যুগের প্রশ্নসংকুল বিক্ষুব্ধ সামাজিক পরিস্থিতিতে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা, সাহিত্য, শাসন ইত্যাদির প্রভাবে উনিশ শতকের বাংলা-দেশে সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি সর্বত্রই এক জটিল ভাবদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। নানা মত ও পথের ভীড়ে মানুষের জীবনে তখন দেখা দিয়েছিল এক অভিনব চাঞ্চল্য। সেই জটিল ভাবদ্বন্দ্ব ও জীবনচাঞ্চল্যের জন্যই নানা দল, সংঘ বা সংস্থা দেখা দিয়েছিল সমাজে। এইসব দল বা সংঘ-সংস্থার অনেকগুলির মধ্যে মতামত ও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যেমন পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব বজায়

ছিল, তেমনি আবার কতকগুলির মধ্যে চরম বিরোধিতাও দেখা দিয়েছিল। এই সহযোগিতা বা বিরোধিতার মূলে ছিল ধর্মমতের বৈচিত্র্য, সামাজিক আচার পালনের অন্ধতা, শিক্ষা-বিস্তারের প্রচেষ্টা, রাজনৈতিক বিধি-নিষেধের সমস্যা ইত্যাদি অনেক কিছুই। এই সব বিষয়ে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, সংগঠনে-সংগঠনে, পত্রিকায়-পত্রিকায় মতামতের লড়াই চলেছিল তখন প্রবল ভাবে। বহু সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম-সংস্কারক, রাজনীতিবিদ্ এবং সাধারণ মানুষও লেখনী চালিয়েছিলেন আপনার মত প্রতিষ্ঠার জন্যে ভিন্নমতের বিরুদ্ধে।—আমাদের আলোচ্য বিতর্করচনা (Polemics) হলো তাদের সেই মসী চালনারই ফলশ্রুতি। এই কারণেই পোলেমিককে বলা হয়েছে "The art and practice of argumentation, controversy ; debate ;…" [Dictionary of Literary Terms—Harry Shaw ; p 294.]

প্রসঙ্গক্রমে Harry Shaw 'পোলেমিক' শব্দটির উৎস কি এবং প্রথমে কোন্ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হতো, তাও জানিয়েছিলেন—"Polemics, from a Greek word-meaning "hostile" as "opposed" especially applies arguments in church circles designed to refute errors of belief." [Ibid, p 294]

এখানে লক্ষণীয়, চার্চে চার্চে ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কিত মতামত খণ্ডনেব বিষয়ে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হলেও, পরবর্তীকালে 'পোলেমিকে'র অর্থ বিস্তার ঘটেছে এবং সব বিতর্কিত বিষয়ে লেখা রচনাকেই 'পোলেমিক' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন, প্রত্যক্ষভাবে একের বক্তব্যকে যুক্তির সাহায্যে অপরের খণ্ডন করবার বা সমর্থন করবার চেষ্টাই বিতর্ক-পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু দেখা যায়, প্রত্যক্ষভাবে কারও মতের খণ্ডন বা সমর্থন না করেও অনেকে বিতর্কিত বিষয়ে আপন মতামত জ্ঞাপন করে পুস্তকাদি রচনা করেছেন; ব্যাপক অর্থে এই পুস্তকাদিও বিতর্ক রচনার অন্তর্ভূক্ত।

এবার বিতর্কপুস্তকের কয়েকটি সাধারণ লক্ষণের কথা উল্লেখ করা যাক। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিতর্ক-ঝঞ্ঝার বার্তা বহন করাই এর প্রধান বিশিষ্টতা। যে যুগগত অবস্থায় বিতর্করচনার উদ্ভব ও বিকাশ, সেই অবস্থাই তাকে পরিণত করেছে ঐ বার্তাবাহকে।

আলোচ্য রচনার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো তার তর্ক—তার্কিকতা। মতবাদের

লড়াই হয় বলেই তর্ক; আর তর্ক আছে বলেই তার্কিকতা। তার্কিকতা বলতে বলিষ্ঠ যুক্তির অবতারণা, উপযুক্ত তথ্যের পরিবেশন এবং তর্কের উপযুক্ত নিয়ম-কানুন মেনে চলা।

বিতর্করচনার ভাষা এবং আঙ্গিকেরও বিশিষ্টতা কম নয়। সাধারণতঃ এই রচনার ভাষায় একটি গতিবেগ থাকে (অন্ততঃ থাকা বাঞ্ছনীয়); কেননা তার্কিকের ভাষা থেমে থেমে বা মন্থর গতিতে চললে বক্তব্য প্রকাশের দৃঢ়তা নষ্ট হয়ে যায়। বিতর্করচনার ভাষায় গতির তীব্রতা আনবার জন্যে দেশী প্রবাদ-বচন ও আটপৌরে শব্দের প্রয়োগে তাই তার্কিক লেখকেরা তৎপর হন। শুধু তাই নয়, আপন বক্তব্যকে জোরালো ও রসালো করবার জন্যে তার্কিক লেখক নানা আঙ্গিকেরও আশ্রয় নিয়ে থাকেন। বিতর্করচনায় এইজন্যে আঙ্গিক-বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায়।

আর একটি কথা। এই ধরণের রচনায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নিক্ষেপও একটি বিশেষ লক্ষণ। বিতর্কের সময় ভিন্নমত ব্যক্তির প্রতি তীব্র আক্রমণ করা হয়—এই আক্রমণ তার যুক্তির বিরুদ্ধে হওয়াই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু নিছক ব্যক্তিগত আক্রমণও কম হয়ে থাকে না। এই কারণে বিতর্ক রচনায় বহুল পরিমাণে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য নির্মল হাস্যরসও এসব রচনায় দুষ্প্রাপ্য নয়।

বিতর্করচনা সাধারণভাবে সমসাময়িক বিষয়ে রচিত অচিরস্থায়ী লেখনী প্রয়াস বলেই অভিহিত; কিন্তু তবুও বলা যায়, কিছু কিছু বিতর্করচনা মনন ও প্রকাশভঙ্গিতে সমৃদ্ধ ও সুন্দর হয়ে ঐ সমসাময়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে কালোত্তীর্ণতার মর্যাদা লাভ করতেও সক্ষম হয়। ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে এর অনেক দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়।

এবার প্রশ্ন উঠতে পারে, সাহিত্যে এই শ্রেণীর রচনার কোন স্থান আছে কি? সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যের তথ্যের আলোকে এই প্রশ্নের মীমাংসা করা যেতে পারে।

তর্ক একটি মানসিক ক্রিয়া; কাজেই সব যুগেই সমাজ ও মানুষের মধ্যে এই তর্ক বর্তমান—একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তবে তর্ক থাকলেই যে বিতর্ক-রচনা থাকবে, তা কিন্তু আদৌ নয়। আগেই বলা হয়েছে, সমাজ ও রাষ্ট্র বিষয়ে বিতর্ক-বিক্ষুব্ধ যুগগত পরিবেশেই বিতর্করচনা দেখা দিয়ে থাকে। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষের যে পরিস্থিতিতে বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তা' বিতর্কবিক্ষুব্ধ ছিল না। তাছাড়া প্রাচীনকালে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে

সমস্যা বা বিপর্যয় দেখা দিলেও সাধারণ মানুষ তাতে প্রশ্নসংকুল হয়ে উঠেছিল বলেও মনে হয় না। কাজেই বিতর্কপুস্তক রচনার প্রেরণা ও প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়নি সে সময়। তবে একথাও সত্য, তার কিছু আভাস যে বৈদিক বা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না তাও নয়। প্রথমে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তের কথাই বলা যাক। উর্বশী পুরুরবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে; সেই সময় পুরুরবা তাকে যুক্তি দেখিয়ে চলে না যেতে অনুরোধ করছে। সেই বিষয়ে উভয়ের যে কথোপকথন, তারই বর্ণনা রয়েছে আলোচ্য সূক্তটিতে। বিতর্ক বলতে যা বোঝায় এখানে ঠিক তা নেই; তবে একজনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবেই যেন অপরের বক্তব্য এসেছে; সেজন্যে ঐ কথোপকথনের মধ্যে অস্পষ্টভাবেও বিতর্কের ভাবটি কল্পনা করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় অংশের বঙ্গানুবাদ উদ্ধার করছি—

"[পুরুরবার উক্তি]—যে উর্বশী আকাশ হইতে পতনশীল বিদ্যুতের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছিল এবং আমার সকল মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিল, তাহার গর্ভে মনুষ্যের ঔরসে সুশ্রী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। উর্বশী তাহাকে দীর্ঘায়ুঃ করুন ॥১০॥ [উর্বশীর উক্তি]—হে পুরুরবা, তুমি পৃথিবীর পালনের জন্য পুত্রের জন্মদান করিলে, আমার গর্ভে নিজ বীর্য পাতিত করিলে। সর্বদা আমি তোমাকে কহিয়াছি যে, কি হইলে তোমার নিকট থাকিব না, কারণ আমি তাহা জানিতাম। তুমি তাহা শুনিলে না, এক্ষণে পৃথিবী পালন কার্য পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছ ॥ ১১ ॥"

[ঋগ্বেদ সংহিতা (২য়)—রমেশচন্দ্র দত্ত। অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত; ১৯৭৭; পৃ. ৭০৯—৭১০]

উদ্ধৃত অংশটিতে পুরুরবাকে ছেড়ে চলে যাবার কারণ হিসেবে উর্বশী যুক্তি দেবার চেষ্টা করেছে—পুরুরবার অনুরোধ ও বক্তব্যের বিরুদ্ধেই এই যুক্তি দেওয়া হয়েছে। এইজন্যে বলা যায়, ঋগ্বেদের মধ্যে খুব অস্পষ্ট হলেও বিতর্কের আভাস একেবারে অলক্ষ্য নয়।

মহাভারতেরও কোথাও কোথাও বিতর্কের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে দুর্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রের কথোপকথন খুবই উল্লেখযোগ্য।—পাণ্ডব ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে দুর্যোধন মানসিক কষ্ট পেতে থাকলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন—

"......পরধন গ্রহণেচ্ছা নিতান্ত অসতেরই হইয়া থাকে, ফলতঃ যিনি

নিরবচ্ছিন্ন স্বধর্মে সন্তুষ্ট ও ধর্মনিষ্ঠ হয়েন, তিনিই প্রকৃত সুখী। পরস্ব গ্রহণে অনিচ্ছা, আত্মকর্মে উৎসাহ ও স্বোপার্জিত ধনের রক্ষণাবেক্ষণ—পণ্ডিতেরা ইহাকেই বিভব লক্ষণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।…পাণ্ডবেরা তোমার ভ্রাতৃ-সদৃশ, অতএব ধনের নিমিত্ত মিত্রদ্রোহ করা নিতান্ত অন্যায়।…মিত্রদ্রোহে অতি-শয় অধর্ম আছে, তোমার ও পাণ্ডবদিগের একই পিতামহ।" [মহাভারত (১ম)—কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত (সাক্ষরতা প্রকাশন, ১ম সং)। সভাপর্ব ; পৃঃ ৪৪-৪৫]

দুর্যোধন পিতার উপদেশ মেনে নিতে না পেরে বলেছিলেন—

"…বৃহস্পতি লোকব্যাপার ও রাজব্যাপার এই উভয়বিধ ব্যাপারকেই পৃথক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, অতএব রাজারা সর্বদা প্রমত্তচিত্তে স্বার্থচিন্তা করিবে। ক্ষত্রিয়দিগের জয়ই প্রধান বৃত্তি, অতএব ইহা ধর্মই হউক আর অধর্মই হউক, আত্মব্যাপারে দোষাদোষের আশঙ্কা কি ? …যে গূঢ় কিংবা বাহ্য উপায় দ্বারা শত্রুদিগকে সংহার করা যায়, সেই উপায়ই শস্ত্রধারীদিগের শস্ত্র স্বরূপ। কে শত্রু, কে মিত্র, ইহাতে কোন লেখ্য প্রমাণ নাই, যে যাহাকে সন্তাপ দেয়, সেই তাহার শত্রু।…[তদেব ; পৃঃ ৪৫]

মূল মহাভারতে বর্ণিত দুর্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রের আলোচ্য কথোপকথনে ন্যায়-নীতি, রাজধর্ম—সত্যধর্মের স্বরূপ ও তাদের কোনটির স্থান কার কাছে কিরূপ তার নির্ণয়ে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে একটি বিতর্কের ভাব রয়েছে বলেই মনে হয়।—মহাভারত থেকে এরকম দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যেতে পারে ; কিন্তু বাহুল্য বোধে বিরত হওয়া গেল।

এরপর হিন্দুশাস্ত্ররূপে যে গ্রন্থগুলি উল্লিখিত হয়ে থাকে, সেই সব গ্রন্থের ভাষ্যের কথায় আসা যেতে পারে। দেখা যায়, টীকাকারেরা অনেক সময় শাস্ত্রকারদের বচন বিশেষের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নির্ণয় করে ভাষ্য রচনা করেছেন। শাস্ত্রীয় বচনের ভাষ্য রচনায় এইভাবে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল ; আর ঐ মত-ভেদ থাকায় আপন আপন মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও স্বাভাবিক ভাবে দেখা দিয়েছিল।

সংস্কৃত ভাষায় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাতেই বস্তুতঃ পক্ষে প্রকৃত বিতর্কের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে এক মতের বিরুদ্ধে অপর মত প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়োজনীয়তা বেশি ছিল বলেই পরমত খণ্ডনের জন্যে কঠোর যুক্তি বিন্যাস করতে হয়েছিল।

ভারতবর্ষের অন্যতম দর্শনশাখার নাম চার্বাক দর্শন। ভারতবর্ষের নানা দার্শনিক মতের মধ্যে একমাত্র চার্বাক দর্শনই জড়বাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষীয় জীবনে সাধারণভাবে সে যুগে জড়বাদের কোন স্বীকৃতি ছিল না বলে অন্যান্য দর্শন শাখার প্রবক্তা ও সমর্থকেরা চার্বাক দর্শনের মত খণ্ডনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। চার্বাক দর্শনে অনুমানের কোন স্থান নেই; প্রত্যক্ষকেই সেখানে জ্ঞানের প্রমাণ বলে মানা হয়েছে। অন্যান্য দর্শন তা স্বীকার করে না। জৈন দর্শনও তা মানে না। নানা যুক্তিতে তাই জৈন দর্শন চার্বাক দর্শনের এই মত খণ্ডনের চেষ্টা করেছিল। জৈন গ্রন্থ 'প্রমেয়-কমলমার্তণ্ড'-এ চার্বাক মতের বিরুদ্ধে বহু যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল।

শুধু চার্বাক ও জৈনদর্শনের মধ্যেই যে মতভেদ ছিল তা নয়; অন্যান্য দর্শনের মধ্যেও মত বিরোধিতা ছিল এবং সেই সব মতবাদের প্রবক্তা ও সমর্থকদের মধ্যে পারস্পরিক মতামত খণ্ডনের প্রয়াসও কমবেশি দেখা গিয়েছিল।—সেই প্রয়াসের মধ্যে বিতর্কমূলক রচনার আভাস বেশ স্পষ্ট।

শাস্ত্রীয় ও দার্শনিক আলোচনায় একপক্ষ অপর পক্ষের মত খণ্ডনে কেমন যুক্তি ও ভাষা প্রয়োগ করতেন, এবার তার দু' একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাব। –

"যদা হি লোকপ্রসিদ্ধঃ পদার্থঃ পরীক্ষকৈর্ন পরিগৃহ্যতে.
তদা স্বপক্ষসিদ্ধিঃ পরপক্ষ দোষো বা উভয়মপ্যুচ্যমানং
পরীক্ষকাণামাত্মনশ্চ যথার্থত্বেন ন বুদ্ধিসন্তানমারোহতি।
এবমেবৈষোঽর্থ ইতি নিশ্চিতং যত্তদেব বক্তব্যং,
ততোঽন্যদুচ্যমানং বহু প্রলাপিত্বমাত্মনঃ কেবলং
প্রক্ষ্যাপয়েৎ।" [শংকরভাষ্যম্। ব্রহ্ম সূত্র – ২।২।২৫]

"কোন ব্যক্তি যদি লোকপ্রসিদ্ধ বস্তু স্বীকার না করেন, তাহা হইলে স্বমত স্থাপনই হউক, অথবা পরমত খণ্ডনই হউক, কিছুই পরীক্ষকের (বস্তুবিচারকারী পণ্ডিতের) ও আপনার বুদ্ধিতে যথার্থ বলিয়া অধ্যারূঢ় হইবে না। যাহা "ইহা এইরূপই" এতদ্রূপে নিশ্চিত হয়, তাহাই বলিবার যোগ্য ও বলা উচিত। তদ্‌-তিরিক্ত বলিতে গেলে আপনার বহুভাষিত্ব বা প্রলাপভাষিত্ব প্রকাশ করা হয়।"

[ব্রহ্মসূত্র; ২।২।২৫, শংকর ভাষ্যানুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ]

উদ্ধৃত অংশে যুক্তি রয়েছে; আবার লোকপ্রসিদ্ধ বস্তু স্বীকার করে না যারা, তাদের প্রতি কটাক্ষও করা হয়েছে। বিতর্কে পরমত খণ্ডনের সময় যুক্তিজাল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ মত ও মতাবলম্বীকে অনেক সময় কটাক্ষও করা হয়ে

থাকে,—অন্ততঃ তাই-ই দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত শাস্ত্রীয় ও দার্শনিক আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থের আলোচকেরাও আপন আপন মত প্রতিষ্ঠার সময় ঐ রকম কটাক্ষপাত করে থাকতেন। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।—

"অবিরুদ্ধন্তু লোকপ্রসিদ্ধং স্বাত্মব্যতিরিক্তেন
বিজ্ঞানেন বাহ্যোঽর্থোঽনুভূয়ত ইতি নেচ্ছসি, অহো
পাণ্ডিত্যং মহদ্দর্শিতম্।" [ব্রহ্মসূত্র ; ২।২।২৮ ; শংকরভাষ্যম্]

"বিজ্ঞানের দ্বারা বহির্বস্তু জানা যায়, এই অবিরুদ্ধ ও সর্ববিদিত তত্ত্ব অস্বীকার করিয়া বৌদ্ধ মহৎ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন।"

[ব্রহ্মসূত্র ; ২।২।২৮ ; শংকর ভাষ্যানুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ]

শঙ্করাচার্য এখানে বৌদ্ধদের অতি পরিশীলিত অথচ তীক্ষ্ণ ভাষায় কটাক্ষ করেছেন। এই সুন্দর ব্যঙ্গ কিন্তু বিতর্কমূলক রচনার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আর একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে –

"অনিয়তত্বেঽপি নাযৌক্তিকস্য সংগ্রহোঽন্যথা
বালোন্মত্তাদি সমত্বম্" [সাংখ্যসূত্রম্ ; ১।২৬]

"নিয়ত পদার্থ স্বীকৃত নাই বলিয়া যুক্তিবিরুদ্ধ পদার্থ সংগ্রহ করিতে পার না। সেইরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ পদার্থ স্বীকার করিলে বালকের ও উন্মত্তের সমান হইবে।" [সাংখ্যসূত্রম্ ; ১।২৬ ; বঙ্গানুবাদ-দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ]

এখানেও পরপক্ষকে কটাক্ষ করা হয়েছে ভদ্র ভাষাতে। দার্শনিক আলোচনায় দেখা যায়, এক মতবাদের মানুষ অপর মতবাদের সমর্থক কি বলতে পারেন, তা কল্পনা করে নিয়েই তার জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে পূর্বপক্ষ খণ্ডনের চেষ্টা দার্শনিক মতামত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। একে ঠিক প্রত্যক্ষ বিতর্ক না বলে অনেকটা পরোক্ষ বিতর্কপ্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা যায়। এই প্রক্রিয়ার কিছু নমুনা উদ্ধার করছি—

"ভেদবাক্যানাং পদার্থ-স্বরূপাদিবিধান পরত্বেন কৃতার্থত্বম্,
তাদাত্ম্যসম্বন্ধ এব তেষাং বিষয়ঃ। অভেদবাক্যানাং তু
পদার্থকদম্বস্য ব্রহ্ম তাদাত্ম্যসম্বন্ধবিধায়কত্বেন
কৃতার্থত্বম্, তাদাত্ম্য সম্বন্ধ এব তেষাং বিষয়ঃ।
এবঞ্চ ন ইতরেতর বাধ্যবাধকভাবঃ, তস্মাৎ ন উক্ত দোষাবকাশঃ
তন্মতে তু "সর্বপ্রত্যয়বিষয়ভূত ব্রহ্ম ভিন্ন ভেদান্ত –
ভাবেন অভেদবাক্যানামেবানুবাদপরত্ববৎ। স্বার্থাসিদ্ধিঃ"

ইতি বিচারণীয়ং পণ্ডিতম্মন্যৈরিত্যলং প্রাসঙ্গিকেন।
…নমুশ্রীবাচস্পতিমিশ্রৈর্বিষয়াদীনামাক্ষেপ
মুখেন নিপুণং নির্ণীতত্বাৎ ন উক্তদোষপ্রসক্তিঃ
সম্ভাবনীয়া। তথাহি—যদ্যপি জীব এব ব্রহ্ম,
স চাহমিতি জ্ঞানে ভাসত এবেতি সন্দিগ্ধত্ব,
ভাবাৎ ন শাস্ত্রস্য বিষয়ঃ।”

[মাধবমুকুন্দ দেবাচার্য বিরচিতম্—অধ্যাস (পরপক্ষ) গিরিবজ্রম—পণ্ডিত শ্রীবিনোদবিহারী পঞ্চতীর্থানূদিতম্। পৃঃ ৭৫-৭৬ ; কলিকাতা সংস্করণম্ ; চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং লিঃ]

উদ্ধৃত অংশের বঙ্গানুবাদ ঃ

"সর্বজ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্মাব্যতীত ভেদাদি কিছুই নাই বলিয়া শ্রুতিপ্রোক্ত অভেদবাক্যসমূহ অভেদের অনুবাদপর, কারণ, সকল জ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম হওয়ায় অভেদ গৃহীতই আছে, গৃহীত অভেদের প্রতিপাদন করায় ঐ সকল শ্রুতিবাক্য অনুবাদপর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং অদ্বৈত-বৈদান্তিকগণ শ্রুতিপ্রোক্ত অভেদবাক্য সমূহে প্রমাণ দেখাইয়া যে অভেদ সিদ্ধি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই স্বার্থের সিদ্ধি হয় না। ফলতঃ অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া পড়ে। ইহা পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের বিচারণীয় এই স্থলে প্রাসঙ্গিক কথায় আর প্রয়োজন নাই। · এক্ষণে অদ্বৈতবাদিগণ যদি বলেন—শ্রীবাচস্পতি মিশ্র শঙ্কর ভাষ্যের টীকা স্বরচিত 'ভামতী' গ্রন্থে পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া আমাদের সিদ্ধান্তিত বিষয় প্রয়োজনাদি নিপুণভাবে নির্ণয় করিয়াছেন, সুতরাং দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ পূর্ব প্রদর্শিতরূপে যে আমাদের সিদ্ধান্তিত বিষয় প্রয়োজনাদির অসিদ্ধি ও আমাদের শাস্ত্রারম্ভ ব্যর্থ বলিয়া দোষ দেখাইয়াছেন, সেই দোষ প্রসঙ্গের সম্ভাবনা নাই। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—অসন্দিগ্ধ বিষয়ে কাহারও জিজ্ঞাসা হয় না ; সন্দিগ্ধ বিষয়েই জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে ; শাস্ত্র হইতে জানা যায় আত্মাই ব্রহ্ম। আর সেই আত্মাই দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্নরূপে প্রাণিমাত্রেরই 'অহং' এইরূপ জ্ঞানে ভাসমান আছে। 'অহং' এইরূপ অনুভবগম্য আত্মার বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। আত্মা সন্দিগ্ধ নহে বলিয়া জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না।"

[তদেব ; পৃঃ ৭৫-৭৬]

এখানে কোন কটাক্ষ বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নেই। শুধু যুক্তি রয়েছে। এই বিশুদ্ধ

যুক্তিবাদের হীরকবিচ্ছুরণেই আলোচ্য বিতর্করচনার আভাস দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

এবার ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-শাস্ত্র-আলোচনার মধ্যেও যে কিছু কিছু বিতর্কের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল, তা' বলা যেতে পারে।

পাণিনির পরবর্তী অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ হলেন পতঞ্জলি। "পতঞ্জলি অনেকস্থলে পাণিনির অনেক সূত্রের বৈয়র্থ্য দেখাইয়াছেন, অনেকক্ষেত্রে আবার কাত্যায়ন পাণিনির যে সকল ত্রুটি দেখাইয়াছেন, তাহা সার্থকভাবে খণ্ডনও করিয়াছেন।" [সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা—ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য ; ৪র্থ সংস্করণ ; পৃঃ ১৫৮]

এখান থেকে বোঝা যায়, ব্যাকরণের ক্ষেত্রেও মতভেদ থাকায় মতামত খণ্ডন করা হতো এবং তার জন্যে স্বাভাবিকভাবেই যুক্তিও প্রদর্শন করা হতো। —কাজেই বিতর্কের কিছু অবকাশ যে এখানেও ছিল তা বলা যায় বৈ কি !

এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা গিয়েছে, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে সাধারণভাবে বিতর্করচনার আভাস থাকলেও তার আবির্ভাব ছিল না। কিন্তু এর যে একেবারেই ব্যতিক্রম ছিল না তাও নয়। প্রসঙ্গক্রমে মৃত্যুঞ্জয়াচার্যের 'বজ্রসূচী'র উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রন্থটির কিয়দংশ (প্রথম নির্ণয়) বাঙলাভাষায় অনুবাদ করে রামমোহন প্রকাশ করেছিলেন। এখানে প্রকৃত ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা নির্ণীত হয়েছে এবং অন্যান্য বিষয়ের মত জাতি দ্বারাও যে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করা যায় না তা'র অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। বিশেষ কোন ব্যক্তির বা বিশেষ কোন পুস্তকের বক্তব্যের বিরুদ্ধে যে 'বজ্রসূচী' রচিত হয়েছিল তা মনে হয় না ; তবে সে যুগের অসহ্য ব্রাহ্মণ্য-আধিপত্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই যে তা লেখা হয়েছিল তা'তে সন্দেহ নেই। রামমোহন কৃত বঙ্গানুবাদের কিছু অংশ প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধার করছি—

"যদি জাতিকে ব্রাহ্মণ কহ, তবে ক্ষত্রিয়াদিবর্ণ এবং পশুপক্ষী সকলও এক এক জাতিবিশিষ্ট হয় কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ নহে। যদি জাতি শব্দে জন্ম কহ অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হইতে জন্ম যাহার হয়, সে-ই ব্রাহ্মণ, তবে শ্রুতিস্মৃতিতে প্রসিদ্ধ অনেক মহর্ষিদের ব্রাহ্মণত্ব ব্যাঘাত হইল, যেহেতু ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি মৃগী হইতে জন্মেন এবং পুষ্প স্তবক হইতে কেসিব মুনি, উই ঢিবি হইতে বাল্মীকি, মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গমুনি, কলশ হইতে অগস্ত্য, ভেকের গর্ভে মাণ্ডুক্য, হস্তিগর্ভে অচরঋষি, শূদ্রা গর্ভে ভরদ্বাজ মুনি, কৈবর্ত্যকন্যাতে

বেদব্যাস, ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্মেন, ইহাদের তাদৃশ জন্ম ব্যতিরেকে ও সম্যক্ প্রকার জ্ঞানদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব শাস্ত্রে শুনিতেছি, অতএব জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে।"

[রামমোহন গ্রন্থাবলী (৪র্থ) ; বঙ্গীয়—সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ (১৩৬৬) ; পৃঃ ৪৭]

উনবিংশ শতকের বাংলা বিতর্ক রচনাতে এই 'বজ্রস্থচী' গ্রন্থের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল। ঐ প্রভাব পড়েছিল বলেই রামমোহন জাতিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 'বজ্রস্থচী'র অংশ বিশেষের অনুবাদ করতে প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন।—ঐ অনুবাদ বাংলা বিতর্করচনার অন্তর্ভুক্তও হয়েছে।

সংস্কৃত ভাষায় লেখা আর একটি গ্রন্থেও প্রকৃত বিতর্কের বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা গিয়েছে।—গ্রন্থটির নাম 'চতুঃশতক' ;—বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আর্যদেব ছিলেন এর রচয়িতা। ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা করাই ছিল গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। বাংলা বিতর্করচনার প্রসঙ্গে এ গ্রন্থটির উল্লেখও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু সে যাই হোক, উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে সিদ্ধান্ত করা যায়, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বিতর্করচনার আভাস আদৌ অস্পষ্ট ছিল না ; দু'একখানি সত্যিকারের বিতর্করচনাও তখন ছিল। তবে তাদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই অল্প।

বোধহয় এই কারণেই সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে বিতর্করচনা বলে কোন স্বতন্ত্র সাহিত্য প্রজাতির উল্লেখ দেখা যায় না। সেখানে মহাকাব্য, গীতিকাব্য, গদ্যকাব্য, ঐতিহাসিক কাব্য, গল্পসাহিত্য, নানাধরণের সাহিত্য স্থষ্টিরই উল্লেখ রয়েছে ; কিন্তু নিছক বিতর্কের উদ্দেশ্যে রচিত পুস্তকাদির স্বতন্ত্র কোন উল্লেখ নেই। বস্তুতঃ পক্ষে প্রকৃত বিতর্করচনা লেখার অনুকূল সামাজিক ও মানসিক প্রস্তুতি তখন দেশে ছিল না। বিতর্করচনার প্রাচুর্যও তাই তখন দেখা যায় নি। এহেন অবস্থায় সে যুগের আলঙ্কারিকেরা বিতর্করচনাকে অলঙ্কার শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করবার কোন প্রয়োজন বোধ করেন নি।

ইংরেজী সাহিত্যে কিন্তু বিতর্করচনার (polemics) গুরুত্ব অনেকটা স্বীকৃত হয়েছে। এই সাহিত্যে বিতর্করচনার প্রাচুর্যও বেশ লক্ষ্য করবার মতো। ঐ সব রচনার বিষয়ও খুব বিচিত্র। তবে ধর্মকে কেন্দ্র করেই এই রচনার স্থত্রপাত ঘটেছিল। আমাদের ভাষাতেও তাই দেখা যায়। তার কারণও উভয়ক্ষেত্রে প্রায় এক।

সাধারণতঃ যে সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় পরিবেশে বিতর্করচনার সূত্রপাত ও বিকাশ ঘটে, সেই পরিবেশই ইংরেজী 'পোলেমিক্‌স্'-এর সূচনা ও ক্রমোন্নয়ন ঘটেছিল। প্রতিবাদ ও আত্মরক্ষা—বিতর্করচনার মূলে এই দু'টিই হলো প্রধান প্রেরণা। এই প্রতিবাদ ও আত্মরক্ষা সামাজিক, গোষ্ঠীগত এবং একান্ত ব্যক্তিগত—সব রকমই হতে পারে। আমাদের দেশে এগুলির সবকটিই প্রধান হয়ে উঠেছিল উনিশ শতাব্দীতে। ইংলণ্ডেও তা দেখা দিয়েছিল; তবে অনেক আগে—চসারের সময়ে চতুর্দশ শতকে। আরম্ভেরও আরম্ভ আছে এই কথা মনে রেখে বলা যায়, ঐ শতক থেকেই শুরু হয়েছিল ইংরেজী সাহিত্যের যথার্থ পদক্ষেপ। দেখা যাক, ঐ যুগে পোলেমিকের অবস্থা কি ছিল।

বৃটেনে তখন রাজতন্ত্র ও যাজকতন্ত্র পাশাপাশি চলছিল; তবে সহাবস্থানের নীতি মেনে নয়। সেই জন্যে উভয়ের মধ্যে তখন বিরোধিতা বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে যাজকতন্ত্রের ধারক-বাহকদের মধ্যেও আবার দলাদলি দেখা দিয়েছিল। দেশে তখন যাজকসম্প্রদায়েরই আধিপত্য ছিল বেশি। তবে ঐ আধিপত্য দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারেনি আদৌ; কেননা যাজকসম্প্রদায়ের গোঁড়ামি আর স্বার্থান্ধতায় দেশের জনজীবন প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছিল। তবে ঐ অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার মতো মানুষও সমাজে ছিল। যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে তারাই তুলেছিল প্রতিবাদের কেতন। তারই মধ্যদিয়ে ওদেশে প্রটেস্ট্যাণ্ট মতের সূচনা দেখা দিয়েছিল। ঐতিহাসিক তাই বলেছিলেন "In the religious world there was a serious outburst of unorthodoxy. Wyclif and his followers were making an organised attack upon the church. In town and country alike, doctrines were being preached which a future age was to familiarise under the name of protestantism." [A History of English Literature—Arthur Compton Rickett; Indian Edition (1976) p-63]

সে যুগে ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন ওয়াইক্লিফ। তিনি আপনার মতবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে লেখনীও ধারণ করেছিলেন। ক্যাথলিকরাও কিন্তু চুপ হয়ে বসেছিলেন না; তাঁরাও এগিয়ে এসেছিলেন আত্মরক্ষার তাগিদে। আর তারই ফলে বিতর্কপুস্তক রচিত হয়েছিল সে যুগে ইংরেজী ভাষাতে।

আলোচ্য সময়ে অন্যান্য বিষয়েও মতামতের ভিন্নতা দেখা দিয়েছিল। সে বিষয়েও যে দু'চারটি পুস্তক রচিত হয় নি তা নয়।

কিন্তু বিতর্কপুস্তক রচনার উপযুক্ত ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থা বর্তমান থাকলেও সেযুগে প্রচুর পরিমাণে এমন পুস্তক রচিত হতে পারে নি। তার বড় কারণ, তখন ইংরেজী গদ্য তার নিজস্ব বলিষ্ঠ রূপ খুঁজে পায় নি। চতুর্দশ এমন কি পঞ্চদশ শতকেও গদ্যে কিছু লিখতে হলে সাধারণতঃ ল্যাটিন ভাষাতেই তা লেখা হতো।

ইংরেজী সমাজে নবজাগরণ আসবার আগে ও পরে দুই সময়েই বিতর্কপুস্তক রচিত হয়েছিল ; তবে নবজাগরণের পরেই রচিত হয়েছিল বেশি। কিন্তু এই বিতর্কপুস্তক রচনার আগে ইংরেজী সাহিত্যে কথোপকথনমূলক এক ধরণের রচনার প্রচলন ছিল। জনসাধারণের মধ্যে ঐ আঙ্গিকে লেখা রচনাদি শিক্ষা বা ধর্মপ্রচারে খুবই কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। এই রচনাগুলির মধ্যে বিতর্করচনার আদিমতম ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। চসারপূর্ব যুগে ধর্মকেন্দ্রিক সংলাপাত্মক রচনার মধ্যে 'Debate of the Body and the Soul' খুবই উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশেও বাংলা ভাষাতে এমন আঙ্গিকে লেখা পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা কম নয়।

যাই হোক, চসারপূর্ব যুগের এই ধরনের রচনার কথা মনে রেখেও বলা যায়, চসারের সময়েই হয় পোলেমিক-এর প্রকৃত সূচনা।

ইংরেজী সাহিত্যের আদিপর্বের বিতর্কপুস্তকের আলোচনায় পঞ্চদশ শতকের দু'জন রচয়িতার নাম না করলেই নয়। এঁরা হলেন Sir John Fortescue এবং Pecock। দু'জনেই খুব যুক্তিবাদী লেখক ছিলেন। Fortescue ছিলেন রাজনীতিজ্ঞ। তাঁর রচনা "The Difference between absolute and a limited Monarchy"। সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধানী ও সমালোচক Rickett বলেছিলেন—"The book was completed about 1470, and it is supposed that the book was intended for Henry VI. It is an interesting piece of controversial writing." [Ibid ; p. 110)

ষোড়শ শতকে আমরা আরও বলিষ্ঠ বিতর্করচনার সন্ধান পেয়ে থাকি। ঐ সব রচনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য "Martin Marprelate Papers" ; আর একটি হলো রিচার্ড হুকারের রচিত "Laws of Ecclesiastical Polity।" হুকার ও তাঁর এই বইটি সম্বন্ধে সাহিত্যের সমালোচক ও গবেষক

আইফর ইভান্স বলেছিলেন, "Religious controversy in the sixteenth century produced one excellent prose writer in Richard Hooker (1554—1600), whose laws of Ecclesiatical polity began publication in 1594. Hooker rose above heat of argument, and in quiet, systematic way set down the principles on which the Church of England should be governed, discovering its compromise only an evidence of its wisdom. As he found a middle road in style, a path between the English and the Latin, with the virtues of both, clarity and dignity, strength and by a native harmony."

[A short History of English Literature (1961)—Sir Ifor Evans ; p-196-197]

সপ্তদশ শতকে ইংরেজী ভাষাতে আরও বলিষ্ঠ পোলেমিক রচিত হয়েছিল। ঐ শতকে দেশে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় বাদবিতণ্ডাও এক বিশেষ আকার নিয়েছিল। রাজনৈতিক সমস্যা তখন নতুনভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল।—মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নও দেখা দিয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে, চতুর্দশ শতক থেকে ওদেশে ধর্ম এবং রাজনীতির মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল, এবং রাজতন্ত্র ও যাজকতন্ত্রের ঐ বিরোধ সমাজে বেশ আলোড়নও সৃষ্টি করেছিল। ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেযুগে মিলের অভাব ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ঐ বিরোধ সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছিল। এই যুগে প্রটেস্ট্যাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে মতামত প্রতিষ্ঠার লড়াই ছিলই ; তার ওপর পিউরিটান ও লিবারেলদের মধ্যেকার বিরোধও তীব্রতর হয়েছিল। এই দুই গোষ্ঠী ছাড়া আরও একটি গোষ্ঠী ছিল ; ঐ গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের বলা হতো প্রেসবিটারিয়ান্স্। প্রটেস্ট্যাণ্ট হলেও সংশোধিত আকারে প্রেসবিটারগণ আসলে পুরোহিততন্ত্রেরই পৃষ্ঠপোষণা করে থাকতো। এদের সঙ্গেও অন্যগোষ্ঠীর বিরোধিতা ও মতামতের লড়াই চলতো।

সপ্তদশ শতকে যে বাদবিতণ্ডা,—সামাজিক রাষ্ট্রিক ও ধর্মীয় ঝড়ঝাপটা, তাতে কিন্তু প্রগতিবাদীদের ভূমিকাই প্রধান ছিল ; প্রচলিত অবস্থার সংস্কার সাধনের যে প্রয়োজন রয়েছে, দেশের বহু মানুষই তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। বহু বুদ্ধিজীবী উদারপন্থী মানুষ এই সংস্কার সাধনের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন ;

তাঁদেরই অনেকে বিতর্করচনায় আপন আপন মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। সমাজ-ধর্ম-রাষ্ট্র-শিক্ষা-দর্শন সর্বক্ষেত্রেই এই শতকে এমনি বিতর্কপুস্তক রচিত হয়েছিল।

এই যুগের যাঁরা সার্থক বিতর্কপুস্তকের রচয়িতা তাঁদেরই অন্যতম হলেন মহাকবি জন মিলটন। তিনি একাধিক বিতর্কপুস্তক রচনা করেছিলেন; তাদের মধ্যে আবার 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' খুব উল্লেখযোগ্য। 'অ্যারিও-প্যাগিটিকা' তৎকালীন গ্রন্থপ্রকাশের নিয়ন্ত্রণ আদেশের প্রতিবাদে রচিত হয়েছিল। বইটির সাহিত্যিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে ওয়েজউড্ তার সম-সাময়িক বিতর্কপুস্তকের বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেছিলেন। ঐ আলোচনা থেকে বোঝা যায়, 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'-র সমসাময়িক বিতর্করচনার স্বরূপ কি ছিল। ওয়েজউড্ বলেছিলেন, "গৃহযুদ্ধের সময়কার প্রচারপুস্তিকাগুলি প্রায় সবক্ষেত্রেই অত্যন্ত হিংস্র একটা 'যুদ্ধং দেহি' রীতিতে লিখিত, জঘন্য নিন্দাপূর্ণ বাক্যস্রোতে যুক্তি সমুপস্থাপিত হইত, লগুড়াঘাতের মহিমা এবং বৈশিষ্ট্য ব্যতীত ইহাতে অন্যবেশি কোন মহিমা বা বৈশিষ্ট্য ছিল না। অনেকগুলি পুস্তিকাতেই আবেগ আছে, রসিকতা আছে, বলিষ্ঠতা আছে, আর ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুস্তিকা গুলির মধ্যে অতি তৎপরতার সঙ্গে ব্যবহার দেখিতে পাই আমাদের দেশজ ভাষার—যে ভাষা ইতোমধ্যেই ডেফোর রচনারীতির অভিমুখী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কোথাও ক্লাসিক্ সুষমা বা মহিমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এগুলির লক্ষ্য ছিল তন্মুহূর্তের মনোযোগ আকর্ষণ করা, তন্মুহূর্তের সময়কে অতিক্রম করিয়া বাঁচিয়া থাকা এবং তাহাদের বিতর্কের উদ্দেশ্যের বাহিরে চলিয়া যাইবার এগুলির কোনই লক্ষ্য ছিল না।"

[অ্যারিওপ্যাগিটিকা—শশিভূষণ দাশগুপ্ত অনূদিত (১৮৬৩); "মুখবন্ধ" অংশ ; পৃঃ ১৭-১৮]

সপ্তদশ শতকের এহেন ইংরেজী বিতর্কপুস্তকের মধ্যে 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' ছিল একেবারেই স্বতন্ত্র। তার ঐ স্বাতন্ত্র্যের মূলে ছিল তার সাহিত্যিক ঐশ্বর্য। পুস্তকটির সাহিত্যিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে ওয়েজউড্ খুব মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন—

"…'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র জন্য তিনি সিসারোর আদর্শ গ্রহণে একটি ক্লাসিকভঙ্গি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা হইল একটি মহৎ এবং মহিমান্বিত সালঙ্কার ভাষণ, …যে সব চমৎকার শব্দসমষ্টি, যে সব ওজোগুণান্বিত ধ্বনিগাম্ভীর্য আজ আমাদিগকে আনন্দিত করে এগুলির

মধ্যে এমন ভীষণতা এবং আঘাত হানিবার শক্তি নাই যাহা সমসাময়িক শ্রোতৃবর্গকে আকর্ষণ করিতে পারিত। আমাদের এইরূপ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় যে মিল্টন নিজে তাঁহার বক্তব্যের কালাতীত সর্বজনীন উপযোগিতার কথা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি এমন একটি রচনাভঙ্গি বাছিয়া লইয়াছিলেন যাহা তাঁহার পুস্তকটিকে তৎকালীন রাজনৈতিক মল্লভূমি হইতে অনেক সমুন্নতির মধ্যে তুলিয়া লইতে পারিয়াছিল।" [তদেব, পৃঃ ১৮]

পরবর্তীকালেও নানা সময়ে অনেক বিতর্কপুস্তক রচিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে রাজনৈতিক বিষয়ে বেশ শক্তিশালী লেখকেরা পলেমিক রচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বার্কের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীতেও রাজনৈতিক বিতর্ক অবলম্বন করে কম উল্লেখযোগ্য পোলেমিক রচিত হয় নি। সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও তার প্রয়োজনীয়তা সে সময়ে দেশের বুদ্ধিজীবীদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল এবং তাঁদের সে-সব ভাবনা নানা রচনায় প্রকাশও পেয়েছিল।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হোল, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, ইংরেজী সাহিত্যে বিতর্করচনার একটি ধারা বহুদিন আগে থেকেই বহতা ছিল। কিন্তু তবুও দেখা যায়, সাহিত্যের ইতিহাসে তার উল্লেখ থাকলেও প্রকৃত সাহিত্যের কৌলীন্য তাকে দান করা হয়নি। অবশ্য তার কারণও আছে। সুকুমার সাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত হবার কোন যোগ্যতাই এর নেই। তার আঙ্গিক, বিষয় ও উদ্দেশ্যই এমন যার জন্যে বিতর্করচনা সুকুমার সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না : অবশ্য কখনও কখনও কারও রচনা প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে ; কিন্তু সাধারণভাবে বিতর্করচনাকে প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

কিন্তু তবুও বলতে হয়, ইংরাজী সাহিত্যে এমন রচনার মূল্য একেবারে অস্বীকৃতও হয়নি। ইংরেজী সাহিত্যের গবেষক ও সমালোচকেরা বিতর্করচনার গুরুত্ব সম্বন্ধে নানা সময় যে-সব মন্তব্য করেছেন তা থেকেই এই বক্তব্য প্রমাণিত হয়। এই শ্রেণীর রচনারও একটা সাহিত্যক মূল্য থাকতে পারে এবং সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনেও তার ভূমিকা রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এই বক্তব্যের সমর্থনে দু'একটি প্রয়োজনীয় মন্তব্য উদ্ধার করা গেল। আগে হুকারের কথা বলা হয়েছে। তাঁর গদ্যরীতি সম্বন্ধে রিকেট মন্তব্য করেছিলেন—"The aim of Hooker was to give us a prose that should be at once simple and impressive. Sidney had combined simplicity with

Cadence. Hooker gave to the Cadence a finer and more sustained rhythm. In point of time he is the forerunner of Lyly, but he certainly carried prose style to a higher stage of development and if less powerful an influence in his day than either Lyly or Sidney, exerted in the long run a more potent one. Theological literature very rarely lends itself to literary excellances of how few modern theologians can it be said that they had the art of saying well what they had to say. But Hooker will be remembered not merely as the first vernacular defender of the English Church, but as a writer of fine, eloquent prose."

[A History of English Literature—A. C. Rickett. Indian Edition (1975), P. 113]

হুকারের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্যকে গবেষক সমালোচক এখানে শুধু প্রশংসাই করেননি ; ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর গদ্য রচনার ঐতিহাসিক গুরুত্বও স্বীকার করে নিয়েছেন।

মিল্টনের বিতর্কমূলক রচনার গদ্যভঙ্গিও কম প্রশংসিত হয় নি। ত্রুটি যে তাঁর গদ্যে ছিল না তা নয়, কিন্তু তাঁর গদ্যের ক্লাসিক ভাবগাম্ভীর্য ও সমালোচক-দের কাছে অভিনন্দিত হয়েছিল। ওয়েজউড্ 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র গদ্যরীতি সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার কিয়দংশ আমরা আগেই উদ্ধার করেছি। সেখানে মিল্টনের গদ্যের শ্রী ও সমৃদ্ধি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। শুধু এই বইটিই কেন, মিল্টনের অন্য বিতর্কমুলক রচনার গদ্যও কমবেশি স্বীকৃতি পেয়েছে।

এবার অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের একজন শক্তিশালী বিতর্কপুস্তক রচয়িতা বার্কের রচনারীতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রিকেটের বক্তব্য উদ্ধার করছি—

In comparing Burke's prose at the close of the century, with the prose of Dryden in its early years, we cannot help noticing the gradual swing back of the pendulum to Renaiscence models. Flinging of in Dryden all the glitter and colour of the Elizabethan Prosemen striving above all after plainness of speech, homeliness of phrase and flexibility of method, the

prosemen having tidied up the gorgeous confusion that beset so much of the prose at their start, grew tired of the plain veracity of speech, and gradually recaptured some of the golden qualities of the Elezabethan and caroline writers.

... ...

"It is a fine tribute to Burke's power that his work, concerned as it is with the politics of his own age, should possess so much permanent value for the student of literature and history . The subject with whice he is concorned are bid and important ones, for the transitional age in which he lived abounded in problems of striking and memorable importance ; but his greatness is due less to the greatness of his subjects than to the greatness of his way of approaching them. " [Ibid ; p-270]

বার্ক বিতর্কমূলক রচনার জন্যেই বিখ্যাত ; সেই বার্কের রচনারীতির এই যে মূল্যায়ন তাতে বোঝা যায়, ইংরেজী গদ্যসাহিত্যের ঐশ্বর্য বৃদ্ধিতে বিতর্ক-রচনার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বস্তুতঃ ইংরেজী বিতর্কমূলক রচনার (Controversial Writings বা Tracts বা Polemics) ভাষা ও রীতি সম্বন্ধে উদ্ধৃত অংশকটিতে যে বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, বিশুদ্ধ সাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত না হলেও সাহিত্যের গুণ ও রসসৃষ্টি ক্ষমতা থেকে এই সব রচনা একেবারে বঞ্চিত নয়। শুধু তাইই নয়, সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধিতেও এদের কিছু ভূমিকা রয়েছে। বাংলা-সাহিত্যেও এই বিতর্করচনার অমর্য্যাদা করা হয় নি। আমাদের সাহিত্যেও অনেক শক্তিশালী ব্যক্তি বিতর্কমূলক রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং তাঁদের অনেক রচনা বাংলা সাহিত্যে আজও অমর হয়ে আছে। বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধি সাধনে এবং তার আঙ্গিক বৈচিত্র্য সৃষ্টিতেও বিতর্করচনার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বিগত শতকের বিতর্করচনার সাহিত্যিক মূল্য নির্ণয়ে মনোযোগী হলেই এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা যাবে।

অতএব বলা যায়, সুকুমার সাহিত্যের সম্মান না পেলেও বিতর্করচনাকে সাহিত্যের আসরেই স্থান দিতে হবে।

এবার বাংলা বিতর্করচনার বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা কতখানি তা দেখা যাক। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র নানা ক্ষেত্রের বহুবিধ সমস্যা নিয়েই বিগত শতকের জ্ঞানী, গুণী ও সচেতন মানুষ বিতর্কমূলক পুস্তকপুস্তিকা রচনায় মনোযোগী হয়েছিলেন। ঐ সব বিষয়ে লেখা বিতর্করচনাকে আমরা নিম্নলিখিত শ্রেণী সমূহের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি :

১। সমাজসংস্কার বিষয়ক—

(ক) সতীদাহ প্রথা নিবারণ

(খ) বিধবাবিবাহ প্রবর্তন

(গ) কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথা নিবারণ

(ঘ) স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন

স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্তন বিষয়ক বিতর্করচনা আসলে শিক্ষা সংক্রান্ত রচনারই অন্তর্ভুক্ত ; কিন্তু বিগত শতকের প্রায় সব প্রধান সমাজসংস্কার আন্দোলনের মূলে নারীকল্যাণই লক্ষ্য ছিল বলে স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন ও তৎসংক্রান্ত বিতর্ক-রচনাকে সমাজসংস্কার আন্দোলন বিষয়ক বিতর্করচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(ঙ) বাল্যবিবাহ প্রথা রদ

(চ) পণপ্রথা ও কন্যাবিক্রয় প্রথা বিলোপ

(ছ) মদ্যপান নিবারণ

(জ) জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণ

(ঝ) হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা

২। ধর্মান্দোলন সংক্রান্ত—

এই বিষয়ক বিতর্করচনায় তিনটি দিক লক্ষণীয় :

(ক) খ্রীষ্টান মিশনারী ও হিন্দুধর্মাবলম্বীর আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ।

(খ) সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বী ও ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীর পারস্পরিক মত বিনিময়।

(গ) রক্ষণশীল হিন্দু ও উদারপন্থী সংস্কারমুক্ত হিন্দুর মতামতের লড়াই।

৩। শিক্ষাসংক্রান্ত—

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন বাঞ্ছনীয় কিনা, মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত কিনা ইত্যাদি বিষয়েও সে সময় বেশ মসীযুদ্ধ হয়েছিল।

৪। রাজনৈতিকবিষয় সংক্রান্ত।

৫। সাহিত্যের বিষয় ও রুচি সংক্রান্ত।

বিষয়বস্তুগত এই বিভাজন থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, বিতর্করচনার ব্যাপকতা ছিল খুবই বেশি। তবে আমাদের আলোচ্য বিষয় অত ব্যাপক নয়। বিগত শতকের প্রধান প্রধান সমাজসংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক-পুস্তকাদি রচিত হয়েছিল, তাদের নানাদিক পর্যালোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

বাংলাভাষায় বিতর্কমূলক রচনার রীতিমত আত্মপ্রকাশ ঘটে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে; তার আগে নয়। অথচ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সূচনা দেখা দিয়েছিল আনুমানিক দশম শতাব্দীতে। এজন্যে প্রশ্ন এসে যায়, বিতর্ক রচনার আবির্ভাবে এত বিলম্ব ঘটলো কেন। এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের জন্যে বাংলা ভাষার আদিমতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' রচনার সমসাময়িক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার বিচারবিশ্লেষণ থেকেই যাত্রা শুরু করা প্রয়োজন। একথা আমাদের জানা, সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচিত হওয়া সম্ভব নয়; বিতর্ক-রচনা সম্বন্ধে একথা বিশেষ ভাবেই সত্য। কাজেই বিতর্করচনার সূত্রপাতের কারণ সন্ধানের জন্যে সমসাময়িক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয়।

বলা হয়েছে, বিতর্করচনার মূলে বিতার্কিকদের মতভেদের বলিষ্ঠতা নিহিত থাকে। 'বলিষ্ঠতা' শব্দটিকে একটু বিশেষভাবেই বুঝতে হবে। কেননা মতভেদ থাকলেই হয় না, ঐ মতভেদের মূলে থাকা চাই দৃঢ় বিশ্বাস—কঠোর আত্মপ্রত্যয়। বিতার্কিকের জীবন দর্শনের নিষ্ঠার মধ্যেই আবার দেখা দিয়ে থাকে এই বিশ্বাস—এই আত্মপ্রত্যয়। এক কথায় বলা যেতে পারে বিশিষ্ট জীবন দর্শনঋদ্ধ মানুষের নিজস্ব জীবনবোধ সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয় না থাকলে কোন বলিষ্ঠ স্বকীয় মতবাদ গড়ে উঠতে পারে না। ব্যক্তিত্বের দীপ্তি, অহং-ভাববিযুক্ত আত্মসচেতনতার ঋজুতা এবং দীপ্র বুদ্ধিশক্তি না থাকলে মানুষের মধ্যে কোন বলিষ্ঠ মতবাদ দেখা দেয় না; আর তা' দেখা না দিলে ভিন্ন মতের বিরুদ্ধে আপন মতের পক্ষে তর্ক করাও তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। উনিশ শতকের আগে সমাজে এমন মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল কিনা তাও তাই সম্যক অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

চর্যাপদের আবির্ভাব ও বিকাশ ঘটেছিল পালরাজাদের আমলে। অবশ্য এর ধারা সেন আমলেও প্রসৃত হয়েছিল। পাল আমলে দেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল দৃঢ় ভিত্তির ওপর। রাজার মর্যাদা তখন দেবমর্যাদারই সমতুল বলে গণ্য হতো। রাজশাসন তখন ক্ষণভঙ্গুর ছিল না। অবশ্য মাঝে মাঝে রাজায়

রাজায় যে বিরোধ ঘটেনি তা নয়; কিন্তু তাহলেও বলা যায়, রাজশাসন সে যুগে দৃঢ় ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। পালরাজাদের আমলে বৌদ্ধধর্ম ছিল রাজধর্ম। কিন্তু উদারপন্থী পালরাজারা অন্যধর্মকে কখনও অপমানিত করবার চেষ্টা করেন নি। রাজধর্মকে তাঁরা জোর করে প্রজার ওপর চাপিয়ে দেন নি। এজন্যে সে যুগে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ধর্মকলহও দেখা দেয় নি। ধর্মকলহ না হবার অন্য কারণও অবশ্য ছিল। যাই হোক, ঐ কলহকে কেন্দ্র করে সে যুগে সমাজ রীতিমত উত্তাল হয়ে উঠতে পারতো। আর ঐ পরিবেশে বিতর্করচনার আবির্ভাবও সম্ভাবিত হতে পারতো। কিন্তু না, তা হবার সম্ভাবনা ছিল না আদৌ। কেননা দেখা গেছে, শক্তিশালী হয়েও বৌদ্ধধর্ম তখন সনাতন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেনি। অন্য ধর্মও ছিল অনাক্রান্ত। উনিশ শতকে বিতর্করচনা গড়ে উঠেছিল প্রধানতঃ এই ধর্মকলহকেই কেন্দ্র করে, কিন্তু আলোচ্য যুগে তেমন কোন কলহ ছিল না।

আবার দেখা যায়, রাষ্ট্রিক শাসনের সুস্থিরতা ও রাজতন্ত্রের অপ্রতিহত প্রভুত্বে মানুষের বিশ্বাস থাকায় সামাজিক কোন উপপ্লবের সম্ভাবনাও তখন দেখা দিতে পারেনি। একথা আমাদের জানা আছে, পুরনো জীবন দর্শনে যখন পরিবর্তন আসে বা পুরনো জীবনধর্মের পরিবর্তে যখন নতুন কোন জীবন-ধর্ম অবলম্বনের তাগিদ দেখা দেয় তখনই সমাজ ও সামাজিকের মধ্যে জেগে ওঠে মতামতের লড়াই। ঠিক ঐ পরিবেশেই দেখা দিতে পারে বিতর্কমূলক রচনার সম্ভাবনা।

কিন্তু না। তেমন কোন পরিবেশও ছিল না চর্যাপদ রচনার সময়; তার বিকাশ ও বিলুপ্তির কালেও তা দেখা দেয় নি। নতুন কোন জীবন-পদ্ধতির প্রয়োজন তখন কেউ বোধ করেছে বলে জানা নেই। প্রচলিত জীবন-চর্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন বা সংশয়ও তখন দেখা দেয় নি। কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আবি-র্ভাবও সে সময় ঘটে নি। কাজেই বিতর্কমূলক রচনার আভাস ঐ যুগে আর দেখতে পাওয়া যায়নি। লোক-চক্ষুর আড়ালে পরিচিত বাস্তব জীবনের বাইরে নিভৃত প্রদেশে বসে অক্ষুব্ধ সাধকদের পক্ষে তাই চর্যাপদ রচনাই তখন স্বাভাবিক ছিল।

পালযুগের শাসন ব্যবস্থায়, আগেই বলা হয়েছে, সুশৃঙ্খলা ছিল। তবে দেখা যায়, ঐ যুগে দেশে সামন্ততন্ত্রেরও বিকাশ ঘটেছিল। আমলাতন্ত্রের বাড়াবাড়ি তো ছিলই। কিন্তু তবুও প্রজারা তাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে নি আদৌ। ঐ সব ব্যাপার মেনে নেওয়াই উচিত বলে তারা বুঝে নিয়েছিল। ফলে সমস্যা

থাকলেও দৈব বলেই তাকে বিশ্বাস করেছিল সকলে। পরবর্তীকালে এই পালরাজত্বে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই সেন রাজারা বসেছিলেন বাংলার সিংহাসনে। সেন রাজত্বের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিজয় সেন। দেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অবস্থা প্রথম সংহত ও শৃঙ্খলিত হয়েছিল তাঁরই আমলে। অবশ্য পরে তার বিকাশ ঘটেছিল আরও বেশি। কিন্তু সেন রাজাদের মুশকিল হলো একটি ; বাঙালী তাদের আপনজন বলে গ্রহণ করতে পারে নি একেবারে। তারা যে বহিরাগত, বাঙালী তা ভুলতে পারে নি কখনও। ঐতিহাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বিখ্যাত 'বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব'—এ বলেছেন, "এই রাষ্ট্র ও রাজবংশ বাংলার ও বাঙ্গালীর নয়। কবি উমাপতি ধর কিংবা শ্রীহর্ষ বিজয় সেনের, কিংবা পরবর্তী সভাকবিরা সেন রাজাদের স্তুতি ও চাটুবাদে যতই উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকুন না কেন—রাষ্ট্র বা রাজপ্রসাদপুষ্ট কবিরা তো তাহা হইয়াই থাকেন—সমসাময়িক বাঙ্গালী জনসাধারণ এই রাজবংশকে আপনারজন বলিয়া মনে করিয়াছিল, একথা মনে করা কঠিন।"

[বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব ; (১ম সং)—ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ; পৃঃ ৫০৩]

সেন আমলে পালরাজাদের শাসনধারা যে পরিবর্তিত হয়েছিল তা' নয় ; কিন্তু সামাজিক জীবনে এ যুগে নানা বৈষম্য দেখা দিয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে, পালরাজারা বৌদ্ধ হলেও প্রজাদের ওপর রাজধর্মের চাপ এসে পড়ে নি। সর্বধর্মের প্রতিই পালরাজাদের একটি মহৎ উদারতার ভাব ছিল। সেন আমলে কিন্তু এমনটি হয় নি। সেন রাজারা গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিরূপতা এযুগে বেশ দেখা দিয়েছিল।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষণ ও প্রসার প্রচেষ্টায় নিম্নশ্রেণীর মানুষ এই সময় মানবিক মর্যাদা থেকেও বঞ্চিত হয়েছিল। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এই সময়-কার অবস্থা সম্বন্ধে বলেছেন, "বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজ ভেদবুদ্ধিদ্বারা আচ্ছন্ন, স্তরে উপস্তরে দুর্লঙ্ঘ্য সীমায় বিভক্ত, রাজসভাচরিত্রও আত্মশক্তিহীন। ধর্ম ও সমাজ বিলাস-লালসায় ও যৌনাতিশয্যে পীড়িত ; শিল্প ও সাহিত্য বস্তু সম্বন্ধ বিচ্যুত ভাবকল্পনার জগতে পল্লবিত বাক্য, উচ্ছ্বাসময় অত্যুক্তি, আলঙ্কারিক আতিশয্য এবং দেহগত লীলা-বিলাসে ভারগ্রস্ত ও মদির ; জনসাধারণের দেহমন বৌদ্ধ বজ্রযান-সহজযান প্রভৃতির এবং তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য ডাকিনী-যোগি-

নীদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড তুকতাকে পঙ্গু; উচ্চতর বর্ণ সমাজ ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে আড়ষ্ট।"

[তদেব ; পৃঃ ৫২৯]

এই তথ্য থেকে বোঝা যায়, সেন রাজাদের আমলে মানুষের মধ্যে নীতিগত অধঃপতন বেশ গ্লানিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য একথাও সত্য, এক শ্রেণীর সত্য-নিষ্ঠ আদর্শবান মানুষ ঐ অবস্থার কালিমা স্পর্শ থেকে নিজেদের সযত্নে সরিয়েও রেখেছিলেন। অর্থাৎ সমাজে তখন নৈতিক আদর্শের বিভিন্নতা বেশ তীব্রভাবেই উপলব্ধ হতো। এই যে আদর্শের বিভিন্নতা, সাধারণভাবে বলা যায়, তারই পরবর্তী স্তর আদর্শগত সংঘাত, এবং তারই ফলে দেখা দেয় নৈতিকতা নিয়ে বাদ-বিতণ্ডা, এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরের আত্মপক্ষ সমর্থন। বিতর্কমূলক রচনার প্রয়োজন অনুভূত হয় এই পরিবেশেই। কিন্তু না; সেন আমলেও বিতর্করচনার আবির্ভাব ঘটে উঠলো না। জীবনচর্যার আদর্শগত বিভিন্নতাই সে যুগে ছিল—পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধিতা ছিল না; কাজেই আদর্শের সংঘাত বা নীতির লড়াই বলতে আর কিছুই দেখা দিল না। সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ উৎকট ভাবে অধঃপতিত জীবনের কলুষতায় নিমজ্জিত হয়ে থাকলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সনাতন হিন্দুধর্মাদর্শ ও সাধারণ রীতি-নীতি মেনে চলবারই চেষ্টা করতো। বস্তুতঃ নগরবাসীর মধ্যেই দেখা দিয়েছিল তখন নৈতিক অধঃপতন। সাধারণতঃ দেখা যায়, উচ্চশিক্ষা ও নতুন আদর্শের পথ উন্মুক্ত হয় প্রথমে নগর ও নগরেরই চতুঃসীমায়। সেখানেই মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে নতুন চেতনায়। তারাই খুঁজে পায় প্রথম জীবনের বলিষ্ঠ আদর্শ। শহরেই শোনা যায় তাই গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে প্রথম জেহাদ ঘোষণা। বহু দিনের ভ্রান্তবিশ্বাস ও জীবনবোধে তাতেই লাগে মৃত্যুর আঘাত। বিরোধিতাও অবশ্য থাকে। গতানুগতিকতার প্রতিআক্রমণও কম তীব্র হয় না। এই আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের ফলেই সৃষ্ট হয় সমাজে তর্ক-বিতর্কের পালা। তারই অন্যতম প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতির নাম বিতর্করচনা। কিন্তু সেন আমলে নগরজীবনে ছিল শুধুই বিলাসী মানুষের কলুষতা : বলিষ্ঠ জীবনবোধের কোন সক্রিয়তাই সেখানে ছিল না। এর ফলে সে যুগে বিতর্কমূলক রচনার সম্ভাবনাও আর দেখা দিল না।

আলোচ্যযুগে মানুষের মন কোন কিছু হারাবার ভয়ে ভীত ছিল না—যা চলছে চলুক মেনে নেবার এই মনোভাবের জন্যে বিক্ষোভও মানুষের মধ্যে ছিল

অনুপস্থিত। বড় কিছুর প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষাও তারা পোষণ করতো না। গতানুগতিকতায় ভেসে যাওয়াকেই তারা মনে করতো তাদের চলা। সে যুগের কাব্যাদিতে এরই পরিচয় পাওয়া যায়। দারিদ্র্য এবং নিদারুণ সামাজিক অবিচারের চিত্র যে সে যুগের সাহিত্যে নেই তা নয়; ধর্মীয় নিষ্ঠুরতার কথাও সেখানে স্পষ্ট। অর্থাৎ সমাজে ঐ সব বহালতবিয়েতেই ছিল; কিন্তু ঐ দারিদ্র্য বা নিষ্ঠুরতা সামাজিকের মনে সেদিন কোন প্রশ্নই জাগাতে পারে নি। প্রশ্ন থেকেই তো মানুষ ধীরে ধীরে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে—বিতর্কমূলক রচনার ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয় ঐভাবে। কিন্তু আলোচ্য যুগে সে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নি। মানুষের মধ্যে তখন ঐ মেনে নেবার মনোভাবই প্রধান হয়ে উঠেছিল। "প্রাকৃত পৈঙ্গল"-এ সংকলিত একটি পদে রচয়িতা বলেছিলেন—

"সের এক্ক জই পাঅই ঘিত্তা
মণ্ডা বীস পকাইল ণিত্তা।
টঙ্ক এক্ক জই সিন্ধব পাআ।
জো হউ রঙ্ক সো হউ রাজা॥"

[প্রাকৃত পৈঙ্গল—চন্দ্রমোহন ঘোষ সম্পাদিত]

যেখানে একসের ঘি পেলে মহাসুখ, এক টাকার সৈন্ধব লবণ পেলে রাজা হবার আনন্দ সেখানে মানুষ নতুন ভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের বা গতানুগতিক জীবন ধারার বাইরে ভাবতে পারবে কি করে?

'চর্যাপদ' রচনার কালে অর্থাৎ পাল ও সেন রাজাদের আমলে (তুর্কী আক্রমণের আগে পর্যন্ত) ধর্মের দিক থেকে প্রাধান্য পেয়েছিল বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। ঐ যুগে ধর্ম কলহ না থাকলেও এই দুই ধর্মের মানুষ কিন্তু পরস্পর পরস্পরকে অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করে থাকতো। সামাজিক ক্ষেত্রে জাতি ও ধর্মের স্বাতন্ত্র্য চিন্তাও অদৃশ্য ছিল না একেবারে। চর্যাপদের মধ্যে আমরা তার পরিচয় পেয়ে থাকি। যেমন—

"নগর বারিহিরে[১] ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছই ছোই যাই সো বাহ্ম[২] নাড়িয়া॥ ধ্রু॥"

কিন্তু এই উক্তির মধ্যে কোন প্রতিবাদ নেই। সমাজে যেমনটি ছিল

"১='বাহিরে'" (টীকার পাঠ)।

২ টীকা অনুসারে "ব্র(া)হ্মণ।" [চর্যাগীতি-পদাবলী (১৯৬৬)—ডঃ সুকুমার সেন; পৃঃ ৬৫]

তেমন অবস্থাটিকেই শুধু প্রয়োজনবোধে আপন বক্তব্য প্রকাশের জন্যে দৃষ্টান্ত হিসেবে পদকর্তা তুলে ধরেছেন। ব্রাহ্মণ ও ডোমের ঐ সামাজিক অবস্থাকে এখানে বরং মেনেই নেওয়া হয়েছে। বস্তুত: সমাজে যে অবস্থা ছিল ঠিক তারই হুবহু বর্ণনা এখানে আমরা পেয়ে থাকি।

ধর্মকলহ সমাজে তর্ক-বিতর্কের পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু বৌদ্ধ পালরাজা বা ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সেন অধিপতিদের রাজত্বে যথার্থ ধর্ম-কলহ দেখা দেয় নি আগেই সে কথা উল্লিখিত হয়েছে। পাল আমলে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের অন্যধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা ছিল; কাজেই বিরোধ সেখানে দেখা দেওয়া সম্ভব নয়। সেন আমলে অবশ্য বৌদ্ধদের প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বীদের আক্রমণ ঘটে থাকতো। কিন্তু তাও বিশেষ কারণে ধর্মযুদ্ধের বা ধর্মকলহের কারণ হয়ে উঠতে পারে নি।—বৌদ্ধধর্ম নানা কারণেই পাল আমলের শেষ ভাগ থেকে সংকুচিত হয়ে পড়ছিল। সেন আমলে রাজাদের বৌদ্ধ-বিরক্তি পরবর্তীকালে ঐ ধর্মের অবনতিকে আরও ত্বরান্বিত করেছিল। দুর্বল বৌদ্ধধর্ম তাই ব্রাহ্মণ্যধর্মের আক্রমণ ও প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করবার কোন সক্রিয় চেষ্টাই করতে পারে নি। হিন্দুধর্ম তখন বেশ সুনিয়ন্ত্রিতই ছিল। এই ধর্মের মধ্যে সম্প্রদায়ের সংখ্যা কম ছিল না; কিন্তু তাদের ভেতরও তেমন কোন বিরোধিতা বা কলহের মনোভাব ছিল না। থাকলেও তা কোন সামাজিক বা ধর্মীয় সংঘর্ষের কারণ হয়ে উঠতে পারে নি। অর্থাৎ হিন্দুধর্ম যে তখন বেশ নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবেই সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। তাহলে বলা যায়, সমাজে তখন একদিকে ছিল দুর্বল বৌদ্ধধর্ম, অপর দিকে ছিল শক্তিশালী ব্রাহ্মণ্যধর্ম। এহেন অবস্থায় বৌদ্ধধর্মকে আত্ম-রক্ষার চেষ্টা বিহীন অবস্থাতেই থাকতে হয়েছিল। তাই ধর্মকলহের সম্ভাবনা সেন যুগেও দেখা দিতে পারে নি।

বাংলাদেশের ইতিহাসে তুর্কী আক্রমণ ছিল এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাঙালীর জীবনে ঐ ঘটনা, বলা যায়, এক অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা। এবার দেখা যাক, এই জীবনবিপর্যয়কারী ঘটনা সমাজে বিতর্কমূলক রচনার পটভূমি প্রস্তুত করতে পেরেছিল কিনা। তুর্কী আক্রমণের নেতা ছিলেন বখ্‌তিয়ার খিলজী। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকেই জয় করেছিলেন তিনি বাংলা দেশের নবদ্বীপ। লক্ষ্মণাবতী জয় করেছিলেন তিনি তারপরে। তুর্কী আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে সেন রাজাদের শাসন ব্যবস্থাতে দেখা দিয়েছিল শিথিলতা।

সামন্ততান্ত্রিকতার প্রাধান্য ঘটেছিল এই যুগেই বেশি। সেনরাজাদের এই দুর্বলতাকেই তুর্কীশক্তি কাজে লাগিয়েছিল আপন স্বার্থে। দেশের মানুষের মধ্যে তখন আত্মশক্তি বলতে কিছুই ছিল না। অদৃষ্টবাদিতায় আচ্ছন্ন ছিল তাদের মন। এহেন অবস্থায় দেশের বলিষ্ঠ জীবনবোধ ও প্রতিরোধশক্তি থাকবার কথা চিন্তা করা যায় না। তুর্কী সৈন্যরা তাই খুব সহজেই জয় করে নিয়েছিল সোনার বাংলা। তাদের আক্রমণে ও জয়ে বাঙালীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ধর্মীয় এবং নৈতিক জীবনে নেমে এসেছিল অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের অস্থিরতা। তুর্কী সৈন্যরা বিবেকহীন ভাবে ধ্বংস করেছিল বুদ্ধ ভক্তদের বিহার, সনাতন হিন্দুদের মন্দির। এই বিপর্যয়ের চিত্র সাহিত্যেও তুলে ধরা হয়েছিল। অথচ আশ্চর্য, বিপর্যস্ত বাঙালী তুর্কীশক্তিকে হিন্দু দৈবশক্তিরই রূপভেদ বলে মনে করে নিজেদের সঁপে দিয়েছিল ভাগ্যের হাতে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এর নিদর্শন খুবই স্পষ্ট।—

"ধর্ম্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথা এত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিরূচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥৬
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলেত দম্বদার।
জতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেত পরিল ইজার ॥৭
ব্রহ্ম হৈল মহামদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল স্থলপানি।
গণেশ হইআ গাজী কার্ত্তিক হৈল কাজি
ফকির হইল্যা জত মুনি ॥৮"

[শূন্যপুরাণ (রামাই পণ্ডিত)—নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত ; ১৩১৪, মাঘ ; পৃঃ ১৪১]

হিন্দু দেবতাগণের এই রূপভেদ কল্পনার মধ্যে, বলা বাহুল্য, অসহায় বিপর্যস্ত মানুষের পলায়নী মনোভাবই ব্যক্ত হয়ে উঠেছে। এই মানসিকতায় না থাকে আত্মবিশ্বাস—না থাকে বলিষ্ঠ জীবনচেতনা। এরই জন্যে তুর্কী আক্রমণের

পয়ে কোন আদর্শ বা বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করবার মনোভাব দেখা দিতে পারে নি সমাজে।

প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। তুর্কী আক্রমণে দেশের এক স্তরের জীবনে বিপর্যয়ের চূড়ান্ত ঘটলেও একেবারে সাধারণ মানুষের জীবনে তার ঢেউ তেমন আঘাত হানতে পারে নি। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "এই অধিকার প্রসার উপদ্রবহীন ছিল না বটে কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিতে খুব একটা আঘাত পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।"

[বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম. পূর্বার্ধ ; ৫ম সং]—ডঃ সুকুমার সেন ; পৃ: ৮৩]

বস্তুতঃ বৃহত্তর সমাজে প্রাক্ তুর্কীআক্রমণ যুগের গতানুগতিক ভাব-ভাবনা ও জীবনচর্যার ধারাই বহতা ছিল ; এজন্যে আগের মতো এ সময়েও বিতর্কমূলক রচনার প্রেক্ষাপট আর গড়ে উঠতে পারে নি।

তবে যে ধর্মকলহ সমাজে বিতর্কমূলক রচনার পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে সেই ধর্মকলহের কারণ কিন্তু তুর্কী আক্রমণে প্রবল হয়ে উঠেছিল। হিন্দু ও অ-ইসলাম অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে তুর্কীসৈন্যদের বিরোধিতা ও অত্যাচার কম ছিল না। এর ফলে অন্যধর্ম রুখে দাঁড়াতে পারতো আত্মরক্ষার চেষ্টায়। কিন্তু তা আর হতে পারে নি ; কারণ তা সম্ভবপর ছিল না।

বস্তুতঃ তুর্কী আক্রমণের অব্যবহিত পরেই শুধু নয়, সমগ্র মধ্যযুগেই অমুসলমান (বিশেষভাবে হিন্দু) এবং মুসলমান ধর্মের মধ্যে একটি বিরোধ রয়েই গিয়েছিল ; কিন্তু আশ্চর্য এখানেই ঐ বিরোধ কোনদিন তীব্র সামাজিক সমস্যার রূপ নিতে পারে নি। বিরোধের চিত্র ও ভেদ মুছে ফেলবার জন্যে নানা মনস্বী ও ধার্মিক ব্যক্তি তখন উপদেশও দিয়ে থাকতেন। কিন্তু বিরোধ ঠিক থেকেই যেতো ; তবে সত্যি কথা বলতে কি, সমাজের মানুষের কাছে ঐ বিরোধ একরকম গা সহাই হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে তুর্কী আক্রমণের পরে কেন— সমগ্র মধ্যযুগেই কোন বিপর্যয়কারী ধর্মকলহ সমাজে দেখা দিতে পারে নি।

পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে বাংলাদেশের অধিপতি ছিলেন হোসেন শাহ। তুর্কী আক্রমণের পরে দেশে বহুদিন পর্যন্ত নানা অশান্তি চলে আসছিল ; কিন্তু হোসেন শাহের আমল থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রে একটি স্থিতাবস্থা দেখা দিতে পেরেছিল এবং তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে দেশে সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার একটি পরিবেশও গড়ে উঠছিল। কিন্তু তবুও দেখা যায়, এযুগে ধর্মকলহ একটি প্রবল

রূপ নেবার পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। বস্তুতঃ এই শতকের শেষ ভাগ থেকে দেশে ধীরে ধীরে নানা ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের কঠোরতা দেখা দিতে শুরু করেছিল। এর সামগ্রিক ফল হিসেবে সমাজে বেশ একটা অসন্তোষও জেগে উঠেছিল। জাতিভেদের জটিলতাও তখন খুব বেড়ে গিয়েছিল।—ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যও প্রকটিত হচ্ছিল। হিন্দুমুসলমান বিরোধ সাধারণভাবে সকলে মেনে নিয়েছিল বটে, তবে ঐ বিরোধ এ সময় প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে হিন্দুসমাজের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আচার-আচরণ প্রচলিত ছিল সেখানে সংকীর্ণতার চিহ্ন প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের প্রতি উদার মনোভাব নিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতো খুবই সামান্য। নৈতিক মানদণ্ডও তখন ভেঙ্গে পড়েছিল। দেশের এমন একটা সামাজিক ধর্মীয় অবস্থাতেই আবির্ভাব ঘটেছিল চৈতন্যদেবের। তিনি ছিলেন প্রেমধর্মের প্রচারক। কিন্তু তিনি শুধু প্রেমিক নন; প্রেমের কোমলতাই তাঁর চরিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল না। পৌরুষের কঠোরতাও ছিল তাঁর অন্যতম গুণ। উনিশ শতকে নবচেতনার আলোকে উদ্দীপ্ত মানুষ যেমন প্রচলিত অযৌক্তিক প্রথা বা রীতি-নীতির ওপর আঘাত হেনেছিলেন, ঠিক অতটা না হলেও চৈতন্যদেবের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ মানুষও তেমনি অনেক প্রচলিত অবাঞ্ছিত সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি ও বিশ্বাসের ওপর আঘাত হেনেছিল। ঐ আঘাতেও সমাজ ও ধর্মে অনেক কল্যাণজনক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। প্রেমের ধর্মকে হাতিয়ার করে চৈতন্যদেব জাতিভেদের গণ্ডী একেবারে মুছে ফেলতে না পারলেও তাকে অনেক-খানিই অস্পষ্ট করে দিতে পেরেছিলেন। নানা ধর্মের পারস্পরিক কলহের ঝড়কেও তিনি অনেকখানি শান্ত করেছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে চৈতন্যদেব স্থানীয় শাসকের আদেশের বিরুদ্ধে যেভাবে নিজের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করেছিলেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে। পৌরুষদীপ্ত ব্যক্তিত্বের জন্যে তিনি কাজীকে পরাজিত করে বৈষ্ণবদের ধর্মচর্চাকে অবাধ করেছিলেন এবং মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সৎ উদ্দেশ্যে সংবদ্ধ জনসমষ্টির কাছে অন্যায়কারী শাসকও নমিত হতে বাধ্য হয়। ধর্মই হোক, সমাজই হোক,—সবক্ষেত্রেই আত্মরক্ষার জন্যে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই আত্মরক্ষার শক্তিতেই তিনি উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছিলেন বাঙালী জীবনকে। বস্তুত: তিনি ছিলেন প্রেম ও তেজের,—মধুর ও রুদ্রের হরগৌরী মূর্তি।

কিন্তু আফশোষ এখানেই, তাঁর মহৎ প্রেমের আদর্শও যেমন অনুসৃত হয় নি

তেমনি তাঁর দৃপ্তপৌরুষেরও মর্যাদা বাঙালী বোঝে নি। তাঁর পৌরুষের কঠোরতা তো বরং ভক্তরা চাপা দেবারই চেষ্টা করেছিলেন। চৈতন্যদেবের জীবিতকালেই তাঁর ঐ পৌরুষ বাঙালী গ্রহণ করতে পারে নি। অবশ্য একথাও সত্য, শেষ দিকে চৈতন্যদেবও প্রেমাবেশে বিভোর হয়ে আপনার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি হারিয়ে ফেলেছিলেন। যোগ্যনেতৃত্বে কাজীর বিরুদ্ধে সংকীর্তনকারীর দল নিয়ে গিয়ে যে চৈতন্যদেব তাদের বলেছিলেন—

"ভাঙ্গিব কাজির ঘর কাজির দুয়ারে।
কীর্ত্তন করিব, দেখোঁ কোন্ কর্ম করে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস।
মুঞি বিদ্যমানেও কি ভয়ের প্রকাশ॥
তিলাদ্ধেকো ভয় কেহো না করিহ মনে। ...

[শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবনদাস; গৌরাঙ্গহরি পাল প্রকাশিত ও প্রচারিত; ১৩৭৮। পৃঃ ২৭২]

সেই চৈতন্যদেবের স্বরূপ মুছে ফেলতে বৈষ্ণবগুরুরাও কম চেষ্টা করেন নি। কিন্তু তাঁরা প্রেমবিহ্বল চৈতন্যের যে রূপটি লোকসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন তাতে বাঙালী শেষ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় ও দুর্বলই হয়ে পড়েছিল।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' থেকে জানা যায়, চৈতন্যদেব প্রেমধর্মের প্রচারক হয়েও সেই ধর্মের প্রতিষ্ঠায় এবং বিরুদ্ধশক্তির বিরুদ্ধে আপন মত প্রতিষ্ঠায় কি কঠোরই না ছিলেন—

"ক্রোধে বলে প্রভু" আরে কাজি বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেলোঁ মাথা॥
... ...
প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।
"ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ" প্রভু বলে বারবার॥"

[তদেব; পৃঃ ২৮১-২৮২]

পৌরুষদীপ্ত অগ্নিগর্ভ মন নিয়ে চৈতন্য আরও বলেছিলেন—

"প্রভু বলে অগ্নিদেহ বাড়ীর ভিতর॥
পুড়িয়া মরুক সবগণের সহিতে।
সর্ব বাড়ী বেঢ়ি অগ্নি দেহ চারিভিতে॥"

[তদেব; পৃঃ ২৮২]

কিন্তু এই চৈতন্যমূর্তি বাঙালী ভুলে গিয়েছিল দিনে দিনে—তাদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল একথাও অবশ্য বলা যায়। চৈতন্যদেবকে দেবতার অবতার বানিয়ে মানুষ চৈতন্যের স্বরূপটিকে এক শ্রেণীর ভক্ত ও শিষ্য একেবারেই গৌণ করে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন; অথচ আশ্চর্য, চৈতন্যদেব নিজেকে ঈশ্বররূপে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। রামানন্দ রায়কে তিনি প্রসঙ্গক্রমে একবার বলেছিলেন—

"প্রভু কহে, আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥ ৪৮ ॥
শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্র সর্বলোকে গায় ॥
... ...
... পূর্ণ যেছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দুপাতে কেহো না করে পরশ ॥ ৫১ ॥"

[শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত; প্রথম প্রকাশ; পৃঃ ২৪৩]

কিন্তু চৈতন্য বললে কি হবে, ভক্তরা তা শুনতে চান নি; এই কারণেই চৈতন্যের প্রভাব সামাজিক জীবনে যেমনটি হতে পারতো, ঠিক তেমনটি আর হতে পারে নি।

কাজেই বলা যায়, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে দেশে আত্মবোধ ও আত্মরক্ষার স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠলেও এবং ধর্মকলহে নিমগ্ন কুসংস্কারে আবদ্ধ পঙ্গু সংকীর্ণতাদুষ্ট জাতির বক্ষদেশে নবচেতনার আঘাত ঘটলেও বিতর্করচনা সৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ তখনও গড়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। নিছক একটা অস্থির চঞ্চলতায় সামাজিক মন যেন কিছুদিন একটা ঘোরের মধ্যেই কাল কাটিয়ে চুপ হয়ে গেলো। তাছাড়া চৈতন্যযুগের জাগরণটি প্রধানতঃ আধ্যাত্মিকতানির্ভর ছিল বলে মানুষকে তা প্রধানতঃ ভাবের পথেই চালিত করেছিল—ভাবনার পথে নয়। আবেগে বিশ্বাস করা সহজ—তর্ক করা কঠিন। বুদ্ধিবাদের জন্ম না হলে মানুষের মনে কোন বিষয়েই প্রশ্ন জাগে না—বুদ্ধির দৃঢ় ভিত্তি না থাকলে কারও বিরুদ্ধে আপনার পক্ষ নিয়ে তর্ক করাও সম্ভব নয়। চৈতন্যযুগে এই বুদ্ধিবাদের তথা যুক্তিবাদের অভাবহেতু মানুষের মনে কৃষ্ণপদ ছাড়া আর কিছু স্থান পায় নি।

চৈতন্যযুগে সমাজজীবনে আত্মরক্ষার বোধও দেখা দেয় নি ব্যাপকভাবে। ভয়ে নতি স্বীকার করা বা ভয়ে সত্য গোপন করা বা বিরুদ্ধ শক্তির ভয়ে

আপনার বিশ্বাস বিসর্জন দেওয়া সর্বক্ষেত্রেই যে দেখা যেতো তা নয়। এই জন্যেই চৈতন্যভক্ত চন্দ্রশেখর তার পূজ্য দেবমূর্তিকে যবনদের বিরুদ্ধে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে বলিষ্ঠ অসহযোগপন্থায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন ; চৈতন্যদেবের কাজী-দমন ঘটনা তো রয়েছেই। কিন্তু আপন মত ও বিশ্বাস রক্ষার এই আত্মিক শক্তি বৃহত্তর সামগ্রজীবনে সাধারণ সত্যরূপে জাগ্রত হতে পারে নি। ব্যক্তিনিচয়ের এই শক্তি বা মনোভাব কোন বৃহৎ সামাজিক বা ধর্মীয় প্রতিরোধ বা স্বপক্ষরক্ষিণী শক্তির রূপ ধারণ করে নি। অথচ তা না হলে বিতর্করচনার পটভূমিই রচিত হতে পারে না।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, আলোচ্যযুগে বিতর্কমূলক রচনা না থাকলেও প্রশ্নো-ত্তরমূলক পুস্তক-পুস্তিকা কিছু লেখা হয়েছিল। সপ্তদশ শতকেও এই ধরণের রচনা লক্ষ্য করা যায়। ঐ সময় মৌখিক তর্কযুদ্ধেরও প্রচলন ছিল। পরেও তা' বন্ধ হয় নি। তবে সেসব তর্ক প্রধানতঃ শাস্ত্রসম্পর্কিত। পরকীয়া মত খণ্ডনের জন্যে ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরের মহারাজা একদল পণ্ডিতকে নানা দেশে পাঠিয়েছিলেন, বাংলাদেশেও তাঁরা এসেছিলেন। ছয়মাস ধরে এখানে তর্ক চলেছিল। শেষে জয় ঘটেছিল পরকীয়া মতবাদের। এই বিতর্ক যদি লিখিতরূপ পেতো তাহলে হয়তো বিতর্কমূলক রচনার সূচনা ঘটতে পারতো।

প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারকার্য একটি বৃহৎ কর্মযজ্ঞের রূপ নিয়েছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের তিরোধানের অল্পসময়ের মধ্যেই ঐ ধর্মে দেখা দিয়েছিল নানা পরি-বর্তন নানা ব্যভিচার। সাধনপদ্ধতি নিয়েও মতভেদ প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল তখন। ডঃ সুকুমার সেন এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "চৈতন্যের তিরোধানের পরে ধীরে ধীরে বৈষ্ণবতত্ত্ব চিন্তায় ও সাধনাপদ্ধতিতে দুইটি মত স্পষ্ট এবং কতকটা পরস্পর বিরোধী হইয়া জাগিল। গোড়াতে মত দুইটিতে স্বতোবিরোধ ছিল না এবং যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহাদের কাছে কখনো দুই মতের মধ্যে বিরোধ প্রতি-ভাত হয় নাই। রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। যখন তাঁহাকে কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া কৃষ্ণলীলার সঙ্গে মিলানো হইল তখন রাধা স্বভাবতঃই কৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকা হইলেন।...সনাতন রূপের শাস্ত্রদৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণ প্রেম পুরাপুরি অধ্যাত্ম ভাবনার আশ্রয়। তাই সমাজ-সংস্কারে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের প্রতিফলন সম্ভাবনা তাঁহাদের বিব্রত করে নাই।" [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, অপরার্ধ, ২য় সং)– ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৪১-৪২]

পরবর্তী সময়ে এই মতবাদ নিয়ে স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠেছিল। জীব গোস্বামীর আমলে রাধাকৃষ্ণের প্রেম স্বকীয়ারূপে অভিহিত হয়েছিল। "গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা রাধাকে কৃষ্ণের পরকীয়া—অথচ—স্বকীয়া এই অনির্বচনীয় নায়িকা-বাদ মানিয়া লইলেন। তবুও মতভেদ রহিয়া গেল। বৃন্দাবনীয় বৈষ্ণবেরা প্রধানত স্বকীয়াবাদী হইলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা প্রধানত পরকীয়াবাদী রহিলেন। দুই দলের মধ্যে বাদবিতণ্ডা চলিত।" [তদেব ; পৃঃ ৪২]

১৭শ-১৮শ শতকেও এ নিয়ে বিচার বিতর্ক হয়েছিল। কিন্তু তবুও দেখা যায়, এই বিচার-বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও বিতর্কমূলক রচনা তখনও বাংলাভাষায় সম্ভাবিত হতে পারে নি।

অবশ্য একথাও সত্য, বিতর্কমূলক রচনার আবির্ভাব না ঘটলেও, মধ্যযুগে তার আভাস দেখা দিয়েছিল। বিতর্কমূলক রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য পরস্পরের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষণ তখনকার বাংলা সাহিত্যে খুবই প্রকট হয়ে উঠেছিল। ঐ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বড় কারণ ছিল সাম্প্রদায়িক বৈষম্য, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, নৈরাশ্যবোধ। দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টির আলোচনা করা যেতে পারে।—

বিজয়গুপ্ত ছিলেন পঞ্চদশ শতকের কবি। সে যুগে যে রূপেই হোক না কেন, হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ভেদাভেদ জ্ঞান ঠিকই বর্তমান ছিল। বিজয়গুপ্তের কাব্যে মুসলমান শাসক হিন্দুদের প্রতি কেমন ব্যবহার করতো তার বর্ণনা পাওয়া যায়।—

"সর্বক্ষণ হোসেনের আগে আগে আসে।
তাহার ভয়ে হিন্দু সব পালায় তরাসে॥
যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ॥
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্রকিল।
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল॥"

[পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল—বিজয়গুপ্ত ; ৪র্থ সং। বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সঙ্কলিত ; পৃঃ ৫৪]

হিন্দু ও মুসলমান কেউই তখন কাউকেও খুব একটা ভালো চোখে দেখতো না। (অবশ্য তাতে কোন সামাজিক দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়নি) ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য থেকে এর নজীর উদ্ধার করা যেতে পারে।—

"আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম।
কহি যদি হিন্দু পতি পাইবে সরম॥
সয়তানে বাজি ছিল না পেয়ে বেগবাণ।
ঝুটমুট পড়ি মরে আগম-পুরাণ॥
... ...
আর দেখ পাঁঠা-পাঁঠী না করি জবাই।
উভ চোটে কাটে বলে খাইল গোঁসাই॥
... ...
মাটী কাঠ পাথরের গড়িয়া মূরত।
জীউদান দিয়ে পূজে নানা মত ভূত॥
... ...
দাড়ী রাখে বাঁদী রাখে আর যবে খায়।
কান ফোঁড়ে টিকি রাখে এই মাত্র দায়॥
আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।
সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই॥

[ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী—বসুমতী সং, পৃঃ ১৪১-১৪২]

'পাতশা'র এই উক্তির জবাবে হিন্দু ভবানন্দের উত্তরটিও কম উল্লেখযোগ্য নয়—

"পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে।
ভাবি দেখ আগে হিন্দু মুসলমান পাছে॥
... ...
মাটী কাঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর।
পুরাণে কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর॥
তাঁহার মূরতি গড়ি পূজা করে যেই।
নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই॥
... ...
হিন্দুরে সুন্নত দিয়া কর মুসলমান।
কানে ছেঁদা মুদে যদি তবে সে প্রমাণ॥
কার সাজি যদি কর্ণ বেধে বল বাজী।
ভেবে দেখ সুন্নত বিষম কারসাজী॥

[তদেব ; পৃঃ ১৪২]

এই উত্তর প্রত্যুত্তরের মধ্যে এক ধরণের তার্কিকতা রয়েছে এবং বলাবাহুল্য, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষণও এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষণ শুধু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেই নয়, হিন্দুদের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখা যেতো। বাধ্যতামূলক ভাবে ধর্মপ্রচারের চেষ্টাও এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনও কখনও উৎকট হয়ে উঠতো। ডঃ সুকুমার সেনের "মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী" থেকে এ বিষয়ে তথ্য আহরণ করা যায়। তিনি বলেছেন—

"মল্লরাজারা তাঁদের অধিকার ভূমিতে বৈষ্ণব-আচার করলেন কঠোরভাবে আবশ্যিক। দেশের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলেও এর অনুকরণ হতে দেরি হয় নি। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই "বাধ্যতামূলক" বৈষ্ণবতার প্রভাব কিরূপ হাস্যকর হয়েছিল তার একটু উদাহরণ রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল থেকে দিচ্ছি—

রাজ্যের সহিত রাজা করে একাদশী,
পঞ্চবর্ণ দ্বিজ আদি থাকো উপবাসী।
চারামানা হাথিকে ঘোড়াকে মানা ঘাস,
দশমীর বাজ্যবাজে রাজার নিবাস।"

[মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী (১৩৬৯)—ডঃ সুকুমার সেন ; পৃঃ ৩৮-৩৯]

এখানেও ব্যঙ্গের উপস্থিতি এবং বৈষ্ণব রাজার প্রতি আক্রমণ দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

শাক্ত-বৈষ্ণবদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বও তখনকার সাহিত্যে কম পরিস্ফুট নয়। শাক্ত রামপ্রসাদ বৈষ্ণব বিদ্বেষী ছিলেন বলা হয়। তাঁর কাব্যে ঐ বিদ্বেষেরও পরিচয় পাওয়া যায়—

"খাসা চীরা বহির্ব্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে।
চিকন গুধড়ীগায় বাঁকা কোঁত্কা হাতে॥
মুঞ্জ-গুঞ্জ ছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব।
দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টি ছাড়া ভাব॥
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট।
ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট॥
এক একজনার ধুমড়ী দুটি দুটি।
দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটী॥"

[রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী (বসুমতী সাহিত্য মন্দির ; ৬ষ্ঠ সংস্করণ) 'বিদ্যাসুন্দর'—পৃঃ ৩২]

রামপ্রসাদও অবশ্য অপরের দ্বারা, রঙ্গের ছলে হলেও, আক্রান্ত হয়েছিলেন। "কালীকীর্তনে" রামপ্রসাদ প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন—

"উমার মধুর বেণু শুনিয়া শ্রবণে।
সারি সারি নিকটে দাঁড়ায় ধেনুগণে ॥"

[তদেব ; কালীকীর্ত্তন ; পৃঃ ৮]

সে যুগে বিখ্যাত আজু গোঁসাই ঐ বক্তব্যের জবাবে বলেছিলেন—

"না জানে পরমতত্ত্ব, কাঁটালের আমসত্ত্ব,
মেয়ে হোয়ে ধেনু কি চরায় রে।
তা যদি হইত, যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায় রে ॥"

[ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনী—ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, ১ম সং ; ১৯৫৮। পৃঃ ৬১]

রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাই-এর মধ্যে এমন বাদবিতণ্ডার আরও দৃষ্টান্ত রয়েছে।

মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে বিভিন্ন ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিরোধিতা ছিল, তার চিত্র মঙ্গলকাব্যগুলিতেই খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ঐ কাব্যগুলিতে দেখা যায়, দেবদেবীরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে আছেন ; কলহলিপ্তও তাঁরা হয়েছেন। এক দেব বা দেবী অপর দেব বা দেবীকে সহ্য করতে পারেন নি। ঐ যে তাঁদের বিদ্বেষভাব ও কলহ তার মধ্যে আসলে ভক্তদেরই মত-ভিন্নতা প্রকাশ পেয়েছে।

মধ্যযুগের সমাজে এক ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে নিচের অংশটুকু খুবই উল্লেখযোগ্য।—

"এতেক মন্ত্রণা করি বিনতানন্দন।
পাখাতে করিল ঘর অদ্ভুত রচন ॥
ভকত বৎসল রাম তাহার ভিতরে।
দাণ্ডাইল ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ ধরে ॥
ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে।
হনুমান দেখে বসি ভাবিতেছে দূরে ॥

হনূবলে প্রাণপণে করি প্রভুহিত।
পক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের পিরীত ॥
দেখিলেন হনূমান মহাযোগে বসি।
ধনু খসাইয়া পক্ষী করে দিল বাঁশী ॥
হনূমান বলে পক্ষী এত অহঙ্কার।
ধনুক খুলিয়া বাঁশী দিলে আরবার ॥
যদি ভৃত্য হই মন থাকে শ্রীচরণে।
লইব ইহার শোধ তোরি বিদ্যমানে ॥
বাঁশী খসাইয়া দিব ধনুঃ শর করে।
লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ অবতারে ॥"

[রামায়ণ—কৃত্তিবাস (সাহিত্য সংসদ) ; লঙ্কাকাণ্ড ; পৃঃ ২৬৯]

কিন্তু এই ধরণের কলহ, আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ, পারস্পরিক ব্যঙ্গবিদ্রূপ বর্ষণের ঘটনা মধ্যযুগের সমাজ ও সাহিত্যে দেখা গেলেও বিতর্করচনার সূচনা তখনো ঘটতে পারে নি।

আগেই বলা হয়েছে, ষোড়শ শতক থেকে বাংলা ভাষায় (অনেক সময় রোমান অক্ষরে) প্রশ্নোত্তরমূলক পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হতে শুরু করেছিল। ঐ সব পুস্তকে দুই বিবদমান পক্ষের প্রত্যক্ষ তর্কযুদ্ধের পরিচয় না থাকলেও একপক্ষ অপর পক্ষের বক্তব্য অনুমান করে নিয়ে তার জবাব দিতেন। অবশ্য অন্যকে আক্রমণ না করেও শুধুমাত্র নিজেদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যেও অনেকে প্রশ্নোত্তরমূলক প্রকাশরীতির অবলম্বন করে থাকতেন। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, এই রচনাগুলির মধ্যে বিতর্করচনার অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এমন ধরণের কয়েকটি পুস্তক আজও খুব বিখ্যাত হয়ে আছে ; যেমন, দোম আন্তনিও-এর "ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ", মনোএল দা আসসুম্পসামের "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" ইত্যাদি। বৈষ্ণব সাধকদের কোন কোন কড়চাও এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টানদের এ ধরণের পুস্তক-পুস্তিকায় হিন্দুধর্মের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কমবেশি থাকতোই। কখনো বা যুক্তিহীনতা বা হিন্দু আচার-আচরণের সঠিক ব্যাখ্যা না দেবার চেষ্টাও দেখা যেতো।

যেমন :

"গু। যাঁহারা বিভাও করে তাহারা বিভাত্তর আগে কি করিবেক ?

শি। কন্‌ফেসার করিবে, এবং নির্মল ধর্মও লইবে।

'অধিবাসও, সোহাগ পানীও না করিবে, যেমত হিন্দুরা করে। এবং বিভাত্তর পাছে' 'বাইস বিয়াও' না করিবে; 'পাগ-পরশ' ও করিবে না।

গু। 'অধিবাস, সোহাগ-পানী, বাইস বিয়া, পাগ-পরশ

এহা-সকল আমি বুঝি না, বুঝাইলে বুঝিব।

শি। অধিবাস, সোহাগ-পানী, এবং বাইস বিয়া, এবং পাগ-পরশ বুঝাইবার গরজ নাহি; জরুর কেবল আছে যে, খ্রীস্তাওঁ এহা না করুক।"

[কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ—সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত; ১৩৪৬। পৃঃ ২৯০]

আলোচ্য গ্রন্থটিতে অস্পষ্ট হলেও তর্কের আভাস পাওয়া যায়। উদ্ধৃত অংশটিতে হিন্দু আচারের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানী আচরণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার কৌশলের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের রীতিই আভাসিত।

বিতর্করচনার স্পষ্টতর আভাস লক্ষ্য করা যায় দোম-আন্তনিওর গ্রন্থটিতে।—

"রো।—তোমোরা মছ্যোরে কহো পর মেশর অবোতার?

ব্র।—হস, তিনি রোহিত মছ্যো হইয়া ভেদ তুলিয়া দিলেন সমুদ্রের তলে থাকিয়া।

রো।—তবে কি বিনে পরমেশর মছ্যো না হইলে সমুদ্রের তলে থাকিয়া ভেদ তুলিতে না পারিতেন?

ব্র।—কেমতে পারিবেন? সমুদ্রো বরো গহিন, এহাতে বিনে।

রো।—পরমেশর সর্বোকর্তৃত ধরেন?

ব্র।—হএ তিনি সর্বোকর্তৃত ধরেন; তিনি সর্বোকর্ত্তা, এহা নহে বলিতে পারি না।

রো।—তবে কেনো কহো, যে বিনে মছোরূপ না হইলে ভেদ তুলিতে পারেন কেমতে?

ব্র।—এহা তাহান মহিমা, নীলা করিলেন, ভালো তোমার গিয়ানে নিলএ এমত? পরমেশর পরমো ব্রর্মো, এহা নি কহো তাহান মহিমা?

রো।—না, এমত কথা এ অমহিমা পরমেশরের, যাহার আজ্ঞা ঐ সকোল হএ, সে কেমত এমত করিবেন? যাহার কর্তৃত নাহি সে মছ্যো হইয়া ঢুব দিয়া পুথি তোলে, এমত নীলা তাহান নহে; এ কু পৃকৃতি বারি; তিনি যদি শাস্ত্রে দেন; তবে তাহান আজ্ঞা এ মুখিকে কতো ভেদ করিতে পারেন

সাক্ষ্যাতে ? বিনে ডুব দেওনে বিনে দণ্ডে রাখোন যে জোন সকোল করিতে পারেন, তাহান ঠাই এমত নাহি, যে এহাবহি আর করিতে।”

[ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ—সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত ; ১৯৩৭। পৃঃ ১৮-১৯]

উদ্ধৃত অংশে ব্রাহ্মণ ও রোমানের মধ্যে যে তর্ক চলছে তা বেশ বোঝা যায়। তবে চরিত্র দু'টি, বলাবাহুল্য, কাল্পনিক। এই চরিত্র দু'টির কথোপকথনের মাধ্যমে লেখক তাঁর নিজের বক্তব্যই প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছিলেন।

বাংলা বিতর্করচনার পটভূমির ইতিহাস সন্ধানে অষ্টাদশ শতকের সামাজিক ও সাহিত্যিক অবস্থার গুরুত্ব অনেক বেশি। এই শতকের বাংলা দেশে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। বর্গীর আক্রমণ আর ইংরেজ শক্তির ক্ষমতা দখল এদের মধ্যে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দুটি ঘটনাই মানুষকে অনেকখানি বস্তুমুখী করে তুলেছিল। অবশ্য অদৃষ্টবাদিতা যে তখন কম ছিল তা নয়। কিন্তু তা হলেও বলা যায়, ঐ অদৃষ্টবাদিতার সঙ্গে সংশয়বাদও মিশে গিয়েছিল অনেকখানি। সমাজে তাই জেগে উঠেছিল নানা প্রশ্ন। বিতর্করচনার আবির্ভাবের ক্ষেত্রে এই সামাজিক প্রশ্নের মূল্য অনেক। সে যা হোক, এ শতকে যে ভাগ্যবাদিতা বর্তমান ছিল প্রথমে তার কথাই বলা যাক।—

তুর্কী আক্রমণের পরে, আমরা দেখেছি, বিদেশী শক্তিকে বিপর্যস্ত বাঙালী হিন্দু দেবদেবী রূপে গ্রহণ করেছিল। আলোচ্য শতকেও ইংরেজ শক্তিকে সেইভাবে বরণ করে নেবার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল।—

“শুন সভে এক মজা বাঙ্গলার যথেক প্রজা
ছিল সুবেদারীতে প্রধান
ইতিমধ্যে কোন ধাতা সৃষ্টি কৈল কৈলকাতা
সাহেবরূপে দেবতা অধিষ্ঠান।
শিরে টুপি মুজা পায় হাতে বেত কুর্তিগায়
এক বর্ণ দেখ সভাকার
বুঝিলাম অনুভবে অবতার দেবতা সভে
ভূতলে করিলা অধিকার।

[বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম ; অপরার্ধ ; ২য় সং)—ডঃ সুকুমার সেন। পৃঃ ৫২০]

এই শতকে বর্গীর আক্রমণ সমাজে একটা বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল।

ছোট বড় সকলের জীবনই তাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মারাঠাশক্তির আগমনের আগেই দেশের মানুষ যবন-অত্যাচারে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল,—বর্গীর আক্রমণে তারা একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়লো। যবন আক্রমণের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিতে গিয়ে 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' গঙ্গারাম বলেছিলেন—

"বাঙ্গালা চৌ আরি জত বিষ্ণু মোণ্ডব।
ছোটবড় ঘর আদি পোড়াইল সব।"

[মহারাষ্ট্র পুরাণ বা ভাস্কর পরাভব—গঙ্গারাম দাস ; চিন্তয়সি প্রকাশন। ১৩৭৩ ; পৃঃ ২৫]

বাঙ্গালী—কি শাসক শক্তি, কি প্রজাশক্তি—একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েছিল তখন। শুধু পলায়নই ছিল একমাত্র সম্বল—

"পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥
লুটিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী।
সেই পাপে তিন সুবা হইল নারকী॥"

[ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (বসুমতী সং), পৃঃ ৭৭]

বর্গীর আক্রমণের আগে থেকেই দেশের শাসন ব্যবস্থায় তথা সমাজজীবনে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। দিল্লির মোগল সিংহাসনে কোন শক্তিশালী ব্যক্তির অধিষ্ঠান ছিল না। এর ফলেও বাঙলা দেশের শাসনকার্যে শিথিলতা ও দুর্নীতি প্রকট হয়ে ওঠে। দেশের মানুষের ওপর চালু হয়েছিল নানা অতিরিক্ত খাজনার বোঝা। ছলে বলে অর্থ উপার্জনের অভিপ্রায়ে এক শ্রেণীর মানুষ সাধারণ জীবনযাত্রাকে করে তুলেছিল ভারগ্রস্ত। এমন অবস্থাতেই ঘটেছিল বর্গীর আক্রমণ। অতএব, তাকে রোধ করবার মত চেষ্টা ও সাহস এবং সংগঠিত শক্তি বাঙালীর তখন ছিল না। ঘরে বাইরে মার খেয়ে বিপর্যস্ত মানুষ আত্মরক্ষায় মরিয়া হয়ে উঠবার শক্তিই হারিয়ে ফেলেছিল। এমন অবস্থায় মানুষ শুধু মার খায় আর হয়ে ওঠে দেবনির্ভর। অষ্টাদশ শতকেও বাঙালী দেবতার আশ্রয় নিয়েছিল আত্মরক্ষার তাগিদে। সন্তানের আশ্রয় মা। আলোচ্য শতকের বাঙালী তাই অসহায় হয়ে আশ্রয় করেছিল শক্তিরূপিণী জগৎজননীকে। রামপ্রসাদ ও অন্যান্য শাক্তপদরচয়িতার গানে এই মনোভাব সুব্যক্ত হয়ে উঠেছে। মাকে তাঁরা নানা অভাব-অভিযোগের কথাও জানিয়েছিলেন। দুঃখ-বেদনার কথা জানিয়েছিলেন তাঁরা মাকে অসহায় সন্তানেরই মতো।

রামপ্রসাদ বলেছিলেন—"কোন্ অবিচারে আমার পরে, করলে দুঃখের ডিক্রী জারি?" [শাক্তপদাবলী—অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত ; ৫ম সং ; পৃঃ ১১৩] তবে এ কোন প্রতিবাদ নয়,—এ নিছকই অভিমান। শক্তিকে আশ্রয় করে শক্তিমান হয়ে বাস্তব দুর্বিপাককে বাস্তব পদ্ধতিতে বিদূরণ করবার চিন্তা তখনো সমাজে আসতে পারে নি। বস্তুতঃ আধ্যাত্মিকতার আড়ালে অসহায় বাঙালীর আত্মগোপনের মনোভাব এ শতকেও সমাজে অলক্ষণীয় ছিল না। সমস্ত দেশবাসী যেন বলে উঠেছিল—

"বার বার যে দুখ দিয়েছ দিতেছ তারা,
সে কেবল দয়া তব, জেনেছি গো দুখহরা।" [তদেব ; পৃঃ ১৮৫]

তবে আগেই বলেছি, শুধু অস্পষ্টবাদিতাই নয়, সংশয়বাদিতাও এযুগে দেখা দিয়েছিল। দেবনির্ভরতা বা দেবতার ওপর বরাত দেবার মনোভাব বা যুক্তিহীন দেববিশ্বাস সব কিছু সম্বন্ধেই তখন অনেকের মন প্রশ্নাকীর্ণ হয়ে উঠেছিল। আলোচ্য শতকের মধ্যভাগে রাধাকান্ত মিশ্র 'শ্যামার সঙ্গীত' রচনা করেছিলেন। মধ্যযুগে কবিগণ তাঁদের কাব্য রচনার যে কৈফিয়ৎ দিতেন তা সকলেরই জানা ; রাধাকান্ত মিশ্র কিন্তু তেমন কোন কৈফিয়ৎ দেন নি। তার কৈফিয়তের মধ্যে সমসাময়িক যুগ মানসেরই প্রতিফলন ঘটেছিল। তিনি বলেছিলেন—

"আর এক নিবেদন শুন সর্বজন প্রাচীন কবির সম কৈরাছি রচন
কেহো কহে মায়ের হয়্যাছে প্রত্যাদেশ কেহো কহে দিলা
দেখা ধরিনিজবেশ
কেহো বলে জিহ্বাতে কবিতা দিল লিখি কেহো কেহো
বলে আমি স্বপনেতে দেখি।
যে পদ ধিয়ান করি না পান বিধাতা মানব হইয়া
কেহো কহে হেন কথা।
কেমনে এমন কথা লইবে হিয়ায় কিন্তু সত্য মিথ্যা
কিছু কহা নাহি যায়।"

[বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম. অপরার্ধ, ২য় সং)-ডঃ সুকুমার সেন ; পৃঃ ৪৯২]

বস্তুতঃ মানুষ যখন কঠোর বাস্তবের কাছে নিদারণ আঘাত পেতে থাকে তখন তার দেবনির্ভরতা কমে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভারতচন্দ্রের

মত ঘাখাওয়া মানুষের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত সমাজ ও ধর্মের বাদানুবাদ বিপন্নঅস্তিত্ব ভারতচন্দ্রের কাছে গণনীয় বিষয় বলে গৃহীত হতে পারে নি। শ্রদ্ধেয় শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'ভারতচন্দ্র' গ্রন্থে বলেছেন, "ভাগ্যতাড়িত ভারতচন্দ্রের কাছে সমাজবিধির বহু অংশ অর্থহীন মনে হয়েছিল, মনে প্রাণে বুঝেছিলেন ধর্মকলহের অসারত্ব।"

[ভারতচন্দ্র (১ম সং) ; শঙ্করীপ্রসাদ বসু ; পৃ: ৩] ভারতচন্দ্রের মন ও কাব্যেও সংশয়বাদ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু অষ্টাদশ শতকে যে সংশয় দেখা গিয়েছিল সামাজিক পরিবর্ত্তন আনয়নে বা সমাজে বিতর্কসৃষ্টিতে তা কোন ভূমিকা নিতে পারে নি। বস্তুতঃ সংশয়ই সব নয়। সংশয় থেকে শুরু, পরে ঐ সংশয়ের বাধা কাটিয়ে নিজস্বমতে পৌঁছোতে হবে। সেই মতের ওপর দাঁড়িয়েই তবে ভিন্নমতের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়। আলোচ্য শতকে মানুষ কেবল সংশয়ের মধ্যেই কাটিয়েছে—তার বাইরে আসতে পারে নি।

প্রসঙ্গক্রমে বিতর্করচনার ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। তর্ক-বিতর্কের ভাষা হলো গদ্য। গদ্যের বিচরণক্ষেত্র স্বভাবতই বিস্তৃত। তার বহনক্ষমতাও যথেষ্ট। এ কারণে বিতর্কের জন্যে যেমন উপযুক্ত সামাজিক পটভূমির প্রয়োজন তেমনি তার উপযুক্ত ভাষা মাধ্যম গদ্যেরও দরকার। কিন্তু উনিশ শতকের আগে ব্যবহারযোগ্য গদ্যের সূচনা হতে পারে নি। এদিক থেকেও উনিশ শতকের আগে গদ্যবাহন বিতর্করচনার দেখা পাওয়া অসম্ভবই ছিল।

বস্তুতঃ সবদিক থেকে বিচার করলে বলতে হয়, উনিশ শতকই ছিল বাংলা বিতর্করচনার উপযুক্ত আবির্ভাবকাল। এই শতাব্দীর প্রথম থেকে শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্টউইলিয়ম কলেজ এবং রামমোহনের চেষ্টায় বাংলা গদ্য ধীরে ধীরে যে রূপ ধারণ করেছিল তাতে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বিতর্করচনার ভাষাপথ বেশ সুগম হয়ে গিয়েছিল।

তবে শুধু ভাষা নয়, বিতর্করচনার আবির্ভাবের অনুকূলে অন্যান্য অবস্থাও এই সময় উপস্থিত ছিল। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, মতামতের দৃঢ়তা, আত্মরক্ষার বৌদ্ধিক ক্ষমতা, গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে নতুনকে গ্রহণ করবার প্রেরণা—সব কিছুই দেখা দিয়েছিল এই শতকের সূচনায়। ঐ অবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো লোকও তখন হয়ে উঠেছিল মরিয়া। তার ফলে, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বেধে গিয়েছিল প্রবল সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষেরই

অপর নাম হলো তর্কযুদ্ধ। উনিশ শতকের তর্কযুদ্ধে মুখ চলেছিল যত মসী চলেছিল তার চাইতেও বেশি।—বিতর্করচনা ঐ মসীযুদ্ধেরই ফলশ্রুতি।

বিগত শতকে রক্ষণশীল গোঁড়া ব্যক্তিদের সঙ্গে নব ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ, আত্মসচেতন, পৌরুষদীপ্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সমাজ-বিপ্লবীদের বিবাদ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এই বিবাদে একের অপরকে পরাজিত করবার অস্ত্র ছিল যুক্তি। সমাজজীবনে এই যুক্তিবাদ জাগ্রত না হলে বিতর্করচনার আবির্ভাব ও সমৃদ্ধি ঘটে না। উনিশ শতকে এই যুক্তিবাদেরও বিকাশ ঘটেছিল।

উনিশ শতকীয় নবজাগরণের ফলে মানুষের মধ্যে আত্মবোধও জেগে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, স্বাধীনভাবে নিজের মত প্রকাশের একটা প্রেরণাও সমাজে দেখা দিয়েছিল। নতুন করে ভাববার একটা প্রবণতা এসেছিল তখন। পুরনোকে হুবহু ধরে রাখবো, না কিছু বাদ-সাদ দিয়ে বরণ করে নেবো, না একেবারে নতুনকেই স্বাগত জানাবো এসব চিন্তা সমাজের মধ্যে বিশেষ করে নাগরিক জীবনে প্রকট হয়ে উঠেছিল। এইসব চিন্তার মানুষই আপন আপন বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দিয়ে লেখনী চালনা করেছিলেন। বিতর্করচনা তাই নবজাগরণেরই সৃষ্টি—উনিশ শতকেই তার আবির্ভাব।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

উনিশ শতকে নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ প্রগতিশীল মানুষ সমাজ জীবনের নানা স্তরে ক্লেদ ও পঙ্কিলতা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শুধু ক্ষুব্ধ হয়েই তারা বসেছিল না; ঐ ক্লেদ ও পঙ্কিলতা দূর করার জন্যে এগিয়েও এসেছিল। বিগত শতকের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলি সেই এগিয়ে আসারই ফসল। তবে সমাজের রক্ষণশীল মানুষ ঐ আন্দোলনগুলির বিরোধিতাও করেছিল প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে। সংস্কার আন্দোলনগুলিকে কেন্দ্র করে তাই বেধে গিয়েছিল প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্ক। সেই তর্ক-বিতর্ক নির্ভর বিতর্করচনা আলোচ্য বলে উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলির ইতিহাস সন্ধানের প্রয়োজন। বর্তমান পরিচ্ছেদে সেই ইতিহাস সন্ধানেরই চেষ্টা করা হয়েছে।—

: সতীদাহ প্রথা নিবারণ আন্দোলন :

সতী হবার সংস্কার বা কুসংস্কার বহুদিন থেকেই চলে আসছিল,—শুধু বাংলাদেশেই নয়, ভারতের সর্বত্রই। তবে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত এই প্রথা ভয়ংকরভাবে বেড়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশেই ঘটেছিল এই বাড়াবাড়ি।

সতীপ্রথার বিরুদ্ধাচরণ ভারতবর্ষে অনেক বছর আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল,—আকবরের আমলেও সতীপ্রথা দূর করবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আধুনিক যুগের সূত্রপাত থেকে সতীপ্রথার বিরুদ্ধে যেসব প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল আমরা শুধু তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মনোযোগী হবো।

বাংলা তথা ভারতের এই দুঃসহ ও নিষ্ঠুর প্রথাটির বিরুদ্ধে প্রথম পরিকল্পনা মাফিক বিরোধিতা শুরু করেছিলেন মিশনারী পাদ্রীগণ। বিদেশী শাসকগণও এ সম্বন্ধে কম সচেতন ছিলেন না; তবে ঐ প্রথার বিলোপ সম্পর্কে কোন সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে তাঁরা ভীত ছিলেন। ঐ প্রথার অবলোপ ঘটালে ভারতীয়দের ধর্মাচারণে হস্তক্ষেপ ঘটতে পারে—এটা-ই ছিল তাঁদের ভয়।

রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে)। সতীপ্রথা আন্দোলনের সঙ্গে বাঙালী রামমোহনের নামই বিশেষভাবে

জড়িত ; কিন্তু দেখা যায়, তাঁর বহু আগে থেকেই সমাজে সতীবিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এস. ডি. কোলেটের মতে ১৭৭২ সালেই সতীপ্রথার বিরুদ্ধে বিদেশীর হস্তক্ষেপ ঘটেছিল। ঐ বছরে দক্ষিণ ভারতের ত্রিপল্লীতে ক্যাপ্টেন টমিন মৃতস্বামীর চিতারোহণে উদ্যত জনৈকা বিধবাকে উদ্ধার করে এক নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান।—একেই তিনি বিদেশী হস্তক্ষেপ বলে অভিহিত করেছিলেন। ঐ বিদেশী হস্তক্ষেপে অসন্তুষ্ট হয়ে এক ক্রুদ্ধ জনতা দাঙ্গাহাঙ্গামা করেছিল বলেও তিনি জানিয়ে ছিলেন।

যাইহোক প্রথম দিকে সতী প্রথার বিরুদ্ধে এমনি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও কোন সংঘবদ্ধ আন্দোলন তার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে নি। গড়ে ওঠা অবশ্য সম্ভবপরও ছিল না। সরকার থেকেও তখন কোনও পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি ; বিদেশী হস্তক্ষেপ যা ঘটেছিল তা ছিল শুদ্ধ বেসরকারী প্রচেষ্টা। সরকারী উদ্যোগ দেখা দিয়েছিল তারও পরে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক বৃটিশ ম্যাজিষ্ট্রেট কর্নওয়ালিসকে একটি পত্রে লিখেছিলেন—

Cases sometimes occur in which a collector having no specific orders for the guidance of his conduct, is necessitated to act from his own sense of what is right. This assertion has this day been verified in an application from the relatives and friends of a Hindu woman, for my sanction to the horried ceremony of burning with her decessed husband. Being impressed with a belief that his savage custom has been prohibited in and about Calcutta, and considering the same reasons for its discontinuance would probably be held valid throughout the whole extent of the Company's authority, I positively refused my consent. The rites and superstitions of the Hindu religion should be allowed with the most unqualified tolerance, but a practice at which human nature shudders I cannot permit within the limits of my jurisdiction, without particular instructions. I beg therefore my Lord, to be informed whether my conduct in this instance meets your approbation." [The life and letters of Raja Rammohun

Roy—S.D. Collet. Edited by Dilip Kumar Biswas, Prabhat Chandra Ganguli ; 1962.P-79]

কর্নওয়ালিস সতীপ্রথা উচ্ছেদ করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে তিনি ঐ ব্যাপারে যে কিছু নির্দেশ দেন নি তা নয়। সতী হতে ইচ্ছুক নারীকে সতী না হবার আবেদন জানাবার জন্যেই শুধু তিনি রাজকর্মচারীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া 'সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণ নিজামত আদালতের জজ'দের কাছ থেকে সতীপ্রথা সম্বন্ধে তথ্যাদি ও তাঁদের মতামত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা কিন্তু সতীপ্রথার উচ্ছেদের কথা না বলে তার সামান্যমাত্র নিয়ন্ত্রণ করবার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। নারী স্বেচ্ছায় সতী হচ্ছে কি না, মাদক দ্রব্যের প্রয়োগ করে তাকে সতী হতে বাধ্য করা হচ্ছে কিনা সরকারের সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য বলে তাঁরা মতামত জানিয়েছিলেন। রাজনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখার জন্যেই তাঁরা ঐ প্রথা বিলোপের কথা ভাবতে চান নি।

কর্নওয়ালিসের পরে মিণ্টোর 'Minute'-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮১৩ সালে তিনি নিজামত আদালতের বিচারকদের মতামতের ওপর ভিত্তি করে ঐ 'Minute'-এ বলেছিলেন, সতীদাহের জন্যে উদ্যোক্তাদের সরকারের কাছে প্রার্থনা জানাতে হবে।—এই প্রার্থনা মঞ্জুর হবে ; তবে সরকারী কর্মচারীর আদেশ ছাড়া সতীদাহ ঘটতে পারবে না। ঐ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আরও বলা হয়েছিল, সরকারী কর্মচারী দেখবেন, জোর করে বা মাদক দ্রব্য প্রয়োগ করে নারীকে সতী হতে বাধ্য করা হচ্ছে কি না। ঐ নারী অন্তঃসত্ত্বা কি না, তার বয়স ষোল হয়েছে কি না তাও তাঁরা দেখবেন। সরকারী কর্মচারী ঐ নারীকে সতী না হবার জন্যে বোঝাবারও চেষ্টা করবেন।

কিন্তু যতই নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হোক না কেন, সতীর সংখ্যা কিন্তু দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। লোকে সরকারী ঘোষণার অর্থও উল্টো বুঝেছিল। তারা মনে করেছিল, সরকার যখন বিশেষ দু একটি ক্ষেত্র ছাড়া সতীদাহের অনুমতি দেবেনই তখন তা আর বে-আইনী কিসের। বরং সরকারও একে সমর্থন করেন। তাছাড়া, সতীদাহের স্থানে রাজকর্মচারী উপস্থিত থাকবে জানায় সতী হওয়াকে তারা আরও গৌরবের ব্যাপার বলে মনে করেছিল।

অবশ্য এইসব সরকারী প্রচেষ্টায় যে একেবারেই কোন ফল হয় নি তা নয় ; সামান্য হলেও সতীদাহের ঘটনা তাতে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। 'সমাচার দর্পণের এক সংবাদ থেকে তা বোঝা যায়—

"শহর কলিকাতায় এক ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন অল্প বয়স্ক। তাহার স্ত্রী সহগমন করিয়াছে আমরা শুনিয়াছি যে দুইদিন পর্যন্ত আপন মৃত স্বামীকে রাখিয়া তৃতীয় দিন সহগমণ করিয়াছে এত বিলম্বে সহগমন করিতে পূর্বে শুনি নাই। তাহার কারণ এই স্ত্রীর বয়স বিবেচনা করাতে এতকাল বিলম্ব হইল। কথক বৎসর হইল শ্রীশ্রীযুত নানা দেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরদের নিকটে হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে সহগমন বিষয়ে যথার্থ ব্যবস্থা লইয়া আজ্ঞা দিয়াছেন যে ষোড়শ বর্ষ ন্যূন বয়স্কা কিম্বা গর্ভবতী কিম্বা যাহার অতি শিশুবালক থাকে সে স্ত্রী-সহগমন করিতে পাইবেক না" [সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম, ৩য় সং)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। পৃঃ ২৮১]

শাসন কর্তৃপক্ষের এই ধরণের প্রচেষ্টার পাশাপাশি মিশনারী পাদ্রীদের কার্য-ধারাও বহতা ছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের ভূমিকাই ছিল এক্ষেত্রে সর্বাধিক। ১৮০৩ সাল থেকেই তাঁরা সতীপ্রথার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। ঐ বছরে তাঁরা একটি নির্দিষ্ট স্থান বেছে নিয়ে সেখানে কত নারী সহমৃতা হয়েছিল তার সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। ঐভাবে পরের বছরও তাঁরা একই সমীক্ষা চালান। সমীক্ষার পরে তাঁরা জেনেছিলেন, ১৮০৩ সালে এবং ১৮০৪ সালের ছয় মাসে সেই নির্দিষ্ট স্থানে যথাক্রমে ৪০০ এবং ৩০০ জন নারী সতী হয়েছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে এত নারীর মৃত্যু ঘটতে দেখে উইলিয়ম কেরী উদ্যোগ নিয়ে এই দেশের পণ্ডিতদের কাছ থেকে সতীপ্রথা সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় তথ্য ও সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করেছিলেন এবং তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলীর কাছে সতীদাহ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সেগুলি পাঠিয়ে এক আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বলা হয়েছিল—

"These documents were placed in the hands of Mr. Udny, the philanthropic member of Council, and embodied by hi n in a representation which he submitted on thesubject to Lord Wellesley and the Supreme Council. It was the first official notice regarding female immolation which had appeared on the records of Government."

[The Life And Times of Carey, Marshman And Ward (Vol. II)—J.C. Marshman ; (1859) ; P-222]

তদানীন্তন গভর্নর জেনারেলের পরামর্শে সমস্যাটিকে নিজামত আদালতের

গোচরীভূত করা হয়েছিল ; এবং তদানীন্তন 'কোর্ট-পণ্ডিত' ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য আদালতের নির্দেশমত সহমরণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করে প্রেরণ করেছিলেন যথাস্থানে। ঘনশ্যাম ঐ প্রথার বিরুদ্ধেই মত জ্ঞাপন করেছিলেন ; কিন্তু সংশ্লিষ্ট মহলের তৎপরতা সে-সময় ঐখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তবে মিশনারিগণ তাতে দমিত না হ'য়ে ঐ প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য চালিয়েই গিয়েছিলেন। ঐ সতীপ্রথা বিরোধিতার মধ্যে শুধু তাঁদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যই ছিল তা নয়, —প্রকৃত মানবিকতাবোধও ছিল।

'দি এশিয়াটিক অবজার্ভার' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে "On the Burning of Widows" নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮২৪ সালের অক্টোবর সংখ্যা 'দি এশিয়াটিক অবজার্ভার'-এ প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধের একটি অংশ থেকে জানা যায়, সতীপ্রথা বিদূরণে মিশনারীদের মানবিকতাবোধ কত সক্রিয় ছিল। [দ্রঃ দি এশিয়াটিক অবজার্ভার ; ১৮২৪, অক্টোবর। পৃঃ ৩৬৫]

কিন্তু যে কারণেই তারা সতীপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠুন না কেন, মিশনারীদের কার্যকলাপে সরকার ও জনসাধারণ সকলেই সতীদাহের নিষ্ঠুরতা ও ভয়ংকরতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল। তবে আশ্চর্যের বিষয় এখানেই যে, ঐ সচেতনতা সত্ত্বেও সমাজে সতীর সংখ্যা ভয়ঙ্করভাবে বেড়েই চলেছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুনের 'সমাচার দর্পণে' এই বৃদ্ধির কথা প্রকাশিত হয়েছিল—"তৃতীয় সন জেলা হুগলিতে একশত বার স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে গত বছর ঐ জেলাতে দুইশত স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে কিন্তু গত বৎসর যে এত অধিক হইয়াছে ইহার কারণ কিছু নিশ্চয় হয় নাই অন্য ২ জেলা হইতে হুগলিতে অধিক সহগমন নিত্য হয়।"

[সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম, ৩য় সং)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। পৃঃ ২৮১]

সতীর এই সংখ্যা বৃদ্ধিতে অবশ্য সরকার স্থির হয়ে ছিলনা। দেশের ম্যাজিষ্ট্রেটদের কাছ থেকে এই বিষয়ে তাই নানা তথ্য ও মতামত আবার সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাঁদের কেউ কেউ মিণ্টোর অনুসৃত নীতির পরিবর্তন চেয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, 'সতী' সমস্যাকে নিয়ন্ত্রিত করবার মিণ্টোনীতি ফলপ্রদ হতে পারে নি। পার্লামেণ্টেও সে সময় 'সতী' সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল ; কিন্তু তখনো আইনের দ্বারা প্রথাটিকে নিষিদ্ধ করবার সাহস সরকার দেখাতে পারে নি।

ইতিমধ্যে রামমোহন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৮১৫ সালে তিনি 'আত্মীয়সভা' স্থাপন করেন। ঐ সভা বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে প্রথম সভা বা এ্যাসোসিয়েশনের মর্যাদা লাভ করে থাকে। 'আত্মীয়সভা'য় সতীপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আলোচনা করা হতো ; কিন্তু তখনো কোন কার্যকরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা 'আত্মীয়সভা' বা রামমোহন গ্রহণ করতে পারেন নি। অথচ সতীর সংখ্যা দিন দিন সমাজে বেড়েই চলেছিল। এহেন অবস্থায় ১৮১৮ সালে সতী প্রথা শাস্ত্রসম্মত নয় প্রমাণ করবার চেষ্টা করে রামমোহন একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন।

কিন্তু তার আগে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সতীবিরোধী বক্তব্যের সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।—রামমোহনের আগেই তিনি সতীপ্রথার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। ১৮১৮ সালে রামমোহনের সহমরণ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হবার আগেই ১৮১৭ সালে মৃত্যুঞ্জয় ঐ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন। সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি মৃত্যুঞ্জয়কে সতীপ্রথা সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্রের বক্তব্য সংগ্রহ করতে বলেছিলেন—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। মৃত্যুঞ্জয় সেই নির্দেশমত ঐ বক্তব্য সংগ্রহ করে নিজের মতামতসহ তা প্রেরণ করেছিলেন যথাস্থানে। "Friend of India" পত্রিকায় মৃত্যুঞ্জয়ের মতামতের সারাংশ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে। পত্রিকাটি প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছিল, "Mrityoonjuya however shews from various authors, that though burning is termed optional, it is still not to be recommended"···

[সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১ম) ; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ; পৃঃ ৩০। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত।

মৃত্যুঞ্জয় সতীপ্রথার বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় আন্দোলন সংগঠিত করেন নি বা সেরকম কোন আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্তও হন নি ; কিন্তু 'সতী' সম্পর্কে তিনি শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করে যে বক্তব্য রেখেছিলেন সতীপ্রথা নিবারণের ইতিহাসে তার মূল্য অনেক। মৃত্যুঞ্জয়ের ঐ বক্তব্য যে রামমোহনকে প্রভাবান্বিত করে নি তা জোর করে বলা যায় না।

কিন্তু সে যাই হোক, বাংলাদেশে প্রবল সতীবিরোধী আন্দোলনের সংগঠক রামমোহনের কথাতেই এবার ফিরে আসি।—প্রথমে একটি প্রশ্ন তোলা যাক, রামমোহনের মনে কখন কিভাবে সতী বিরোধী মনোভাব দেখা দিয়েছিল।

একটি মত প্রচলিত আছে, জলন্তচিতায় আপন ভ্রাতৃবধূকে সতী হতে দেখেই তিনি ঐ প্রথা বিলোপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অতএব প্রশ্নের সমাধান করতে হবে অন্য তথ্যের ভিত্তিতে।

'আত্মীয় সভা'তে রামমোহন সতীদাহ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু তার আগে যে তিনি ঐ বিষয়ে কিছু ভাবেন নি তা নয়। সমসাময়িক সামাজিক অবস্থাই তাঁকে ঐ বিষয়ে সচেতন করে তুলেছিল। সমাজে বহু নারীই তখন সতী হতো, তা স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক। সে সব ঘটনা রামমোহনকে নিশ্চয়ই ব্যথাতুর করে তুলেছিল। 'আত্মীয়সভা'র প্রতিষ্ঠার বছরে অর্থাৎ ১৮১৫ সালে সতীসংখ্যা বৃদ্ধির ঘটনায় রামমোহন নিশ্চয়ই চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। ঐ বছরে 'ক্যালকাটা ডিভিশনে'র বর্ধমান, কটক-বালাসোর, হুগলী, যশোর, জঙ্গলামহল, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা এবং কলকাতার আশেপাশে ২৫৩ জন নারীর সহমরণ ঘটেছিল। ১৮১৫ সালে হঠাৎ সতীর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল এবং পরে তা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দেশের কোথায় কত নারী সহমৃতা হয়েছিল তার যে তালিকা S. D. Collet [দ্রঃ The Life And Letters of Raja Rammohun Roy—Edited by Dilip Kumar Biswas, Pravat Chandra Ganguly ; 1962, p-83-84]—এর বইতে পাওয়া যায় তার বিশ্লেষণেই এই সত্য প্রমাণিত হয়। সতীর এই ভয়ঙ্কর সংখ্যাবৃদ্ধিই মানবতাবাদী রামমোহনকে ঐ প্রথা বিলোপে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

প্রসঙ্গক্রমে সতী সংখ্যার এই আকস্মিক বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা যেতে পারে। শুধু শাস্ত্রের নির্দেশ মান্য করবার জন্যে বা কুসংস্কারের বশবর্তী হবার ফলেই যে নারীর এই সতীহবার ঘটনা বেড়ে গিয়েছিল তা নয় ; সে সময় সাধারণ বাঙালীর জীবনে যে আর্থিক সংকট প্রবল হয়ে উঠেছিল তার জন্যেও ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ;—এই কারণই বরং জোরালো হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই এই অবস্থা শুরু হয়েছিল আর উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকে ক্রমশঃ তা প্রবল হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গক্রমে বিনয় ঘোষের বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থের বক্তব্য উদ্ধার করছি—

"বহুবিবাহের বিস্তারের corollary বা প্রতিফলন হল বালবিধবার সংখ্যা-

বৃদ্ধি। কুলীনের স্ত্রী পিতৃগৃহবাসী, এমনিতেই সে অর্থনৈতিক বোঝা। তার উপর বৈধব্যের যন্ত্রণা তার জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তুলল। তখন সহমরণের শৌর্যবীর্যের আদর্শও বিকৃত হয়ে দায়মুক্তির অপকৌশলে পরিণত হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের মধ্যে সহমরণের সংখ্যা বাংলা দেশে সব চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল, কোন শাস্ত্রীয় বা আদর্শগত যুক্তি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না।"…

[বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (১ম)-বিনয় ঘোষ। ১ম সং। পৃঃ ১০০]

উপর্যুক্ত আলোচনায় স্পষ্ট বোঝা যায়, ১৮১৫ সালের আগে থেকেই দেশে সহমরণ সমস্যা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে শুরু করেছিল। এই সামাজিক অবস্থা সহ্য করতে না পেরেই রামমোহন 'সতী' বিরোধী আন্দোলন গঠনে এগিয়ে এসেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ১৮১৭ সালে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা খুবই উল্লেখযোগ্য। ঐ বছরে সরকার সতীদাহ বিষয়ে কয়েকটি নিয়ম প্রচার করেছিলেন। একটি নিয়ম ছিল, কোন নারী যদি মৃত স্বামীর সহগমনে ইচ্ছুক হয় তবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোন রাজকর্মচারীর কাছ থেকে তাকে অনুমতি নিতে হবে। এই নিয়ম সমাজের রক্ষণশীল ব্যক্তিদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, "এই বিধি প্রচার হইলেই হিন্দু সমাজ মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বহু সহস্র লোকের স্বাক্ষর করাইয়া পূর্বোক্ত রাজবিধি রহিত করিবার জন্য এক আবেদন পত্র প্রেরিত হইল।" [রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (নিউ এজ সং) – শিবনাথ শাস্ত্রী ; পৃঃ ৬৫]

সমাজের এই প্রতিক্রিয়াশীলতা রামমোহনকে নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ করেছিল। সহমরণের বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলন সংগঠনে এবং গ্রন্থরচনায় এই ঘটনার প্রভাব থাকা তাই অস্বাভাবিক নয়।

সতী সংক্রান্ত আন্দোলনে রক্ষণশীল হিন্দুদের প্রধান নেতা ছিলেন রাধাকান্ত দেব। 'সমাচার চন্দ্রিকা' ছিল রাধাকান্ত দেব ও তাঁর দলের মুখপত্র। প্রগতিশীল যোদ্ধাদের মুখপত্রের কাজ করেছিল 'সমাচার দর্পণ'। অবশ্য দুইদলের পক্ষে আরও পত্র-পত্রিকা ছিল। এই সব পত্র-পত্রিকায় মত বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে এবং নানা সভাসমিতির আয়োজনের মাধ্যমে সতীপ্রথা সম্পর্কিত আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল। দুই দলের পক্ষে তখন গণস্বাক্ষরও সংগ্রহ করা হয়েছিল। রামমোহন- কাশীনাথ—বিপ্র—মুগ্ধবোধ ছাত্রের মধ্যে মসীচালনাও ঐ আন্দোলনকে প্রবল করে তুলেছিল। সতীবিরোধী ব্যক্তিগণ ঘটনাস্থলে

গিয়েও সতীহবার ঘটনা বন্ধ করবার অনেক চেষ্টা করেছিল। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগস্টের 'সমাচার দর্পণে' এমন একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ও তার মুখপত্র কিন্তু এই সব ঘটনাকে বেশ ফলাও করে প্রকাশ করতো—সহমরণের পক্ষে ওকালতি করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। বাধা দিতে গেলেও বাধাদানকারীরা সফলতা লাভ করতো কদাচিৎ। ঐ ব্যর্থতাকে সহ-মরণের মহিমার কাছে তাদের পরাজয় বলে রক্ষণশীল ব্যক্তিরা ঘোষণা করে থাকতো।

বস্তুতঃপক্ষে সরকার সতীপ্রথাকে উচ্ছেদ করবার সিদ্ধান্ত না নিয়ে কয়েকটি নিয়মের দ্বারা তাকে শুধু নিয়ন্ত্রিত করবার কথাই ভেবে ছিলেন বলে সতীবিরোধী ব্যক্তিদের পক্ষে ঐ প্রথা বন্ধের কাজ সফল করা সম্ভবপর হচ্ছিল না। এমন অবস্থায় আন্দোলনের গতিও সব সময় এক থাকছিল না। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ বিষয়ে যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে কখনও এসেছিল জোয়ার, কখনও বা ভাঁটা। তবে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে ঐ সময় সতী বিরোধী আন্দোলন ভাঁটার মন্দা কাটিয়ে জোয়ারের বেগবত্তা লাভ করতে পেরেছিল। তখন লর্ড আমহার্ষ্টের আমল। লেডি আমহার্ষ্টের ডায়েরীতে ঘটনাটির বর্ণনা রয়েছে। কলেরায় এক যুবকের মৃত্যু হবার পর তার স্ত্রী সহমরণে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সহমরণে যাবার জন্যে যা করণীয় ও আচরণীয় সবই সে পালন করেছিল; কিন্তু চিতায় যখন আগুন ধরানো হলো তখন বিধবা নারীটি ভীত হয়ে নিকটের জঙ্গলে পালিয়ে গেল। সে পালিয়েছে বুঝতে পারার পর "…The mob became furious and ran into the jungle to look for the unfortunate young creature, dragged her down to the river, put her into a dingy, and showd off to the middle of the stream, when they forced her violently over board and she sank to rise no more" [তদেব ; পৃ: ৬৩]

রামমোহন ও প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ এই ঘটনায় অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে নতুন শক্তিতে আন্দোলনে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন; কিন্তু তাতেও সরকার পক্ষ সতীপ্রথা উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিতে চান নি। লর্ড আমহার্ষ্ট তাঁর পূর্ববর্তী শাসনকর্তার মতোই সতীপ্রথাকে নিছক নিয়ন্ত্রণ করতেই চেয়েছিলেন এবং সেই কারণে তিনিও কটি আচরণবিধি প্রণয়ন করেছিলেন। [দ্রঃ তদেব ; পৃঃ ৬৩-৬৪] তবে পূর্ববর্তী শাসকদের তুলনায় আমহার্ষ্ট আচরণবিধি প্রণয়নে

অনেক বেশি বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। ঐ বিধিগুলির অন্যতম ছিল 'সহমৃতা বিধবার মৃতপতির কোনও সম্পত্তি থাকিলে তাহা গবর্নমেণ্টের বাজেয়াপ্ত হইবে।' [তদেব ; পৃঃ ৬৩-৬৪] এই নির্দেশে সত্যিই বাস্তবজ্ঞান ও সামাজিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিধবার সম্পত্তির লোভে তার আত্মীয়স্বজন অনেক সময় জোর করে তাকে সতী করতো ; কাজেই বিধবার সম্পত্তি যদি সরকার বাজেয়াপ্ত করে তাহলে ঐভাবে সতী করবার চেষ্টাও বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তবুও বলতে হয়, সতীপ্রথা বিলোপের সিদ্ধান্ত না হওয়ায় সমস্যা ঠিক থেকেই গেল।

সমাজসচেতন প্রগতিশীল মানুষ কিন্তু ঐ প্রথার পূর্ণ অবলোপই চেয়েছিল। আইনের দ্বারা ঐ প্রথা নিষিদ্ধ হোক এইই ছিল তাদের প্রার্থনা। লর্ড আমহার্স্টের আমলে খোদ বিলেতের মানুষও পার্লামেণ্টে ঐ আইনের প্রার্থনা জানিয়ে আবেদন করেছিল। কিন্তু তাতেও ঐ আইন বিধিবদ্ধ করবার কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি। ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ ঘটবে সেই কথা ভেবেই আর ঐ আইন পাস হলো না। ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ ঘটলে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন হতে পারে সেই ভয় থেকে পার্লামেণ্ট তখনো মুক্ত হতে পারে নি।

কিন্তু পরবর্তীকালে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ঐ ভয় থেকে মুক্ত হয়ে আইন পাসের মাধ্যমে সতীপ্রথা নিষিদ্ধ করবার ঐতিহাসিক কাজে এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি এদেশে এসে বুঝেছিলেন, প্রধানতঃ সিপাহি বিদ্রোহের ভয়ে আগে সতীপ্রথারদের জন্যে আইন প্রণয়ন করতে কেউ সাহস পান নি। এ বিষয়ে তাই সঠিক তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যে তিনি দেশের বেশ কয়েকজন সৈন্য বিভাগীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তির মতামত জানতে চেয়েছিলেন। জিজ্ঞাসিত অধিকাংশ ব্যক্তিই সতী বিরোধী আইনের অনুকূলে মতামত জ্ঞাপন করেছিলেন। বেণ্টিঙ্ক একথা জানতে পেরেছিলেন, ঐ আইন পাস হলে সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেবার কোন সম্ভাবনা নেই। নিজামত আদালত থেকেও সতীপ্রথা রদের সুপারিশ করা হয়েছিল। বেণ্টিঙ্ক ঐ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং রামমোহনের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত সতীবিরোধী আন্দোলনের মর্ম উপলব্ধি করে সতীপ্রথারদের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তারই ফলে ঐ প্রথা নিষেধক আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বরে।

কিন্তু তার আগে বেণ্টিঙ্ককে রাধাকান্ত দেব প্রমুখের নেতৃত্বে সংগঠিত রক্ষণশীল ব্যক্তিদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগষ্টের 'সমাচার দর্পণ', 'সমাচার চন্দ্রিকায়' প্রকাশিত এক খবর প্রকাশ করেছিল। 'সমাচার চন্দ্রিকা' আবার ঐ সংবাদ প্রকাশে 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' মুদ্রিত খবরকে ভিত্তি করেছিল। যাইহোক, 'সমাচার চন্দ্রিকা'র ঐ সংবাদ থেকে জানা যায়, রক্ষণশীল গোষ্ঠী কিভাবে সতীপ্রথা সম্বন্ধীয় সরকারের সম্ভাব্য সিদ্ধান্তের এবং রামমোহনের বিরোধিতায় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাদের মতে ঐ প্রথা শাস্ত্র সম্মত; লর্ড আমহার্ষ্টের আমলে প্রবর্তিত নিয়মই ঐ ব্যাপারে যথেষ্ট। সতীর বিপক্ষে রামমোহনের শাস্ত্রীয় যুক্তি আদৌ মান্য নয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র ঐ সংখ্যায় এক আবেদন জানিয়ে বলা হয়েছিল, "আমাদিগের ইহা নিতান্ত বিশ্বাস আছে যে দেশাধিপতি মহামহিম শ্রীযুত লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক সাহেব যিনি দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন ও ধর্ম সংস্থাপন করণ জন্য এতদ্দেশে শুভাগমন করিয়াছেন তিনি আমারদিগের চিরকালাবধি স্থাপিত যে ধর্ম কিম্বা রীতি আছে তাহার অন্যথাকরণে কখন প্রবৃত্ত হইবেন না।" [সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম, ৩য় সং)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ২৮৯]

বলাবাহুল্য, রক্ষণশীল ব্যক্তিদের এই বক্তব্য ও আবেদনে লর্ড বেণ্টিক সাড়া দেন নি। সব বাধাবিপত্তির জগদ্দল পাথর সরিয়ে মানবিকতার দাবীকে মর্যাদা দিয়ে ঐ প্রথারদের সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু ঐ আইন পাসের পরেই যে সতীদাহ সম্পর্কিত আন্দোলন থেমে গিয়েছিল তা নয়। ঐ আইনের প্রবর্তনায় উদারপন্থী প্রগতিশীল মানুষ যেমন উল্লসিত হয়েছিল তেমনি রক্ষণশীল ব্যক্তিরা ব্যথিত ও বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, বৃটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন হবার ভয় আদৌ দেখা গেল না। J. C. Marshman তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছিলেন, "Four months after the Act had been passed, it was reported to Government that twenty five cases of attempt suttee had been prevented by the police, and without the smallest commotion."

[The Life And Times of Carey, Marshman, And Ward —J. C. Marshman. 1859 ; Vol II ; P—417.]

ঐ গ্রন্থে আরও কিছু মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করা হয়েছিল—

"Without the slightest tumult, without even a national sigh, a practice which had existed in India since the days of Alexander the great, and which was represented as the glory of Hindooism, was extinguished at once and forever by a stroke of Lord William Bentinek's Pen." [Ibid. p-418].

কিন্তু তবুও বলতে হয়, ঐ আইন প্রবর্তিত হবার পরে বাংলাদেশের রক্ষণশীল হিন্দুরা নিশ্চুপ হয়েছিল না।—পার্লামেণ্টে ঐ আইনের পুনর্বিচার চেয়ে আবেদন পাঠাবার জন্যে তারা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রথমে বেণ্টিককে পূর্বোক্ত আইন রদের আবেদন জানানো হয়েছিল. কিন্তু তিনি জানিয়েছিলেন, "প্রার্থনাকারিরা যদি এ বিষয় বিলাতে শ্রীযুত বাদশাহের নিকট আপীল করেন তবে শ্রীযুত গবর্নর জেনারল বাহাদুর সেই আরজী তুষ্টিপূর্বক বিলাতে পাঠাইয়া দিবেন।" [সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম, ৩য় সং)—ব্র. ব. সম্পাদিত ; পৃঃ ৩০১]

এরপর রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গ 'ধর্মসভা' (১৮৩০) প্রতিষ্ঠা করে তার পক্ষ থেকে বিলেতে ঐ মর্মে আবেদন পাঠাবার জন্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। 'সতী'-বিরোধী মানুষেরাও অবশ্য নিশ্চেষ্ট ছিল না। 'সমাচারদর্পণ'ও রক্ষণশীল হিন্দুদের ঐ প্রচেষ্টা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে দিয়েছিল এবং তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে জানিয়েছিল, "সতীর পক্ষীয় আরজিতে আগামি দিবস সহি হইয়া পার্লামেণ্টে প্রেরিত হইবেক অতএব এ বিষয়ে ধর্ম সভাস্থেরদের প্রতিবাদি স্বরূপ যাহারা হইয়াছেন তাঁহারা আপনাদের পক্ষীয় ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়া পার্লামেণ্টে প্রেরণ করুন তাহাতে সেই বিষয় উপস্থিত হইলে উত্তমরূপে তাহার মীমাংসা পার্লামেণ্টে হইতে পারিবে।" [তদেব ; পৃঃ ৫৪৬]

রক্ষণশীল হিন্দুদের আবেদন পত্র প্রেরিত হয়েছিল ১৮৩০ সালের ১৪ই জানুয়ারী। ঐ আবেদনপত্রের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ—

"...That the Hindoo religion is founded, like all religions, on usage as well as precept, and one when immemorial is held equally sacred with the other under the sanction of immemorial usages as well as respect, Hindoo widows perform of their own accord and pleasure, and for the benefit of husbands' souls and for their own, the sacrifice of self-

immolation called suttee, which is not merely a sacred duty but a high privilege to her who sincerely believes in the doctrines of their religion ; and we humbly submit that any interference with a persuasion of so high and self annihilating a nature ; is not only an unjust and intolerant dictation in matters of conscience, but is likely wholly to fail in procuring the end proposed." [Raja Rammohun Roy And progressive Movements in India (1941)-J. K. Mazumder ; P-156]

এই আবেদনপত্রের স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন নিমাইচাঁদ শিরোমণি, রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, কালাকান্ত বিদ্যাবাগীশ, রামজয় তর্কালঙ্কার, মহারাজ গিরীশচাঁদ এবং আরও অনেকে। এই আবেদনপত্র নিয়ে পার্লামেণ্টে যখন আলোচনা শুরু হয়েছিল রামমোহন তখন লণ্ডনেই উপস্থিত ছিলেন। ধর্মসভার পক্ষে প্রিভি কাউন্সিলে বক্তব্য উত্থাপন করেছিলেন Bathie এবং "It was taken into consideration on the 23rd of June, 1832,"…[The Life And Times of Carey, Marshman And Ward (Vol. II)—J. C. Marshman ; 1859. P-419] কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই তা খারিজ হয়ে যায়। সতীবিরোধী ব্যক্তিগণ, বলাবাহুল্য, খুশী হয়েছিলেন পার্লামেণ্টের ঐ সিদ্ধান্তে। অপর দিকে আর কিছুই করবার নেই বিবেচনায় রক্ষণশীল হিন্দুরা নীরব ও নিশ্চেষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন।

॥ ২ ॥

ঃঃ বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আন্দোলন ঃঃ

১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তিত হয় ; কিন্তু তার পেছনে ছিল বহুদিনের ও বহুজনের বিচ্ছিন্ন ও সংঘবদ্ধ সংগ্রাম। বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনের ব্যাপারে সাধারণভাবে বিদ্যাসাগরেরই নাম করা হয়ে থাকে ; কিন্তু শুধু তাঁর সংগ্রামই যে ঐ আইন প্রবর্তনের মূলে একথা বলা বোধ হয় সমীচীন নয়। অবশ্য একথা সত্য, বিদ্যাসাগরের চেষ্টা ও নেতৃত্বই শেষ পর্যন্ত বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছিল। আসলে অনেকের বিচ্ছিন্ন ভাবনা, অনেক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সীমিত প্রচেষ্টা এবং বহুমানবদরদী প্রগতিপন্থী ব্যক্তির শুভেচ্ছাই বিদ্যাসাগরের সফল প্রচেষ্টার মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছিল ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই-এ।

বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা এবং তার প্রবর্তন প্রচেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু উনিশ শতকের আগে ঐ বিষয়ে যে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা তার আলোচনায় অভিনিবিষ্ট হবো না।

মিশনারীগণ আমাদের দেশে এসেছিলেন ধর্মপ্রচার করতে। ১৮১৩ সালের কোম্পানীর সনদে তাঁদের ভারত-আগমন হয়েছিল অবাধ। অবশ্য তার আগেও মিশনারীদের এই দেশে আগমন করতে দেখা যায়। অষ্টাদশ শতক থেকেই তাঁরা এদেশে রীতিমত ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যকলাপ শুরু করে দিয়েছিলেন। মিশনারীগণ হিন্দুদিগের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে গিয়ে হিন্দু-ধর্মের সমালোচনা করতেন এবং ঐ ধর্ম যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন তা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হতেন। মিশনারীদের এই প্রচেষ্টায় একশ্রেণীর হিন্দু ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল ; কিন্তু আর এক শ্রেণীর হিন্দু তাতে কুসংস্কার বিদূরণের প্রেরণাও পেয়েছিল। উনিশ শতকের নবজাগরণে এবং কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনে মিশনারী ক্রিয়াকাণ্ডের ঐতিহাসিক গুরুত্বের এ ছিলো একটি দিক।

তবে বাংলাদেশে কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনে প্রাণবত্তা দেখা দিয়েছিল রামমোহনেরই চেষ্টায়। 'সতী' বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেও বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তিনি যে কিছু ভাবেন নি তা নয়। 'আত্মীয়সভা'য় তা নিয়ে আলোচনাও করা হতো। [দ্রঃ ক্যালকাটা জার্নাল ; ১৮১৯, ১৮ই মে) তবে বিধবাবিবাহের প্রবর্তনে তাঁর যে সম্মতি ছিল তা ওখান থেকে বোঝা যায় না। বরং তাঁর রচনায় বিধবাবিবাহ সম্পর্কে এমন বক্তব্য রয়েছে যার আলোকে মনে হয়, বিধবাবিবাহ তিনি সমর্থন করতেন না। [দ্রঃ রামমোহন-গ্রন্থাবলী (৩য় খণ্ড, ৩য় সং)—ব. সা প. ; পৃঃ ৫৬] কিন্তু সে আলোচনায় না গিয়েও বলা যায়, বিধবারমনীর প্রতি রামমোহনের যে সহানুভূতি ও সমবেদনা ছিল পরবর্তীকালে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের সংগ্রামকে তা কিছুটা প্রভাবান্বিত করলেও করতে পারে।

বাংলাদেশে প্রথম সংগঠিতভাবে বিধবাবিবাহের বিষয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল 'ইয়ংবেঙ্গল'। বিদ্যাসাগরের আগে তারাই বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে একটা নির্দিষ্টপথে চালিত করবার চেষ্টা করেছিল। বিদ্যাসাগরের সমকালেও ডিরোজিওর উত্তরাধিকারীরা তাঁকে সহায়তা করেছিল নানাভাবে।

নব্যবঙ্গ পরিচালিত 'জ্ঞানান্বেষণ,' 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' এবং সে যুগের আরও

পত্র-প্রত্রিকা থেকে প্রাক্-বিদ্যাসাগরযুগের বিধবাবিবাহ অন্দোলনের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

১৮৩৩-৩৪ সালে বিধবার পুনর্বিবাহের বিষয়ে একটি সভা করবার কথা ভাবা হয়েছিল। উদ্যোক্তা ছিলেন দেশের 'কতিপয় ধনি লোক'।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-বিষয়ে কিছুই করা হয় নি। [দ্রঃ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (৪র্থ)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, ১৯৬৬, পৃঃ ৮০৩] বিধবা বিবাহ বিষয়ে ঐ সভা করবার জন্যে যে ব্যক্তিবর্গের উদযোগ নেবার কথা ছিল তাদের মধ্যে মতিলাল শীল এবং হলধর মল্লিক ছিলেন প্রধান। এঁদের উদ্দেশ্য সমর্থন করে 'জ্ঞানান্বেষণ'ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজের ভয়ে শেষ পর্যন্ত এঁরা ঐ বিষয়ে আর এগুতে সাহস পান নি।

১৮৩৭ সালে গঠিত হয়েছিল 'ইণ্ডিয়ান ল কমিশন'। গ্র্যাণ্ট ছিলেন এর সেক্রেটারী। ঐ কমিশনের সদস্যরা বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলাদেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকার জন্যে সমাজে ব্যভিচার ভয়ংকরভাবে বেড়ে গিয়েছে ; তার ফলে সমাজে শিশুহত্যার করুণ ঘটনা ঘটছে। কিন্তু এই সত্য উপলব্ধি করতে পারলেও বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনের কথা তখনও তাঁরা কেউ ভাবতে পারেন নি। হিন্দু ধর্মাচরণে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ ঘটবে এই আশঙ্কায় আইন প্রবর্তন বিষয়ে তাঁরা চুপ করে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে 'ইণ্ডিয়ান ল কমিশন'-এর মনোভাবকে রাধাকান্ত দেব বিধবাবিবাহের বিপক্ষে প্রেরিত আবেদন পত্রে উল্লেখ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের আগে দেশে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের অনুকূলে কয়েকটি পত্র-পত্রিকা বেশ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। এ বিষয়ে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' আবার বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। জনসাধারণও এই কাজে তাদের মতামত প্রকাশ করতো জোরালভাবে। এই প্রসঙ্গে ১৮৪২ সালের এপ্রিল মাসের 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এ প্রকাশিত জনৈক ব্যক্তির প্রেরিত পত্রের কথা খুবই উল্লেখযোগ্য। পত্রটিতে বিধবাবিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় যুক্তি দেওয়া হয়েছিল। পত্রপ্রেরক বলেছিলেন, নারদ, শঙ্খ, যাজ্ঞবল্ক্য, হারীত এবং আরও অনেকে 'পুনর্ভূ'র মর্যাদা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন, বিধবা পুনর্বিবাহিতা হলে মোটেই অসতী বলে অভিহিত হয় না। তিনি বিধবা নারীর বিবাহের ক্ষেত্রে ক্ষত বা অক্ষত যোনির বাধা মানেন নি। মনুর মতে বিধবা নারীর বিবাহে সংস্কার বিহিত ; কিন্তু দান নিষিদ্ধ। এরকম নানা শাস্ত্রীয় তথ্যের

সমাবেশ ঘটিয়ে পত্রপ্রেরক বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বেশ কয়েক বছর আগে বিধবাবিবাহের পক্ষে এমন বক্তব্য সত্যিই উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু সমাজে এই পত্র প্রেরকের মতো শুধু প্রগতিশীল ব্যক্তিই ছিলেন না—প্রগতিহন্তা রক্ষণশীল ব্যক্তিও ছিলেন; বরং তাঁদের সংখ্যাই ছিল বেশি। 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করা হতো। বস্তুতঃপক্ষে দেখা যায়, বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা পত্রপত্রিকায় মতামত বিনিময় প্রবল হয়ে উঠেছিল সেই সময়।

'বেঙ্গলস্পেক্টের' তখন বিধবাবিবাহের বিষয়ে একটি বাস্তব প্রস্তাব রেখে লিখেছিলেন, "···অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা ও যুবাদিগের কর্তব্যকর্মে সাহসাবলম্বনের উপদেশ ব্যতিরেকে এতদ্বিষয় ক্রমশঃ সিদ্ধ হইবার আর সদুপায় নাই আর আমাদিগের বোধহয় যে কতিপয় হিন্দুব্যক্তিরা যদ্যপিপুনর্ভূ বিবাহ করিয়া পথ দেখান তবে ইহার প্রতি লোকের যে দ্বেষ আছে তাহাও ক্রমে হ্রাস হইয়া পরে সর্বসম্মত রূপে প্রচলিত হইতে পারে।" [সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (৩য়)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, ১৯৬৪। পৃঃ ৯১—৯২] প্রস্তাবটি নিঃসন্দেহে ভালো; তবে ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন পাসের আগে কোন যুবকের মধ্যেই ঐ বিধবাবিবাহ করার সাহস দেখা যায় নি।

প্রাক্ বিদ্যাসাগর যুগে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে সরকারের সহায়তা নেওয়া হবে কি হবে না সে বিষয়েও মতভেদ দেখা দিয়েছিল।

১৮৪৫ সালে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ নামে জনৈক উদারপন্থী ব্যক্তি বিধবা-বিবাহের পক্ষে কোন ব্যক্তিকে একটি ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন। তার অবশ্য বিরোধিতাও সেসময় করা হয়েছিল। ১২৫৩ সালে রামজয় শর্মা ঐ বিষয়ে বক্তব্য রেখে 'বিধবা-বিবাহ নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের আন্দোলন সংগঠনের পূর্বে কৃষ্ণনগরের শ্রীশচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তিও ঐ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণনগর সে-সময় ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে প্রগতিশীল আন্দোলনের একটি ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। ওখানকার রাজা শ্রীশচন্দ্র অন্যান্য বিষয়ে যেমন তেমনি বিধবাবিবাহের ব্যাপারেও নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন; তবে তিনি যে তাতে সফল হতে পেরেছিলেন তা নয়। পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে তিনি নবদ্বীপের কিছু

পণ্ডিতের কাছ থেকে বিধবাবিবাহের পক্ষে ব্যবস্থাপত্র নেবার চেষ্টাও করেছিলেন; কিন্তু সে চেষ্টা তাঁর সফল হতে পারে নি। কৃষ্ণনগর কলেজে ঐ সময় স্থানীয় নব্যপন্থীরা এক সভা করে বিধবাবিবাহের প্রবর্তনে সচেষ্ট হবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু প্রাচীন পন্থীদের এক হীন চক্রান্তে তাদের আর ঐ বিষয়ে সচেষ্ট হবার সুযোগ ঘটলো না। প্রাচীন পন্থীরা রটিয়ে দিয়েছিল, নব্যদল ঐ কলেজে গোমাংস ভক্ষণ করেছে—মদ্যপান করেছে। ঐ কথা শুনবার পর থেকে অভিভাবকেরা যার যার ছেলে বা আত্মীয়কে ঐ কলেজ থেকে সরিয়ে নিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ফলে কলেজটিও বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। ঐ অবস্থার চাপে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের চেষ্টাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল [দ্রঃ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (নিউ এজ সং)—শিবনাথ শাস্ত্রী ; পৃঃ ১৬৭-১৬৮]

বিধবাবিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগর সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন ১৮৫৫ সালে—বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকা হাতে নিয়ে। কিন্তু তার আগে ঘটে গিয়েছিল একটি উল্লেখ করবার মতো ঘটনা।

পটলডাঙ্গার শ্যামাচরণ দাস কর্মকার নিজের বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে চেয়ে দেশীয় স্মার্তপণ্ডিতদের কাছ থেকে এক ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ঐ পত্র পেয়েও ছিলেন। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ঐ পত্র রচনা করেছিলেন। ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত; ঠাকুরদাস চূড়ামণি প্রমুখ দশজন স্মার্তপণ্ডিত। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায়, এঁরা নিজেরাই নিজেদের মত পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন। রাধাকান্ত দেবের প্রযোজনায় এই ব্যবস্থাপত্রকে কেন্দ্র করে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিচার করবার জন্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ সভায় স্মার্তপণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় নয় প্রমাণ করে জয়লাভ করেছিলেন এবং পুরস্কারও পেয়েছিলেন। এই ভবশঙ্করও অল্প পরে বিধবা-বিবাহের ঘোরতর বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন। ঐ বিচার বিষয়ে বলতে গিয়ে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলেছিলেন—

"শ্যামাচরণ দাস বিষয়ী লোক, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়দের কথার স্থিরতা নাই দেখিয়া, স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বস্তুতঃ উল্লিখিত বিচারদ্বারা উপস্থিত বিষয়ের কিছুমাত্র মীমাংসা হইল না, তথাপি ঐ

বিচারদ্বারা এই এক মহৎ ফল দর্শিয়াছিল যে, তদবধি অনেকেই এ বিষয়ের নিগূঢ়-তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন।"

[বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ (বুকল্যাণ্ড সং; ১৯৬২)—শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পৃঃ ১০৯-১০]

বাংলাদেশের এই অবস্থায় বিদ্যাসাগর রচনা করেছিলেন তাঁর বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তিকা। শাস্ত্রীয়বচন উদ্ধার করে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করেছিলেন তিনি এই বইএ বাংলাদেশের এত বড় পণ্ডিত প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছ থেকে বিধবাবিবাহের সমর্থন এসেছে দেখে রক্ষণশীল ব্যক্তিরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করবার জন্যেও তারা সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল। তবে বিরোধী ব্যক্তির যুক্তিখণ্ডনে বিদ্যাসাগরও এগিয়ে এসেছিলেন কঠোর আত্মবিশ্বাস নিয়ে।

যাইহোক বিদ্যাসাগরের পূর্বোক্ত পুস্তক প্রকাশের পরেই কিন্তু বাংলাদেশে বিধবাবিবাহ আন্দোলন এক নতুন প্রাণলাভ করেছিল। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কাগজ নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়। তাঁর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তেই বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক পূর্বোক্ত পুস্তিকা প্রথম মুদ্রিত হয়। বিদ্যাসাগরের বক্তব্য সমর্থন করে প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন তিনি তাঁর পত্রিকায়। অক্ষয়কুমার ছাড়া সেযুগের আরও অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিছু পত্র-পত্রিকাও তাঁকে সহায়তা করেছিল।

এই প্রসঙ্গে, বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে সফল করবার জন্যে বিদ্যাসাগর যে রাধাকান্ত দেবের সাহায্য প্রার্থী হয়েছিলেন তাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর জানতেন, তৎকালীন সমাজে বিশেষভাবে রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে রাধাকান্ত দেবের খুব প্রভাব রয়েছে। অতএব এমন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে সমর্থক হিসেবে পেলে তাঁর কাজের খুবই সুবিধা হবে। এই জন্যে বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকা প্রকাশের পরে তিনি তাঁর সে বাসনার কথা আনন্দকৃষ্ণ এবং আরও অনেককে জানিয়েছিলেন। আনন্দ কৃষ্ণের পরামর্শ অনুযায়ী একটি পত্রসহ তিনি তাঁর রচিত পুস্তকের একখণ্ড রাধাকান্ত দেবকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রাধাকান্ত দেব সেই পত্র ও পুস্তক পেয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঐ বিষয়ে পরামর্শ করেছিলেন এবং বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা নিয়ে এক বিচার সভা আহ্বানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ঐ বিচার সভা অনুষ্ঠিতও হয়েছিল; তবে

তার ফলাফল কি হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বিহারীলাল সরকার তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে বলেছিলেন, ঐ বিচার সভায় কোন মীমাংসা না হলেও বিদ্যাসাগরের তর্কপ্রণালীতে খুশী হয়ে রাধাকান্ত দেব তাঁকে পুরস্কৃত করেছিলেন। অপরপক্ষে 'সংবাদ প্রভাকর' জানিয়েছিল, ঐ সভায় বিধবা-বিবাহ পক্ষেরই পরাজয় ঘটেছিল।

যাই হোক, রক্ষণশীল ব্যক্তিরা কিন্তু শুনেছিল, বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেয়েছেন ; তাতে তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল এবং ভেবেছিল, রাধাকান্ত দেব বুঝি বিধবাবিবাহ সমর্থন করেছেন।

কিন্তু রাধাকান্ত দেব বিধবাবিবাহ সমর্থন করতেন না। তিনি বিদ্যাসাগরকে যুক্তিজাল বিস্তার করার নৈপুণ্যের জন্যেই পুরস্কার দিয়েছিলেন। তবে পরে তাঁর বিপদ তিনি সম্যক রূপেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই আর একটি বিচার সভা আহ্বান করে বিধবাবিবাহের বিরোধী পক্ষকেই পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে ঐ দিনেও বিচারের মীমাংসা হতে পারেনি বলে জানা যায়।

রক্ষণশীল ব্যক্তিরা এই ঘটনায় স্বস্তিলাভ করেছিল ; কিন্তু বিদ্যাসাগর রাধাকান্ত দেবকে চিনতে পেরেছিলেন সম্যকভাবে। তবে তিনি তাতে দমে যান নি। সমস্ত বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবার সংকল্প তাঁর অটুটই ছিল। ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর বিধবাবিবাহের পক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় তিনি এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন।

এই প্রসঙ্গে 'সমাজোন্নতি-বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি'র কথা বলা প্রয়োজন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর ঐ সমিতির প্রথম সভায় বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনের জন্যে ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিদ্যাসাগরের আগে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

যাই হোক, বিদ্যাসাগর তাঁর আবেদন পত্র প্রেরণের আগে সংশ্লিষ্ট সরকারী পদস্থ বিদেশীদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। আবেদনপত্রটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন ৯৮৭ জন। বিদ্যাসাগর একটি ব্যক্তিগত পত্রও ঐ আবেদনপত্রের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে প্রেরিত আবেদন পত্র যথাস্থানে পৌছোবার পরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্যে আইনের একটি খসড়া (বিল)-ও প্রস্তুত করা হয়েছিল। ব্যবস্থাপক সভায় ঐ বিল প্রথম উত্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর। বিধবাবিবাহ আইনের প্রয়োজনীয়তা

বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ গ্র্যান্ট খুব জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন। ১৮৫৬ সালের ১৯শে জানুয়ারী ঐ খসড়া আইন ব্যবস্থাপক সভায় দ্বিতীয়বার উত্থাপিত হয়েছিল। ঐ সময় বিধবাবিবাহ আইন যাতে পাস হতে না পারে তার জন্যে বিরোধী পক্ষের চেষ্টাও খুব জোরদার হয়ে উঠেছিল। ১৮৫৬ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারীর 'সম্বাদ ভাস্কর' থেকে জানা যায়, হিন্দু বিধবাবিবাহের বিরোধী ব্যক্তিবর্গ ব্যবস্থাপক সভায় একটি আবেদন পত্র প্রেরণ করেছিল; তবে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে নামী ব্যক্তি কেউই ছিলেন না। পরে অবশ্য 'ভাস্কর' জানিয়েছিল, ঐ আবেদন পত্র প্রেরিত হয় নি। তবে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় দ্বিতীয়বার আইনের খসড়া উত্থাপিত হবার প্রায় দু'মাস পরে ১৮৫৬ সালের ১৭ই মার্চ রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বেএক আবেদন পত্র প্রেরিত হয়েছিল। স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ছিল তাতে ৩৬, ৭৬৩। যে রাধাকান্ত দেবের সাহায্য পাবার আশা পোষণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর, তিনিই শেষ পর্যন্ত হয়েছিলেন তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষ।

প্রসঙ্গক্রমে বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে অন্য যেসব উল্লেখযোগ্য আবেদনপত্র সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরিত হয়েছিল তাদের কথা বলে নেওয়া যাক। প্রথমে বিধবাবিবাহের পক্ষে প্রেরিত আবেদনপত্রগুলির উল্লেখ করছি—

(ক) ১৮৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রেরিত হয়েছিল কৃষ্ণনগরবাসীদের আবেদনপত্র। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, কার্তিকেয় চন্দ্র রায় প্রমুখ।

(খ) ঐ বছরের ঐ মাসেই কৃষ্ণনগর ও তার পরিপার্শ্বস্থ অঞ্চলের অধিবাসীরা আর একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন।

(গ) ১৮৫৫ সালের ঐ একই মাসে বারাসাত ও তার আশেপাশের মানুষেরাও একটি আবেদনপত্র প্রেরণ করেছিলেন। ১৮৫৬ সালেও ঐ স্থান থেকে আর একটি আবেদনপত্র এসেছিল।

(ঘ) কলকাতা মিশনারী সম্মিলন থেকেও বিধবাবিবাহের পক্ষে আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছিল।

(ঙ) কলকাতা থেকে দিগম্বর মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি ব্যক্তিগণ একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন।

(চ) শান্তিপুর থেকেও একটি আবেদনপত্র এসেছিল।

(ছ) ১৮৫৬ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রেরিত হয়েছিল 'নব্যবঙ্গের' আবেদনপত্র।

(জ) আর একটি আবেদনপত্র প্রেরিত হয়েছিল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী। রামবাগান বাসীদের ঐ আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন কৈলাসচন্দ্র দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, শশিচন্দ্র ও হরচন্দ্র দত্ত, কৈলাসচন্দ্র বসু, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ইত্যাদি।

(ঝ) ঠিক ঐ তারিখেই চট্টগ্রাম থেকে এসেছিল আর একটি আবেদনপত্র।

(ঞ) মুর্শিদাবাদের অধিবাসীরা তাঁদের আবেদনপত্র প্রেরণ করেছিলেন ১৮৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী।

(ট) ১৮৫৬ সালের মার্চ মাসে বিখ্যাত মনীষী ও সমাজসেবী রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে যে আবেদনপত্রটি প্রেরণ করা হয়েছিল তারও মূল্য অনেক।

(ঠ) বাঁকুড়া ও বর্ধমানবাসীরাও বিধবাবিবাহের দাবী জানিয়ে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন ১৮৫৬ সালের এপ্রিল মাসে।

(ড) এর প্রায় একমাস পরে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র স্বাক্ষরিত আবেদনপত্রটি প্রেরিত হয়েছিল।

(ঢ) ঐ একই বছরের ১৯শে মে ময়মনসিংহের অধিবাসীরা তাঁদের আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন।

(ন) ঢাকা থেকেও ১৮৫৬ সালের ২৪শে জুলাই একটি আবেদনপত্র এসেছিল।

এবার বিধবাবিবাহের বিপক্ষে প্রেরিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আবেদনপত্রের উল্লেখ করছি—

(ক) নদীয়া, ত্রিবেণী, বাঁশবেড়িয়া, ভাটপাড়া, কলকাতা এবং আরও কয়েকটি স্থানের পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রেরিত আবেদনপত্র।

(খ) ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ফেব্রুয়ারী কলকাতা, নবদ্বীপ ও আশে-পাশের অধিবাসীরাও একটি আবেদনপত্র প্রেরণ করেছিলেন।

(গ) ঐ সালেরই এপ্রিল মাসে আর একটি উল্লেখযোগ্য আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছিল। আবেদনকারীরা ছিলেন কলিকাতাস্থ উত্তর ভারতীয় হিন্দু অধিবাসী।

(ঘ) রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে আরও একবার আবেদনপত্র প্রেরণ করেছিলেন;—প্রেরণের তারিখ ছিল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই।

এবার বাংলাদেশের বাইরে থেকে বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে কি রকম আবেদনপত্র এসেছিল প্রসঙ্গক্রমে তার কথা বলা যাক।

বিধবাবিবাহের পক্ষে—

(ক) ১৮৫৫ সালের ৭ই নভেম্বরে প্রেরিত পুনা অধিবাসীদের আবেদনপত্র।

(খ) ১৮৫৬ সালের ১২ই জানুয়ারী প্রেরিত ভিঞ্চুর অধিবাসীদের আবেদনপত্র।

(গ) এর অল্পকাল পরে পাঠানো বোম্বের ধুলিয়া নিবাসীদের আবেদনপত্র।

(ঘ) সেকেন্দ্রাবাদ থেকে প্রেরিত আবেদনপত্র।

বিধবাবিবাহের বিপক্ষে—

(ক) দাক্ষিণাত্য থেকে পাঠানো হিন্দু ব্রাহ্মণ স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র।

(খ) ১২৬২ বঙ্গাব্দে প্রেরিত ত্রিপুরাবাসীদের আবেদনপত্র।

(গ) বোম্বের সাতারা অঞ্চলের আবেদনপত্র (১৮৫৬, ২৫শে মার্চ)।

(ঘ) ১৮৫৬ সালের ১৫ই এপ্রিলে প্রেরিত পুনাবাসীদের আবেদনপত্র।

(ঙ) ঐ বছরের ঐ এপ্রিল মাসেই পাঠানো বোম্বেবাসীদের আবেদনপত্র।

বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলনের সময় বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে আরও অনেক আবেদনপত্র যথাস্থানে প্রেরিত হয়েছিল; তবে তাদের মধ্যে বিধবাবিবাহবিরোধী আবেদনপত্রের সংখ্যাই ছিল অধিক। বিহারীলাল সরকার তাঁর 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে জানিয়েছিলেন, ঐ বিবাহের বিরুদ্ধে আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছিল ৪০টির বেশি—তাতে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ছিল ৫০ থেকে ৬০ হাজার। অপরদিকে পক্ষে পড়েছিল ২৫টি আবেদনপত্র ;—তাতে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ হাজার।

তবে 'সম্বাদ ভাস্কর' ভিন্ন তথ্য পরিবেশন করেছিল।—'বিধবাবিবাহের সপক্ষ মূল আবেদন সভায় প্রদানের পরে ঐ অভিপ্রায়ের প্রায় ২০।২৫ খান আবেদন সমাজে অর্পিত হইয়াছে কিন্তু বিপক্ষ পক্ষ হইতে ঊর্দ্ধসংখ্যা ২।৩ খানির অধিক আবেদন হয় নাই,"…[সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৩য়)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ; ১৯৬৪। পৃঃ ৪৬৯]

কিন্তু 'সম্বাদ ভাস্কর' পরিবেশিত এই তথ্য সত্য নয় বলেই মনে হয়। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, মিঃ গ্র্যাণ্ট বিধবাবিবাহের পক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, "বিরোধিগণের ত্রিশ সহস্র স্বাক্ষরের

তুলনায় বিধবাবিবাহ পক্ষীয় লোকেদের অল্পসংখ্যক স্বাক্ষরেরও মূল্য অনেক অধিক। কারণ এরূপ সংস্কারের পথে সাহস করিয়া অগ্রসর হওয়া কিরূপ কঠিন কার্য, তাহা ভাবিলে, প্রত্যেকেই আমার কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।" [বিদ্যাসাগর (১৮৯৫)—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃঃ ১৬২] স্বাক্ষরকারীর সঠিক সংখ্যা সম্বন্ধে বিহারীলাল ও চণ্ডীচরণ পরিবেশিত তথ্যে অমিল থাকলেও বোঝা যায়, বিধবাবিবাহ বিরোধীর সংখ্যাই ছিল অধিক।

যাই হোক, ১৮৫৬ সালের ৩১শে মে 'সিলেক্ট কমিটি' বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত 'রিপোর্ট' পেশ করেছিল। ঐ কমিটির সদস্য ছিলেন স্যার জেম্‌স্ কলভিন, মিষ্টার ইলিয়ট, মিষ্টার সি. জেইট এবং পূর্বে উল্লিখিত মিষ্টার গ্র্যাণ্ট। এঁদের দ্বারা গঠিত কমিটির রিপোর্ট পেশ হবার পর ১৮৫৬ সালের ১৯শে জুলাই আইনের খসড়াটি তৃতীয়বার পঠিত হয়। তারপর ২৬শে জুলাই সেটি লাভ করে আইনের মর্যাদা।

কিন্তু বিধবাবিবাহ আন্দোলন তখনই সমাপ্ত হয়ে যায় নি—ঐ আইন পাসের পর বিধবাবিবাহকে বাস্তবায়িত করবার প্রয়োজনও ছিল। বিদ্যাসাগর সে কাজও করেছিলেন—সমাজে তার প্রতিক্রিয়াও প্রবল আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু তার আগে দেখা যাক, ঐ আইন পাসের পরে সমাজ তাকে কিভাবে গ্রহণ করেছিল।

১৮৫৬ সালের ২রা আগষ্টের 'সম্বাদ ভাস্কর' বিধবাবিবাহ আইন চালু হবার পরে খুব উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক কিন্তু তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত মাত্র অক্ষতযোনি বিধবারই বিবাহ স্বীকার করেছিলেন ; কিন্তু আইনে বিধবা মাত্রেরই বিবাহের কথা স্বীকৃত হয়েছিল। তাছাড়া তিনি মনে করেছিলেন, বিধবাবিবাহ সম্পর্কে শাস্ত্রীয় বিচার শেষ না হতেই ঐ আইন পাস করা হয়েছে। [দ্রঃ সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১ম ; ১ম সং)-বিনয় ঘোষ সম্পাদিত। পৃঃ ২১৯] যেভাবে আইনটি বিধিবদ্ধ হয়েছিল তাতে 'ইয়ং বেঙ্গল'ও খুশী হতে পারে নি। তাদের মতে আইনটি ত্রুটিমুক্ত ছিল না। বিদ্যাসাগরও পরে তা বুঝতে পেরেছিলেন। বিধবাবিবাহ দিতে গিয়ে তিনি কখনও কখনও প্রতারিত হয়েছিলেন। অনেকে বিধবাবিবাহের নামে বহুবিবাহ করে তাঁকে ঠকিয়েছিল। এই জন্যে তিনি পরে বিধবাবিবাহকারীর কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নিতেন—যাতে কন্যাকে পাত্র প্রতারণা করতে না পারে সেই মর্মে। কিন্তু ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র অপেক্ষা সরকারী ব্যবস্থাই যে প্রশস্ত বিদ্যাসাগর তা অনুধাবন করেছিলেন।

এবার দেখা যাক, আইন প্রবর্তিত হবার পরে তাকে বাস্তবে কার্যকরী করবার ক্ষেত্রে সফলতা এসেছিল কতটুকু।

রক্ষণশীল ব্যক্তিদের ধারণা ছিল, আইন পাস হলেও বিধবাবিবাহ বাস্তবে আদৌ ঘটা সম্ভব নয়। ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন অর্থাৎ বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হবার অব্যবহিত পরেই কোন বিবাহের ঘটনা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় তাদের ঐ ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছিল। এই কারণে দেশে নানা গুজবও রটেছিল—বিরোধীপক্ষও নানা কথা বলবার সুযোগ পেয়েছিল।

কিন্তু জানা যায়, ঐ আইন পাসের পরে বিদ্যাসাগর খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ; সেজন্যে ঐ সময় তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই বিশ্রাম নেবার সময়েই বিরোধীপক্ষ ঐ সব কথা বলবার সুযোগ পেয়েছিল।

কিন্তু যে যাই-ই অনুমান করুক না কেন, আইনানুগ বিধবাবিবাহ দেবার জন্যে বিদ্যাসাগর ঠিকই চিন্তা করেছিলেন ; এবং ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর তাঁর সেই চিন্তাই সফলতা লাভ করেছিল খোদ কলকাতাতে। ঐ দিনেই বিদ্যাসাগরের প্রযত্নে শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিবাহ করেছিলেন বিধবাকন্যা কালীমতী দেবীকে। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ইতিহাসে দিনটি নিঃসন্দেহে স্মরণীয়।

প্রথম বিধবাবিবাহের ঘটনাটি তৎকালীন বাংলাদেশে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। সে-যুগের সংবাদ পত্রাদিতে ঐ আলোড়নের পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে। সমসাময়িক সংবাদপত্রাদিতে উল্লিখিত বিবাহঘটনার বিস্তৃত পরিচয় বর্ণিত হয়েছিল ; তবে কোন কোন পত্রিকা ঐ বিবাহ বর্ণনায় কিছু কিছু অসত্য তথ্যও পরিবেশন করেছিল। 'সম্বাদ ভাস্কর' থেকে জানা যায়, "গত রবিবাসরীয় রজনীযোগে লক্ষ্মীমণি দেবী শ্রীশচন্দ্র বরে ঐ কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন, বিবাহের পূর্বদিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিস্তর চলিতপত্র বিতরণ হইয়াছিল উপস্থিত পণ্ডিতগণকে পত্র দিতে অবকাশ হয় নাই। অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন অধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাহারদিগের নাম লিখিয়া লইয়াছিলেন, বরযাত্র, কন্যাযাত্র, প্রায় দুই সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল ...বিবাহকালে স্ত্রী আচারাদি যে সকল হইয়া থাকে এ বিবাহে সে সকলের কোন অংশ ত্রুটি হয় নাই। যথাশাস্ত্র মন্ত্রপাঠ পূর্বক কন্যা সম্প্রদান হইয়াছে,"...[তদেব ; (৩য় ; ১ম সং) ; পৃঃ ৩৪৭-৪৫]

'সংবাদ প্রভাকরে' কিন্তু ঐ বিবাহের বর্ণনায় অন্য কথা পাওয়া যায়।—

"পাঠকগণ ! আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি এবং এইক্ষণেও লিখিতেছি যে

হিন্দুবিধবার এই প্রথম বিবাহ কোন ক্রমেই সর্বাঙ্গসুন্দররূপে বাচ্য হইতে পারে না, যেহেতু বিবাহস্থলে দম্পতির পরিবার বা জ্ঞাতিকুটুম্ব কেহই উপস্থিত হয় নাই, এবং কন্যার খুড়া কিম্বা ভ্রাতা ইত্যাদি কেহই তাঁহাকে পাত্রস্থ করেন নাই, তাঁহার জননী চক্রাকার রূপচাঁদের মোহনমন্ত্রে মুগ্ধা হইয়া তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, বর-পাত্রও কেবলমাত্র রাজদ্বারে প্রিয়পাত্র হইবার প্রত্যাশায় এতদ্রূপে ত্রিকুল পবিত্র করিলেন, পরিশেষে কি হয় তাহা অনির্বচনীয়, যাহা হউক তিনি প্রধানতঃ সাহসিকরূপে বুক বান্দিয়া ততদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়াতে বিধবারবিবাহ পক্ষগণ অবশ্য তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন।" [বিদ্যাসাগর (১৩০২)—বিহারীলাল সরকার ; পৃঃ ৩৪৮-৩৪৯]

এই বক্তব্য পাঠ করলেই বোঝা যায়, এ নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যমূলক। 'সংবাদ প্রভাকরে'র যিনি সম্পাদক ছিলেন তিনি বিধবাবিবাহ ব্যাপারে একেবারে অনুদার ছিলেন না ; তবে, আগেই বলা হয়েছে, যে-ভাবে বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল তা তাঁর মনঃপূত হয় নি। এই কারণেই মনে হয়, 'সংবাদ প্রভাকরে'র সংবাদ পরিবেশনা উদ্দেশ্যমূলক হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সে যাই হোক, ঐ বিধবাবিবাহের ঘটনায় অনেকে উৎসাহিত হয়ে ঐ বিষয় সমর্থনের জন্যে এগিয়েও এসেছিলেন। বর্ধমানের মহারাজ এক সময় বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু ঐ ঘটনার পরে তিনি তা সমর্থনের জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। [দ্রঃ সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৩য় ; ১ম সং)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, পৃঃ ৩৫৫-৩৫৬]

বস্তুতঃ শ্রীশচন্দ্রের বিবাহের পর বহু মানুষের ধারণা হয়েছিল বিধবাবিবাহ এবার সত্যিই চালু হলো। ঐ বিবাহের পরে অল্পদিনের মধ্যে আরও তিনটি বিধবানারীর বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চতুর্থটির পরে পঞ্চম বিবাহটির ব্যবধান ছিল একটু বেশি সময়ের। সেজন্যে তা নিয়ে গোঁড়া মনোভাব সম্পন্ন মানুষ আবার সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। রক্ষণশীল মানুষের চিন্তা সম্পর্কে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় লেখা হয়েছিল, "…কয়েকমাস আর বিবাহ হয় নাই। ইহাতে অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং সর্বত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যে বিধবাবিবাহের আইন রহিত হইয়া গিয়াছে আর বিধবার বিবাহ হইবেক না।"

[তদেব, (২য় ; ১ম সং,) পৃঃ ২০৩]

পঞ্চম বিবাহটি ঘটেছিল ১২৬৪ বঙ্গাব্দের ২৮শে অগ্রহায়ণ ; কিন্তু ষষ্ঠ বিবাহটি

ঘটেছিল ১২৬৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে। এই দুই বিবাহের মধ্যে যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান তার কারণ সিপাহিবিদ্রোহ। রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের চাপে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা চাপা পড়ে গিয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে রক্ষণশীল হিন্দুরা কিভাবে ঐ রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়কে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করেছিল তারও উল্লেখ করা প্রয়োজন। তারা প্রচার করেছিল, ইংরেজ বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেছিল বলেই সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছিল।

অবশ্য বিদেশীরাও কেউ কেউ বিধবাবিবাহকে সিপাহিবিদ্রোহের অন্যতম কারণ বলে অনুমান করেছিলেন।

কিন্তু একথা মনে রেখেও বলা যায়, বিধবাবিবাহ যেভাবে প্রচলিত হওয়া উচিত ছিল বা যেভাবে ঐ বিবাহ প্রচলিত হবে বলে আশা করা গিয়েছিল তা কিন্তু সত্যিই হতে পারেনি। তার অন্যতম কারণ উদারপন্থী প্রগতিশীল মানুষেরই উদাসীনতা বা অসহযোগিতা।

কালীপ্রসন্ন সিংহ বিধবাবিবাহকে উৎসাহিত করবার জন্যে এক সময় 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকাটির পাঠকদের জানিয়েছিলেন, প্রতি বিধবাবিবাহকারীকে 'সহস্র মুদ্রা' পুরস্কার দেওয়া হবে। 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকেই তিনি ঐ কথা জানিয়েছিলেন। [দ্রঃ তদেব ; (৩য় ; ১ম সং) ; পৃঃ ৫০৩]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ প্রতিশ্রুতি আর রক্ষা করা হয়নি। পরোক্ষভাবে এতে বিধবাবিবাহ প্রচলনের পক্ষে বাধাই সৃষ্টি হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে কালীপ্রসন্ন সিংহকে অভিযোগ করে লেখা একটি পত্রের কিছু অংশ উদ্ধার করছি—

"মহাশয় ভাস্করপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে গমনপূর্বক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করত বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দিয়াছিলেন সংবৎসর মধ্যে বিধবাবিবাহের সাহায্য ও উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে প্রত্যেক বিবাহে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন সে বিজ্ঞাপন এইক্ষণে কোথায় থাকিল, বাবু মহাশয়ের বাক্য শরৎকালের মেঘ গর্জনের ন্যায় কেবল ডাক হাঁক সার হইল, আমি বিধবা রমণীর পাণি পীড়ন করিয়া মহাবিপদগ্রস্ত হইয়াছি, কোন ব্যক্তির পরামর্শ ক্রমে উক্ত মহাশয়কে পত্র লিখিয়া বিস্তারিত জ্ঞাপন করিয়াছি, অনুমান ছিল বাবু মহাশয়ের বদান্যতা সফল হইবেক তাহা কৈ হইল, সে পত্র প্রাপ্ত হইলেন কিনা তাহাই বা কিসে জানিতে পারিব,"…[তদেব ; পৃঃ ৩৭৭]

এছাড়াও দেখা যায়, প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা সাহায্য করবেন বলে বিদ্যাসাগরকে কথা দিয়েছিলেন—চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁরাও ধীরে ধীরে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। সব দায়িত্ব তখন একা বিদ্যাসাগরেরই ঘাড়ে এসে চেপে বসেছিল। কি অসহায় অবস্থা তখন তাঁর! বিদ্যাসাগরের সেই মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের ব্যাপারে কিছু অর্থ ধার নিয়েছিলেন দুর্গাচরণের কাছ থেকে। দুর্গাচরণ সেই টাকার জন্যে তাগাদা দিলে বিদ্যাসাগর তাঁকে প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছিলেন, সাহায্যদানের অঙ্গীকার করেও অধিকাংশ অঙ্গীকারকারী তাঁকে সাহায্য করেন নি।

বস্তুতঃ ধীরে ধীরে এমন সময় এসেছিল যখন বিদ্যাসাগর প্রায় কারও সহযোগিতা পান নি। তিনিও এক রকম নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই একা ঐ অবস্থায় তাঁর আর বেশি কিছু করবার উপায় ছিল না। আইনপাসের পরে প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর; তারপর কখনও তীব্র বেগে, কখনও বা মন্দগতিতে ঐ বিবাহের ধারা প্রসৃত হয়েছিল ১৮৭০ সালের ১১ই আগস্ট বিদ্যাসাগরপুত্র নারায়ণ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের বিবাহের সময় পর্যন্ত। কিন্তু তারপরে বিধবাবিবাহের ঘটনা ক্বচিৎ দু'একটি ঘটে থাকলেও বিধবাবিবাহ ঠিক চালু আর হলো না।

অবশ্য এ জন্যে বিদ্যাসাগরের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের অসহযোগিতাই যে একমাত্র দায়ী তা' নয়; দেশবাসীর দেশাচারবশ্যতাও সেজন্যে দায়ী। যুক্তি ও শাস্ত্রের কথা অনুধাবন করলেও দেশাচারকে তারা শেষ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করতে পারে নি। দেশবাসীর ঐ দেশাচারপ্রিয়তা দেখে বীতশ্রদ্ধ বিদ্যাসাগর খেদের সঙ্গে বলেছিলেন—

"আমি আশা করিয়াছিলাম, কোনো সামাজিক ক্রিয়াকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলেই এদেশের লোক তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে, কিন্তু আমার সে বিশ্বাস বিনষ্ট হইয়াছে। এদেশে শাস্ত্র এবং দেশাচার এক পথে না চলিয়া পরস্পর বিভিন্ন পথে চলিয়াছে।" [বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; ১৩৭৬; পৃঃ ২৫৮]

আজও এদেশের মানুষ সম্বন্ধে একথা পরিপূর্ণভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয় নি। বিদ্যাসাগরের যুগ থেকে আজকের যুগের মানুষ অনেক উন্নত চিন্তার অধিকারী হয়েছে, অনেক বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার ধারকবাহক হয়েছে;

কিন্তু তবুও কি অধিকাংশ লোক মনেপ্রাণে বিধবাবিবাহের সমর্থক হতে পেরেছে ?

॥ ৩ ॥

ঃঃ কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথা নিবারণ আন্দোলন ঃঃ

উনবিংশ শতাব্দীতে কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকায় বাংলার সমাজজীবন রীতিমত কলুষিত হয়ে উঠেছিল। অথচ আশ্চর্য, ঐ প্রথার বিরুদ্ধে কোন সংগঠিত আন্দোলনই দেখা দেয় নি ১৮৫০-এর আগে। অবশ্য তার আগে ঐ আন্দোলনের ক্ষেত্র যে প্রস্তুত হচ্ছিল সে-কথা বলা যায়, কিন্তু তাহলেও বলতে হয়, প্রস্তুতিকাল ছিল বড় দীর্ঘসময়ের।

কৌলীন্যজনিত বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বিদেশী মিশনারীগণই প্রথম এদেশে প্রচার কার্য চালিয়েছিলেন। তাঁদের ঐ কার্যের পেছনে যে উদ্দেশ্যই থাক না কেন, তাতে এই দেশেরই উপকার সূচিত হয়েছিল। বাঙালী প্রথম সংগঠিত-ভাবে বহুবিবাহ বিষয়ে আলোচনা শুরু করে 'আত্মীয় সভা'তে। অবশ্য 'আত্মীয় সভা'র প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন বা তাঁর সদস্যবৃন্দ ঐ বিষয়ে কোন আন্দোলন গঠনের চেষ্টা করেছেন বলে জানা যায় না ; কিন্তু তাহলেও বলা যায়, তাঁদের সেই আলাপ-আলোচনা দেশের মানুষকে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতন করেই তুলেছিল। রামমোহন তাঁর গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে বহুবিবাহ বিষয়ে যে বক্তব্য রেখেছিলেন বহুবিবাহ বিরোধী মনোভাব গঠনে তারও গুরুত্ব অনেক।

রামমোহনের সময় বাংলাদেশে 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠীও নানা সামাজিক কুসংস্কারের বিরোধিতায় সোচ্চার ছিল ;—কৌলীন্য ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও তারা নীরব ছিল না। তাদের প্রচারিত পত্র-পত্রিকাতেও সেই বিরোধিতা প্রকাশিত হয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনমত গঠন করেছিল। এই বিষয়ে 'নব্য বঙ্গের' 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এর ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামপুরের মিশনারী পরিচালিত 'সমাচার দর্পণ'ও এ বিষয়ে কম অগ্রসর ছিল না। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বরের 'সমাচার দর্পণ' থেকে জানা যায়, দেশের মানুষ সে সময় কৌলীন্যপ্রথা বিলোপের কথা ভেবে দেখছিল—

"……হিন্দুরা এই অনুমান করেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে রাজাজ্ঞাক্রমেতে যেমন এই নিয়ম স্থাপিত হয় তেমন বর্তমান দেশাধিপতির আজ্ঞাতেও তাহা স্থগিত হইতে পারে।"……

[সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় ; ৩য় সং)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ; পৃঃ ২৪৩]

অবশ্য 'দর্পণের' নিজস্ব মতটি ছিল একটু ভিন্ন ধরণের ; "যদ্যপি বর্তমান গবর্ণমেণ্ট প্রজারদিগের দুঃখ রহিত ও সুখের বৃদ্ধি করিতে সর্বদা চেষ্টিত তথাপ আমারদিগের এই আশঙ্কা যে উক্ত ব্যবহার দেশের মধ্যে এমত বদ্ধমূল হইয়াছে যে তাহার একেবারে সমূলোৎপাটন করা অসাধ্য এবং আমারদের বোধ হয় যে এতদ্বিষয়ে অনেক ব্যাঘাত আছে"…[তদেব]

কিন্তু এই দুইমতে সামান্য ভিন্নতা থাকলেও তা' ততটা উল্লেখযোগ্য নয় ; ঐ সময়ে আইন করে বহুবিবাহ রদ করবার কথা যে সমাজে দেখা দিয়েছিল সেইটিই বড় কথা।

বহুবিবাহ সমাজে নৈতিক শিথিলতা এনেছিল ; এনেছিল আরও অনেক সমস্যা। কৌলীন্যের নাম ভাঙ্গিয়ে বহুবিবাহ করবার ফলে কুলীন ভিন্ন অন্য ব্যক্তির পক্ষে তখন বিবাহ করা ছিল প্রায় অসম্ভব। এইসব বাস্তব অবস্থার দিকে তাকিয়ে সে-সময়ের মানুষ রীতিমত চিন্তিত হয়েই উঠেছিল এবং তাঁর আশু-সমাধানের পথ সন্ধান করেছিল। আর এইভাবেই ধীরে ধীরে সংগঠিত (organised) আন্দোলনের পথও প্রস্তুত হয়েছিল।

গভর্ণমেণ্টের কাছে সমাজের উচ্চশিক্ষিত ও সমাজসচেতন ব্যক্তিদের নেতৃত্বে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রথম আবেদনপত্র গিয়েছিল ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু দেখা যায়, তার বহু বছর আগেই 'সমাচার দর্পণে' এক পত্রপ্রেরক ঐ আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছিলেন। (দ্রঃ তদেব ; পৃঃ ২৪৬)

পরবর্তীকালেও দেশের মধ্যে ঐ মনোভাব সোচ্চার হয়ে উঠেছিল আরও বেশি—"সম্প্রতি আমরা কোন কোন পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইয়া এই বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহাতে পণ্ডিত, বিষয়ি, এবং ইতর লোক পর্যন্ত অধিবেদনের নিবারণকল্পে অভিলাষ ও আহ্লাদ প্রকাশ করিলেক, এবং তন্নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিতে প্রস্তুত হইলেক।"

[সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৩য়)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ; ১৯৬৪। পৃঃ ৫৭১]

বহুবিবাহের বিরোধিতায় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। সামাজিক নানা বিষয়ের উন্নতি-বিধানের জন্যে ১৮৫৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তাঁর উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল 'সমাজোন্নতি-বিধায়িনী সুহৃদসমিতি।' এই সমিতিরই পক্ষ থেকে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রথম আবেদনপত্র প্রেরিত হয়। ঐ সময় বহুবিবাহের পক্ষেও একটি আবেদনপত্র প্রেরিত হয়েছিল। পরে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বহুবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক আবেদনপত্রই জমা পড়েছিল। ঐসব পত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বর্ধমানের রাজাসহ অন্যান্য ব্যক্তি-স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র এবং বিদ্যাসাগর-স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র। বাংলা-দেশের হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, রাজশাহী, ময়মন-সিংহ প্রভৃতি প্রায় সকল স্থান থেকেই তখন আবেদনপত্র সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। বহুবিবাহ বিলোপ সাধনের চেষ্টা রমাপ্রসাদ রায়ও সেযুগে কম করেন নি। এই কারণে বহুবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তকে তাঁর ভূমিকার কথা বিদ্যাসাগর শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করেছিলেন। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন প্রার্থনা করে আবেদনপত্র পেশ হবার পরে সরকারের পক্ষ থেকে গ্র্যাণ্ট আইন পাসের বিষয়ে আশা প্রদান করেছিলেন। রমাপ্রসাদ রায়ের সহায়তায় তখন একটি বিলের খসড়াও প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু এতদূর এগিয়েও ঐ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা তখন যায় নি। তার বড় কারণ ছিল সিপাহি বিদ্রোহ। বৃটিশ সরকার তখন ঘর সামলাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

কয়েকবছর পর অবশ্য আবার ঐ বিষয়ে উদ্যোগ-আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছিল। তদানীন্তন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য দেবনারায়ণ সিংহ তখন ঐ বিষয়ে খুব সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। বহুবিবাহবিরোধী একটি খসড়া বিলও তিনি তৈরী করেছিলেন। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় তা' উত্থাপনের আগেই সভার সদস্য থাকবার মেয়াদ তাঁর উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কাজেই তাঁর পক্ষে আর সে বিল উত্থাপন করা সম্ভব হয় নি। খসড়া বিলসহ তিনি আবেদন করেছিলেন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। সেই বছর আরও কয়েকটি আবেদন-পত্র ঐ একই মর্মে সরকারী মহলে প্রেরিত হয়েছিল। সমাজের সাধরণ মানুষ তখন কুলীন প্রথা ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে রীতিমত সজাগ হয়ে উঠেছিল। সে যুগের নানা ব্যক্তির ও সংবাদপত্রের বহু লেখায় তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। দেশের নানাস্থানের রাজা থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই এই হীনপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁদের মতামত জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সিসিল বীডনের কাছে আবার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু বীডন তখন কিছুই করতে পারেন নি।

তবে দেশের মানুষ যে তাতে হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল তা' নয়। ১৮৬৬ সালে ঐ ব্যাপারে উদ্যোগ আয়োজন তাই আবার জোরালো হয়ে উঠেছিল। এই বছরটি বহুবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলনের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনেই রাধাকান্ত দেব বহুবিবাহ আইন গঠনের বিরোধিতা করে অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে এক আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। ১৮৬৬ সালেরই ১লা ফেব্রুয়ারী বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে প্রেরিত হয়েছিল আর একটি আবেদনপত্র। মহারাজ সতীশচন্দ্র ও অন্যান্য ব্যক্তি স্বাক্ষরিত আর একটি উল্লেখযোগ্য আবেদনপত্র লেফটেনান্ট গভর্ণরকে হাতে হাতে দেওয়া হয়েছিল একটি ডেপুটেশনের মাধ্যমে। ডেপুটেশনের তারিখ ছিল ১৯শে মার্চ, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। তখন লেফটেনান্ট গভর্ণর ছিলেন বীডন সাহেব। ডেপুটেশনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রার্থনা পূরণের আশা দিয়ে তিনি বলেছিলেন—

"I shall gladly use my best endeavours to procure the enactment of a law to restrain the abuses attending the practice of polygamy among Hindus, and to impose upon a custom, which I cannot but regard as altogether demoralizing, the utmost degree of restriction of consistent with the reasonable opinions and wishes of the intelligent Hindu public !".…

[Isvar Chandra Vidyasagar (1907)—S. C. Mitra ; P-229]

এরপর বর্ধমানের মহারাজার স্বাক্ষরসহ আরও একটি আবেদনপত্র যথাস্থানে প্রেরণ করা হয়েছিল।

বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করবার বিষয়ে ঐ ১৮৬৬ সালে বাংলা ও ভারত সরকারের মধ্যে বেশ কয়েকটি পত্র বিনিময়ও হয়েছিল। (দ্রঃ করুণাসাগর বিদ্যাসাগর—ইন্দ্র মিত্র) বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারকে জানিয়েছিল, সারাভারত না হলেও অন্ততঃ বাংলাদেশ থেকে বহুবিবাহের কুফল দূরীকরণের জন্যে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। অবশ্য ভারত সরকার ঐ বিষয়ে তখন কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। তবে ভারত সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী বাংলা সরকার একটি তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করেছিল। ঐ কমিটিতে দেশী-বিদেশী উভয় শ্রেণীর সদস্যই ছিলেন। সত্যশরণ ঘোষাল, বিদ্যাসাগর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ

মুখোপাধ্যায়, দিগম্বর মিত্র, হব হাউস্, এইচ. টি. প্রিন্সেপ—এঁরা সকলেই ঐ কমিটির সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। কমিটি যথাশীঘ্র তার রিপোর্টও বের করেছিল। কিন্তু সদস্যদের মধ্যে ঐকমত্য ঘটতে পারে নি। বিদ্যাসাগর ছিলেন আইনের পক্ষপাতী ; কিন্তু অন্য সদস্যরা ছিলেন তার বিরোধী। বস্তুতঃ বাংলা ও ভারত সরকারের মধ্যে বহুবিবাহ বিষয়ে যে পত্র বিনিময় হয়েছিল তাতেও ঐ আইন পাসের বিষয়টি নিশ্চিত ছিল না। ভারত সরকারকে 'সেক্রেটারি অব্ স্টেট' একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন—

"I concur with your excellency in the opinion that there is not sufficient evidence that a large majority of even the more enlightened people of the province "of Bengal" will be found to be heartily against polygamy, apart from the special abuses practised by the kulin Brahmins.

I am inclined to think therefore that at present no measure of a legislative character should be taken."

[করুণাসাগর বিদ্যাসাগর (১ম সং)—ইন্দ্র মিত্র ; পৃঃ ৩৪৫] কাজেই শেষ পর্যন্ত ঐ আইন রচনা করা আর তখন সম্ভবপর হলো না।

বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনে 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র ভূমিকাও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য।—'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা ১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে, (আষাঢ়) লিখেছিল, "সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা কন্যাপণ ও বহুবিবাহ নিবারণ এবং কৌলীন্য প্রথার উন্মূলন বিষয়ে চেষ্টা পাইতেছেন শুনিয়া আমাদিগের হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল।" [সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৪র্থ) ১ম সংস্করণ—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ; পৃঃ ২৩৭] 'ধর্মরক্ষিণী সভা' বহুবিবাহ নিবারণ আইনের জন্যে আবেদন করবার উদযোগ নিয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য 'সোমপ্রকাশ' বহুবিবাহবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তার নিবারণে সরকারী আইনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করতো না। এই কারণে ধর্মরক্ষিণী সভার উদ্দেশ্য মহৎ হলেও সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়কে 'সোমপ্রকাশ' অভিপ্রেত বলে মনে করে নি।

যা হোক, 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা' সরকারের কাছে ঐ বিষয়ে আইনের জন্যে আবেদন করবার উদযোগ নিয়েই ক্ষান্ত থাকে নি, বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত নয় তা জানবার জন্যে পণ্ডিতদের মতামতও সংগ্রহ করেছিল—এই 'সনাতন

ধর্মরক্ষিণী সভা'কে সহায়তা করবার জন্যেই বিদ্যাসাগর রচনা করেছিলেন বহুবিবাহ সংক্রান্ত তাঁর প্রথম পুস্তক। ঐ পুস্তকটির সমালোচনা করা হয়েছিল 'সোমপ্রকাশে'। সেখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছিল :

"......বিদ্যাসাগরও বহুবিবাহকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত বৃথা বহুল প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে ইষ্টলাভ কি? বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ এই কথা শুনিলেই কি এদেশের লোকে ভীত হইয়া তাহা হইতে বিরত হইবেন।"

[সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৪র্থ)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ; ১৯৬৬ ; পৃঃ ২৪২]

'সোমপ্রকাশ' ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে বহুবিবাহ বিষয়ে সেযুগে বেশ মতামত বিনিময় হয়েছিল। 'সোমপ্রকাশের' পৃষ্ঠায় অপর ব্যক্তির সঙ্গেও ঐ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের বাদবিতণ্ডা হতে দেখা যায়। এই বাদবিতণ্ডার মধ্য দিয়ে বহুবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলন বেশ তীব্র হয়েই উঠেছিল।

বহুবিবাহ সম্বন্ধে সমাজে নানাবিধ মত চালু ছিল। একদল মনে করতো, বহুবিবাহের প্রয়োজন আছে—তা শাস্ত্রসম্মত। অপরদল মনে করতো, ঐ বিবাহ অ-শাস্ত্রীয়—তার বিলোপই বাঞ্ছনীয়। আবার যারা এর বিরোধিতা করতো, তারাও সবক্ষেত্রে একমত ছিল না। এইসব মত নানাসময় নানাভাবেই প্রকাশিত হতো ; তবে বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকা প্রকাশের পরেই তার প্রকাশবাহুল্য ঘটেছিল। সে-যুগের পাঁচজন পণ্ডিতব্যক্তি বিদ্যাসাগরের ঐ পুস্তকের সমালোচনা করে পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরও তার জবাবে পুনরায় পুস্তক রচনা করেছিলেন। এর সঙ্গে অপর ব্যক্তির মতামত বিনিময়ও প্রবল হয়ে উঠেছিল। বহুবিবাহ ও কৌলীন্যবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে উনিশ শতকের সপ্তম-অষ্টম শতক এই কারণেই খুব উল্লেখযোগ্য।

বহুবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলন শুধু দেশের রাজধানী বা তার আশে-পাশেই নয়—সেখান থেকে বহুদূরে নানা স্থানেই ছড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতা থেকে দূরে পূর্ববাংলায় বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। নিজে ছিলেন তিনি ভঙ্গকুলীন ; কৌলীন্যের অভিশাপ তিনি নিজের জীবনেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাই কুলীন হওয়া সত্ত্বেও কৌলীন্য ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে তিনি ব্যাপক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠনের জন্যে তিনি কয়েকটি পুস্তকও রচনা করেছিলেন। কুলীন ব্রাহ্মণেরা যাতে সর্বদ্বারিক বিবাহে রাজি হয় তার জন্যে তিনি স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানেও নেমেছিলেন। 'হিন্দু হিতৈষিনী' ও 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকা দু'টি সে-সময় আন্দোলন সংগঠনে রাসবিহারীকে সহায়তা করেছিল অকুণ্ঠভাবে। তিনি বিক্রমপুরের বংশজদিগের দ্বারা কৌলীন্য ও বহুবিবাহবিরোধী এক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক মূল্যের কথা চিন্তা করে প্রতিজ্ঞাপত্রটি উদ্ধার করা হলো—

"ভঙ্গকুলীনদিগের মেল ও পর্য্যায় নানা অনিষ্টকর বিবেচনায় আমরা বংশজগণ এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ভঙ্গকুলীন মহাশয়রা মেল পর্য্যায় ভঙ্গ করিয়া পূর্বরূপ সর্বদ্বারিকতা নিয়মে আদানপ্রদান করিলে, আমরা তাঁহাদিগের কুলের হানি জ্ঞান করিব না; কারণ অদ্যাপিও আমরা কৌলিন্যগ্রন্থে স্পষ্ট জানিতেছি যে ইহা দেবীবরের কৃত নানা অধর্মকর আধুনিক প্রথা। সুতরাং ইহা ত্যাগ করিলে কুলীনদিগের কৌলীন্যমর্য্যাদার হানি কোন মতেই হয় না। অতএব আমরা ইহাতে যারপরনাই সন্তোষের সহিত সম্মত আছি। আর যাহারা এই নিয়মে আদানপ্রদান করিবেন তৎসন্তানদিগের নিকট আমরা চির প্রচলিত প্রথা মতে গণপণ দিয়া কন্যা প্রদান করিব।

আমাদের পূর্ববৎ পরস্পর আদান-প্রদান না থাকাতে বংশভাব এবং অনেকে বিজাতিয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া জাতিমান নাশ করিতেছেন। তৎপ্রযুক্ত আমরা বিধান করিতেছি যে আমাদের তুল্য প্রতিযোগি মতে আদানপ্রদান করিলে কাহারও কোন মানের হানি হইবে না।

আমরা মন্বাদিশাস্ত্রমতে অর্থাৎ বন্ধ্যাদি কারণ ভিন্ন কৃতদার পাত্রে কন্যা প্রদান করিব না। সকলেই উপরোক্ত বিবরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া এই পত্রিকায় নাম স্বাক্ষর করিলাম।" [শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত (১ম ও ২য় খণ্ড)—রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় রচিত। দ্বিতীয় সং; ১৮৮১। পৃঃ ৩৭-৩৮]

এই প্রতিজ্ঞাপত্রে অনেকেই স্বাক্ষর করেছিলেন; কিন্তু তবুও দেখা যায়, রাসবিহারীর ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর অভিযান সফল হতে পারে নি। তিনি নিজে অবশ্য ঐ প্রতিজ্ঞানুযায়ী মেয়ের বিবাহ দিয়েছিলেন এবং আরও কয়েকজন ঐ প্রতিজ্ঞাপালনে এগিয়েও এসেছিলেন; কিন্তু তবুও বলতে হয়, রাসবিহারীর উদ্দেশ্য তাতে সফল হয় নি।

বহুবিবাহ নিয়ে আন্দোলনের সময় তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল একবার ঢাকা সহরে এসেছিলেন। রাসবিহারী তখন তাঁর হাতে বহুবিবাহ নিবারণের জন্যে এক আবেদনপত্র অর্পণ করেন। এই আবেদনপত্র সম্বন্ধে একটি প্রয়োজনীয় তথ্য তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি বলেছিলেন, "এই আবেদনপত্রের পাণ্ডুলিপি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত।" [তদেব ; পৃঃ ৬৬] আবেদন পত্রটিতে বহু ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। পরে রাসবিহারী আরও একটি আবেদনপত্রে অন্য ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলেন। রায়েরকাঠি অঞ্চলের মাধব নারায়ণ রায় চৌধুরীর মাধ্যমে ঐ আবেদনপত্র গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থাও করেছিলেন।

কৌলীন্য ও বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে রাসবিহারী একটি অভূতপূর্ব কার্যসূচী গ্রহণের জন্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ ব্যক্তিগত প্রযত্নে ও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সহায়তায় কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম সর্বদ্বারিক বিবাহের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঐ বিবাহের সামাজিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ঐ বিবাহের পরে 'ঢাকা প্রকাশে' বলা হয়েছিল—

"অদ্য বিক্রমপুরের তিমিরাবৃত বল্লালিক্ষেত্রে সুখতারা প্রকাশ পাইল। অদ্য আমাদের আনন্দের দিন, অদ্য আমাদের সৌভাগ্যের দিন। অদ্য রাঢ়ীয় কুলীন ঘোষণা—কুমারীগণের হুলুধ্বনিতে ও মাঙ্গলাকগীতে বিক্রমপুর নৃত্যকরুক। অদ্য কৌলীন্য সংশোধনেচ্ছু নবীন যুবকগণের জয়ধ্বনিতে স্বর্গ কম্পিত হউক, অদ্য দেবীবরের কৃত, মেল বন্ধনরূপ কুপ্রথা নরকের কাঙ্গালিনী হইয়া রোদন করুক।"…[তদেব ; পৃঃ ১১৩]

কিন্তু না,—বিদ্যাসাগর, রাসবিহারী এবং তাঁদের আগে পরে আরও অনেক ব্যক্তির আন্তরিক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও আইনের দ্বারা বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা গেল না। বহুবিবাহ আন্দোলনই বরং ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়লো। ঐভাবে স্তিমিত হবার কতকগুলি কারণও ছিল। দেশের এক শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ বিশ্বাস করতেন, কৌলীন্য ও বহুবিবাহ নিঃসন্দেহে কুপ্রথা ; কিন্তু তাই বলে রাজবিধির দ্বারা তা বন্ধ করার প্রয়োজন নেই। দেশে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বহুবিবাহ বিলুপ্ত হয়ে যাবে ; এবং যাচ্ছেও। এই বক্তব্য সরকার ও জনগণকে বহুল পরিমাণেই প্রভাবান্বিত করেছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় ভেবে দেখবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তকের সমালোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধে পূর্বোক্তমত প্রচার করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে কিছু অংশ বাদ দিয়ে প্রবন্ধটিকে 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এ সংকলিত করতে গিয়ে প্রবন্ধটি সম্পর্কে জানিয়েছিলেন. "উহা আমাদের দেশে আধুনিক সমাজসংস্কারের ইতিহাসের অংশ হইয়া পড়িয়াছে —উহার দ্বারাই বহুবিবাহ বিষয়ক আন্দোলন নির্বাপিত হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি।" [বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খণ্ড ; ৩য় মুদ্রণ, ১৩৭১)—সাহিত্য সংসদ ; পৃঃ ৩১৪]

কিন্তু সত্যিই কি তাই ?—বঙ্কিম ও তাঁর সমর্থকদের বহুবিবাহ সংক্রান্ত ঐ মতামতের প্রভাবের কথা স্বীকার করেও বলা যায়, এ বিষয়ে বঙ্কিম-বক্তব্য পরিপূর্ণ সত্য নয়।

সিপাহিবিদ্রোহের পরে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সাম্রাজ্যরক্ষার চিন্তায় বেশ উদ্বিগ্ন হয়েই পড়েছিল। কোন অবস্থাতেই বিদেশী শাসক ভারতীয়দের সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করতে চাইছিলনা। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী যে ঘোষণাপত্র (কুইনস প্রক্লেমেশন) প্রচার করেছিলেন তাতে ঐ সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করবার কথা বলা হয়েছিল। বিধবাবিবাহ আইন পাস হবার পরে সিপাহিবিদ্রোহ ঘটেয় গেছে গিয়েছিল, ঐ আইন পাসই ছিল সেই বিদ্রোহের কারণ। আগেই বলা হয়েছে, বিদেশীদের মধ্যেও এই বিশ্বাস দেখা দিয়েছিল। কাজেই সিপাহিবিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে বহুবিবাহবিরোধী আইন পাসের ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট যে খুব সচেতন থাকবে তাতে আশ্চর্য কি ? এহেন অবস্থায় সরকারের কাছ থেকে তেমন কোন সাড়া পাবার আশা না পাওয়াতেই নেতৃবৃন্দ বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এছাড়াও অন্য কারণ ছিল। 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা' তার জন্মলগ্ন থেকেই বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলন সংগঠনে ব্রতী হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তীকালে কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতি হবার পর ঐ প্রস্তাব নাকচ হয়ে গিয়েছিল। ঐ সময় পূর্ববাংলার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় কৌলীন্য ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে জোরদার করবার জন্যে কমলকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কিন্তু 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র কাছ থেকে সাহায্য পাবার সকল আশা তিনি পরিত্যাগ করতেই বাধ্য হয়েছিলেন। বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলন থেকে ঐ

সভার সঙ্গে দাঁড়াবার ফলেও ঐ আন্দোলন বহুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

সবশেষে বলতে হয়, কৌলীন্য ও বহুবিবাহজনিত সমস্যা সর্বশ্রেণীর মানুষের সমস্যা ছিল না। সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষেরই সমস্যা ছিল। কাজেই ঐ আন্দোলনে সর্বশ্রেণীর মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যায় নি। অধিকন্তু, কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথা বিলুপ্ত হলে বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের আর্থিক ক্ষতি নিশ্চিত ছিল। এই কারণেও অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ কৌলীন্য ও বহুবিবাহের ভয়াবহতা উপলব্ধি করলেও তার বিলুপ্তিতে উৎসাহিত হতে পারে নি।

এইসব কারণেই ধীরে ধীরে বহুবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলন তার তীব্রতা হারিয়ে ফেলেছিল এবং ক্রমশঃ তা বন্ধও হয়ে গিয়েছিল। অতএব একমাত্র বঙ্কিমের বিশেষ প্রবন্ধটির জন্যেই বহুবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলন 'নির্বাপিত', হয়েছিল সে কথা সত্য নয়।

॥ ৯ ॥

:: স্ত্রী-শিক্ষা-প্রবর্তন আন্দোলনের ইতিহাস ::

বহুদিন আগে থেকেই আমাদের দেশে নারীজাতি অসম্মানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে আসছিল। রক্ষণশীল সমাজের জন্যেই ছিল ঐ অসম্মান ও লাঞ্ছনা। নারীর ঐ অবস্থার ফলেই দেখা দিয়েছিল দেশে সামাজিক ও নৈতিক শিথিলতা। বিগত শতকের সমাজ সংস্কারকেরা তাই চেয়েছিলেন নারীর সার্বিক কল্যাণ। সে-যুগের প্রধান সংস্কার আন্দোলনগুলির অন্যতম উদ্দেশ্যও ছিল তাই। স্বামীর মৃত্যুর পর নারী প্রথমে বেঁচে ছিল চিতার আগুন থেকে, পরে রক্ষা পেয়েছিল সে অসহনীয় বৈধব্যের কবল থেকে। প্রগতিশীল সমাজনেতারা তাকে কৌলীন্যের অভিশাপ থেকেও চেয়েছিলেন বাঁচাতে। শুধু তাই-ই নয়, তার আত্মিক বিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যেও তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন। সেই চেষ্টাই সফল হয়ে উঠেছিল স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের কর্মসূচীতে।

স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রেও খ্রীষ্টান মিশনারীদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মিশনারী নন অথচ খ্রীষ্টান এমন বিদেশী নাগরিকের অবদানও কম ছিল না। তবে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে মিশনারী ও অমিশনারী খ্রীষ্টান বিদেশী নাগরিকের সঙ্গে এদেশীয় সমাজনেতা ও সাধারণ মানুষের সক্রিয়তাও যুক্ত হয়েছিল।

রামমোহনের 'আত্মীয়সভাতে' অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষা নিয়েও আলাপআলোচনা হতো। ব্যক্তিগতভাবে রামমোহন নারীর শিক্ষাগ্রহণ ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। [দ্রঃ রামমোহন-রচনাবলী (হরফ প্রকাশনী ; ১৩৮০) ; পৃঃ ২০২] স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তবে তার প্রচারের কোন উদ্যোগ তিনি নেন নি। রাধাকান্ত দেব কিন্তু সেই সময় এক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন। অবশ্য তিনি চাইতেন না প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে গিয়ে মেয়েরা লেখাপড়া শিখুক। তিনি অন্দরমহল শিক্ষারই সমর্থক ছিলেন। রাধাকান্ত দেব নিজেও তাঁর বাড়িতে মেয়েদের শিক্ষাদেবার জন্যে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। 'স্কুল সোসাইটি' পরিচালিত পরীক্ষাগুলি তখন রাধাকান্ত দেবের বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হতো। 'The Female Juvenile Society For The Establishment and Support of Bengalee Schools'-এর অধীনস্থ বিদ্যালয়ের মেয়েরাও ঐ একই সময় তাদের অর্জিত শিক্ষার পরীক্ষা দিত সেখানে। এই 'Female Juvenile Society' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে। সোসাইটি কর্তৃক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনাও ঘটেছিল ঐ বছরে। এই সোসাইটি বেশ কটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল ; কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য বড় হওয়ায় তার শিক্ষা প্রচারের কার্য জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছিল।

বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের কার্যে 'স্কুল বুক সোসাইটি'র অবদানও অনেক। এই সংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রীরা ছাত্রদের সঙ্গেই একত্রে পাঠ গ্রহণ করতো। পরে 'Female Juvenile Society'-ও এই বিষয়ে এগিয়ে এসেছিল।

বিগতশতকে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্যে কুমারী কুকও অনেক কাজ করেছিলেন। পূর্বোক্ত 'স্কুল সোসাইটি'র কয়েকজন সদস্য স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি-সাধনের জন্যে তাঁকে এদেশে আসতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এদেশে এসে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মেয়েদের জন্যে স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন ; এবং একবছরের মধ্যে বেশ কটি স্কুলও তিনি স্থাপন করেছিলেন। এই অক্লান্তকর্মী কুমারী কুকের চেষ্টাতে 'লেডিজ্ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে। চার্চমিশনারী এবং কুমারী কুকের প্রতিষ্ঠিত সমুদয় বিদ্যালয়েরই দায়িত্ব এসে পড়েছিল এই সোসাইটির হাতে। কুমারীকুকের পরিচালনাধীন বিদ্যালয় এবং তার শিক্ষাদান সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় বলা হয়েছিল —

"কলিকাতা জরনেলে ২৮ ফেব্রুআরি তারিখে পাদরি শ্রীযুত করি সাহেব এক পত্র ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই বিবরণ আছে যে মিস কুকের শাসনের মধ্যে পনেরটা বালিকা পাঠশালা ছিল তাহাতে এগার পাঠশালা প্রস্তুত হইয়াছে। প্রথমতঃ কতকদিন পর্য্যন্ত বালিকারা ক খ লিখে তাহাতে প্রস্তুতা হইলে পর বাঙ্গালি ইতিহাসের ক্ষুদ্র২ পুস্তক পাঠ করে তাহাতে নৈপুণ্য জন্মিলে পর শিল্প বিদ্যাশিক্ষা করে এই কর্ম্মে যত লাভ হয় তাহা তাহারদিগকে পারিতোষিকের মত দেওয়া যায় সেই লাভ দেখিয়া শিল্পকর্ম্ম করিতে অনেকের লোভ জন্মিয়াছে তাহাতে ছয় পাঠশালাতে প্রায় এক হাজার থান গামছা কিনারা সিলাই হইয়াছে এবং কোন২ পাঠশালাতে মোজা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে এখন পোনর পাঠশালাতে তিনশত বালিকা শিক্ষা পাইতেছে।"...[সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম ; ৩য় সং)

—ব্র. ব. সম্পাদিত ; পৃঃ ১৫-১৬]

কলকাতা থেকে দূরে অন্যান্য স্থানেও মেয়েদের জন্যে অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। তার মধ্যে শ্রীরামপুরের বিদ্যালয় সংখ্যা ছিল খুব উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্যালয়গুলির পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যাবে নিচের অংশটিতে—

"৫ এপ্রিল সোমবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় শহর শ্রীরামপুরের কাছারিবাটীর সম্মুখস্থ বাবু গোপাল মল্লিকের বাটিতে শ্রীরামপুরের ও তচ্চতুর্দিকস্থ গ্রামের পাঠশালার বালিকারদের বিদ্যার পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে সাহেব লোক ও বিবি লোক অনেকে আসিয়াছিলেন। ঐ স্থানে তেরটা পাঠশালার সর্ব্বসুদ্ধা দুইশত ত্রিশ বালিকা একত্র হইয়াছিল। ইহারদের মধ্যে পঞ্চাশজন শব্দ পাঠ করিল ও পঁয়ত্রিশ জন নানা প্রকার ক্ষুদ্র২ পুস্তক পাঠ করিয়া সকলকে পরমাপ্যায়িত করিল ও অবশিষ্ট বালিকারা ফলা বানান ইত্যাদি পড়িল।...... দুই প্রহরের পর পরীক্ষা সমাপ্তা হইলে রিবরেণ্ড শ্রীযুত জন মাক সাহেব ঐ সকল পাঠশালার বিবরণ পাঠ করিলেন তাহা শুনিয়া সাহেব লোকের তুষ্টি হইল।"...[তদেব ; পৃঃ ১৬]

প্রসঙ্গক্রমে, স্ত্রী-শিক্ষার জন্যে শ্রীরামপুর মিশনের ওয়ার্ড যা করেছিলেন তার উল্লেখ প্রয়োজন। শ্রীরামপুর ও তার আশেপাশের অঞ্চলেই তিনি স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের কাজ করেছিলেন। তাঁর ঐ কাজের আলোচনা করতে গিয়ে জে. সি. মার্শম্যান তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছিলেন—

"He and his colleagues had always acted on the principle that a native Christian mother must, at the least, be qualified to teach her children to read the Bible, and that female ignorance and Christianity could not exist together. But they were anxious to extend the blessing of knowledge also to heathen families, and, after Mr. Ward's return, he took the department of female education into his own hands, and established numerous schools in and arround Serampore, which were vigorously maintained after his death. In the course of the present year more than three hundred female children were assembled in the college hall, and passed a very satisfactory examination"

[The Life and Times of Carey, Marshman, And Ward (Vol. II) ; —J. C. Marshman ; 1859 ; P—303]

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় আর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ;—'Calcutta Ladies Association for Native Female Education'। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রে এই সংগঠনটিরও ভূমিকা অনেক।

ঐ সময়ে অনেক হিন্দু ব্যক্তিও মেয়েদের শিক্ষার জন্যে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তাদের অনেকে নানা খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠানকে ঐ ব্যাপারে সহায়তাও করেছিলেন। রাধাকান্ত দেবের কথা আমরা আগেই বলেছি। অন্য ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য ছিলেন রাজা বৈদ্যনাথ রায়, মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ইত্যাদি। 'লেডিজ সোসাইটি'র উদ্যোগে কলকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে মিসেস উইলসনের (বিবাহিতা কুক) স্কুলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিদ্যালয়টির পঠন-পাঠন শুরু হয়েছিল ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিলে। রাজা বৈদ্যনাথ রায় এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ২০ হাজার টাকা দান করেছিলেন।

অবশ্য দেখা যায়, কালক্রমে এদেশীয় ব্যক্তিবর্গ খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠানগুলির সাহচর্য থেকে দূরে সরে এসেছিলেন। তার অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকলাপে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, মিশনারী ও অন্যান্য খ্রীষ্টান সংস্থা পরিচালিত

বিদ্যালয়ে সে যুগে ভদ্র ও ধনী ঘরের মেয়েরা কখনও ছাত্রী হয়ে পড়তে আসতো না। ঐ সব বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও তা জানতেন। এতে তাঁরা আদৌ সন্তুষ্ট ছিলেন না; কেননা সম্ভ্রান্ত বংশের শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে খ্রীষ্টমহিমা প্রচার করতে পারলেই তাদের সুবিধে। কিন্তু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে যখন তা সম্ভবপর হলো না তখন তাঁরা এক অভূতপূর্ব পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। —সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্তঃপুরে গিয়ে খ্রীষ্টান মহিলারা ঐ সব ব্যক্তির স্ত্রী-কন্যা বা অন্য আত্মীয়াকে লেখাপড়া শেখাতে সচেষ্ট হলেন। স্ত্রী-শিক্ষার ইতিহাসে একেই বলা হয় 'অন্তঃপুর শিক্ষা'। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করেও তাঁরা তাঁদের মূল উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারেন নি।

বিগতশতকের নব্যবঙ্গগোষ্ঠী (Young Bengal)-ও স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল। ঐ বিষয়ে তাঁরা আলাপ-আলোচনায় খুবই সোচ্চার ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষাবিষয়ে অনেক প্রবন্ধাদিও তাঁরা রচনা করেছিলেন। সভা-সমিতিও তাঁরা কম করেন নি। 'নব্যবঙ্গের' গুরু ডিরোজিও 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই অ্যাসোসিয়েশনে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার বিষয়েও আলাপ-আলোচনা হয়ে থাকতো। পরবর্তীকালে ডিরোজিওর উত্তরসূরীদের পরিচালিত 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' ও 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা দুটি স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। পূর্বোক্ত 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে'র সভ্য এবং অপর কিছু 'নব্যবঙ্গ' মিলে ১৮৩৮ সালে 'Society for the Acquisition of General Knowledge' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ। তাঁর রচিত 'The Native Female Education' গ্রন্থটি স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে সহায়তা করেছিল অনেকখানি। বইটির রচনাকাল ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ। কৃষ্ণমোহনের এই বইটির বক্তব্য সম্বন্ধে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে "Society for the Acquisition of General Knowledge"-এর এক অধিবেশনে প্যারীচাঁদ মিত্র আপনার মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে দেখা যায়, ঐ সোসাইটিতে স্ত্রী-শিক্ষা নিয়ে বেশ গঠনমূলক আলোচনাই করা হতো।

স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের কথায় 'হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডে'র কথাও বলা প্রয়োজন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ 'ফণ্ডের' প্রবর্তন করা হয়েছিল ডেভিড হেয়ারের নামে। নানা বিষয়ে লেখা শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্যে ঐ 'ফণ্ড' থেকে পুরস্কার দেওয়া হতো।

স্ত্রী-শিক্ষার ওপর রচিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্যেও ঐ 'ফণ্ড' থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মেয়েদের ভালো পাঠ্য বই-এর জন্যেও ঐ 'ফণ্ড' থেকে অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন।

স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের ইতিহাসে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষ বছরটি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঐ বছরেই (১৮৪৯, মে মাসে) প্রতিষ্ঠিত মহামতি ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের বিখ্যাত বিদ্যালয়টি নারীশিক্ষার এক নতুন দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছিল। মিশনারী ও মিশনারী ভিন্ন অন্য খ্রীষ্টান ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের ওপর এদেশের মানুষ আস্থা হারিয়েছিল। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যই ছিল তার কারণ। কিন্তু বেথুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সে উদ্দেশ্য আদৌ ছিল না। ঐ বিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দেবারই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। বেথুনের ঐ মহৎ উদ্দেশ্য সফল করবার জন্যে এদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বেথুনের বিদ্যালয়েই সর্বপ্রথম সম্ভ্রান্তবংশের মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণ কার্য শুরু হয়েছিল।

বেথুনের বিদ্যালয়ের কথায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। বেথুনের বিদ্যালয় চালু করবার জন্যে দক্ষিণারঞ্জন প্রথমে তাঁর বাড়ির বৈঠকখানা ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং পরে বিদ্যালয় ভবনের জন্যে মীর্জাপুরের সাড়ে পাঁচ বিঘে জমি দান করেছিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারও বেথুনকে নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন। সম্ভ্রান্ত-বংশ থেকে ছাত্রী সংগ্রহে তিনি বেথুনের সহায়ক হয়েছিলেন। নিজের মেয়েদেরও তিনি ঐ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। অবশ্য এই কাজে অন্যব্যক্তিও বেথুনকে সহায়তা করবার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। এই ছাত্রীসংগ্রহের কাজ কত কঠিন ছিল এখন তা বোঝা যাবে না। এই বিদ্যালয়ে খ্রীষ্টধর্মের ভয় ছিল না; সম্ভ্রান্ত বংশীয় মেয়েদের নিম্নবর্ণ মেয়েদের সংস্পর্শে আসবারও সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু তবুও অভিভাবকেরা সেখানে মেয়েদের পাঠাতে রাজি হন নি। কারণ সংস্কার। ঐ সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষেরাই বেথুনের বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নানা ধরণের প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন।

এমন অবস্থায় বেথুন সাহেবের বিদ্যালয়ের জন্যে ছাত্রী সংগ্রহের কাজ যে কষ্টসাধ্য ছিল তা খুব সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু সেই দুরূহ কাজেও মদন-মোহন ও আরও কয়েকজন উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়েছিলেন।

বেথুনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দেশে স্ত্রী-শিক্ষা সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা

ও বিতর্ক খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। সে সময়ের পত্র-পত্রিকাতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি'ও স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। যোগেশচন্দ্র বাগল জানিয়েছেন, "সমিতি স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে তৎপর হন। কিশোরীচাঁদের কাশীপুরস্থ বাসভবনে একটি বালিকা শিক্ষালয় সমিতির আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হইল।" [বাংলার নবসংস্কৃতি (১৯৫৮)-যোগেশচন্দ্র বাগল ; পৃঃ ৬৫]

১৮৫৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল বিখ্যাত 'এডুকেশান্যাল ডেসপ্যাচ্', উডের ডেসপ্যাচ্ নামে যা বহু পরিচিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নির্দেশেই ঐ 'ডেস্‌প্যাচ্' রচিত হয়েছিল। ঐ ডেস্‌প্যাচেই সর্বপ্রথম নারীশিক্ষার ব্যবস্থায় সরকারী দায়িত্বের কথা স্বীকৃত হয়েছিল। মেয়েদের বিদ্যালয়কে সরকারী সাহায্যদানের কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, সরকারী দায়িত্বে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা তেমন কিছুই হয় নি।

তবে ঐ ডেস্‌প্যাচ্ প্রকাশিত হবার পরে স্ত্রী-শিক্ষাপ্রচারে বিদ্যাসাগর উঠে পড়ে লেগেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি বেথুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি স্কুল ইনস্পেক্টরের পদে। বাংলা সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি সরকারের অনুকূল মনোভাব রয়েছে বুঝে লিখিত নির্দেশ ব্যতিরেকেই তিনি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনে উদযোগী হয়েছিলেন এবং অল্পদিনের চেষ্টাতেই ৩৫টি বিদ্যালয় স্থাপনে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু সরকারী সাহায্য না পাবার জন্যে বিদ্যালয়গুলি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। বিদ্যালয়গুলি যাতে সরকারী সাহায্য পায় তার জন্যে বহু চেষ্টা করেও বিদ্যাসাগর সফল হতে পারেন নি। 'সোম প্রকাশ'-এ তাই খেদ প্রকাশ করে লেখা হয়েছিল "বঙ্গদেশীয় অঙ্গণাগণ অতিশয় হতভাগ্য। কতকালে ইহাদিগের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইবে বলিতে পারা যায় না। আমাদিগের রাজপুরুষেরা এত যে সভ্য তাঁহারাও তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্নরূপ নহেন।"...[সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৪র্থ)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ; ১৯৬৬, পৃ : ৪৮৯]

বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের কাজে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্ব সর্বাধিক ফলপ্রদ হয়েছিল। নানা কারণেই তখন বিদ্যালয়ে মেয়েদের শিক্ষার পূর্ণতা ঘটা সম্ভবপর ছিল না।

বাল্যবিবাহ ছিল তার অন্যতম বড়ো কারণ। এই জন্যেও 'অন্তঃপুর শিক্ষা' প্রচারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। "প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষার পরিপূরক রূপে এই সভার সভ্যগণ দ্বারা 'বয়স্কা নারীগণের' শিক্ষার্থে 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা' সভা গঠিত হইল।" [বাংলার নব্যসংস্কৃতি (১৯৫৮)-যোগেশচন্দ্র বাগল ; পৃঃ ৭২]

বাড়ির বাইরে না গিয়ে ঘরে বসেই মেয়েরা যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে তার জন্যেই 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা' কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। 'ব্রাহ্মবন্ধুসভা'র সম্পাদক হরলাল রায় অভিভাবকদের কাছে এক আবেদনে জানিয়েছিলেন—

"যাঁহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া আপন আপন পরিবারস্থ বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে চাহেন তাঁহারা তাহাদিগের নাম, ধাম, বয়স, পাঠ্যপুস্তক ও পাঠে কতটুকু উন্নতি হইয়াছে, এই সমুদায় বিবরণসহ আমাকে পত্র লিখিবেন।" [সাহিত্যসাধক চরিতমালা (৯ম ,—"কেশবচন্দ্র সেন", পৃঃ ৭৩]

এই অন্তঃপুর শিক্ষার প্রসঙ্গে কয়েকজন বিদেশী খ্রীষ্টান মহিলার অবদান অবশ্যই স্মর্তব্য। ১২৭৫ সালের ৬ই আশ্বিনের ৪৬ সংখ্যা 'সোমপ্রকাশ' থেকে তাদের কার্যকলাপের মূল্যায়ন তুলে ধরছি—

"মৃত বিবি মলেন্স প্রথমতঃ আমাদিগের বর্তমান অন্তঃপুর শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভাবন করেন। তাহার পর বিবি মরে নামে এক গুণবতী মিসনরি পত্নী এই প্রণালীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। বিবি মরে কতগুলি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ান শিক্ষয়িত্রীকে স্থানে স্থানে প্রেরণ করেন ; তাহারা লিখনপঠন ও সূচির কাজের শিক্ষা দিতেন। বিবি মরে সকলের তত্ত্বাবধান করিতেন। ঐ গুণবতী রমণী ইংলণ্ডে গমণ করিলে পর তাহার বিদ্যালয় সকল মিস ব্রিটনের হস্তে পতিত হয়। ইনি আমেরিকাবাসিনী। ডাক্তর জারবোর সাহায্যে তিনি অন্তঃপুরের শিক্ষাকার্য্যের ভারগ্রহণ করেন।" [সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (৪র্থ ; ১ম সং)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ; পৃ, ৫২৩]

এমনি আরও বেশ কয়েকজনের সহায়তায় আমাদের দেশে অনেক আগে থেকেই অন্তঃপুর শিক্ষার ধারা বহতা ছিল।

যাইহোক, পরবর্তীকালে এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের দায়িত্ব 'বামাবোধিনী সভা'র ওপর এসে পড়েছিল। এই সভাও ব্রাহ্মগণ স্থাপন করেছিলেন।

স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারকার্যে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'উত্তর পাড়া হিতকরী

সভা'ও এগিয়ে এসেছিল। এই সভার সঙ্গে উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জড়িত ছিলেন।

মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্যে শিক্ষিকা তৈরীর বিষয় নিয়েও সেযুগে অনেক আলোচনা হয়েছিল। ঐ ব্যাপারে মিস্ কার্পেন্টারের ভূমিকা উল্লেখ করবার মতো। শিক্ষয়িত্রী তৈরীর জন্যে তিনি নর্মাল বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তার পরিকল্পিত বিদ্যালয় নিয়ে দেশের জ্ঞানী, গুণী এবং সাধারণ মানুষ সবাইই তর্ক-বিতর্কে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। তৎকালীন পত্রপত্রিকাই তার সাক্ষ্যবহন করে। স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের ইতিহাসে ঐ বাদবিতণ্ডার মূল্য অনেক।

এই প্রসঙ্গে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে নভেম্বরে অনুষ্ঠিত 'বেথুন সোসাইটি'র অধিবেশনের কথা কিছু বলা প্রয়োজন। এই সোসাইটিতে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে নানা সময়েই আলোচনা করা হতো। বহু বছর আগে সোসাইটির এক অধিবেশনে কৈলাসচন্দ্র বসু "Hindoo Female Education, how best achieved under the present circumstances of Hindoo Society" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৮৬৭ সালের নভেম্বর মাসে সোসাইটির সভাপতি ফিয়ার পাঠ করেছিলেন, "Women Teachers for Women" শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধ। কুমারী কার্পেন্টারের প্রস্তাবিত 'Female Normal School' নিয়ে যে বাদ-প্রতিবাদ দেখা দিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ফিয়ারের প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক মূল্য অনেক।

যাইহোক, কুমারী কার্পেন্টারের প্রস্তাবিত বিদ্যালয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বাংলার স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে তা একটি নবযুগও আনয়ন করেছিল। বিদ্যাসাগর কার্পেন্টারের ঐ বিদ্যালয় স্থাপন সমর্থন করতে পারেন নি। অনেক সাধারণ মানুষও তা পছন্দ করে নি। তবে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ঐ বিদ্যালয়কে শুধু সমর্থনই করেন নি, তার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কুমারী কার্পেন্টারকে রীতিমত সাহায্যও করেছিলেন। তিনি নিজেও এমনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন ১৮৭১ সালে।

১৮৭৩ সালে আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। কেশবচন্দ্র সেনের মতের বিরুদ্ধে নবীন যুবক ব্রাহ্মগণ একটি নতুন বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করেছিল। মিস্ এক্রয়েডের ওপর এর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের

শিক্ষক ছিলেন। শুধু শিক্ষকতাই নয়, বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যেও তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। তবে বিদ্যালয়টি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। দ্বারকানাথ পরে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যালয়টির শিক্ষা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি খুবই উচ্চাঙ্গের ছিল। সেযুগের খ্যাতনামা অনেক ব্যক্তিই দ্বারকানাথকে ঐ বিদ্যালয় স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন।

সেযুগে স্ত্রী-শিক্ষা যারা সমর্থন করেছিল তাদের মধ্যে মেয়েদের পাঠ্য বিষয় বা শিক্ষণীয় বিষয় নিয়েও মতভেদ ছিল। এই মতভেদের কিছু নমুনা তুলে ধরছি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা' নামক প্রবন্ধ থেকে—

"স্ত্রী ও পুরুষ জাতির প্রকৃতির বিভিন্নতার নিমিত্ত দুইয়ের পক্ষে এক প্রকার শিক্ষার উপযোগিতা অসম্ভব। স্ত্রী প্রকৃতি স্বভাবত হৃদয় প্রধান, এবং পুরুষ প্রকৃতি স্বভাবত বুদ্ধিপ্রধান। অতএব তাহাকেই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা বলা যাইতে পারে যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ের উন্নতি এবং গৌণ উদ্দেশ্য বুদ্ধির উন্নতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ, এম, এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা বুদ্ধিপ্রধান শিক্ষা, হৃদয়-প্রধান শিক্ষা নহে; অতএব ঐ প্রকার শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা নহে।" [সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২য়)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত; ১৯৬৩। পৃঃ ৪৬৩]

প্রাবন্ধিক অবশ্য শিক্ষার বিষয় নির্বাচনে ছাত্রীদের স্বাধীনতা দেবার কথাও বলেছিলেন; তবে স্ত্রী-শিক্ষার বিষয় নির্ধারণে জোর দিয়েছিলেন তিনি অন্য ক্ষেত্রে—"প্রত্যেক স্ত্রীলোকের পাক-ক্রিয়া, সীবন কার্য্য প্রভৃতি নানা গৃহকার্য্য বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়া তদ্বিষয়ে সুদক্ষা হওয়া কর্ত্তব্য। স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী-প্রবর্ত্তকেরা স্ত্রীলোকদিগকে গৃহকার্য্যে সুনিপুণা করিতে কিছু মাত্র অবহেলা করিবেন না।" [তদেব; পৃঃ ৪৬৫]

স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তনের ইতিহাস আলোচনায় এ পর্যন্ত সরকারী প্রচেষ্টার কথা প্রায় কিছুই বলা হয় নি। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'এডুকেশন্যাল ডেস্‌প্যাচ্' বা উডের 'ডেস্‌প্যাচে'র কথা উল্লিখিত হয়েছে। আমরা দেখেছি, ঐ ডেসপ্যাচে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করা হলেও এবং বে-সরকারী বালিকা বিদ্যালয়কে সরকারী সাহায্য দেবার কথা থাকলেও স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার তেমন কিছুই করতে পারে নি। পরবর্তীকালে দেশের চালু শিক্ষাব্যবস্থার

পুনর্মূল্যায়নের জন্যে এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষানীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে হাণ্টার কমিশন নিযুক্ত করা হয়েছিল। ঐ কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়েছিল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। তাতেও স্ত্রী-শিক্ষার সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখা হয়েছিল। হাণ্টার কমিশনও বে-সরকারী বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করবার জন্যে সরকারকে সক্রিয় হতে বলেছিল। শিক্ষিকাদের বেতনাদি, শিক্ষিকা শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি বিষয়েও কিছু আশাপ্রদ কথা কমিশনের রিপোর্টে ছিল। কিন্তু থাকলে কি হবে, শেষ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই সরকার থেকে করা হয় নি।

বস্তুতঃ বিগত শতকে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও উন্নতি যা হয়েছিল তা, বলতে গেলে, বেসরকারী প্রচেষ্টাতেই হয়েছিল। মিশনারী ও বিদেশী মহৎপ্রাণ ব্যক্তি এবং উদারপন্থী প্রগতিশীল বাঙালীর প্রচেষ্টাতেই বিগত শতকে দেশের অনেক মানুষ মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল—কিন্তু মেয়েদের উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব যে কেউ উপলব্ধি করে নি বা মেয়েরা যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়েও আসে নি তা' নয়; তবে তাদের সংখ্যা ছিল সামান্য।

বস্তুতঃপক্ষে বলা যায়, স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে বহু আলাপ-আলোচনা-আন্দোলন হলেও সরকারী নিশ্চেষ্টতার জন্যেই বিগত শতকে মেয়েদের জন্যে কোন নিয়ম মাফিক সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় নি। অবশ্য সামাজিক কুসংস্কারও দেশের স্ত্রী-শিক্ষাকে ব্যাহত করেছে। যেমন বাল্যবিবাহ। অল্পবয়সে বিবাহ হতো বলে মেয়েরা দীর্ঘদিন ধরে পিতৃগৃহে থেকে বিদ্যা অর্জনের সময় পেতো না। শ্বশুরবাড়ি এসেও নানা কারণে পড়াশোনা চালানো সম্ভবপর হতো না। তাছাড়া স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী মনোভাবও তখন প্রবল ছিল।

কিন্তু তবুও বলা যায়, উনিশ শতকের স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলন ছোট করে দেখবার মতো নয়।

॥ ৫ ॥

ঃঃ বাল্যবিবাহ-প্রথা-রদ আন্দোলন ঃঃ

বাল্যবিবাহ বাংলাদেশের অন্যতম পুরনো সামাজিক প্রথা। এই প্রথাও বিগত শতকের সমাজ-জীবনকে পর্যুদস্ত করে তুলেছিল। প্রগতিশীল সমাজ-নেতারা এই কারণে বাল্যবিবাহেরও বিরোধিতা করেছিলেন।

বাল্যবিবাহবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসেও রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'র উল্লেখ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এই সভাতে রামমোহন ও অন্যান্য ব্যক্তি বাল্যবিবাহ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। রামমোহন ব্যক্তিগতভাবে বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন বলে অনুমিত হয়। পনের বা ষোল বছর বয়সের আগে তিনি তাঁর নাতনীর বিবাহ দেন নি বলেও জানা যায়। কিন্তু বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে তিনি কিছু লিখে যান নি—কোন আন্দোলন গড়ে তুলবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি।

বস্তুতঃ সেসময় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনের কথা কেউই ভাবেন নি। এই প্রসঙ্গে দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের বক্তব্য খুবই উল্লেখযোগ্য—

"বাল্যবিবাহের ইষ্টানিষ্ট কিছুই জানিতাম না ; তদ্বিষয়ের কোন আন্দোলনও শুনিতে পাইতাম না। এবং সকলকেই বালক বালিকার পরিণয়ের জন্য ব্যস্ত দেখিতাম।" [দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত—কার্তিকেয়-চন্দ্র রায় (আই. এ পি. সং), ১৩৬৩ ; পৃঃ ৩২]

এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বিগত শতকের প্রথম দিকে কোন আন্দোলন গড়ে ওঠে নি।

আসলে ঐ শতকের চতুর্থ দশক থেকেই বাল্যবিবাহ নিয়ে প্রবল মতামত বিনিময় হতে দেখা যায় ; এবং তার মধ্যে দিয়েই ঐ আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' বাল্যবিবাহ বিষয়ে তখন বেশ কটি রচনা মুদ্রিত হয়েছিল ; তবে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'সর্বশুভকরী পত্রিকা'য় প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধটিই ছিল এই বিষয়ে প্রথম সাড়া জাগানো রচনা। বাল্যবিবাহের দোষের প্রতি মানুষের দৃষ্টি ফেরাতে রচনাটি খুবই কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। বিদ্যাসাগর পরবর্তীকালে সমাজসংস্কার ও সামাজিক বিষয়ে একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করে তাতে অনেকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলেন। ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রের ২ ও ৫ নং শর্তে বলা হয়েছিল,—

"২. একাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে কন্যার বিবাহ দিব না।"

"৫. অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে পুত্রের বিবাহ দিব না।"

[বিদ্যাসাগর (১৮৯৫)—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃঃ ৩৩৫]

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর এই ভাবেও জনমত গঠনের চেষ্টা করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের সময়ে দেশের পত্রপত্রিকাতে বাল্যবিবাহ বিষয়ে মতামত বিনিময় বেশ প্রবল হয়েই উঠেছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'য় ১৮৫৬ সালে বাল্যবিবাহ বিষয়ক একটি প্রবন্ধে ঐ প্রথা রদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, এ ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকাতেও এই বিষয়ে লেখালেখি চলেছিল।

কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি, নানা প্রবন্ধে ও মৌখিক আলোচনায় বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করা হলেও খুব অল্পসংখ্যক খ্যাতনামা প্রভাবশালী হিন্দুই ঐ বিষয়ে আন্দোলন সংগঠনে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণই ঐ বিষয়ে বেশি এগিয়ে এসেছিলেন।

'ভারতসংস্কারক' পত্রিকাও সেযুগে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে জনমত গঠনে এগিয়ে এসেছিল। ১৮৭৩ সালের ১৮ই জুলাই ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাল্যবিবাহ' নামক প্রবন্ধে বলা হয়েছিল "হিন্দু সমাজে যতপ্রকার পাপ প্রথা আছে, বাল্যবিবাহ তন্মধ্যে প্রধান। কি শরীর কি মন সমুদয়ের দুরবস্থার প্রবল কারণ এক বাল্যবিবাহ।" প্রবন্ধটিতে বাল্যবিবাহ রোধ প্রচেষ্টারও কিছু উল্লেখ করা হয়েছিল। তা থেকে জানা যায়, ঢাকা সহরে কিছু যুবক একত্রিত হয়ে 'বাল্যবিবাহ নিবারণী' নামে এক সভা প্রতিষ্ঠা করেছিল। সভার নিয়ম সম্বন্ধে পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিতে জানানো হয়েছিল, "সভার এই নিয়ম হইয়াছে যে কোন সভ্য যে বালিকার ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ না হইয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিবেন না। পুরুষের বিবাহের কাল অন্যূন ২১ বৎসর নির্ধারিত হইয়াছে।" ঐ সভা 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ' নামে একটি পত্রও প্রচার করেছিল। সভার সদস্যবৃন্দ ব্রাহ্মসমাজের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন।

'ভারতসংস্কারক' শুধু নয়, 'সোমপ্রকাশ'ও সেযুগে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জোরালো প্রচারকার্য চালিয়েছিল। বিশুদ্ধ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক হয়ে সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১২৭৫ সালের ২০শে জ্যৈষ্ঠের 'সোমপ্রকাশ'-এ সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি বলেছিলেন, "বাল্যবিবাহের উন্মূল একটী মহোপকারক বিষয়।" [সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (৪র্থ ; ১ম সং)-বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ; পৃঃ ২১৩] আগেই বলা হয়েছে, বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মরাই এগিয়ে এসেছিলেন বেশি। 'সোমপ্রকাশ' কিন্তু সব সময় তাদের কাজের প্রশংসা করতে পারে নি।

কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭০ সালে 'ভারত সংস্কার সভা' (ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সভার পক্ষ থেকে বিবাহের বিজ্ঞান সম্মত বয়স নির্ধারণ করে সেই বয়স অনুযায়ী তিনি বিবাহবিধি প্রণয়নের চেষ্টা করেছিলেন। ঐ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ বেশ জোরালো আন্দোলনই করেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছিলেন—

"এই ইণ্ডিয়ান রিফরম্ অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ হইতে কেশববাবু আর একটি কাজ করিয়াছিলেন। তিনি এক মুদ্রিত পত্র দ্বারা দেশের প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের নিকট হইতে, এ দেশীয় বালিকাগণের বিবাহের উপযুক্ত কাল কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে অধিকাংশ স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ডাক্তার ১৬ বৎসরের ঊর্ধ্বে সেই কালকে নির্দেশ করেন। কেবল ডাক্তার চার্লস চতুর্দশ বর্ষকে সর্বনিম্ন বয়স বলিয়া নির্দেশ করেন। তদনুসারে ১৮৭২ সালের তিন আইনে চতুর্দশ বর্ষকে বালিকার সর্বনিম্ন বিবাহের বয়স বলিয়া নির্দেশ করা হয়। তিন আইনের এই আন্দোলনে আমরা সকলেই তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলাম।" [আত্মচরিত (সিগনেট সং, ১৩৫৯)-শিবনাথ শাস্ত্রী ; পৃঃ ১০৮]

তবে এ বিষয়ে আদি ব্রাহ্ম সমাজের কাছ থেকে কেবশচন্দ্র সেনকে বাধাব সম্মুখীন হতে হয়। আইনটি অবশ্য বিধিবদ্ধ হয়েছিল ; তবে যেভাবে সেটি চালু হয়েছিল তাতে কেশবচন্দ্র সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।

'সোমপ্রকাশ' ও কেশবচন্দ্র সেন প্রস্তাবিত তিন আইনের ঘোরতর বিরোধী ছিল। আইনটি বিধিবদ্ধ হবার আগেই তাই 'সোমপ্রকাশ' বলেছিল, "ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ক আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছে, তাহাতে ন্যূনকল্প বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ স্থির করা হইয়াছে ; কিন্তু ব্রাহ্মেরা ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহাদিগের সংস্কার এই, অধিক বয়সে বিবাহ হওয়াতেই ইউরোপীয় জাতি সকল এত বলবান ও তেজস্বী। ইউরোপীয়দিগের বলবত্তা ও তেজস্বিতার ইহাই প্রধান কারণ কিনা, এ স্থলে তাহার বিচার অনাবশ্যক। এ স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, দুর্ব্বলতার প্রকৃত কারণ বিবাহ, না অসাময়িক ও অসঙ্গত স্ত্রীসহবাস ? যদি শেষোক্তটি কারণ হয়, তাহা হইলে আইন কি তন্নিবারণে সমর্থ হইবে ?"... [সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৪র্থ ; ১ম সং)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ; পৃঃ ২৩৯]

সম্পাদক মহাশয় একেবারে বাল্যবয়সের বিবাহ বরদাস্ত করতে পারেন নি, আবার খুব বেশি বয়সের বিবাহকেও মেনে নিতে চান নি।

এই সময়ে বাল্যবিবাহরোধ বিষয়ে একটি নতুন প্রস্তাব উঠেছিল। 'বঙ্গদেশের সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনের ডিরেক্টর সাহেবের নিকট এ ডবলিউ গ্যারেট সাহেবের পত্র' (২৭শে এপ্রিল, ১৮৭৮) হতে বিষয়টি বোঝা যাবে—

"আপনি বিশেষরূপে অবগত আছেন যে বাল্যবিবাহ বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। প্রতিবর্ষেই ইনস্পেক্টর, ডিরেক্টর এবং গবর্ণমেণ্ট এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে কন্যাদিগকে বিবাহের পূর্ব্বে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার অভিলাষ থাকিলেও হিন্দু সমাজের শিক্ষিত লোকেরাও তাঁহাদের কন্যাদিগকে ১০।১১ বৎসরের সময়ে বিবাহ দিয়া থাকেন।...

২০ বৎসর পূর্ব্বে বালিকাদিগের ৭।৮ বৎসরের সময় বিবাহ হইত, এক্ষণে ১০।১২ বৎসরের সময়ে বিবাহ হইয়া থাকে। এই যে কথঞ্চিৎ উন্নতি দেখা যায়, যাহাতে সত্বরে তাহা বৃদ্ধি হয়, তদুদ্দেশেই আমি এই প্রস্তাব করিলাম। সেই প্রস্তাব (যাহা কতিপয় হিন্দু সম্ভ্রান্ত লোক কর্ত্তৃক প্রথম উপস্থিত করা হয়।) এই যে—এই নিয়ম প্রকাশের পর যাহারা বিবাহ করিবে তাহাদিগকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে দেওয়া না হয়।"...[তদেব, পৃঃ ২৮৫-৬]

এই প্রস্তাবের মধ্যে অবশ্য ত্রুটি ছিল, কেননা ঐভাবে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা সম্ভবপর নয়।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অবাঙালী বাইরাম জি. এস. মালাবারি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন করেছিলেন। মালাবারির মতে বাল্যবিবাহ বিদূরিত করার উপায় কি ছিল তা নিম্নে উদ্ধৃত অংশ থেকে জানা যাবে—

"শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই কথাটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া দিন কোন বিবাহিত পুরুষকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে দিবেন না। প্রস্তাবলেখক শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে এই পরামর্শ দিয়াছেন, তাঁহারা সভা করিয়া বিবাহের একটী সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া এই স্থির করুন, তাহারা ন্যূন বয়সে বিবাহ করিবেন না এবং অতি বালিকারও পাণিগ্রহণ করিবেন না। তিনি গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কর্ত্তাদিগকে এই নিয়ম অবলম্বন করিবার অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা তুল্য গুণ সম্পন্ন দুইজন কর্ম্মার্থী উপস্থিত হইলে বিবাহিতকে পরিত্যাগ করিয়া অবিবাহিতকে কর্ম্ম দেন।" [তদেব ; পৃঃ ৩২৪]

বাল্যবিবাহ নিবারণের আরও কয়েকটি উপায় মালাবারি নির্দ্ধারণ করেছিলেন। মালাবারির আন্দোলনের প্রভাব সে সময় ভারতবর্ষে মোটামুটি ব্যাপক ভাবেই ছড়িয়ে পড়েছিল ; কিন্তু বাংলাদেশের (এবং অন্যত্রও) অনেকেই তাঁর

প্রস্তাবকে গ্রহণীয় বলে মনে করে নি। তাঁর প্রস্তাবিত বাল্যবিবাহ নিবারণের উপায়গুলি যে অনেকের কাছে গ্রাহ্য হয় নি মালাবারিও তা বুঝেছিলেন এবং সেজন্যে তিনি তাঁর প্রস্তাবকে সংশোধিত করে নিয়েছিলেন ; কিন্তু তবুও তা সর্বজনের স্বীকৃতিলাভ করতে পারে নি।

অবশ্য একথাও সত্য, তাঁর বাল্যবিবাহবিরোধী আন্দোলন অবহেলা করবার মতোও নয়। মালাবারির কর্ম পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকতে পারে ; কিন্তু তার উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাছাড়া বাল্যবিবাহ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টিতেও তিনি সফল হয়েছিলেন। আর সত্যি কথা বলতে কি, মালাবারির মত কোন বাঙালীই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এমন তীব্র ও ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হন নি বা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন নি। বস্তুত: বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লেখালেখি হয়েছে যে পরিমাণ সেই পরিমাণে কোন আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয় নি। এই কারণে সে-যুগে অনেকে আক্ষেপও করেছিলেন। উনিশ শতকের অষ্টম দশকেও এই জন্যে 'সোমপ্রকাশকে' মালাবারির সমালোচনা করতে গিয়ে লিখতে হয়েছিল—

"কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্যান্ত হিন্দু সমাজ মধ্যে বাল্যবিবাহ নিবারণের জন্য উপযুক্ত চেষ্টা করা হয় নাই। ব্রাহ্মগণ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, পুস্তিকা প্রচার, বক্তৃতা ও অন্য অন্য উপায়ে আন্দোলন করিয়া তাঁহারা এই কুপ্রথার প্রতি হিন্দু সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা সমাজের লোক নন বলিয়া তাঁহাদের সমুদয় যত্ন ও চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছে, সমাজ তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। তাঁহাদের যত্নে কেবল ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই যাহা কিছু বাল্যবিবাহের নিবারণ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু আমাদিগের স্থির ধারণা এই যে মালাবারি মহাশয় আজ যে রূপ যত্ন করিতেছেন, এবং কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালার ব্রাহ্ম সম্প্রদায় যতটুকু চেষ্টা করিয়াছেন, হিন্দু সমাজভুক্ত কোনও পদস্থ ওসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি ততটুকু যত্ন করিতেন এতদিনে এই কুপ্রথা বহুল পরিমাণে নিবারিত হইয়া যাইত।" [সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৪র্থ ; ১৯৬৬)-বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ; পৃঃ ৩২৬]

এখানে সেযুগের বাল্যবিবাহবিরোধী আন্দোলনের প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করা হয়েছে।

বাল্যবিবাহবিরোধী আন্দোলনে রক্ষণশীল সমাজও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এ সমাজের অনেকেই পুস্তক-পুস্তিকা বা প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে বাল্য-

বিবাহের পক্ষে মতবাদ প্রচার করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার সরকার ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'নবজীবন' (৪র্থ ভাগ, কার্তিক, ১২৯৪ ; ৪র্থ সংখ্যা) পত্রিকায় মুদ্রিত তাঁর 'হিন্দুবিবাহ' নামক প্রবন্ধে বাল্যবিবাহকে সমর্থন করে তিনি বলেছিলেন, "বাল্যবিবাহ প্রশস্ত।"

বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত আন্দোলনে আর একদল ছিলেন মধ্যমপন্থী। 'সমাজদীপিকা,' (১ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা, ১২৯২) পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের রচয়িতা বলেছিলেন, "···আমরা না বালিকার, না পূর্ণ যুবতীর বিবাহে পক্ষপাতী। আমাদের মত, দশ বৎসর হইতে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষ পর্যন্ত বিবাহের মুখ্যকাল।···স্ত্রীগণের দশ ও পুরুষের ষোড়শ বর্ষাবধি বিবাহই যুক্তিযুক্ত।"

আরও একদল মানুষ ছিলেন যারা বাল্যবিবাহের সমর্থক নন; কিন্তু আইনের দ্বারা তাকে নিষিদ্ধ করবার পক্ষপাতীও ছিলেন না।

বস্তুতঃ বাল্যবিবাহের বিষয়ে নানা মহলেই নানা মতের বিনিময় চলেছিল। মৌখিক ও লৈখিক দুইভাবেই ঘটেছিল মতামতের লড়াই। কিন্তু বাল্যবিবাহের অবলোপ বিষয়ে কোন চেষ্টাই কার্যকরী হয় নি তখন। উন্নত ব্রাহ্ম ও শিক্ষিত কিছু হিন্দু বাল্যবিবাহকে পরিহার করে চললেও বৃহত্তর সমাজে বাল্যবিবাহ যেমনটি ছিল তেমনটিই রয়ে গিয়েছিল।

॥ ৬ ॥

ঃঃ পণপ্রথা ও কন্যাবিক্রয়প্রথা-বিলোপ আন্দোলন ঃঃ

ঊনবিংশ শতকের আর একটি সামাজিক ব্যাধির নাম ছিল কন্যাপণ। গত শতাব্দীতে এই কন্যাপণের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রথাও সামাজিক অধঃপতনকে অবাধ করে তুলেছিল ;—সেটি হলো কন্যা বিক্রয়। এই জন্যে ঐ দু'টির বিরুদ্ধেও সমাজে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল ; কিন্তু তা ছিল অত্যন্ত দুর্বল।

যতদূর জানা যায়, কন্যাপণ নিয়ে আন্দোলন বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনের সময়েই সমাজনেতাদের মনে বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন প্রার্থনা করার সময় প্রথম দিকে কখনও কখনও আবেদন পত্রে কন্যাপণ নিষিদ্ধকরণেরও দাবী জানানো হয়েছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি'র পক্ষ থেকে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যে আবেদন পত্র পাঠানো হয়েছিল তাতে কন্যাপণ নিবারণের প্রার্থনাও ছিল। ১৮৬৬ সালে

সরকারের কাছে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার ময়মনসিংহ থেকে একটি আবেদন পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। সেখানেও পণপ্রথার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রার্থনা ছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও কন্যাপণের বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলেন।

এই সময় কয়েকটি পত্র-পত্রিকা কন্যাপণের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সচেষ্ট হয়েছিল। 'সোমপ্রকাশ' ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। ১২৭১ বঙ্গাব্দের ১৪ই বৈশাখ, ২৪ সংখ্যা 'সোমপ্রকাশে' বলা হয়েছিল, "কন্যা জন্মিলেই সর্ব্বনাশ! বরের অথবা বরের পিতামাতার অসঙ্গত অর্থলোভই এই বিপত্তির কারণ।... এই কুৎসিত রীতি নিবন্ধন অযোধ্যায় কন্যাহত্যা প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।... বঙ্গদেশে কন্যাহত্যা প্রথা নাই; কিন্তু অনেক স্থলে কন্যার মাতাপিতাকে বরের মাতাপিতার যেরূপ অসঙ্গত অর্থলোভতৃষ্ণা চরিতার্থ করিতে হয়, তাহাতে অনেকে এককালে দরিদ্র হইয়া পড়েন।"...[সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৪র্থ; ১ম সং)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, পৃঃ ২০৬-২০৭]

বাংলাদেশে স্বর্ণ বণিকদের মধ্যেই ছিল কন্যাপণের আধিক্য। এই জন্যে 'সোমপ্রকাশ' ঐ প্রথা নিবারণে তাদেরকেই এগিয়ে আসবার প্রস্তাব করেছিল।

'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র পক্ষ থেকেও বহুবিবাহ এবং কন্যাপণ নিবারণের চেষ্টা করা হয়েছিল; তবে ঐ সভার উদ্যোগে গঠিত আন্দোলনের সময় বহুবিবাহ ও কন্যাপণরোধে সরকারী হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় কিনা সেবিষয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। তবে "বহুবিবাহ ও কন্যাপণ নিবারণজন্য রাজসন্নিধানে আবেদনপত্র করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া প্রায় ছয় হাজার ব্যক্তি" (সনাতন ধর্মোপদেশিনী—১৮৭১; জুন সংখ্যা) ধর্মরক্ষিণী সভার সম্পাদকের কাছে পত্র লিখেছিলেন; ব্রাহ্মণপণ্ডিতও ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকশত।

কিন্তু ঐ সভার উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত চরিতার্থ হতে পারে নি। ১৮৭১ সালের ২০ শে আষাঢ়ের 'সোমপ্রকাশে' তাই মন্তব্য করা হয়েছিল, "সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা" কন্যাপণ ও বহুবিবাহ নিবারণ এবং কৌলীন্য প্রথার উন্মূলন বিষয়ে চেষ্টা পাইতেছেন শুনিয়া আমাদিগের হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা মনে ভাবিয়াছিলাম, সভা অপূর্ব্ব ফল প্রসব করিবেন; কিন্তু যে উপক্রম দেখিতেছি, বুঝি ফল ঝন ঝন করে।" [সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৪র্থ ১ম সং)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত; পৃঃ ২৩৭]

আসলে সমাজের মানুষ পণপ্রথায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও তার বিরুদ্ধে কোন বড আন্দোলনে সামিল হতে পারে নি। সমাজনেতারাও ঐ বিষয়ে কোন বড আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন নি। কাজেই কন্যাপণের কাঁটা সমাজশরীরে বিঁধেই রইল। বহুদিন পরে বিংশ শতাব্দীতে কন্যাপণ আইনতঃ নিষিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু পণ দেওয়া-নেওয়া ঠিকই বহাল তবিয়তে আছে। আজকের দিনে তাই নতুনভাবে পণবিরোধী আন্দোলন সংগঠনের প্রয়োজন রয়েছে।

এবার কন্যা বিক্রয় সংক্রান্ত আন্দোলন প্রসঙ্গে আসা যাক। কন্যা বিক্রয় অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে কন্যার বিবাহদান। এই প্রথায় অর্থলোভে অন্ধ পিতা বেশি অর্থের বিনিময়ে অযোগ্য ব্যক্তিকেও কন্যা সম্প্রদান করতে কুণ্ঠিত হতো না। তার ফলে ঐ কন্যার দাম্পত্যজীবন হতো নিতান্তই দুঃখের। শুধু তাই-নয়, অর্থের বিনিময়ে বিবাহের জন্যে কন্যা পাওয়ার রীতি থাকায় অনেক সময় অজান্তেই ব্যক্তিগত মানসম্মান ও কুল-জাতি-মর্যাদা নষ্ট হয়ে যেতো। ১৮৩৭ সালে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের সম্পাদককে লেখা জনৈক পাঠকের পত্রে ঐ বিষয়ে অনেক ঘটনার কথা জানা যায়। তাদের একটি—

"...২। কলিকাতা শহরের সীমা সংযুক্ত পূর্ব্বাংশবাসি—মুখোপাধ্যায় এক সাহেবের হিন্দুস্থানীয় উপপত্নী ব্রাহ্মণীর কন্যাকে বিবাহ করেন ঐ কন্যা সাহেবের ঔরসজাতা পরে তাহার গর্ভে মুখুয্যের এক কন্যা এবং তাহাকে রাঢ় দেশবাসি এক শুদ্ধাচার বিশিষ্ট পরিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে বিবাহ দেন ঐ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী কলিকাতাতেই ছিল পরে বিবাহ করিয়া বাটীতে গেলেন তিনি ঐ ভার্য্যাকে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত সংবাস করিয়াছিলেন এবং তাহার গর্ভে দুই তিনটা সন্তানও জন্মিল পরে টের পাইলেন সাহেবের দৌহিত্রী বিবাহ করিয়াছেন কিন্তু পণ্ডিতের যজমান শিষ্য ও জ্ঞাতি কুটুম্ব অনেক আছেন সাহেবের কন্যার অন্নে সকলের উদর পবিত্র হইয়াছে।" [তদেব ; পৃঃ ৮০৩]

ক্রীত কন্যার বংশ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ সঠিক খবর না পাবার দরুণই এই বিপত্তি। যাদের মাধ্যমে বিবাহের জন্যে কন্যা ক্রয় করা হতো তারাও নিজের কাজ হাসিল করবার জন্যে কন্যার আসল পরিচয় লুকিয়ে রাখতো বা যেমনটি বললে তার অর্থলাভ বেশি হবে তেমনি ভাবেই কন্যার পরিচয় দিয়ে থাকতো। তারই ফলে বিবাহকারীর পারিবারিক মর্যাদার হানি ঘটতো।

যাই হোক, এই কন্যা বিক্রয়ের বিরুদ্ধেও সেযুগে প্রতিবাদ উঠেছিল;

তবে সে প্রতিবাদ কোন আন্দোলনের রূপ নিতে পারে নি। অবশ্য সমাজ-সংস্কারকেরাও যে ঐ বিষয়ে খুব তৎপর ছিলেন তাও নয়। তবে কন্যা বিক্রয়ের বিরুদ্ধে কিছু পুস্তিকা ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল। সেসময় নানা পত্রপত্রিকাতেও ঐ প্রথার বিরোধিতা করা হয়েছিল। সেযুগের অন্যতম প্রগতিশীল পত্রিকা 'হিতসাধক' (১ম খণ্ড, ১২৭৪; ফাল্গুন। ২য় সংখ্যা)—এ "আসুরবিবাহ—কন্যাবিক্রয়" নামে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কন্যা বিক্রয়ের বিরোধিতা করা হয়েছিল। 'হিন্দুবিবাহ ও কন্যা বিক্রয়' শীর্ষক পুস্তকে জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখকও কন্যা বিক্রয়ের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন।

কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, পণপ্রথা ও কন্যাবিক্রয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা, লেখালেখি ও সভাসমিতি কিছু হলেও ঐ দু'টি বিষয়ে আসলে কোন জোরালো আন্দোলনই গড়ে তোলা হয় নি।

॥ ৭ ॥

ঃঃ মদ্যপান-নিবারণ আন্দোলন ঃঃ

উনবিংশ শতকের সমাজসংস্কার অন্দোলনগুলির ইতিহাস আলোচনায় মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনের কথাও এসে পড়ে। ঐ আন্দোলনের প্রকৃত সূত্রপাত ঘটেছিল বিগত শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে। তার আগে না ঘটার বড় কারণ, মদ্যপান তখন শিক্ষিত সমাজে খুব একটা নিন্দিত ব্যাপার বলে গণ্য হতো না। বিগত শতকের প্রথমভাগে নব্যশিক্ষিত বাঙালী মদ্যপানকে কিভাবে গ্রহণ করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে সেই যুগেরই কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তির বক্তব্য থেকে—প্রথমে কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কথা শোনা যাক্—

"......এক্ষণে য়ুরোপদেশীয়েরা সভ্য চূড়ামণি হইয়াছেন, এই স্থির সিদ্ধান্ত হইল। সুতরাং সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের যে প্রণালী তাঁহারা নির্ব্বাচন করিয়াছেন তাহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীতি জন্মিল; এবং তাহারই অনুকরণ করিবার বিশেষ যত্ন হইয়া উঠিল। আমাদের দেশে বহুকাল হইতে সুরাপান বিশেষ দোষাকর ও পাপজনক বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। এবং মদ্য স্পর্শ করিলে শরীর অপবিত্র হয়, এইরূপ বিশ্বাস এদেশস্থ লোকের মনে ধারণা ছিল। কিন্তু আমাদের মনে এই স্থির হইল যে, যখন এমন বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও সভ্য জাতীয়েরা ইহা আদরপূর্ব্বক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিতজনক কখনই

নহে। অতএব ইহা পান না করিলে সভ্যতাই বা কিরূপে হইবে, আর পূর্ব্ব-কুসংস্কারইবা কিরূপে যাইবে? হিন্দু কলেজের সুশিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা এদেশের সমাজ সংস্কার করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুরাপান করিতেন।"

[দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্ম-জীবন চরিত (আই. এ. পি. সংস্করণ ; ১৩৬৩)—কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়। পৃঃ ৯৭-৯৮]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে দেশে যে নবভাব ও ভাবনার জোয়ার বয়ে গিয়েছিল তার প্রভাবে পুরনোকে অস্বীকার করবার ঝোঁক প্রবল হয়ে উঠেছিল। প্রচলিত নিয়ম ভাঙ্গতে হবে এই ছিল তাঁদের মনোভাব। এই মনোভাবের জন্যে তাঁরা মদ্যপানও করতেন। মদ্যপানকে তাঁরা সংস্কার ভাঙ্গার প্রতীক বলেই গ্রহণ করেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছিলেন, "সে সময়ে সুরাপান করা কুসংস্কার ভঞ্জনের একটা প্রধান উপায়স্বরূপ ছিল। যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে সুরাপান করিতে পারিতেন, তিনি সংস্কারক দলের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন।"

[রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (নিউ এজ সং)-শিবনাথ শাস্ত্রী ; পৃঃ ৮৬]

সে যুগের আর একজন সমাজ সংস্কারক রাজনারায়ণ বসু এক সময় মদ্যপান নিবারণের জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন ; কিন্তু তিনিও হিন্দু কলেজে পাঠকালে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাঁর যুগের ও নিজের কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছিলেন "আমি পাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল……, প্রসন্নকুমার সেন এবং নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সহিত কলেজের গোলদিঘীতে মদ খাইতাম, এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শিককাবাবের দোকান ছিল, তথা হইতে গোলদিঘীর রেল টপকাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) উক্ত কাবাব কিনিয়া আনিয়া আমরা আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শ শূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য্য মনে করিতাম।"

[রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (১৩১৫)—রাজনারায়ণ বসু ; পৃঃ ৪১-৪২]

মদ্যপান সম্বন্ধীয় এই মনোভাবের জন্যে মদ্যপানের বিরুদ্ধে বিগত শতকের প্রথম ভাগে তেমন কোন আন্দোলন সংগঠিত হয় নি। তবে মদ্যপানের বিরুদ্ধে কেউই যে কিছু বলেন নি তা নয়। রামমোহনের সঙ্গে মদ্যপান সংক্রান্ত বিতর্কের

সময় রক্ষণশীল হিন্দু মদ্যপানের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে নব্যশিক্ষিত সংস্কারমুক্ত মানুষের অনেকে মদ্যপান করতেন বটে, তবে তাঁরা পরিমিত পানেরই পক্ষপাতী ছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন রামমোহন রায়। 'চারি প্রশ্নের উত্তর' এবং আরও পুস্তক-পুস্তিকায় তিনি পরিমিত মদ্যপানের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন। রামমোহন ঐসব পুস্তক-পুস্তিকায় মদ্যপান নিন্দনীয় বা মদ্যপান অনুচিত এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে জবাব দিয়েছিলেন এবং মদ্যপান মাত্রই নিন্দনীয় তা অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বিহিত ও পরিমিত মদ্যপানের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। সেই সময় এবং তার পরেও অনেকে তা মেনে নিয়েছিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, মদ্যপানকে যে নব্যশিক্ষিত সমাজ বরণ করে নিয়েছিল সেই সমাজেরই অনেকে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। মদ্যপানের কুফলই তার কারণ। তাঁরা পরিমিত পান তো দূরের কথা মদ্যপানেরই ঘোরতর বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে বহু আগে থেকেই—রামমোহনের কাল থেকেই মদ্যপানের চল ছিল; কিন্তু সেই ব্রাহ্মসমাজই পরবর্তীকালে এগিয়ে এসেছিল সুরাপানের বিরুদ্ধে।

মদ্যপানের বিরুদ্ধে রীতিমত প্রচারাভিযান ঘটেছিল প্রথমে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে। ১৭৭২ শকের শ্রাবণ মাসের ৮৪ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে মদ্যপানের ক্রমবৃদ্ধির জন্যে অর্থলোভাতুর 'রাজা'কে দোষী করা হয়েছিল; অনুকরণপ্রিয় বাঙালীও যে মদ্যপান বৃদ্ধির জন্যে দায়ী তাও বলা হয়েছিল। পত্রিকাটি মদ্যপান নিবারণের জন্যে শাসন কর্তৃপক্ষকে মদ্যব্যবসায় বন্ধ করবার আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু বলা বাহুল্য, শাসক গোষ্ঠী 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সে আবেদনে সাড়া দেন নি। সেই সময় মাদক দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণে 'ভারত সভা'র সদস্য এবং মিশনারীগণও সচেষ্ট ছিলেন। কোম্পানীর নতুন সনদ পাবার আগে এঁদের তরফ থেকে আবেদন করা হয়েছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যেন মাদক দ্রব্যের ব্যবসায়ে উৎসাহ না দেন। কিন্তু ইংলণ্ডের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সে আবেদনেও সাড়া দিতে চান নি। অথচ মদ্যপান নিবারণের ক্ষেত্রে সরকারী সহায়তারই বড় প্রয়োজন।

বাংলাদেশে মাদক নিবারণী আন্দোলনে মিশনারী পাদ্রী C. H. A. DALL—এর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। "The First Report of the Bengal Temperance Society"-তে বলা হয়েছিল—

"A temperance movement was made in Calcutta, by the Rev. C. H. A. Dall, in 1856. He succeeded in enlisting about 800 members,"

["The First Report of the Bengal Temperance Society ; P—2]

পূর্বোক্ত বিবরণীতে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী মদ্যপান সংক্রান্ত আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। দুষ্প্রাপ্য বলে ঐ বিবরণী থেকে আরও কিছু অংশ উদ্ধার করছি। ১৮৫৬ সালের ডালের আন্দোলনের কথা বলবার পরে ঐ বিবরণীতে জানানো হয়েছিল—

"Three other Abstinence Societies have been formed in this neighbourhood during the last two years :—one at cooly Bazar, presided over by the Rev. Mr. Payne, the second in Central Calcutta, under the presidency of the Rev. E. Storrow ; and the third, at Barrackpore, among soldiers in the Cantonment. There have also occasioally arisen more or less permanent societies among scattered and moving regiments of European troops. There was no general agitaion, however, and nothing attempted by our countrymen for and among themselves, so far as we know, tiil the 15th of November 1863. On that day some of them met, and agreed to the following resolutions, thus forming the constitution and byelaws of the "Bengal Temperance Society."

[Ibid ; P—2]

এই বিবরণীতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রাজনারায়ণ বসুর সুরাপান নিবারণীর কথা উল্লেখ করা হয় নি। তার উল্লেখ করা উচিত ছিল। রাজনারায়ণ বসু ঐ সভা স্থাপন করেছিলেন মেদিনীপুরে। সুরাপান নিবারণের জন্যে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত এইটিই হলো প্রথম সভা। রাজনারায়ণ পরিমিত পানেরও পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই ঐ সভার অনুষ্ঠানপত্রে লেখা থাকতো 'পরিমিত পান করা মানে একটি ছিদ্র রাখা।' রাজনারায়ণ ঐ সভার উদ্দেশ্য সাধনে অনেকাংশেই সফল হতে পেরেছিলেন। মেদিনীপুরের ডেপুটি

ম্যাজিষ্ট্রেটকেও তিনি আপনার দলে এনেছিলেন। তবে মাতালেরা খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিল তাঁর' পরে। কিন্তু তবুও নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও মেদিনীপুরে মদ্যপান নিয়ন্ত্রণে তিনি বহুল পরিমাণেই সফল হয়েছিলেন।

মদ্যপান নিবারণ আন্দোলনে প্যারীচরণ সরকারের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর 'বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজ' (দি বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি)। প্যারীচরণই ছিলেন ঐ সমাজের সম্পাদক। নীলমণি চক্রবর্তী ও হরলাল রায় ছিলেন তাঁর সহকারী। 'বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজের সভা'য় 'দশটি মন্তব্য' ঠিক করা হয়েছিল। নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখিত দুষ্প্রাপ্য 'প্যারীচরণ সরকার' গ্রন্থ থেকে প্রথম মন্তব্যটি (ঐ লেখক কর্তৃকই অনূদিত) উদ্ধার করছি—

১। "মাদক সেবন দেশব্যাপী হইয়া দুষ্ক্রিয়া, দৈন্য, ব্যাধি ও অধঃপতন ভয়াবহ পরিমাণে উৎপন্ন করিতেছে; রাসায়নিক বিশ্লেষণ, শরীরতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক তথ্য, শতশত মহাযশস্বী ভিষক্‌গণের অভিমত এবং নানা দেশীয় বহু দর্শন অভ্রান্তরূপে প্রমাণ করিয়াছে যে, স্বাস্থ্যে বা পীড়ায়, খাদ্য বা অন্নরূপে, ক্ষুন্নিবারণ বা বিলাসিতার জন্য, শ্রমক্লিষ্ট দেহ বা মনের পরিপুষ্টি করণার্থে, রোগ নিবারণের বা আয়ুবর্ধনের উপায় স্বরূপ, কোন প্রকার প্রমত্তকারী পানীয়ের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, প্রত্যুত উহা দুষ্ক্রিয়া, দুঃখ, পীড়া ও মৃত্যু হননের অত্যুর্ব্বর ক্ষেত্র স্বরূপ; সুরা একটী তীব্র বিষ, এবং উহার অল্প মাত্রায় ব্যবহারও অনিষ্টকারী; সর্ব্বদেশে বিশেষতঃ এদেশে দৃষ্ট হইয়াছে যে মদিরার পরিমিত পানই অধিকাংশ স্থলে ঘোরতর পাশব প্রমত্ততার প্রথম সোপান স্বরূপ হয়;—এই সকল কারণে সর্ব্বপ্রকার মদ্যপানে বিরতির অভ্যাস গ্রহণ ও প্রবর্ত্তনের এবং সুরাপানের বিষময় ফল সপ্রমাণিত ও প্রকাশিত করিবার উদ্দেশ্যে, যাবতীয় দেশহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের সমবেত উদ্যম আহ্বান করিয়া "বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজ" (Bengal Temperance Society) নামে একটী সমতি গঠনের প্রয়োজন হইয়াছে।"

[প্যারীচরণ সরকার (১৮৭৯)—নবকৃষ্ণ ঘোষ; পৃঃ ১০০]

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে প্যারীচরণ সরকার প্রেসিডেন্সী কলেজে একটি সভা আহ্বান করেছিলেন। নবকৃষ্ণ ঘোষের গ্রন্থ থেকে জানা যায়, অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তদানীন্তন বঙ্গ সমাজের অন্যতম নেতা রাধাকান্ত দেব ঐ সভায় উপস্থিত থাকতে না পেরে একটি পত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পত্রে তিনি প্যারীচরণের উদ্যোগ সমর্থন করেছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও প্যারীচরণের বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজের সদস্য ছিলেন। রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমর্থন ও সহায়তা প্যারীচরণের মদ্যপান নিবারণ আন্দোলনকে বেশ জোরদার করে তুলেছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মূল সমিতির অনুরূপ চৌষট্টিটি 'ভ্রাতৃ সমিতি' সারা দেশে স্থাপিত হয়েছিল। উত্তরপাড়া হিতকরী সভা প্যারীচরণের মদ্যপান নিবারণের উদ্দেশ্য সফল করবার জন্যে আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে এসেছিল। ১৮৬৩-৬৪ সালের "Report of Uttarpara Hitakory Shova" থেকে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায়—

"When the prospectus of the Bengal Temperance Society inaugurated at Calcutta by Baboo Peary Churn Sircar reached Ootterparrah, the Hitokorry Shova ere while most paintully witnessing the bareful effects produced in this Town by the use of intoxicating liquors, roused itself to action and co-operated with the main Society in their object to arrest the progress of the growing evil."

[Report of Uttarpara Hitokary Shova (1863-64) ; p-13]

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার শাখা হিসেবে উত্তরপাড়া মাদক নিবারণী সভা স্থাপিত হয়েছিল।

যাইহোক, মদ্যপান সংক্রান্ত আন্দোলনে একটি বিষয়ে প্যারীচরণ খুব সফল হয়েছিলেন। সে সময়ে গোপনে ডাক্তারখানায় মদ বিক্রী হতো। সরকারও তখন আবগারী বিষয়ক আইন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। এই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থায় 'বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজ' ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া কোন ওষুধের দোকান মদ্য বিক্রয় করতে পারবে না এই মর্মে ঐ আইনে একটি ব্যবস্থা রাখবার আবেদন জানিয়েছিল। সরকার ঐ আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন। নবকৃষ্ণ ঘোষ বলেছিলেন, "বহু চেষ্টার পর গবর্ণমেণ্ট পরিশেষে ইং ১৮৭৫ সালে ঐ আবেদন গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান আবকারী আইনের ৪৩ ধারা (sec. 43 of Act VII of 1875) এই উদ্যমের ফল"

[প্যারীচরণ সরকার (১৮৭৯)—নবকৃষ্ণ ঘোষ ; পৃঃ ১১১]।

প্যারীচরণের 'Wellwisher' এবং 'হিতসাধক' নামে দুটি পত্রিকা ছিল।

পত্রিকা দুটির মাধ্যমে মদ্যপানের দোষ প্রচারে তিনি বেশ সফল হয়েছিলেন। তিনি মদ্যপানবিরোধী পুস্তকও রচনা করেছিলেন। প্যারীচরণের পরে সেযুগে আরও কয়েকজন মদ্যপানবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আনন্দমোহন বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনে ব্রাহ্ম সমাজের কেশবচন্দ্র সেনের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রথমে প্যারীচরণ ইত্যাদির সঙ্গেই আলোচ্য আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। পরে বিলেত থেকে ফিরে এসে ১৮৭০ সালের নভেম্বর মাসে 'ভারত সংস্কার সভা' (The Indian Reform Association) প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সভারই অন্যতম বিভাগের কার্য ছিল মদ্য ও অন্য মাদকদ্রব্য নিবারণ আন্দোলন সংগঠন। এই বিভাগের প্রথম সম্পাদক ছিলেন যাদবচন্দ্র রায়। সভার মুখপত্র ছিল 'মদ না গরল।' কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ঐ 'ভারত সংস্কার সভা'র পক্ষ থেকে সরকারের কাছে মদ্যপান নিবারণের জন্যে এক আবেদন পাঠানো হয়েছিল। ঐ আবেদনে সাড়া দিয়ে সরকার মাদক দ্রব্যের অঢেল ব্যবহারের ওপর কিছু বিধিনিষেধ জারী করেছিলেন মাত্র। তবে কেশবচন্দ্র সেন তাতে নিরাশ হন নি। এই কারণেই দীর্ঘদিন তিনি মাদক দ্রব্য সেবন-বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭৮ সালে নব উদ্যমে 'আশালতা দল' (Band of Hope) স্থাপন করেছিলেন। এই 'আশালতা দলে'র কার্যক্রমও খুব উল্লেখযোগ্য। মাদকদ্রব্য সেবনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্যে এই 'আশালতা দলে'র পক্ষ থেকে অনেক পুস্তক-পুস্তিকাও প্রচার করা হয়েছিল।

কেশবচন্দ্র সেনের আন্দোলন বহুদিন ধরেই চলেছিল, কিন্তু তবুও বলতে হয়, মাদকদ্রব্য নিবারণের পক্ষে তখনও কোন কার্যকরী উপায় অবলম্বিত হয় নি। সরকারী নিশ্চেষ্টতাই তার প্রধান কারণ। মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলন এহেন অবস্থায় পড়েই ধীরে ধীরে তার তীব্রতা হারিয়ে ফেলেছিল এবং শেষে একেবারেই নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল।

অবশ্য পরবর্তীকালে মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শক্তিলাভ করেছিল; কিন্তু তা আমাদের আলোচনার বাইরে।

:: জাতিভেদ-প্রথা-দূরীকরণ আন্দোলন ::

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতিভেদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনেও মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ব্রাহ্মসমাজ। সনাতন হিন্দুধর্মের মানুষের কাছ থেকে এ বিষয়ে খুব কম সাড়াই পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য জাতিভেদ বিষয়ে যে খুব জোরদার আন্দোলন হতে পেরেছিল তাও নয়।

জাতিভেদ বিষয়ে সংঘবদ্ধ আলাপ-আলোচনা রামমোহন প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভাতে'ই প্রথম দেখা যায়। [দ্রঃ Raja Rammohun Roy And Progressive Movements in india (1941)—J. K. Majumder ; p-18] ব্যক্তিগতভাবে রামমোহন জাতিভেদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। মানুষমাত্রকেই তিনি ব্রহ্মের সন্তান অর্থাৎ ব্রাহ্ম বলে মনে করতেন। এই কারণে মানুষকে বিভিন্ন জাতির বেড়ায় আটকে রেখে আলাদা করে দেখার কথা তিনি আদৌ ভাবতে পারেন নি। জনৈক ব্যক্তিকে লেখা চিঠিতে জাতিভেদ সম্পর্কিত তাঁর মনোভাবের একটি দিকের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়—

"...I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interests. The distinction of castes introducing innumerable divisions and sud-divisions among them, has entirely deprived them of patriotic feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from under taking any difficult enterprise."

[The English Works of Raja Rammohun Roy (part IV) ; Sadharan Brahmo Samaj Publication (1947). p-95]

জাতিভেদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্যে রামমোহন মৃত্যুঞ্জয়াচার্যের 'বজ্রসূচী'র বঙ্গানুবাদও করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের যে 'ট্রাষ্ট ডীড' তিনি করেছিলেন তাতেও তাঁর জাতিভেদ বিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এইভাবে জাতিভেদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের সূচনা রামমোহনই করে গিয়েছিলেন সেসময়। তবে তাঁর ঐ কাজ যে খুব সফল হয়ে উঠেছিল তা নয়। নিজের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ থেকেও তিনি জাতিভেদের সংস্কার দূর

করতে পারেন নি পূর্ণমাত্রায়। ঐ সমাজের যে ঘরে বেদ-উপনিষদ পাঠ করা হতো সেখানে 'অ-ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মে'র প্রবেশাধিকার ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "...তখন সূর্য্য অস্ত হইবার কিছু পূর্ব্বে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ সমাজের পার্শ্ব-গৃহে উপনিষদ্ পাঠ করিতেন— ...শূদ্রদিগের সেখানে যাইবার অধিকার ছিল না।" [ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; ১৩৬০। পৃঃ ১২-১৩] তার কারণ হিসেবে দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় জানিয়েছিলেন, "শূদ্রের সাক্ষাতে বেদ পাঠ করিতে প্রস্তুত, এমন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যুগে পাওয়া যাইত না।" [আত্মজীবনী (৩য় সং)—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; পৃঃ ৩৫৫]

কিন্তু সে যাই হোক না কেন, ব্রাহ্মসমাজ থেকে যে রামমোহন জাতিভেদ সংস্কার দূর করতে পারেন নি তা সত্য।

দেবেন্দ্রনাথ নিজেও জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন। কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্ম-মন্দিরের জন্যে তিনি অব্রাহ্মণ আচার্য পাঠিয়েছিলেন। তবে তিনি এটুকু উপলব্ধি করেছিলেন, জাতিভেদকে রাতারাতি বিলুপ্ত করা যাবে না। রাজনারায়ণ বসুকে একটি চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন, "এক্ষণে এমত সময় উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে জাতিভেদ ভঙ্গ করা যায়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কালে সে জাতিভেদ থাকিবেক না। তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে; যেহেতু নানা ঘটনা সেই জাতিভেদ ভঙ্গ বিষয়ে উন্মুখ হইয়াছে।"... [মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত; ৩৯ সংখ্যক পত্র; পৃঃ ৫০]

জাতিভেদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও কর্মী ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। জাতিবৈষম্য দূর করবার চেষ্টায় কেশবচন্দ্র সেন যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন সনাতন হিন্দু সমাজকেও তা প্রভাবান্বিত করেছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন বলেছিলেন—

"Caste was originally meant to be a system of social distinctions, a division of society into trades and professions; but in later days this system of social distinctions has been strengthened and fortified by religious sanctions. Thus in later times pollytheism and caste came in, and almost wholly swept away the purer Hinduism which existed before."

[Keshub Chunder Sen in England : Diary, Sermons Addresses

and Epistles. (1931) ; Navavidhan Publication Committee ; P-272-3]

জাতিভেদের সংস্কার দূর করবার জন্যে কেশবচন্দ্র সেন অসবর্ণ বিবাহ ও উপবীতবর্জন কার্যসূচী গ্রহণ করেছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের প্রবর্তিত নগর সংকীর্তনেও জাতিভেদ বিরোধী বক্তব্য সংযোজিত হয়েছিল—

"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি,
নাহি জাত বিচার।"

[রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ (নিউ এজ সং)—শিবনাথ শাস্ত্রী পৃ: ২৪৬]

কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলনের ফলে ১৮৭২ সালে যে 'তিন আইন' বিধিবদ্ধ হয় তাতে অসবর্ণ বিবাহ স্বীকৃত হয়েছিল।

বাংলাদেশে সেই সময় জাতিভেদ বিষয়ে বেশ আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল ; নানা পত্র-পত্রিকাতেও ঐ বিষয়ে মতামত বিনিময় হচ্ছিল। ১৮৭৩ সালে 'বঙ্গ দর্শনে' প্রকাশিত 'জাতিভেদ' নামক একটি প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক জাতিভেদের বিপক্ষে বক্তব্য রেখেও বলেছিলেন, ঐ প্রথাকে সহজে নির্মূল করা যাবে না। জাতিভেদ প্রথার সম্পর্কে সেযুগে সমাজে একাধিক মতামত প্রচলিত ছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' থেকে তার একটু পরিচয় তুলে ধরছি—

"জাতিভেদ প্রথা লইয়া এক্ষণে হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন চলিতেছে। কেহ কেহ উহাকে একেবারে উঠাইয়া দিতে চান ; কেহ কেহ উহাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারেন না, আবার কেহ কেহ উহা রাখিতে চান কিন্তু উহার বর্ত্তমান আকার পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক।"...[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ; আষাঢ়, ১৭৯৬ শকাব্দ]

যাঁরা একেবারেই জাতিভেদের পক্ষপাতী নন তাঁদের বক্তব্য ছিল, ঐ প্রথা ভারতবর্ষের উন্নতিকে নানাভাবেই ব্যাহত করেছে। পরিবর্তিত আকারে যাঁরা জাতিভেদ চান তাঁদের কথা, "জাতি বংশগত হইবে অথচ নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি জ্ঞানী ও ধার্মিক হইলে উৎকৃষ্ট জাতিতে উন্নত হইবে এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি অধার্মিক ও মূর্খ হইলে স্বজাতি হইতে অধঃপাতিত হইবে, এইরূপ রীতি প্রচলিত থাকিলে জাতিবিভেদ প্রথার দোষ নিবারিত হইয়া তাহা হইতে কেবল শুভ ফল উৎপন্ন হইবে।" [তদেব]

যাঁরা খুব গোঁড়া ছিলেন, বলাবাহুল্য, জাতিভেদের কোন পরিবর্তনই তাঁরা চান নি। 'সাধারণী' পত্রিকায় (১৮৭৪, ২রা আগষ্ট; ২য় ভাগ) প্রকাশিত 'জাতিভেদে সামাজিক উন্নতি' শীর্ষক প্রবন্ধে ঐ মনোভাব ব্যক্ত হয়ে উঠেছিল।

ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্বে আলোচ্য আন্দোলন যখন বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল, তখন রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই তার বিরোধিতা করবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তাতে যে জাতিভেদবিরোধী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল তা নয়। কেননা ব্রাহ্মসমাজও প্রবল শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে সে সময় আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের পরে ঐ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী এবং ব্রাহ্মসমাজের আরও অনেকে। ঐ আন্দোলনে শিক্ষিত উদারপন্থী হিন্দুরাও যোগ দিয়েছিলেন।

কিন্তু যতই জোরদার হোক না কেন, ঐ আন্দোলনে জাতিভেদের ভিতই শুধু নড়ে উঠেছিল, বৃহত্তর সমাজ থেকে জাতিভেদের সংস্কার তাতে দূর হয় নি। আজও বিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও জাতিভেদের অভিশাপ রয়ে গিয়েছে আমাদের সমাজে।

:: হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা সংক্রান্ত আন্দোলন ::

হিন্দুদের পক্ষে কালাপানি বা সমুদ্র পার হওয়া নিষিদ্ধ এই বিশ্বাস বিগত শতকের পূর্বে তেমন কোন সমস্যাই সৃষ্টি করে নি; করেছিল তার পরে। তার বড় কারণ পশ্চিমী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে অনেক হিন্দুই সমুদ্র পাড়ি দেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল—অনেকে সমুদ্রে পাড়িও দিয়েছিল। সেই সময়ই রক্ষণশীল হিন্দুরা সমুদ্র পাড়ি দিলে জাত ও ধর্ম যাবার শাস্ত্রীয় বচন তুলে এক সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল মানুষের মধ্যে বাদ-বিতণ্ডাও শুরু হয়ে গিয়েছিল তা নিয়ে।

বিগত শতকে বৃটেনের উপনিবেশ ভারতবর্ষের এক শ্রেণীর মানুষ ইংলণ্ডে যাবার জন্যে খুবই উন্মুখ হয়ে পড়েছিল। যদিও তাদের সংখ্যা অনেক কম তবুও তাদের সেই বিলেত যাবার ইচ্ছাকে রোধ করবার জন্যে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলে রক্ষণশীল হিন্দুরা তাদের ভয় দেখিয়েছিলেন। এই অবস্থায় বিলেত যাবার প্রয়োজন আছে কিনা এবং সকলেই ঐ স্থানে যাবার যোগ্য কিনা এই বিষয়ে সমাজে আলাপ-আলোচনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। ১২৭৭

বঙ্গাব্দের ১৬ই ফাল্গুনের 'সোমপ্রকাশে' ঐ বিষয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়। উন্নতি কামনায় যুবকদের বিলেত যাওয়াকে 'সোমপ্রকাশ' সুখের বলেই মনে করেছিল। তবে সেখানে যাবার আগে তাদের যে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে সেকথাও 'সোমপ্রকাশ' বলেছিল। যুবকেরা যাতে সেখানে গিয়ে সৎ আচরণ করে সে নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল।

হিন্দুদের মধ্যে যারা সমুদ্রযাত্রার বিরোধী ছিল তারা সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে নানাবিধ আপত্তি তুলেছিল। তারা কোন কোন শাস্ত্র বচন উদ্ধার করে বলেছিল, শাস্ত্রে সমুদ্রযাত্রাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া ঐ যাত্রায় ম্লেচ্ছ সান্নিধ্যে এসে ম্লেচ্ছদের খাবার খেতে হয় বলে জাতিবিনাশও ঘটে থাকে। আরও আপত্তি তারা তুলেছিল। অবশ্য সমুদ্রযাত্রার যারা পক্ষপাতী ঐ সব আপত্তি তারা খণ্ডনও করেছিল।

সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে আন্দোলন কখনও তেমন তীব্র আকার ধারণ করে নি; তবে বিগত শতকের সপ্তম-অষ্টম দশকে ঐ আন্দোলন কিছুটা জোরালো হয়ে উঠেছিল। ঐ সময় বিলেত যাবার (সমুদ্রযাত্রা তো বটেই) সমর্থক একপক্ষ যাতে হিন্দুত্ব বজায় রেখে বিলেত যাওয়া যায় তার জন্যে বাষ্পীয়যানে নিজস্ব পাচক রাখবার প্রস্তাব দিয়েছিল। হিন্দুত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা না করে তারা সমুদ্রযাত্রায় রাজী ছিল না। 'সোমপ্রকাশ' (১২৭৭, ১৬ ফাল্গুন) এদের এই মনোভাবকে ব্যঙ্গ করেছিল।

১৮৭১ ১৯২৮ সংবৎ) সালে পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সমুদ্রযাত্রার অনুকূলে সংস্কৃত ভাষায় একটি ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। ঐ ব্যবস্থায় কয়েকটি শর্তাধীনে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ নয় বলা হয়েছিল। [দ্রঃ The Hindue Sea-Vayage Movement in Bengal (1894) ; p-11]

বিগত শতকের নবম দশকে সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে আন্দোলন সংগঠনের জন্যে একটি 'ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি' (Standing Committee on the Hindu Sea-Vayage question) স্থাপিত হয়েছিল। ঐ সমিতিতে ছিলেন স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, বিচারক গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশচন্দ্র চন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ সেন, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মন্মথনাথ মিত্র, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রাজকুমার সর্বাধিকারী, কিরণচন্দ্র রায়, সূর্যকুমার সর্বাধিকারী, নীলমণি মুখার্জী ন্যায়ালঙ্কার, উমেশচন্দ্র মিত্র, কুমার রামেশ্বর মালিয়া, মহারাজ বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর, দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জী। এঁদের মধ্যে সভাপতি ছিলেন

রমেশচন্দ্র মিত্র; বিনয়কৃষ্ণ ছিলেন সম্পাদক; দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জী ছিলেন সহ-সম্পাদক এবং যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ছিলেন কোষাধ্যক্ষ। এঁরা সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক সভাসমিতির খবরাখবর বিভিন্ন গণ্য-মান্য ব্যক্তির সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক মতামত ইত্যাদি সংগ্রহ করে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন; পুস্তকটির নাম 'The Hindu Sea-Voyage movement in Bengal (1894)। ঐ পুস্তকে বিদেশী সরকারী কর্মচারীরও মত সংকলিত হয়েছিল। যাইহোক, পূর্বোক্ত 'ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি'র সদস্যদের চেষ্টায় সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক প্রশ্নটি সমাজকে তখন বেশ ভাবিয়েই তুলেছিল। তার ফলে দেখা যায়, নানাস্থানে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান, আলাপ-আলোচনা,পত্র-পত্রিকায় মতামত বিনিময় বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল।

১৮৯২ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'ন্যাশানাল সোস্যাল কনফারেন্স' ঐ কনফারেন্সে সমুদ্রযাত্রার বিষয়টিও আলোচিত হয়েছিল। বাংলাদেশের সমুদ্র-যাত্রা আন্দোলন সম্পর্কে মহাদেব গোবিন্দ রানাডে বলেছিলেন—

"The agitation in Bengal was well Kept up throughout the year; and thanks to the efforts of Kumar Vinay Krishna Bahadur, Mr. Surendranath Banerjee and others. The old orthodox leaders—both Pandits and laymen had been fairly won over to the side of progress. It was a sensible advance to notice that large numbers of Pandits and laymen had been convinced that the Shastras did not consider distant Sea-Voyages and residence in foreign countries as acts involving in themselves any degradation"··· [The Hindu Sea-Voyage Movement in Bengal (1894.) ; P-36]

সমুদ্রযাত্রার পক্ষে সে সময় কলকাতায় কয়েকটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ সভাগুলির মধ্যে জেনারেল এ্যাসেম্বলী মহাবিদ্যালয়ের হলে অনুষ্ঠিত সভার (১৮৯১) কথাই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমবিহারী মিত্র ঐ সভায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। হিন্দুর নানা ধর্মশাস্ত্র থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে তিনি বলেছিলেন, সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে একটি বিতর্ক-সভার ব্যবস্থা করেছিল। ছাত্রদেরকেও যে ঐ বিষয় ভাবিয়ে তুলেছিল, ঐ সভা থেকে তা বোঝা যায়।

১৮৯২ সালে শোভাবাজারের রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত সভাটিরও ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে।

অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত অপর এক সভাতেও বহু জ্ঞানী-গুণী শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় হাজার খানেক লোকের সমাবেশ ঘটেছিল সেখানে। দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জী তাঁর দীর্ঘ ভাষণে সমুদ্রযাত্রার শাস্ত্রীয়তা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সুন্দরভাবে। 'দি ইণ্ডিয়ান মিরর' তাঁর ঐ ভাষণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল—

"The speech was so much appreciated and admitted that it is intended to publish it in a pamphlet form"

[Ibid ; p-62]

পরবর্তীকালে সত্যিই দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতকের নবম এবং দশম দশকে এমনি আরও অনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশের বাইরেও ঐ সময় সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে কিছু কিছু সভা হতে দেখা যায়।

কিন্তু সভা-সমিতি, আলাপ-আলোচনা, মতামত-সংগ্রহ ইত্যাদি হলেও সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে আন্দোলন বেশিদিন চলতে পারে নি। তার কারণ প্রধানতঃ দু'টি—প্রথমতঃ সাধারণ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে তার কোন যোগ ছিল না। তাদের পক্ষে সমুদ্রযাত্রার সম্ভাবনা আর কতটুকু! দ্বিতীয়তঃ যারা সে যুগে বিলেত বা অন্য কোথাও সমুদ্রপথে যেতো সাধারণভাবে তারা সমাজের উচ্চস্তরের-ই মানুষ ছিল। ধন ও প্রতিপত্তি কোনটিরই তাদের অভাব ছিল না। সমাজকেও তারা খুব একটা তোয়াক্কা করতো না। কাজেই সমুদ্রযাত্রা করলে সমাজ শাস্তি দেবে সে ভয়ও তাদের বেশি ছিল না। সমুদ্রযাত্রাবিরোধী মনোভাব এর ফলে দুর্বল হয়েই গিয়েছিল।

তাছাড়া নব্যশিক্ষা ও বলিষ্ঠ ভাবধারার আলোকে কুসংস্কারের অন্ধকার ক্রমশঃই কমে আসছিল। জীবন সংগ্রাম ও জীবনোন্নতির জন্যে সমুদ্রযাত্রার যে প্রয়োজন রয়েছে সে বাস্তববোধও মানুষের মধ্যে ক্রমশঃ দেখা দিচ্ছিল। এই সব কারণে রক্ষণশীল হিন্দুরাও অনেকে ধীরে ধীরে নীরব হয়ে পড়েছিল। সমুদ্রযাত্রা অশাস্ত্রীয় এই বিশ্বাস থাকলেও সামাজিক জটপাকাবার উৎসাহ তারা তাই ধীরে ধীরে হারিয়েই ফেলেছিল।

এতক্ষণ ধরে সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা

করা গেছে; এবার দেখা যাক, জনচিত্তে ঐ আন্দোলনগুলি প্রভাব ফেলেছিল কতখানি।

আমাদের দেশে প্রথম আলোড়নকারী সমাজসংস্কার আন্দোলন সতী-প্রথার বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল এ কথা আগেই বলা হয়েছে। ঐ আন্দোলন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছিল। আন্দোলনের পরিচালনা সম্পর্কেও তাদের অনেকে মতামত জ্ঞাপন করেছিলেন। আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধেও কেউ কেউ নেতৃবৃন্দকে সচেতন করে দিয়েছিলেন। ঐ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সংবাদ পত্রাদিতে তারা যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন তা থেকেই বুঝতে পারি, সতীপ্রথা বিরোধী আন্দোলন সাধারণ মানুষকে কি পরিমাণে ভাবিয়েছিল।

১৮২৭ সালে সতীপ্রথাবিরোধী আন্দোলন মন্দীভূত হয়ে পড়েছিল; সমাজের প্রগতিশীল মানুষের তা ভালো লাগে নি। সেই কারণে ঐ বিষয়ে মতামতও ব্যক্ত হয়েছিল। ১৮২৭ সালের ৫ই মে'র 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকাতে 'টীকাকারকস্য' নামের আড়ালে জনৈক ব্যক্তি ঐ বিষয়ে নেতৃবৃন্দের একরকম কঠোর সমালোচনাই করেছিলেন। [দ্রঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম, ৩য় সংস্করণ)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ২৮৭] পত্রটি সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাবে।

রক্ষণশীল গোষ্ঠীর অনেকেও মতামত জ্ঞাপনে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র অনুদার সংরক্ষণশীল মনোভাবের কথা বহু কথিত। রাম-মোহন ও তাঁর সতীবিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতায় এই পত্রিকাটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। এই পত্রিকাটিতে কুসংস্কারে অন্ধ সতীপ্রথা সমর্থক সাধারণ পাঠকের বক্তব্যও প্রকাশ করা হতো। সে যুগের রক্ষণশীল মানুষের কাছে সতীপ্রথা রদকারী আইন যে আদৃত হয় নি তার পরিচয় পাওয়া যায় পাঠক প্রেরিত একটি পত্রে। পত্রটির অংশ বিশেষ উদ্ধার করছি—

"আমি চন্দ্রিকাপত্রের গ্রাহক (?) অত্যল্প কাল (?) হইয়াছি অর্থাৎ তিন মাসের অধিক হইবে না এই অল্পকালের মধ্যেই দুই তিনটা পতিপ্রাণা সতীর সংবাদ পাঠ করিয়াছি ইহাতে অনুমান হয় যে শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর সতী নিবারণের আইন যে দিবস প্রকাশ করেন তদ্দিবসাবধি অদ্য পর্যন্ত বহুতর সতীর প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকিবেক মহাশয় সে তাবৎ অবশ্যই চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়া থাকিবেন অতএব প্রার্থনা সেই সকল সংবাদের স্থূল

লিখিয়া আগামি এক দিবসের চন্দ্রিকায় করেন ইহা করিলে কেবল আমার অভিস্ট (?) সিদ্ধ হয় এমত নহে অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের উপকারের সম্ভাবনা আছে। যেহেতু যদ্যপিও শ্রীশ্রীযুত পতিপ্রাণা সতীর সংবাদ চন্দ্রিকার দ্বারা বারম্বার অবগত হইয়া থাকিবেন তথাচ একস্থানে অধিক সংবাদ সঙ্কোলন···(?) শ্রবণে অবশ্যই দয়ার্দ্দচিত্তে দয়া হইতে পারিবেক কেননা রাজা······(?) শ্রুতি কর্ণ-ভ্যাংফলত তিনি পূর্ব্বে শুনিয়া ছিলেন যে বলদ্বারা স্ত্রীরদিগকে দাহ করে এই হেতু তদ্বিষয় নিবারণ করিয়াছেন এই নিমিত্ত কলি ভূয়ঃ ২ পতিপ্রাণা সতীদিগের গতি তাঁহার কর্ণগোচর হইলে অবশ্যই মঙ্গল হই (বে ?) এবং হিন্দুদিগের যে কলঙ্ক তা (হার ?) মনে হইয়াছে তদ্দোষ হইতে ইঁহারাও নিস্তার পাইবেন”··

[সমাচারচন্দ্রিকা ; ১২৩৮, ৯ই বৈশাখ]

[উদ্ধৃত অংশের কীটদষ্ট বা ছিন্নস্থানে (?) চিহ্ন দেওয়া হয়েছে ; কোথাও কোথাও প্রথম বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে পাঠোদ্ধারের চেষ্টাও করা হয়েছে।]

বাংলাদেশের জনচিত্ত প্রকৃত অর্থে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময়। সে যুগের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত জনমতের আধিক্য থেকেই তা' বোঝা যায়।

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে একটি মজার চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। মতামত প্রকাশের অভিনবত্বের বিচারে এবং রীতিমত দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় চিঠিটির বেশ কিছু অংশ উদ্ধার করছি। অহল্যাদাসী, দ্রৌপদীদাসী, তারাদাসী, মন্দোদরীদাসী ও কুন্তীদাসীর জবানীতে লেখা ঐ পত্রটিতে বলা হয়েছিল—

“প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়। অস্মদাদির আবেদন পত্র প্রকটন পূর্ব্বক আশ্রয়বিহীনাদিগ্যে আশ্রয় দিবেন।

বিধবার বিবাহের উপায়।

ওলো দিদী তোয়ের হও।

শুনেছিস পাথুরেঘাটা নিবাসিনী এক বিধবা ব্রাহ্মণ সমাস্তিনী এ নারির নিকটে ভাগড়া হইয়াছেন। পাত ২।৩ বাঙ্গালা লেখা বাইবেল উলটাইয়া পতিবিয়োগ বিরহ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধারের সাধু সেতু সংস্থাপিত করিয়াছেন। বাল্যকালে সাঁজ বিয়ানে এয়োব্রতের ফলে পতিহত হইয়াছিল প্রবল বাইবল সনাতন ধর্ম্ম পুনঃপতি মিলাইয়া দিবে। চল সই তাহার শরণ লই। ঘরে আর কি কায? মনুদাদার শাস্ত্র অস্ত্রবৎ জর্জ্জরীভূত করিতেছে, তাঁহার কি লিখা

কন্যা এবং ভগিনী ছিল না? বোধহয় তাহা থাকিলে বিধবার দ্বিসংস্কার জন্য ২।১টা শীতল বচন অবশ্যই লিখিতেন, অতএব এমত নিষ্ঠুর ধর্ম্ম লইয়া কি ধুয়ে খাব? অপর একজন ব্রাহ্মণতনয়া পিতামহের নিন্দা শ্রবণে কহিলেন। ও সই, মিছে মনুদাদার গ্লানি করিতেছিস্, জানিসতো, মনুদাদার মত এক্ষণে বাবুদের মধ্যে চলে আর না চলে। কখন কি এমত শুনেছিস খ্রীষ্টান হইয়া পুনঃ জাত পায়। মনুর দেইনি মনুর বাবাও এমত বিধি দেন নাই। বাবুদের ঘরে আগুন লেগেছে সেই জন্য জল আন জল আন শব্দ করিতেছেন, শ্রীমতী ভগীদিদী এ পক্ষের পথ দেখায়াছেন; বোধ হয় এ পক্ষে এ ক্ষণে সকলে পক্ষপাত বিহীন হইবেন এবং অচিরে বিধবা উদ্ধারিণী নামী সভা স্থাপিতা হইবে। ভাবনা কি? চল, আগে বাবুদের কাছে জানাই। যদি তাঁহারা আমারদের কোন উপায় না করেন তবে বাইবেল সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক বিরহানল নির্ব্বান করিব; হরির খুড়া সংপ্রতি স্কাটলেণ্ডে মৃত চামরা পিতামহের পদাভিষিক্ত হইয়াছেন। কে আর আমারদিগ্যে বাইবল দিবে। বাইবল! তোমাকে চিন্তা করিতে করিতে যেন বায়ু বলিষ্ঠ না হয়।"

[সংবাদ প্রভাকর; ১১ই নভেম্বর; ১৮৫২]

পত্রটিতে সরসভঙ্গিতে বিধবাবিবাহ এবং খ্রীষ্টধর্মকে ব্যঙ্গ করা হয়েছিল। বিধবাবিবাহ যে হিন্দুধর্মে নেই সে কথাও কায়দা করে বলা হয়েছিল।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চের 'সংবাদ প্রভাকরে' 'অহংযথার্থবাদী' পরিচয়ের আড়ালে জনৈক ব্যক্তির একটি পত্র মুদ্রিত হয়েছিল। পত্রপ্রেরক বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন। 'ধর্মানুরঞ্জিকা' পত্রিকা ও তার সম্পাদক নন্দকুমার কবিরত্ন ছিলেন রক্ষণশীলতার পৃষ্ঠপোষক। ঐ পত্রিকায় নন্দকুমার-কৃত বিদ্যাসাগরনিন্দার প্রতিবাদ জানিয়েই 'অহংযথার্থবাদী' পত্র রচনা করেছিলেন। ঐ প্রতিবাদ থেকেও বোঝা যায় সাধারণ মানুষকে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত বাদ-প্রতিবাদ কতখানি প্রভাবান্বিত করেছিল।

বিদ্যাসাগর যখন বিধবাবিবাহ আন্দোলন সংগঠিত করেন রাধাকান্ত দেব তখন খুবই বৃদ্ধ। কিন্তু তদানীন্তন হিন্দু সমাজে তাঁর প্রভাব তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁর বিধবাবিবাহবিরোধিতা সে যুগে রক্ষণশীল মানুষকে প্রেরণা দিয়েছিল। এইজন্যে রাধাকান্ত দেবকে সম্বোধন করে মেদিনীপুরের কয়েকজন ব্রাহ্মণ রমণী এক পত্র রচনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে ঐ পত্রে সমর্থন করা হয়েছিল। জনচিত্তে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলনের

প্রভাব কতখানি তার একটি মূল্যবান দলিল হওয়ায় পত্রটির কিয়দংশ উদ্ধার করছি—

"আমরা অতি শৈশবাবস্থায় পতিরত্ন বিহীনা হইয়া এ পর্য্যন্ত অসহ্য বৈধব্য-যন্ত্রণায় কাল যাপন করিতেছি, কিন্তু অদ্যাবধি আমারদিগের ক্লেশ নিবারণের কোন সদুপায় প্রচলিত না হওয়াতে অস্মদগণ পক্ষে বিবিধ অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে। অধুনা শ্রুত হইলাম দেশহিতৈষীগুণরাশি বিপুল যশস্বী অদ্বিতীয় পণ্ডিতবর গুণসাগর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বহ্বায়াসে বিবিধ শাস্ত্রান্বেষণ করত পরিশেষে বর্ত্তমান কলিযুগের প্রচলিত শাস্ত্র অর্থাৎ পরাশর সংহিতা হইতে বিধবা বিবাহ হওনের যে শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন, তৎপাঠে বিদিত হইল যে বিধবাদিগের পুনঃপরিণয় কিছু অশাস্ত্রিক নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আমারদিগের দেশীয় পণ্ডিতমহোদয়েরা শ্রীযুত বিদ্যাসাগরের এই উৎকট পরিশ্রমে বাধিত না হইয়া তাহাতে নানা প্রকার ফন্দি তুলিতেছেন, এবং স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া যুক্তিসিদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথা যাহাতে প্রচলিত না হয় তাহারাই (!) চেষ্টায় যত্নশীল হইয়াছেন,"···

[সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৪র্থ)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ; ১৯৬৬ পৃঃ ৭৬৯-৭৭০]

পত্রটিতে রাধাকান্ত দেবকে বিধবাবিবাহ সমর্থন করতে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। আবার এ কথাও বলা হয়েছিল,"···ভগবান পরাশর বাক্য প্রচলিত করিতে যত্নশীল হউন, নচেৎ মহাশয়কে ভবিষ্যতে শতশত ভ্রূণহত্যা পাপে জড়িত হইতে হইবে ;"···(তদেব ; পৃঃ ৭৭০)

এখানে বৃদ্ধ রাধাকান্ত দেবের ওপর যে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়। পত্রটি যথার্থ মহিলাদের রচনা কিনা তাতেও সন্দেহ জাগে। কিন্তু সে যাইহোক না কেন জনচিত্তে বিধবাবিবাহের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ নির্ণয়ে এর মূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিধবাবিবাহ আইনের খসড়া প্রস্তুত হবার কথা শুনে খুশি হয়েছিল সে যুগের অনেক মানুষ ; কিন্তু অখুশি মানুষের সংখ্যাও কম ছিল না। উপর্যুক্ত আইনের খসড়া প্রস্তুত হবার সংবাদে তারা খুবই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তাদের ঐ বিক্ষোভ ও বিরোধিতা প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকরে' পত্র লিখেছিলেন এক মহিলা। ঐ ব্যক্তিদের বিক্ষোভ ও পত্রলেখিকার পত্ররচনা—উভয়ের মধ্যে জনচিত্তের প্রতিফলনই আমরা লক্ষ্য করতে পারি। পত্রলেখিকা বিক্ষোভ-

কারীদের নির্দয় বলে অভিহিত করেছিলেন এবং যাতে বিধবাবিবাহ আইন শীঘ্র বিধিবদ্ধ হয় তার জন্যে সম্পাদক মহাশয়কে লেখনী ধারণের অনুরোধও জানিয়েছিলেন। (দ্রঃ সংবাদ প্রভাকর; ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৫৫) অবশ্য এই পত্রও মহিলার রচিত কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে কিছু বলা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আর একজন মহিলার পত্রের কথাও বলা প্রয়োজন। 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় 'বিদ্যাদেবী' নামের ঐ মহিলার পত্র মুদ্রিত হয়েছিল। বিদ্যাদেবীর বিবাহ হয় সাত বৎসর বয়সে চল্লিশ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তির সঙ্গে। বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই তিনি বিধবা হন। তিনি যখন বিধবাবিবাহ বিষয়ক আইন পাসের সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিলেন তখন তাঁর মধ্যেও এক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। এই প্রতিক্রিয়ায় তাঁর বেদনা ও আনন্দ উভয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—

"আপনারদিগের উদ্যোগে এদেশের দারুণ কুসংস্কার পরাভূত হইয়া বিধবা-বিবাহ চালিত হইবে বটে কিন্তু এক্ষণে তাহার অনেক বিলম্ব দেখা যাইতেছে, আমার শরীরে স্বামী সুখের সম্ভাবনা নাই, কারণ ততদিন যে বাঁচিয়া থাকিব এমত আশা নাই, তথাপি এই সুখ হইল যে মরিবার সময় পরমানন্দে প্রাণত্যাগ করিব, কারণ যদিচ আমি ঐ সুখ হইতে বঞ্চিতা হইলাম তথাপি আমার ন্যায় শত ২ স্বামিহীনা কামিনীর যে সুখ হইবে ইহাই স্মরণ করিয়া মরিব।"…

[সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৩য়)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ; ১৯৬৪। পৃঃ ৪৮৪]

বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তিত হবার পরে প্রথম অনুষ্ঠিত বিধবাবিবাহের পাত্রীকে নিয়ে সমাজে নানা কুৎসা প্রচারিত হয়েছিল। বিধবাবিবাহে ভদ্রসমাজের কন্যা পাওয়া দুর্লভ এই কথা প্রচার করাই ছিল কুৎসারটনাকারীদের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করবার জন্যে প্রগতিশীল ব্যক্তিরাও এগিয়ে এসেছিলেন। নানা তথ্যসংগ্রহ করে তাঁরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন, পাত্রী সম্ভ্রান্ত বংশেরই মেয়ে। সে যুগের পত্র-পত্রিকায় এই বিষয় নিয়ে জোরালো মতামত বিনিময় ঘটেছিল। ১৮৫৬ সালে 'সংবাদ প্রভাকরে' একটি ব্যঙ্গাত্মক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রটিতে বিধবাবিবাহ বিরোধী জনমত স্পষ্ট। পত্রটির কিছু অংশ নিম্নরূপ—

"সংপ্রতি এক শুভজনক সংবাদ শ্রবণে বড়ই সন্তোষিত হইয়াছি, শুনিলাম যে চক্রবর্তি, ঘোষাল, হড়, গুড় গড়াগড়ি ইত্যাদি উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যূহের

উপকারক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এ রাজ্যে Second Hand (সেকেণ্ড হেণ্ড) রমণী অর্থাৎ দোজবোরে কোনে চলন হইবেক, এ কারণ ভরসা করি যে আমরা অতি সুলভ মূল্যেই মনোহরা মহিলালাভ করিতে সমর্থ হইব, আর চারি পাঁচশত মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া অশীতি ও নবতী বৎসরে পঞ্চম বর্ষীয় বালিকা বিবাহ করিতে হইবে না,…"

[সংবাদ প্রভাকর ; ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬]

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এজন্যে বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তিত হবার পরেও বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করা হয়েছিল প্রবলভাবে। ১৮৭২ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'হালিসহর পত্রিকা'য় "বঙ্গদেশীয় সমাজ সংস্করণ" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে ঐ বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। সে যুগে 'বঙ্গদর্শন', 'নবজীবন', 'সাধারণী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাতেও বিধবাবিবাহবিরোধী জনমত প্রকাশিত হতো।

কৌলীন্য ও বহুবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলনও সে যুগে বিশেষ এক গোষ্ঠির সাধারণ মানুষকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে তুলেছিল। তাদের প্রকাশিত মতামতের মধ্যে তারই সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

আমরা দেখেছি, কৌলীন্য ও বহুবিবাহজনিত সমস্যার বিরুদ্ধে বিগত শতকের দ্বিতীয়ভাগ থেকে সংগঠিত সংগ্রাম দেখা দিলেও তার আগে থেকেই ঐ বিষয়ে সমাজে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষও তাতে অংশ গ্রহণ করেছিল। ১৮৩১ সালে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রে তিন ব্যক্তি "এতদ্দেশীয় যোত্রহীন শ্রোত্রিয় বা কুলশ্রান্ত বংশজ" ব্রাহ্মণদের দুরবস্থার কথা বলেছিলেন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল মন নিয়ে প্রস্তাব দিয়েছিলেন—

"…যদি এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় অজ্ঞান প্রজাগণের প্রতি সানুকুল হইয়া কুলীন মহাশয়দিগের অত্যন্তপযুক্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং অসহ্য যে গর্ব্ব আছে তাহা খর্ব্ব করেন অর্থাৎ তাঁহারদিগের যে যে অন্যায় প্রাধান্য আছে তাহা এককালে রহিতের আইন জারী করেন এবং ঐ আইনে এইরূপ বিধান থাকে যে উক্ত কুলীনেরা শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় আপন ২ স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারের ভরণ পোষণ বিষয়ে কোন ত্রুটি করিতে না পারেন"…

[সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য়)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৩য় সং। পৃঃ ২৪৬]

সে সময় 'সমাচার দর্পণে' এই বিষয়ে লেখা অনেক ব্যক্তির পত্রই মুদ্রিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা একটি পত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পত্রটি রচনা করেছিলেন 'কাচিৎ শান্তিপুর বাসিনী'। অবিবাহিতা কুলীন কন্যার বেদনা প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর পত্রটিতে।

(দ্রঃ তদেব ; পৃঃ ২৫৬-৫৭)

প্রসঙ্গক্রমে 'শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু' 'বঙ্গদেশস্থ ভদ্রসন্তান সমূহে'র যে নিবেদন পত্রটি মুদ্রিত হয়েছিল তাও এখানে উল্লেখযোগ্য। (তদেব ; পৃঃ ২৪৯-৫০) এই পত্রটিতে কৌলীন্য প্রথার অনিষ্টকারী দিকটি তুলে ধরা হয়েছিল। তাঁরা জানিয়েছিলেন, প্রচলিত 'আধুনিক কৌলীন্যরীতি কোন শাস্ত্রসম্মত নয়'। বল্লালীরীতির তাঁরা ঘোর বিরোধী ছিলেন ; তবে নির্মল প্রকৃত কৌলীন্যরীতি বলতে যা বোঝায় পত্র রচয়িতারা তার বিরোধী ছিলেন না।

'বিদ্যাদর্শন' ছিল বিগত শতকের বিখ্যাত প্রগতিবাদী পত্রিকা। ১৭৬৪ শকাব্দের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত ৩য় সংখ্যা 'বিদ্যাদর্শনে' জনৈক গ্রামবাসী গ্রামে বহুবিবাহজনিত দুর্বিষহ অবস্থার উল্লেখ করেছিলেন। 'কুলীন ভার্য্যাগণের পরিত্রাণার্থ' সম্পাদক মহাশয়কে 'যত্নশীল' দেখে পত্রলেখক যে খুশি হয়েছিলেন তাও জানিয়েছিলেন।

বহুবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলন সাধারণ মানুষের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার আরও প্রকাশ ঘটেছিল 'বিদ্যাদর্শনে'। ১৭৬৪ শকের ৫ম সংখ্যা 'বিদ্যাদর্শনে' এক 'কলিকাতা নিবাসিনী বেশ্যা'র পত্র মুদ্রিত হয়েছিল। পত্রদাত্রী কৌলীন্যের নিদারুণ কুফল সম্বন্ধেই মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছিল।

কিন্তু পত্রদাত্রী কি সত্যিই কোন বারবধূ ? সে বিষয়ে সম্পাদক মহাশয়েরও বোধ হয় কিছু সংশয় ছিল। পত্রটির শেষে 'সম্পাদকীয় মন্তব্য' মুদ্রিত হয়েছিল ; সেখানে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল—

"এই পত্রপ্রেরিকা বেশ্যা বা অন্য যে কোন ব্যক্তি হউন, তাহাতে আমারদিগের কোন আপত্তি নাই। আমরা ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করি না তাঁহার যুক্তি এবং অভিপ্রায়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখি। মনোযোগের সহিত এই পত্র পাঠ করিলে বিবেক মনুষ্য দেশের নানা কু-প্রথা এবং তাহার দেদীপ্যমান ঘৃণিত ফল একত্র সন্দর্শন করিতে পরিবেন।"

[সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৩য়)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত; ১৯৬৪। পৃঃ ৫৭২-৩]

সম্পাদকের এই মন্তব্য যথার্থ। তিনি খুব গুরুত্বের সঙ্গে পত্রটির আলোচনাও করেছিলেন।

কৌলীন্য ও বহুবিবাহের পক্ষ সমর্থন করেও সে যুগে অনেক সাধারণ মানুষ নিজ নিজ মত প্রকাশ করেছিলেন। 'হালিসহর পত্রিকা'য় জনৈক পাঠক কৌলীন্যের পক্ষে মত জানিয়ে লিখেছিলেন, "...কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কেহই দুর্ভাগা কুলীনগিগের পক্ষ নন। তারা কি এত অপকৃষ্ট লোক, এতই অকর্মণ্য যে কেহই তাহাদের মত গ্রহণ করেন না।"...

[হালিসহর পত্রিকা—১ম খণ্ড। ১২৭৮, আশ্বিন, ৬ সংখ্যা)

পত্রদাতা অবশ্য বহুবিবাহকে কুপ্রথাই বলেছিলেন, ঐ প্রথাবিলোপের প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আবার একথাও লিখেছিলেন, "কিন্তু এ প্রথা যুগ চতুষ্টয়েই ভারতভূমিতে প্রচলিত; এবং যবনদিগের মধ্যে এই প্রথার প্রাচুর্য্য আছে ইহাতে বঙ্গের কুলীনদিগকে এই প্রথানুগামী বলিয়া ঘৃণা ও দোষী বিচার সঙ্গত নহে।" (তদেব ; পৃঃ ২৫৯—২৬০), বিদ্যাসাগর ও তাঁর বহুবিবাহ সংক্রান্ত গ্রন্থেরও তিনি কিছু সমালোচনা করেছিলেন। পত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পত্রদাতা যেভাবেই তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করুন না কেন, কৌলীন্যের প্রতি আসলে তিনি দুর্বলই ছিলেন—বক্তা 'কস্যচিত্ সত্য-বাদিন :' পরিচয়ে পত্রটি প্রেরণ করেছিলেন।

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাটিতে সে যুগের সামাজিক ঝড-ঝঞ্চার বহু ইতিহাস সঞ্চিত হয়ে আছে। বহুবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলন সাধারণ মানুষকে কিভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল তারও বহু প্রমাণ সেখানে রয়েছে। বিদ্যাসাগর-তারানাথ এঁদের মত বিনিময় এই পত্রিকাতেই জোরদার হয়ে উঠেছিল। আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির কৌলীন্য ও বহুবিবাহ সম্পর্কিত মতামত এখানে মুদ্রিত হয়েছিল;—সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের বক্তব্যও পত্রটিতে স্থান পেয়েছিল।

স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলনেও সাধারণ মানুষ স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠেছিল এবং সে বিষয়ে মতামত জানাতেও তারা এগিয়ে এসেছিল। স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন, প্রসার এবং পাঠ্যক্রম নিয়ে সাধারণ মানুষ অনেক চিন্তাই করে ছিল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ২০ শে আগস্ট সংখ্যা, 'সমাচার দর্পণে' 'কস্যচিৎ হিন্দু

দর্পণ পাঠকস্য' মতামত মুদ্রিত হয়েছিল। পত্রদাতা তাঁর পত্রটিতে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র রক্ষণশীল মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন। 'প্রভাকর' পত্রিকা এবং অন্যান্য ব্যক্তির স্ত্রী-শিক্ষাবিষয়ক বক্তব্যেরও তিনি সমালোচনা করেছিলেন।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে একই পত্রিকায় 'কস্যচিৎ হিন্দোঃ' রচিত আর একটি পত্রে স্ত্রী-শিক্ষা সমর্থন করা হয়েছিল। স্ত্রী-শিক্ষা যে অনিন্দ্য যুক্তির দ্বারা পত্ররচয়িতা তা প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চের 'সমাচার দর্পণে' অপর এক পত্রদাতা স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারে স্বদেশবাসী যত্নবান নয় বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারে সচেষ্ট হবার আহ্বান জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন—

"...আমি স্বদেশীয় মিত্রবর্গের প্রতি এই বিনীতি করি যে ইহার প্রতি-কারক কোন উপায় স্থির করেন এই অকিঞ্চনের বোধে কলিকাতা বরাহনগর পানীয়হাটি চুঁচুড়া শান্তিপুর প্রভৃতি প্রধান২ গণ্ডগ্রামে শিষ্টবিশিষ্ট মান্য ব্যক্তিরদের উচিত যে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া স্ত্রীরদের বিদ্যাভাসার্থ এক২ পাঠশালা স্থাপন করেন। আমি জানি যে এই বিষয়ে অনেকের সম্মতি আছে কিন্তু কেহ অগ্রসর হন না। এক ব্যক্তি ইচ্ছা করেন যে অপর ব্যক্তি আরম্ভ করেন কিন্তু এতদ্রূপ টালমাটাল আর কতকাল পর্য্যন্ত করিবেন। অতএব অতি সাহস পূর্ব্বক আমরা কেহ এইক্ষণে আরম্ভ করি কর্ম্ম উত্তম বটে এবং শ্রীশ্রীপরমেশ্বরের প্রসাদে আরম্ভ করিলেই নিতান্ত সুফল দর্শিতে পারিবে।"

[সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য়)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ; ৩য় সং। পৃঃ ১০০]

পত্ররচয়িতার এই প্রগতিশীল বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন একজন রক্ষণশীল ব্যক্তি। তিনি তাঁর পত্রে বলেছিলেন, "হায় কি অপূর্ব্ব কথা অঙ্গনারা বিদ্যাশিক্ষা করিলে দেশের যে কিসে উপকার দর্শিত তাহা আমার বোধগম্য হয় না যেহেতুক স্ত্রীলোককে সর্ব্বশাস্ত্রেই অবিশ্বাসী ও খল কহিয়াছেন"......

(তদেব ; পৃঃ ১০০)

এই বক্তব্য অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনার পরিপোষক। তবে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণে' (তদেব ; পৃঃ ১০১—১০৪) 'বঙ্গবালাহিতৈষি' জনৈক হুগলিবাসী উদারপন্থী পত্রদাতা ঐ বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কিত আন্দোলন সাধারণ মানুষের মনে যে প্রতিক্রিয়া

সৃষ্টি করেছিল বিগত শতকের আরও অনেক পত্রপত্রিকায় তা' প্রকাশ পেয়েছিল। 'সম্বাদ ভাস্কর' ছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ঐ পত্রিকার ১৮৪৯ সালের ২৯শে মে সংখ্যায় জনৈক পত্রপ্রেরক বেথুন সাহেবের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তার আলোচনা করেছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কেও বক্তব্য রেখেছিলেন। ঐ একই বছরের ৩১শে মে'র 'ভাস্করে' আরও একটি পত্র মুদ্রিত হয়েছিল। বেথুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের কথা ওখানেও আলোচিত হয়েছিল। সে সময় অনেক ব্যক্তি স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী হলেও প্রকাশ্যে মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়াটা পছন্দ করত না। পত্রপ্রেরক তাদের ঐ মনোভাবের বিরোধিতা করেছিলেন। বেথুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা ক'রে তিনি দেশবাসীকে ঐ বিদ্যালয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। [দ্রঃ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২য়)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, ১৯৬৪। পৃঃ ৫১২—১৩]

বেথুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় প্রসঙ্গে আরও অনেক পত্র 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রকাশ করেছিল। ঐসব পত্রে স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে যেমন তেমনি বিপক্ষেও মতামত ব্যক্ত হয়েছিল।

বিগত শতকে যখন মহিলাদের ছাত্রাবাসের প্রয়োজনীয়তার কথা উঠেছিল তখন সাধারণ মানুষ সকলেই তা' সমর্থন করতে পারে নি। ঐ বিষয়ে সাধারণ মানুষ কি চিন্তা করেছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাদের পত্র থেকে সে বিষয়েও অনেক তথ্য জানা যায়।

বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত আন্দোলনও সমাজের মানুষকে বেশ কিছুটা নাড়া দিয়েছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার সাক্ষ্যও রয়েছে। পণপ্রথা নিয়ে সে যুগে কোন জোরদার আন্দোলন গঠনের চেষ্টা করা হয় নি বটে, তবে তা' নিয়েও জনগণ কম ভাবে নি। বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথা বিরোধী আন্দোলন অপেক্ষা সুরাপান বিরোধী আন্দোলন সে যুগে বেশি প্রবল হয়ে উঠেছিল; তবে মদ্যপানের পক্ষে প্রকাশ্যে সোচ্চার হওয়া সাধারণভাবে স্বাভাবিক নয় বলে মদ্যপানের পক্ষে কোন মতামত জানা যায় না। অবশ্য পরিমিত পানের পক্ষে কেউ কেউ মতামত জানিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ পানের বিরোধিতাই তখন সমাজে প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। জাতিভেদ সংক্রান্ত আন্দোলনের প্রভাব জনচিত্তকে খুব একটা আলোড়িত করে তোলে নি—ঐ আন্দোলন প্রধানতঃ ব্রাহ্মসমাজেই ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বীদের

তা খুব একটা সাড়া জাগায় নি। হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা নিয়েও সামান্য আন্দোলন দেখা দিয়েছিল; কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে তা জড়িত ছিল না। এইজন্যে জনচিত্তে ঐ আন্দোলনের প্রভাবও তেমন দেখা যায় নি। তবে কেউ কেউ যে ঐ বিষয়ে ভাবেন নি তাও নয়। ১২৯৩ সালে 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত একটি পত্রে সাধারণ মানুষের সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক চিন্তাধারার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়—

"বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা শাস্ত্রসম্মত ইহা ভটপল্লি, নবদ্বীপ, কলিকাতা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানের অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পতিতোদ্ধার গ্রন্থে ইহার বিশেষ স্বপ্রমাণ হইয়াছে।"

[সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৪র্থ); ১৯৬৬।—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত; পৃঃ ৩৭১]

এতক্ষণ যে আলোচনা করা গেল তা'র পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে যে সব সমাজসংস্কার আন্দোলন দেখা দিয়েছিল দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার কমবেশি যোগাযোগ ছিলই। যোগাযোগ না থাকলে কোন রকম আন্দোলনই গড়ে তোলা যেতো না।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলি বাঙালী মনকে আলোড়িত করেছিল নিঃসন্দিগ্ধভাবে। কিন্তু প্রশ্ন এখানে, ঐ আন্দোলনগুলি কি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের মনকে ভাবিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল? তাদের সামাজিক সমস্যার সঙ্গে ঐ আন্দোলনগুলির কি কোন যোগসূত্র স্থাপিত হতে পেরেছিল?

প্রথমে সতীপ্রথা নিবারণ আন্দোলনের কথাই বলা যাক। বাংলাদেশে এই প্রথা প্রধানতঃ উচ্চবর্ণের হিন্দু মহিলাদেরই মধ্যে প্রচলিত ছিল, নিম্নবর্ণের নারীর ক্ষেত্রে ঐ প্রথা মানার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তাছাড়া নিম্নবর্ণের হিন্দু মহিলাদের মধ্যে বিধাববিবাহও প্রচলিত ছিল। এই জন্যেও 'সতী' হবার প্রশ্ন সেখানে সমস্যা ছিল না। এই কারণে বলা যায়, সহমরণ সংক্রান্ত আন্দোলনে তাদের সমস্যা স্থান পাবার কথা নয়।

বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলনেও তাই ঘটেছিল। আগেই বলা হয়েছে, নিম্নবর্ণের নারী বিধবা হবার পর ইচ্ছে করলেই বিবাহ করতে পারতো। বস্তুতঃপক্ষে উচ্চবর্ণের নারীর কাছেই বৈধব্য ছিল সমস্যা। সমাজ-সংস্কারকেরা সেই সংস্যার সমাধানেই এগিয়ে এসেছিলেন।

কৌলীন্য ও তজ্জনিত বহুবিবাহ-প্রথার বিলোপ আন্দোলনেও, বলাবাহুল্য, উচ্চবর্ণ মানুষেরই স্বার্থ জড়িত ছিল; তবে স্ত্রী-শিক্ষা সংক্রান্ত আন্দোলনে মোটামুটি সর্বশ্রেণীর নারীর শিক্ষার কথাই উঠেছিল। অবশ্য কার্যক্ষেত্রে ইতর শ্রেণীর নারীর সঙ্গে ভদ্রশ্রেণীর নারীর একত্রে অধ্যয়নের কথা বা প্রথা অনেকেরই ভালো লাগে নি; কিন্তু সে যাই হোক, নিম্নবর্ণের মেয়েদের লেখাপড়ার কথা স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলনে অনালোচিত ছিল না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের প্রথম দিকে, বিশেষ করে মিশনারী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের মেয়েরাই প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে এগিয়ে এসেছিল। উচ্চবর্ণের সম্ভ্রান্ত ঘরের অভিভাবকেরা তখন তাদের ঘরের মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে পাঠাতে চায় নি।

কিন্তু তবুও বলতে হয়, স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলনে সকল শ্রেণীর মেয়েদের লেখাপড়ার কথা ভাবা হলেও উচ্চবর্ণের মেয়েদের শিক্ষার ওপরই জোর দেওয়া হয়েছিল বেশি। বাল্যবিবাহ ও কন্যাপণ-কন্যাবিক্রয় সমস্যা কিন্তু দেশের সকল মানুষেরই সমস্যা ছিল। সুরাপানও সকল বর্ণের মানুষের কাছে অভিশাপ হয়ে উঠেছিল। জাতিভেদ তো একটি বিরাট জাতীয় সমস্যাই ছিল। জাতিভেদের কণ্টক সমগ্র বাঙালী জাতির বুকখানিকেই ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল। সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক আন্দোলনে আবার বৃহত্তর কোন গোষ্ঠীরই সমস্যা প্রাধান্য পায় নি। সমুদ্রযাত্রা বা বিদেশযাত্রা তখন আর কজনের পক্ষেই বা সম্ভবপর ছিল! কাজেই সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক আন্দোলনে বিশেষ এক গোষ্ঠীর সমস্যা দূর করবারই চেষ্টা করা হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলবার আছে। বিগত শতকে যাঁরা সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলির প্রধান নেতা ছিলেন তাঁরা কিন্তু কেউই নিম্নবর্ণের মানুষ ছিলেন না। তা হওয়া অবশ্য তখন সম্ভবপরও ছিল না। কেননা নিম্নবর্ণের মানুষ বহুদিন থেকেই সমাজে লাঞ্ছিত হয়ে আসছিল; মানবিক অধিকার থেকেই তারা বঞ্চিত ছিল। এহেন অবস্থায় সমাজ আন্দোলনের নেতা হবার মতো লোক স্বাভাবিক ভাবেই তাদের মধ্যে দেখা যায় নি।

বস্তুতঃপক্ষে, উনবিংশ শতাব্দীতে যে জাগরণ দেখা দিয়েছিল তা' ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই জাগরণ। ঐ যুগের সামাজিক আন্দোলনের নেতাও ছিলেন তাই সেই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক অর্থাৎ সতীদাহ বিষয়ক রামমোহন রচিত প্রথম পুস্তকের প্রকাশকাল (১৮১৮) থেকে শুরু করে ঐ শতকেরই শেষভাগ পর্যন্ত সমাজের বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সব বিতর্ক-পুস্তক বা প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল তাদের সংখ্যা আমাদের বিস্মিত করে। অবশ্য ঐ সব পুস্তক বা প্রবন্ধের অনেকগুলিই আজ লুপ্ত ;—কোন কোনটিবা বিলুপ্তির মুখে। কিন্তু তবুও যে সব পুস্তক ও প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তাদের সংখ্যাও অনেক। ঐ সব রচনার বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিভিন্ন রচয়িতা বিচিত্র যুক্তি আর আঙ্গিকে আপনআপন বক্তব্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে।

সহমরণ বিষয়ক বিতর্কপুস্তকাদির বক্তব্যধারার অনুসন্ধানই করা যাক সর্বাগ্রে।

ঃঃ সতীপ্রথা বিষয়ক বিতর্করচনা ঃঃ

বাংলা বিতর্কপুস্তকের পথিকৃৎ হিসেবে রামমোহন রায়ের 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১৮১৮) পুস্তিকাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক। সাহিত্যিক মূল্যও তার কম নয়। আলোচ্য পুস্তিকাটিতে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে রামমোহন সতীদাহের নিষ্ঠুরতা ও অপ্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছিলেন। নিবর্তক ছিলেন রামমোহনেরই বক্তব্যের বাহক। সতীদাহের পক্ষপাতী ব্যক্তিদের নিবর্তক "স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ দাতা" রূপে অভিযুক্ত করেছিলেন। ঐ অভিযোগের জবাবে প্রবর্তক অঙ্গিরা, ব্যাস, বিষ্ণুর বচন ও ব্রহ্মপুরাণের বক্তব্য উদ্ধার করে সহমরণ-অনুমরণের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতি ও বেদবচন অনুসারে মনুই একমাত্র মান্য প্রমাণ করে নিবর্তক মনুর বিধবাদের ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশকেই বরণীয় রূপে ঘোষণা করেছিলেন। যুক্তিটির মধ্যে বলিষ্ঠতা খুব স্পষ্ট।

রামমোহন মনে করতেন, সহমরণ আসলে স্ত্রীলোকের 'কামনামূলক

আত্মহনন'। এই আত্মহনন আদৌ শাস্ত্রসম্মত নয়। তাঁর মতে কামনামূলক কোন আচরণই যথার্থ উন্নত ধর্ম আচরণ বলে গণ্য হতে পারে না। কঠোপনিষদের বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে নিবর্তকের মুখে রামমোহন তাই বলেছিলেন—

"শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষসাধন যে জ্ঞান সে পৃথক্ হয় আর প্রেয় অর্থাৎ প্রিয়-সাধন যে কর্ম্ম সেও পৃথক্ হয় ঐ জ্ঞান আর কর্ম্ম ইহারা পৃথক২ ফলের কারণ হইয়া পুরুষকে আপন২ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেন এই দুয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞানের অনুষ্ঠান করে তাহার কল্যাণ হয় আর যে কামনা-সাধন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে পরম পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়।"

[রামমোহন গ্রন্থাবলী (৩য় ; ৩য় সং)—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত ; পৃঃ ৭]

এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি আরও শাস্ত্রীয় নজীর উদ্ধার করেছিলেন।

সহমরণ সম্পর্কে শাস্ত্রীয় নির্দেশ যা' আছে তাতে নারীকে জোর করে জলন্ত চিতায় দগ্ধ করবার কোন কথা নেই। প্রকৃত সহগমন ছিল নারীর স্বেচ্ছাধীন। নিবর্তক অর্থাৎ রামমোহন তাই বলেছিলেন, ঐ নির্দেশের অন্যথা হলেই তা স্ত্রী-হত্যা বলে গণ্য হবে।

দেখা যায়, স্বামীর মৃত্যুর পরে শোকগ্রস্তা স্ত্রী সহগমনের সংকল্প গ্রহণ করলেও চিতার আগুনে ভয় পেয়ে অনেক সময় সংকল্পচ্যুতা হতো। কিন্তু সংকল্পভ্রষ্টা হলে অমঙ্গল হবে ভেবে ঐ নারীর আত্মীয়স্বজনেরা তাকে জোর করে জলন্ত চিতায় ঠেলে দিতো। নিবর্তক বলেছিলেন, 'প্রাজাপত্য ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত' করলে ঐ সংকল্পচ্যুতির পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ঐ প্রায়শ্চিত্ত করবার সামর্থ্য না থাকলে 'এক ধেনু মূল্য তিন কাহন কড়ি উৎসর্গ' করলেও ঐ প্রায়শ্চিত্তের ফল পাওয়া যাবে। অতএব সংকল্পভ্রষ্টা নারীকে জোর করে চিতায় তুলে না দিলে অমঙ্গল হবে এমন কোন কথা নেই। তাকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করালেই অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে। নিবর্তকের এ যুক্তি শাস্ত্রীয়ও বটে, মানবিকও বটে।

অনেকে সতীপ্রথাকে দেশাচার হিসেবে পালনীয় মনে করত। নিবর্তকের মুখে রামমোহন ঐ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "......কোনো ব্যক্তি যাহার লোকভয় ও ধর্ম্মভয় আছে সে এমত কহিবেক না যে পরম্পরাপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রীবধ মনুষ্যবধ ও চৌর্য্যাদি কর্ম্ম করিয়া মনুষ্য নিষ্পাপে থাকিতে পারে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ পরম্পরাকে মান্য করিলে বনস্থ এবং পর্ব্বতীয় লোক যাহারা২ পরম্পরায় দস্যুবৃত্তি

করিয়া আসিতেছে তাহাদিগ্যে নির্দোষ করিয়া মানিতে হয় এবং এ সকল কুকর্ম্ম হইতে তাহাদিগ্যে নিবর্ত্তকরণে প্রয়াস পাওয়া উচিত হয় না”……

(তদেব ; পৃঃ ১০)

রক্ষণশীল মানুষেরা সে সময় সতীপ্রথার পক্ষে একটি অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে থাকতো। তারা বলতো, বিধবানারীর পক্ষে ব্যভিচারিণী হবার সম্ভাবনা বেশি থাকায় তাদের সহমৃতা হওয়াই মঙ্গলজনক। রামমোহন নিবর্তকের মুখে তৎকালীন মানুষের এই হাস্যকর যুক্তির বিরুদ্ধে বলেছিলেন, ভাবী আশঙ্কার বিলোপ সাধনের জন্যে স্ত্রীবধ করার কোনই যুক্তি নেই ; ব্যভিচারিনী হলে নারী স্বামী বর্তমানেও হতে পারে। অবশ্য এ কথা ঠিক, স্বামী অবর্তমানে নারীর ব্যভিচারিনী হবার সম্ভাবনা বেশিই ; কিন্তু তাই বলে ব্যভিচারিনী হলেও হতে পারে এই কথা ভেবে মৃত্যুর মুখে তাকে ঠেলে দেওয়া কোন সুস্থ ব্যবস্থা নয়।

রামমোহনের সহমরণ সংক্রান্ত পুস্তিকাটির প্রচারের পরে রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে খুব প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। ঐ প্রতিক্রিয়ারই ফলে কাশীনাথ তর্কবাগীশ রচনা করেছিলেন ‘বিধায়ক-নিষেধকের সম্বাদ।’ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকা এই পুস্তকটি সম্বন্ধে জানিয়েছিল—

“সম্প্রতি দুইতিন বৎসর হইল মোং কলিকাতার হিন্দুদের শাস্ত্রসিদ্ধ সহমরণের বিষয়ে কেহ ২ প্রতিবাদী হইয়াছেন তন্নিমিত্ত কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কালাচান্দ বসুজা এক নূতন পুস্তক রচনা করিয়া ছাপাইয়াছেন। সে পুস্তকে সহমরণ নিষেধকের কথা ও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন আছে এবং বাঙ্গালা ভাষাতে তাহার তর্জমা আছে এবং সেই বিষয়ের ইংরাজী ভাষাতে পৃথক এক কেতাব অতি সুন্দর রূপে তর্জমা।”……

[সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম , ৩য় সং)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ; পৃঃ ৬৯]

এই বক্তব্যে একটু তথ্যগত ভুল রয়েছে। এখানে কালাচাঁদ বসুকেই ঐ পুস্তকটির রচয়িতা বলা হয়েছে। পুস্তকটিতে অবশ্য রচয়িতার নাম নেই ; তবে সেটি যে কালাচাঁদের রচনা নয় তার প্রমাণ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন ইংরেজী পত্রিকা “Friend of India”-র কিছু অংশ উদ্ধার করছি—

‘On the burning of widows

……a small work in defence of this practice just published

in quarts without name or date; but a manuscript note on the first blank leaf informs us that it is published by Cassee-nath turkubagish, by the desire of Calachund-bhose."…

[রামমোহন-গ্রন্থাবলী (৩য়; ৩য় সং)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত; পৃঃ ১৩]

পুস্তকটির 'first blank leaf'-এ নিম্নলিখিত বক্তব্যটিও লিপিবদ্ধ ছিল—

"নত্বাশ্রীশংবিরচিতং শ্রীকাশীনাথশর্ম্মণা।

আদেশাদতুল শ্রীল কালাচাঁদবসোরিদং॥" (তদেব; পৃঃ ১৩)

বইটি আসলে কালাচাঁদ বসুর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষণায় কাশীনাথ তর্কবাগীশই রচনা করেছিলেন।

কাশীনাথ তর্কবাগীশ রামমোহনের মত তাঁর পুস্তকও প্রশ্ন ও উত্তরের রীতিতে রচনা করেছিলেন। পুস্তকটিতে সহমরণাদির "নিষেধক" রামমোহনের যুক্তির বিরুদ্ধে তার "বিধায়ক" কাশীনাথ আপনার বক্তব্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন।

রামমোহন বিষ্ণুঋষির "মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণম্বেতি" বচনের অর্থ করেছিলেন নিম্নরূপ—

"পতি মরিলে পত্নী ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন কিম্বা পতির চিতাতে আরোহণ করিবেন"। (তদেব; পৃঃ ৪)

রামমোহন বেদের 'তস্মাত্ব হন পুরায়ুষঃ স্বঃ কামী প্রেয়াদিতি' এই বচন এবং মনুস্মৃতির নির্দেশ মান্য করে বিধবার ব্রহ্মচর্যেরই বিধান মেনে নিয়েছিলেন এবং বিষ্ণু ঋষির বচনের 'বিকল্প' ব্রহ্মচর্যেরই সমর্থন করেছিলেন।

কাশীনাথ কিন্তু তাঁর পুস্তকে রামমোহনের ঐ ব্যাখ্যার বিরোধিতা করে বলেছিলেন, "ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে পর স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য করিবেন কিম্বা জ্বলচ্চিতারোহণ করিবেন। এমন অর্থ করিলে ইচ্ছা বিকল্প হয় তাহাতে অষ্টদোষ শাস্ত্রে কহিয়াছেন অতএব অষ্টদোষে দুষ্ট যে ইচ্ছাবিকল্প তাহাকে ত্যাগ করিয়া ব্যবস্থিত বিকল্প গ্রাহ্য করিতে হবেক তাহাতে অর্থ এই যে জ্বলচ্চিতারোহণে অসমর্থা যে স্ত্রী সে ব্রহ্মচর্য্য করিবেক এই অর্থেরি গ্রাহ্যতা।" (তদেব; পৃঃ ১৬)

মনুস্মৃতিই মান্য—অন্য শাস্ত্র মান্য নয়, রামমোহনের এই বক্তব্যও তিনি মানতে চান নি। তিনি বলেছিলেন, স্মৃতিতে স্মৃতিতে বিরোধ ঘটলেই মনুস্মৃতি মান্য। কিন্তু শ্রুতি আর স্মৃতির মধ্যে যদি বিরোধ ঘটে তাহলে সেখানে শ্রুতি

গ্রাহ্য। তিনি দেখিয়েছিলেন, ঋগ্বেদের 'ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু। অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে ॥'* এই বচনে সহমরণের পক্ষতা করা হয়েছে ; সুতরাং এক্ষেত্রে মনুস্মৃতির বক্তব্য পরিত্যাজ্য। অবশ্য কাশীনাথ একথাও বলেছিলেন, কোন কারণে অসমর্থা হলে বিধবা ব্রহ্মচর্যেও জীবন অতিবাহিত করতে পারে ; তবে তা নেহাতই ব্যতিক্রম ছাড়া আর কিছু নয়।

রামমোহন কিন্তু সহমরণবিষয়ক তাঁর প্রথম পুস্তকে বলেছিলেন, ঐ বচনে সহমরণকে কামনামূলক ধর্মাচরণ বলা হয়েছে এবং ঐ ধরণের আচরণ উন্নত ধর্মাচরণের পর্যায়ে পড়ে না।

কাশীনাথ কিন্তু মানতে চান নি, কামনামূলক আচরণ হিসেবে সহমরণ নিন্দনীয়। এই প্রসঙ্গে কাশীনাথ প্রদত্ত যুক্তিটি বেশ জোরালো—

"……স্বর্গকামনা থেকে সহমরণাদিরূপ আয়ুর্ব্যয় করিবেক মুমুক্ষু হয় যদি তবে স্বর্গকামনা পূর্ব্বক আয়ুর্ব্যয় করিবেক না এইরূপ ব্যবস্থিত বিকল্প হইল। এবং তোমার পঠিত শ্রুতি মুমুক্ষু প্রকরণীয় এ প্রযুক্ত তাহার অর্থ এই হয় যে মুমুক্ষু ব্যক্তি স্বর্গকামনা করিয়া মরিবেক না অতএব স্বর্গকামীর সহমরণাদি কোনরূপে নিষিদ্ধ নহে।"… (তদেব ; পৃঃ ১৮)

সহজ ভাষায় বলা যায়, মুমুক্ষু ব্যক্তি স্বর্গকামনা করে মৃত্যুবরণ করবে না ঠিকই, কিন্তু বিধবা রমণী স্বর্গকামনা করে যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে ক্ষতি কি! নিছক যুক্তি হিসেবেই যদি দেখা যায়, তাহলে এ যুক্তি দুর্বল নয়।

রামমোহন বলেছিলেন, 'মোক্ষসাধন যে জ্ঞান' এবং 'প্রিয়সাধন যে কর্ম্ম' এ দুয়ের মধ্যে 'জ্ঞানের অনুষ্ঠান' করাই কল্যাণকর। কামনা সাধনক্ষম কার্যের অনুষ্ঠান করা হলে ঐ কার্যের অনুষ্ঠাতা 'পরমপুরুষার্থ' লাভে বঞ্চিত হয়। অতএব কামনামূলক কাজ সহমরণাদিতেও পুরুষার্থ লাভ হয় না। তিনি বিধবার নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য পালনের কথাই বলেছিলেন। কিন্তু কাশীনাথ দেখিয়েছিলেন, বিধবার নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য বলতে যা বোঝানো হয়েছে তাও আসলে নিষ্কাম নয়। তাঁর বক্তব্য, সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য দুই-ই কামনামূলক কার্য ; তবে ঐ দুয়ের মধ্যে সহমরণই প্রশস্ত।

* এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, রামমোহন ও কাশীনাথ দু'জনেই এই বচনের সঠিক পাঠ 'যোনিমগ্রে'র স্থলে 'যোনিমগ্নেঃ' এই ভুল পাঠ গ্রহণ করেছিলেন।

"পরন্তু বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষায় স্ত্রীর সহমরণ অনুমরণে অতিশয় ফল যেহেতু ইহাতে ব্রহ্মঘ্ন কিম্বা কৃতঘ্ন কিম্বা মিত্রঘ্ন যে পতি সেও নিষ্পাপ হয় এবং নরক হৈতে মুক্ত হয় এবং ত্রিকুল পবিত্র হয় এবং স্ত্রী শরীর হৈতে মুক্ত হয় অতএব এই সহমরণ অনুমরণ বিষয়ে অধিক প্রয়াস।" (তদেব ; পৃঃ ২০)

এখানে শাস্ত্রীয়যুক্তি দিয়ে ব্রহ্মচর্য ও সহমরণ উভয়কেই সকাম কার্যরূপে প্রতিষ্ঠা করবার মধ্যে কাশীনাথের যুক্তিবিন্যাস প্রশংসনীয় হয়েছে ; কিন্তু তবুও বলবো তাঁর উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তে রক্ষণশীলতার অন্ধতাই ধরা পড়েছে ; কেননা কাশীনাথও তার পুস্তকে জানিয়েছিলেন, সকাম শাস্ত্র নিন্দনীয় ; কাজেই বিধবার ব্রহ্মচর্য এবং সহমরণ সকাম হওয়ায় উভয়কে নিন্দা করাই তাঁর উচিত ছিল ; কিন্তু তা না করে ঐ দুয়ের মধ্যে যেটিতে বেশি কামনা সাধিত হয় সেই সহমরণকেই তিনি সমর্থন করেছিলেন।

রামমোহন বলেছিলেন, ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাসের মাধ্যমে বিধবানারী মুক্তি লাভে সমর্থ হয়, সহমরণে যা সম্ভব নয়। কিন্তু কাশীনাথ একথা মেনে নেন নি ; কেননা তার মতে জ্ঞানাভ্যাসে নারী অক্ষম।

কাশীনাথের এই মনোভাবের মধ্যে রক্ষণশীলতাই প্রকট হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে জ্ঞানবতী নারীর দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও এই কথা বলায় বোঝা যায়, তিনি রক্ষণশীলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। তিনি যদি একথাও বলতেন, যে সব নারী ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যাসের উপযুক্ত তারাই জ্ঞানাভ্যাসের পথে যেতে পারে, আর যারা অনুপযুক্ত তারা ভিন্ন পথেই চলবে তাহলেও তাঁকে অনেকখানি উদার মনোভাবাপন্ন বলা যেতে পারতো। কিন্তু তা তিনি বলেন নি। পরম্পরাগত কার্য মেনে চলা উচিত কিনা সেই প্রসঙ্গে ব্যক্ত রামমোহন-বক্তব্যেরও তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর মতে পরম্পরাগত কার্য বলতে শিষ্টব্যক্তির কার্যই বোঝায় এবং তা মেনে চলাই বিধেয়।

জলন্তচিতায় বল পূর্বক নারীকে বন্ধনাদির পর দাহ করা নিন্দনীয় কাজ রামমোহনের ঐ বক্তব্যের বিরুদ্ধেও কাশীনাথ মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। হারীতের বচন উদ্ধার করে তিনি বলেছিলেন, স্ত্রীশরীর পরিপূর্ণভাবে দগ্ধ না হলে শরীর থেকে নারীর মুক্তি ঘটে না। এই জন্যেই ঐ বন্ধনাদির প্রয়োজন। কাশীনাথের এই উত্তরে যুক্তির দুর্বলতা খুবই স্পষ্ট

কাশীনাথের প্রতিবাদের মধ্যে রামমোহন মেনে নেবার মতো কোন যুক্তিই খুঁজে পান নি। সেই কারণেই 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' গ্রন্থের প্রতিবাদে

এগিয়ে এসেছিলেন তিনি এবং রচনা করেছিলেন 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' গ্রন্থটি। রামমোহনের এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে।

কাশীনাথ তাঁর গ্রন্থে বিষ্ণুর 'মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণংবেতি' বচনের রামমোহন কৃত ব্যাখ্যা সমর্থন করেন নি। রামমোহন ঐ বচনের প্রতিটি শব্দের অর্থ নির্ণয় করে আলোচ্য গ্রন্থে কাশীনাথকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর নির্ণীত অর্থই যথার্থ। রামমোহন এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করে এখানেও বলেছিলেন, কাম্যকর্মে মোক্ষলাভ হয় না।

কাশীনাথ বলেছিলেন, বিধবানারীর পক্ষে সহমরণ বা অনুমরণই প্রশস্ত। রামমোহন তার প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অঙ্গিরার বক্তব্য, সহমরণ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম ; বিষ্ণুঋষির বক্তব্য, বিধবা হয় ব্রহ্মচর্য পালন করবে নয় জলন্তচিতায় আরোহণ করবে। এই দুই বক্তব্যের বিরোধিতা মীমাংসা করতে গিয়ে রঘুনন্দন বলেছিলেন, অঙ্গিরার বক্তব্যে আসলে সহমরণের প্রশংসাই করা হয়েছিল। এই বক্তব্যের মধ্যদিয়ে রামমোহন বলতে চেয়েছিলেন, সহমরণই যে বিধবা নারীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ আচরণ তা নয়। রামমোহন মনুবচনের ওপর জোর দিয়ে বিধবার ব্রহ্মচর্যপালনের নির্দ্দেশই মেনে নিয়েছিলেন।

ঋগ্বেদের বচন উদ্ধার করে কাশীনাথ যে বক্তব্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন তার বিরুদ্ধেও রামমোহন বক্তব্য রেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, যারা 'অতি মূঢ়মতি কামাসক্ত' তারাই ঐ শ্রুতিবচনের নির্দেশ মেনে চলতে পারে ; কিন্তু তা শ্রেয়স্কর নয়।

কাশীনাথ তাঁর পুস্তকে বলেছিলেন, বিধবার ব্রহ্মচর্যও নিষ্কাম নয়। রামমোহন তার বিরুদ্ধে বলেছিলেন, একই কাজ নিষ্কাম ও সকাম দুই মন নিয়ে করা যেতে পারে। 'ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্মকে' তাই কেউ স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় নিষ্পন্ন করতে পারে ; আবার 'কোন ব্যক্তি কামনার ত্যাগ পূর্ব্বক উহার অনুষ্ঠান করিয়া মুক্তিপদকে ক্রমশঃ প্রাপ্ত হয়।' (তদেব ; পৃঃ ৫৪)। অবশ্য মনু বচনে ব্রহ্মচর্যকে যে কামনামূলক বলা হয় নি রামমোহন তাও আলোচনা করেছিলেন।

কাশীনাথ তর্কবাগীশ নিষ্কাম কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েও সকাম সহমরণকে বরণীয় মনে করেছিলেন ; কেননা তাতে 'ত্রিকুল পবিত্র হয়', 'মহা-পাতকী' স্বামীরও মুক্তি ঘটে থাকে। রামমোহন তার জবাবে বলেছিলেন, সকাম অনুষ্ঠানকে নিন্দনীয় স্বীকার করে নিয়েও তার পক্ষতা করা ঠিক নয়।

রামমোহন আরও বলেছিলেন, সহমরণে যা সিদ্ধ হয় বলা হয়েছে তা অন্য ক্রিয়ানুষ্ঠানেও সম্ভবপর। সুতরাং এর জন্যে কষ্টকর সহমরণের কোন প্রয়োজন নেই। যুক্তিটি খুবই বলিষ্ঠ।

নারীজাতি জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা মোক্ষসাধনের অযোগ্য কাশীনাথের ঐ বক্তব্যেরও বিরোধিতা করেছিলেন রামমোহন। কাশীনাথ নারীর পক্ষে জ্ঞানপথ সুগম বা বাঞ্ছনীয় নয় আলোচনায় গীতার উক্তি উদ্ধার করেছিলেন; কিন্তু তাঁর ঐ উক্তি ব্যাখ্যার ত্রুটি দেখিয়ে রামমোহন বলেছিলেন, জ্ঞানমার্গের কথায় পঞ্চমুখ গীতায় নিষ্কামকর্মীর বুদ্ধিভেদ না করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ তাকে কর্মের কথা বলে বিপথগামী না করতে বলা হয়েছে। জ্ঞানের পথই শ্রেষ্ঠ— তার মধ্য দিয়েই মোক্ষসাধন সম্ভব হয়, একথা গীতারই প্রতিপাদ্য; তাই গীতা কি করে স্বমতের বিরোধিতা করবে!

সহমরণবিষয়ক প্রথম পুস্তকে রামমোহন বলেছিলেন দেশাচার হিসেবেও সহমরণ সমর্থনযোগ্য নয়। কাশীনাথ তার বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু রামমোহন তাঁর বিরোধিতাকে অসার প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। কাশীনাথ শিষ্টব্যক্তির আচরণমাত্রই মান্য বলে মনে করেছিলেন; এবং সহমরণ তাঁর কাছে শিষ্টব্যক্তির শিষ্ট আচরণ বলেই গণ্য হয়েছিল। রামমোহন কাশীনাথের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন, "দুষ্টতা ও শিষ্টতা, ব্যক্তির ক্রিয়া দ্বারা নিশ্চিত হয়, সর্ব্বশাস্ত্র নিষিদ্ধ এবং সর্ব্বযুক্তি বিরুদ্ধ যে বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ তাহা পুনঃ ২ করিয়া এ দেশীয় লোক যদি শিষ্ট মধ্যে গণিত হইলেন, তবে ইতর মনুষ্যাদি বধ যাহা পর্ব্বতীয়েরা ধনলোভে অথবা তাহারদের বিকট দেবতারদের তুষ্টির নিমিত্ত করে, ইহাতে তাহারা অতি শিষ্টের মধ্যে কেন না গণিত হয়?" (তদেব; পৃঃ ৪০)

কাশীনাথ রামমোহনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে বলেছিলেন, যেহেতু পরিপূর্ণ দগ্ধ না হলে দেহ থেকে নারীর মুক্তি ঘটবে না সেই হেতুই মৃত স্বামীর চিতায় নারীকে বন্ধনাদি করা হয়। যারা দাহ ও বন্ধনাদি কার্য সম্পন্ন করে, আপস্তম্বের মতানুসারে তারাও পুণ্য অর্জন করে থাকে।

রামমোহন তার জবাবে বলেছিলেন, বিধবাকে তো সামান্য দড়ি দিয়েই বাঁধা হয়, সে দড়ি দগ্ধ হলে নারীর মৃত্যুর আগেই ভস্ম হয়ে যায়; তাহলে শরীরের অংশবিশেষ পতিত হবার সম্ভাবনা তো থেকেই যায়। বস্তুতঃ কাশীনাথ স্বীকার করতে চান নি যে, আগুনের ভয়ে বিধবার চিতা থেকে পালিয়ে যাবার

সম্ভাবনা দূর করবার জন্যেই বন্ধনাদি কাজ সমাধা করা হয়। এই জন্যে কাশীনাথ হারীতবচনের অপব্যাখ্যা করে ঐ বন্ধনাদির আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের কথা বলেছিলেন।

কাশীনাথ রামমোহনের সহমরণ বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থের কোন জবাব দেন নি। তবে রামমোহকে তারপরেও অপর দু'জনের সঙ্গে সহমরণ বিষয়ে মসীযুদ্ধ করতে হয়েছিল। 'বিপ্র' এবং 'মুগ্ধ বোধ ছাত্র' নামে দুজন ছাত্র সহমরণ সংক্রান্ত রামমোহনের কোন কোন মতের বিরোধিতা করে তৎকালীন কোন সংবাদপত্রে দুটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। অনুমিত হয়, সংবাদপত্রটি 'সমাচার চন্দ্রিকা'। কিন্তু গবেষকেরা বহু অনুসন্ধানেও আজ পর্যন্ত দুজনের লেখা ঐ চিঠিদুটি খুঁজে পান নি।

যাইহোক, রামমোহন ঐ পত্রদুটির জবাব দিয়েছিলেন। বিপ্র নামধেয় ব্যক্তি তাঁর পত্রে গীতার কাম্য ও নিষ্কাম কর্মের প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন; কিন্তু সেসব প্রশ্নের মধ্যে তার গভীর চিন্তা ছিল না বলেই মনে হয়। বিপ্রের কোন একটি প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন যা বলেছিলেন তা'থেকে বোঝা যায়, সমাজে সকাম লোকের সংখ্যা বেশি হওয়ায় কাম্যকর্মের নিন্দা করা ঠিক নয় বলেই বিপ্র মনে করেছিলেন। কাম্যকর্ম সহমরণ এই কারণেই তাঁর কাছে বরণীয় বলে মনে হয়েছিল; কিন্তু রামমোহন তাঁর এই বক্তব্য সমর্থন করেন নি। তিনি তাই বলেছিলেন, "...লোকের যে ভাগ অধিক সেই ভাগ যদি উত্তমরূপে গণনীয় হয়, তবে স্ববৃত্তিস্থিত ব্রাহ্মণ হইতে এ ভারতবর্ষে স্ববৃত্তি ত্যাগী ব্রাহ্মণ অত্যন্ত অধিক, এ মতে স্ববৃত্তি ত্যাগ কি উত্তমরূপে গণিত হইবেক।" (তদেব; পৃঃ ৫২)

বিপ্র রামমোহনকে একটি হাস্যকর প্রশ্ন করেছিলেন। কামনাবিহীন হয়ে সহমরণে গেলে তাতে নিষ্কাম কর্মজনিত চিত্তশুদ্ধি সম্ভবপর কিনা। রামমোহন তার জবাবে বলেছিলেন, স্বামীর সঙ্গে একত্রে স্বর্গবাস করা যাবে সেই কামনা "ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকের আত্মহত্যাতে প্রবৃত্তি কদাপি হইতে পারে না, সুতরাং প্রবৃত্তির অভাবে শরীরদাহ ক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই।" (তদেব; পৃঃ ৫৩)

প্রসঙ্গক্রমে রামমোহন খুব সুন্দর যুক্তির মাধ্যমে বলেছিলেন, সহমরণের মত কর্মের দ্বারা 'আত্মার পীড়াই' ঘটে থাকে; সহমরণ এই জন্যে 'তামস' ব্যাপার। ঐ 'তামস' কর্ম যে করে তার গতি উর্দ্ধমুখী হয় না। গীতার বাক্যের সাহায্যেই তিনি সে কথা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কিন্তু বিপ্রের একটি প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন ঠিক বলিষ্ঠ যুক্তি দিতে পেরেছেন বলে মনে হয়নি। বিপ্র বলেছিলেন, গীতায় কাম্যকর্মের নিন্দা করা হলে ভগবান "যুধিষ্ঠিরাদি যে কাম্য কর্ম্ম করিয়াছেন তাহার অনুকূল কিরূপে ছিলেন।" রামমোহন তাঁর উত্তরে জানিয়েছিলেন, "বিধিনিষেধাত্মক ভগবানের আজ্ঞানুসারে কর্ম্মকর্ত্তব্য এবং অন্যকেও সেই আজ্ঞানুরূপ উপদেশ করা কর্ত্তব্য "ঈশ্বরাং বচঃ সত্যমিত্যাদি" ইহাতে যদি বিপ্রনামা ভগবানের বিধিনিষেধ বাক্যকে অতিক্রম করিয়া ভগবান যেং কর্ম্ম করিতে অনুকূল ছিলেন তদনুরূপ কর্ম্ম করিতে পাণ্ডব প্রভৃতির ন্যায় উদ্যুক্ত হইলেন, তবে ইহারপর অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ মাতুলকন্যা সুভদ্রাকে অর্জ্জুন ভগবানের আনুকূল্যতায় বিবাহ করিয়াছেন এই নিদর্শনে স্ব-শিষ্যের প্রতি এইরূপ ব্যবহারের উপদেশও দিতে সমর্থ হইবেন।"

(তদেব ; পৃঃ ৫৫)

বিপ্রকে ব্যঙ্গ করা হলেও তাঁর প্রশ্নকে যেন এখানে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। রামমোহন বলতে চেয়েছিলেন, 'বিধিনিষেধাত্মক ভগবানের আজ্ঞানুসারে' কাজ করাই উচিত ; তিনি "যেং কর্ম্ম করিতে অনুকূল ছিলেন" সে সব কাজ করার বিধান না দেওয়াই কর্তব্য। এ কি ঠিক যুক্তি হলো ! বিধান দাতা ভগবানের বিধান আর তাঁর কাজ স্বতন্ত্র হবে এ কি ঠিক !!

এবার 'মুগ্ধবোধ ছাত্র'-এর জবাবে রামমোহন কি বলেছিলেন দেখা যাক—

মুগ্ধবোধ ছাত্র প্রশ্ন করেছিলেন রামমোহনের গীতা ব্যাখ্যার সঠিকতা সম্পর্কে। সহমরণ বিষয় তাঁর কাছে গৌণই হয়ে পড়েছিল। অবশ্য সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে সহমরণ সম্ভব কিনা বিপ্রের মত সে প্রশ্ন মুগ্ধবোধ ছাত্রও করেছিলেন। রামমোহন তাকে বিপ্রকে প্রদত্ত উত্তরই দেখতে বলেছিলেন। মুগ্ধবোধ ছাত্রের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েও রামমোহন জানিয়েছিলেন, নিষ্কাম-কর্মেরই প্রশংসা করা হয় ; এবং সহমরণ নিষ্কাম কর্ম নয়।

পত্রলেখক 'নির্ণয়সিন্ধু'ধৃত সহমরণ সমর্থক এক মনুবচন উদ্ধার করে বলে-ছিলেন, মনুও সহমরণের বিধান দিয়েছিলেন। রামমোহন বলিষ্ঠ যুক্তির আলোকে প্রমাণ করেছিলেন, 'নির্ণয়সিন্ধু'ধৃত ঐ মনুবচন আদৌ প্রামাণিক নয়।

কাশীনাথ তর্কবাগীশের মত ঐ পত্রলেখকও বলেছিলেন, ঋগ্বেদের 'ইমা নারীরবিধবাঃ' বচনে সহমরণের কথা রয়েছে। রামমোহন কিন্তু এবার বলেছিলেন, ঐ বচনে সহমরণের কথা আদৌ নেই।*

* মনে হয়, এবার তিনি ঐ বচনের সঠিক পাঠের সন্ধান পেয়েছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে ১৮৩০ সালে ধর্ম্মসভার পক্ষ থেকে বেণ্টিঙ্ককে 'সতী' নিষেধক আইনের বিরুদ্ধে যে আবেদনপত্র প্রেরণ করা হয়েছিল তার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ আবেদনপত্রে সতীপ্রথার সমর্থনে সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি ব্যবস্থাপত্র সংযোজিত হয়েছিল। সঙ্গে তার বঙ্গানুবাদও ছিল। ব্যবস্থাপত্রটিতে রামমোহনের সতী-প্রথা বিরোধী যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা করে আবেদনকারীরা সতী প্রথাকে সমর্থন করেছিলেন। সহমরণ সমর্থক ও তার প্রশংসাজ্ঞাপক অনেক শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করে ওখানে বলা হয়েছিল, সাধ্বীস্ত্রীর সহগমনই শাস্ত্রসম্মত ; তবে অবস্থাবিশেষে সহগমনে অক্ষম হলে বিধবা ব্রহ্মচর্যই অবলম্বন করবে। বিষ্ণুঋষি বলেছিলেন, বিধবারমণী ব্রহ্মচর্য পালন করবে বা স্বামীর অনুগমন করবে। ব্যবস্থাপত্রটিতে বিষ্ণুর এই বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছিল— "·· বিষ্ণুসূত্রে ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম গ্রহণহেতুক পাঠক্রমে তাহার প্রাধান্য প্রযুক্ত বিধবা স্ত্রীর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন কর্ত্তব্য। তাহাতে অক্ষমা হইলে চিতারোহণ কর্ত্তব্য। অপর ব্রহ্মচর্য্যেরও ক্রমেতে চিত্তশুদ্ধি সাধনতাহেতুক পরম্পরা ক্রমে পরম পুরুষার্থ যে মুক্তি তাহার প্রযোজক হওয়াতে অনিত্য অথচ অল্পসুখ স্বরূপ স্বর্গের কারণী-ভূত যে সহমরণ তদপেক্ষায় ব্রহ্মচর্য্যের প্রশস্ততা হেতুক বিধবার সর্ব্বথাই ব্রহ্মচর্য্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। অপর অন্য অন্য স্মৃতি অপেক্ষা প্রত্যক্ষ বেদমূলকত্ব হেতুক মনুর স্মৃতির বলবত্তা নিমিত্ত সহমরণের মনুসংহিতাতে অনভিধান হেতুক অন্য সংহিতাতে তাহার কথন থাকিলেও মনুর অর্থের বিপরীত যে স্মৃতি সে অপ্রশস্ত এই শাস্ত্রেতে তাহার প্রাশস্ত্যানিমিত্ত তাহার অবশ্য কর্ত্তব্যতা নাই কিন্তু সাধ্বী স্ত্রীরদিগের অত্যুত্তম ধর্ম্মাভিলাষিণী হইয়া স্ত্রী নিজ মরণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারির ধর্ম্মা-বলম্বন পূর্ব্বক ক্ষান্তা অর্থাৎ মানস ব্যভিচারাদি রহিতা হইয়া থাকিবেক। ইহা মনু কর্ত্তৃক উক্ত। এবং ভর্ত্তার মরণানন্তর ব্রহ্মচর্য্য করিবেক অথবা ভর্ত্তার সহিত জ্বলচ্চিতারোহণ করিবেক এই বিষ্ণু সূত্র এবং অন্য২ স্মৃতিতে ব্রহ্মচর্য্য বিহিত হইয়াছে অতএব ব্রহ্মচর্য্যই আচরণ করিবেক। এই কল্পত্রয় ক্রমে দেখা যাইতেছে।" [সতীদাহ—আবেদন ; পৃঃ ২২—২৩]

রামমোহনের মতের প্রতিবাদ করে আলোচ্য ব্যবস্থাপত্রে বলা হয়েছিল, মনু সহমরণের সমর্থক ছিলেন। বহুবিতর্কিত ঋগ্বেদের সেই 'ইমা নারীরবিধবাঃ' বচন সম্পর্কেও আলোচ্য ব্যবস্থাপত্রে বক্তব্য রাখা হয়েছিল - "এই নারী বিধবা নহে ইত্যাদি ঋগ্বেদে কথিত সহমরণের মন্ত্রদ্বারা বোধিত যে বেদ সম্মত সহমরণ তাহার অবশ্য কর্ত্তব্যতার ব্যাঘাত নাই। যেহেতুক শ্রুতি এবং স্মৃতি এ উভয়ের

পরস্পর বিরোধী হইলে শ্রুতির প্রাধান্য প্রযুক্ত তাহার প্রামাণ্য। আত্মহত্যা পাপ ভয়ে সহমরণ কর্ত্তব্য নহে ইহা কথন অযোগ্য যেহেতুক ব্রহ্মপুরাণে এমত কথিত আছে যে ঋগ্বেদে কথন প্রযুক্ত সাধ্বীস্ত্রীর সহমরণে আত্মহত্যার পাপ হয় না।

"অতএব ব্রহ্মচর্য্যাপেক্ষায় অতি প্রাশস্ত্যরূপে সহমরণ অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা সর্ব্বশাস্ত্র মীমাংসা পণ্ডিতেরদের সম্মতা ইতি।" (তদেব ; পৃঃ ২৮)

কাম্যকর্ম হিসেবে সহমরণ যে নিন্দার্হ নয় ব্যবস্থাপত্রটিতে সে কথাও বলা হয়েছিল।

রামমোহন-যুগের বহু পরেও সতীদাহ নিয়ে তর্কবিতর্ক নতুনভাবে দেখা দিয়েছিল। ১২৮৪ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'সতীদাহ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে চন্দ্রশেখর সতীপ্রথা সমর্থন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অঙ্গিরা, ব্যাস, পরাশর সহমরণেরই বিধি দিয়েছিলেন। বিদেশী সাহিত্যে তিনি সতীদাহের নজীর খুঁজেছিলেন এবং তা' পেয়েও ছিলেন। ঐ নজীরের ওপর ভিত্তি করে তিনি প্রথাটিকে আড়াই হাজার কি তার বেশি বছরের প্রাচীন বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

প্রবন্ধটিতে চন্দ্রশেখর সতী হবার কারণ নির্ণয় করে তার দোষ-গুণ বিচার করেছিলেন। সতীপ্রথা বিরোধীদের যুক্তিও খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা খুবই দুর্বল। চন্দ্রশেখরের অন্ধ রক্ষণশীলতা প্রকাশ পেয়েছিল বলে স্থানে স্থানে তা অভাবনীয় ও অদ্ভুত হয়ে উঠেছিল। সতীপ্রথার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, সামান্য সংখ্যক নারীর মৃত্যুতে সংসারে কোন অসুবিধা ঘটে না। তিনি একথাও বলেছিলেন, মহৎ ব্যক্তিদের মৃত্যুতেও যখন কোন বিশেস বা অপূরণীয় ক্ষতি হয় না তখন 'মুগ্ধা, প্রণয়বিহ্বলা, বিরহ-কাতরা, সন্তাপদগ্ধা, অন্তঃপুরবদ্ধা হিন্দু বিধবার মৃত্যুতে কি ক্ষতি ?"···

[বঙ্গদর্শন ; আষাঢ়, ১২৮৪]

চন্দ্রশেখর সতীদাহের পক্ষতা করতে গিয়ে এও বলেছিলেন বৈধব্যের যন্ত্রণা অসীম। পিতামাতা তার ব্রহ্মচর্য পালনে বেদনাবোধ করে থাকে। তাছাড়া কন্যার পদস্খলন ঘটবার ভয়েও তারা ভীত থাকে। এহেন অবস্থায় তার মরাই ভালো। কি ভয়ঙ্কর যুক্তি !

সতীদাহের ঘটনা দেখলে অনেক পথভ্রান্ত নারী ধর্মানুসরণের প্রেরণা

পেতে পারে বলেও চন্দ্রশেখর মনে করেছিলেন। এও কোন যুক্তি নয়। বিপথগামী নারীকে সুপথে আনার অন্য পথ রয়েছে।

প্রবন্ধটিতে চন্দ্রশেখরের আরও দুর্বল যুক্তি লক্ষ্য করা যায়।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি মুদ্রিত করে 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদক জানিয়েছিলেন, ঐ প্রবন্ধে ব্যক্ত সকল মত তাদের অনুমোদিত নয়; তবে 'বঙ্গদর্শনে' নানাবিধ মত সমর্থিত ও সমালোচিত হোক এই মনোভাব থাকার জন্যেই প্রবন্ধটি মুদ্রিত করা হয়েছে। অবশ্য প্রবন্ধটির লিপিচাতুর্যও যে তাব মুদ্রিত হবার অন্যতম কারণ সম্পাদক মহাশয় সে কথাও বলেছিলেন।

এই সম্পাদকীয় বক্তব্যের দ্বারা প্রোৎসাহিত হয়েই নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় চন্দ্রশেখরের প্রবন্ধের প্রতিবাদে একটি প্রবন্ধ রচনা করে 'বঙ্গদর্শনে' পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রবন্ধটি ১২৮৪ সালের কার্তিক সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' মুদ্রিত হয়েছিল।

নগেন্দ্রনাথ ছিলেন মানবদরদী ও উদার মনের মানুষ। সতীদাহ সমস্যা বিচারে তাঁর তদনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাই তিনি চন্দ্রশেখরের বক্তব্যের বিরুদ্ধে বলেছিলেন—

"যদিবা তর্কের খাতিরে স্বীকার করা যায় যে, বিধবার মৃত্যুতে সমাজের কোন ক্ষতি নাই, তাহাতেও এমন প্রমাণ হয় না যে তাহার মরিবার অধিকার আছে।" [বঙ্গদর্শন ; ১২৮৪, কার্তিক]

চন্দ্রশেখর বলেছিলেন, ভারতবর্ষীয় নারীদের মধ্যে "জীবিতচেষ্টা" নেই; তারা অন্যের ওপর নির্ভরশীল। সধবানারী সন্তান প্রসবের মাধ্যমে জনসংখ্যা বাড়িয়ে "জীবিত চেষ্টা বৃদ্ধি করিয়া দেয়"; বিধবানারীর সে শক্তি নেই। এই কারণে তার মৃত্যুতে সমাজের কোন ক্ষতিই হয় না। নগেন্দ্রনাথ এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, ভদ্রজাতীয়া মহিলাদের মধ্যে না হলেও "ইতর জাতীয়া স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে জীবিত চেষ্টা বিলক্ষণ রহিয়াছে। ভদ্রমহিলার অপেক্ষা ইতর জাতীয় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক অধিক।" (তদেব) দাক্ষিণাত্যে সতীর সংখ্যা ইতর জাতীয়দের মধ্যেই বেশি; "সুতরাং সতীদাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে জীবিত চেষ্টার যে ক্ষতি হইত তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিতেছে না। ভদ্রজাতীয়া বিধবাদিগের দ্বারা যে জীবিত চেষ্টার কিছুমাত্র সাহায্য হয় না, ইহাও আমরা মনে করি না।······তাঁহারা অন্নবস্ত্রের জন্য কাহারও না কাহারও অবশ্য গলগ্রহ হইয়া থাকেন; এবং যে ব্যক্তির গলগ্রহ হন, তাহার জীবিত চেষ্টা অবশ্যই বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়।" (তদেব)

নগেন্দ্রনাথের এই যুক্তি যথার্থই বৈজ্ঞানিক ; চন্দ্রশেখরের বক্তব্যের প্রকৃত জবাবই তিনি দিয়েছিলেন।

চন্দ্রশেখর স্পেন্সারের 'সমস্বাতন্ত্র্যবাদে'র বক্তব্য অনুযায়ী সতীনারীর সহমৃতা হবার স্বাধীনতা আছে বলতে চেয়েছিলেন। নগেন্দ্রনাথ তারও বিরোধিতা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, সদ্য স্বামিহীনা শোকাকুলা নারীকে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে (অর্থাৎ সহমৃতা হতে) দেওয়া উচিত নয়।

চন্দ্রশেখর সহমরণকে পথভ্রান্ত নারীর কাছে সতীত্বের দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ সে ক্ষেত্রে বিপথগামী নারীর সামনে বলিষ্ঠ জীবন ধর্মী দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তার বক্তব্য, "শোকাবেগ সম্বরণে অক্ষম হইয়া মুহূর্ত মধ্যে শরীর ভস্মসাৎ করা অপেক্ষা, কি দীর্ঘজীবনের পরোপকার, ইন্দ্রিয়দমন, সহিষ্ণুতা, ও পবিত্রতার দৃষ্টান্ত, শ্রেষ্ঠতর নহে ?"...

(তদেব)

চন্দ্রশেখর সতীপ্রথা নিষেধক আইন চালু করবার জন্যে বেণ্টিঙ্কের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ ঐ আইন প্রণয়নে কোন ক্ষতিই খুঁজে পান নি। আসলে চন্দ্রশেখর ছিলেন ঘোরতর রক্ষণশীল মনের মানুষ ; আর নগেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী। সুতরাং চন্দ্রশেখর অপেক্ষা নগেন্দ্রনাথের বক্তব্য ও যুক্তি অনেক বলিষ্ঠ ও স্বচ্ছ হওয়াই স্বাভাবিক ;—হয়েওছিল তাই।

॥ ২ ॥

ঃঃ বিধবাবিবাহ বিষয়ক বিতর্করচনা ঃঃ

বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত বিতর্কপুস্তকাদির রচনা বিদ্যাসাগরের অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই সব রচনার মধ্যে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে' প্রকাশিত "বিধবার পুনর্ব্বিবাহ" সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৮৪২ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত ঐ রচনাটি জনৈক পত্রপ্রেরকের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল।

পত্রদাতা বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন। তার বক্তব্য ছিল, নারদ, শঙ্খলিখিত বা অন্যান্য কয়েকজন ঋষির শাস্ত্রে ব্যবহৃত 'পুনর্ভূ' শব্দের ব্যবহারে বোঝা যায়, বিধবার বিবাহ তখন অপ্রচলিত ছিল না। বিধবার বিবাহ ঘটলে তার সতীত্ব নষ্ট হতো না—যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ বক্তব্যও তিনি তুলে ধরেছিলেন। পত্র রচয়িতা বলেছিলেন, মনু সংহিতাতেও বিধবাবিবাহের উল্লেখ রয়েছে ; তবে সেখানে ঐ বিবাহে 'দান নিষিদ্ধ'—সংস্কারই বিধেয়। তাঁর কথিত দ্বাদশ

প্রকার পুত্রের মধ্যে পৌনর্ভবেরও উল্লেখ রয়েছে। পত্রদাতা নানা শাস্ত্রীয় বচনের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করে বলেছিলেন, "গুণবান পৌনর্ভব পুত্রের একাংশ ভাগিতা (পিতার সম্পত্তিতে) এবং দায়াদত্ব সংস্থাপন করা যায়। আর যদ্যপিও তাহার আংশিক কিম্বা সময়ানুসারে সম্পূর্ণ ধনাধিকারিত্ব আছে তথাপি ঔরস পুত্রাদির অসত্বেও কদাপি রাজ্যাধিকার নাই ও অসবর্ণ হইলে কেবল গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্তি মাত্র। কিন্তু শূদ্রের প্রতি উক্ত পুত্র সকলের অংশ দানের বিভিন্ন মত খণ্ডিত হইয়া ঔরস পুত্রের সহিত তুল্যাংশিতা ব্যবস্থাপিতা হইয়াছে।"

[সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৩য়)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ; ১৯৬২। পৃঃ ৭৮]

পত্রদাতা জানিয়েছিলেন, তন্ত্রশাস্ত্রে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয় নি। বেণরাজার আমলেও বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল ; পরবর্তীকালে নিষিদ্ধ হলেও শূদ্রের ক্ষেত্রে তা নিষিদ্ধ ছিল না। অন্ত্যজদের মধ্যে এর প্রচলন ছিল বেশি। শেষ পর্যন্ত পত্ররচয়িতা সিদ্ধান্ত করেছিলেন, বিধবাবিবাহ "শাস্ত্রামূলক নহে কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত সাধারণে অপ্রচলিত থাকাতে দেখা হইয়াছে এবং উক্ত পুনর্ভূ বিবাহ পুনঃস্থাপিত হইলে তৎপুত্রের দায়াধিকারক্রম অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইতে পারে।" (তদেব পৃঃ ৭৯)

পত্ররচয়িতা বিধবাবিবাহের বিষয়ে দেশের গভর্ণমেন্টের সহায়তা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন।

পত্রদাতার বক্তব্য যে খুব ব্যাখ্যামূলক বা বিশ্লেষণাত্মক ছিল তা নয়, তবে প্রগতিশীল বক্তব্যের প্রকাশ ঘটায় এর একটি ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। তাছাড়া পত্রদাতার বক্তব্য সে সময় দেশের কোন কোন মহলে বেশ আলোড়নও সৃষ্টি করেছিল। তারই প্রকাশ ঘটেছিল 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত একটি প্রতিবাদপত্রে। পত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪২ সালের ২৬শে এপ্রিলের 'সংবাদ প্রভাকরে'। পত্রপ্রেরক বলেছিলেন, সম্প্রদান একবার করা হলে কন্যার ওপর পিতামাতার কোন স্বত্ব থাকে না ; অতএব বিধবাকন্যাকে আর সম্প্রদান করা যায় না।

এই পত্রপ্রেরকের বক্তব্যেরও কিন্তু প্রতিবাদ করা হয়েছিল। ১৮৪২ সালের ৫ম সংখ্যা 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে' প্রকাশিত একটি পত্রে প্রতিবাদকারী জানিয়েছিলেন, মনুর মত অনুযায়ী বিধবাবিবাহে দান নেই—সংস্কার রয়েছে।

তাছাড়া বিধবা নিজেই নিজেকে দান করতে পারে। 'স্পেক্টেটরের' পত্রলেখক একথাও বলেছিলেন, রাজবল্লভের বিধবাকন্যার বিবাহে ভারতের নানা স্থান থেকে আগত পণ্ডিতেরা "স্বামির দেশান্তর গমন, মরণ, সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বন, ক্লীবত্ব এবং পাতিত্ব এই পঞ্চ প্রকার আপদে স্ত্রীলোকের প্রতি বিবাহান্তর করণের বিধি আছে।" (তদেব ; পৃঃ ৯১)—এই প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে বিধবা-বিবাহের অনুকূলে রায় দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, প্রতিবাদকারী বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন সত্য, কিন্তু পুনর্ভূপুত্রের ধনাধিকার বিষয়ে গবর্নমেন্টের সহায়তা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না।

বিধবাবিবাহ বিষয়ে রীতিমত তর্কযুদ্ধ শুরু হয়েছিল বিদ্যাসাগরের 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫, জানুয়ারী) প্রকাশিত হবার পর থেকে। আলোচ্য পুস্তকে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিচারেই বিশেষ মনোযোগী হয়েছিলেন ; কারণ তিনি বুঝেছিলেন, দেশের মানুষ যুক্তি মানতে চায় না—শাস্ত্রই মানতে চায়।

বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত এই প্রথম পুস্তকটিতে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় যুক্তির দ্বারা বলেছিলেন, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের মানুষের যে ধর্ম আচরণীয় কলিযুগের মানুষের পক্ষে তা' পালন করা সম্ভবপর নয়। মনুও বলেছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ; তবে কোন যুগে কোন ধর্ম পালনীয়—কোন শাস্ত্র অনুসরণীয় মনু তা বলেন নি। বিদ্যাসাগর অবশ্য যুক্তি ও তথ্যসহকারে সেই সমস্যার সমাধান করেছিলেন এবং বলেছিলেন, কলিযুগে পরাশর সংহিতাই পালন করা বিধেয়। এই জন্যে ঐ পরাশর সংহিতার বচন উদ্ধার করেই তিনি বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন। কৃতকার্যও হয়েছিলেন। পরাশর মুনি আপন সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে বিধবাবিবাহের পক্ষে এই বিধান দিয়েছিলেন—

'নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গংযথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥
তিস্রকোট্যোঽর্দ্ধকোটি চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালংবসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥'

[বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ (২য়) ; সাক্ষরতা প্রকাশন ; ১৯৭২। পৃঃ ২৫-২৬]

বিদ্যাসাগর প্রাঞ্জলগদ্যে এই বচনসমূহের যে অনুবাদ করেছিলেন প্রয়োজন-বোধে তা' উদ্ধার করছি—

"স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত। যে নারী, স্বামীর মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সে দেহান্তে স্বর্গলাভ করে। মনুষ্য শরীরে যে সার্ধ ত্রিকোটি লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে, তৎসম কাল স্বর্গে বাস করে।" (তদেব ; পৃঃ ২৬)

পরাশরের এই বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, বিধবা নারীর যে তিনটি কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছিল তাদের মধ্যে বিবাহের কথাই উল্লিখিত হয়েছিল সর্বপ্রথমে। তারপরে উল্লিখিত হয়েছিল ব্রহ্মচর্য ; সহমরণের কথা বলা হয়েছিল একেবারে শেষে। এদের মধ্যে সহমরণ আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছিল অনেক আগে। অতএব বাকি থাকে দু'টি—বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য। বিদ্যাসাগরের মতে কলিযুগে ব্রহ্মচর্য পালন সম্ভবপর নয়, অতএব বিবাহই প্রশস্ত। পরাশরেরই এই বিধান।

বিদ্যাসাগর আগেই বলেছিলেন, পরাশর সংহিতা হলো কলিযুগের শাস্ত্র। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের মানুষের তুলনায় কলিযুগের মানুষ সর্বাপেক্ষা দুর্বল ; এহেন দুর্বল মানুষের আচরণযোগ্য ধর্মই পরাশর মুনি নির্দেশ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন কলিযুগের দুর্বল বিধবারমণীদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য অপেক্ষা বিবাহই সহজসাধ্য বলে পরাশর মনে করেছিলেন। বিবাহিত বিধবার গর্ভজাত সন্তানের মর্যাদা বিষয়েও বিদ্যাসাগর আলোচনা করেছিলেন। পরাশর সংহিতায় পরাশর ঔরসপুত্র, দত্তকপুত্র ও কৃত্রিমপুত্র—এই তিন প্রকার পুত্রের উল্লেখ করেছিলেন। 'পৌনর্ভব' শব্দটি তাঁর গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নি ; এ থেকেই বোঝা যায়, পরাশর বিধবাগর্ভজাত পুত্রকে ঔরসপুত্রেরই মর্যাদা দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর এরপর যে যে শাস্ত্রীয় বচন অনুযায়ী বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ বলা হয়ে থাকে সেই সব বচনের প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ে মনোযোগী হয়েছিলেন।

রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্বে উদ্ধৃত বৃহন্নারদীয় বচনে বলা হয়েছিল, একবার দান করা কন্যাকে অন্য পাত্রে দান করা যায় না। বিদ্যাসাগর বিচার করে বলেছিলেন, ঐ বচনে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ সে কথা বলা হয় নি। নারদমুনি আসলে বলতে চেয়েছিলেন, আগে বাগ্‌দান করা হয়েছে যাকে পরবর্তীকালে তার থেকে ভাল পাত্র পাওয়া গেলেও কন্যাকে সেই পাত্রে দান করা যাবে না।

আদিত্যপুরাণেও যে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ হয় নি বিদ্যাসাগর তা দেখিয়েছিলেন। আদিত্যপুরাণে বলা হয়েছিল 'দত্তা' কন্যার দান নিষিদ্ধ। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, ঐ দত্তা কন্যা বলতেও বাগ্‌দত্তা কন্যাকে বোঝানো হয়েছিল।

বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাণের বক্তব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর আরও একটি যুক্তি দিয়েছিলেন। বেদব্যাসের বচন উদ্ধার করে তিনি বলেছিলেন, স্মৃতি আর বেদের মধ্যে বিরোধ ঘটলে বেদই গ্রাহ্য ; পুরাণ আর স্মৃতির মধ্যে বিরোধ ঘটলে স্মৃতিই মান্য , অতএব বৃহন্নারদীয় পুরাণ ও আদিত্যপুরাণ অপেক্ষা স্মৃতিশাস্ত্র পরাশর সংহিতাই সর্বাগ্রে বরণীয়।

'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' সর্বপ্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৭৬ শকের ফাল্গুন মাসে ১৩৯ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-'তে। ঐ পত্রিকার ঠিক পরবর্তী সংখ্যাতেই (১৭৭৬ শক, চৈত্র ; ১৪০ সংখ্যা) বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব সমর্থন করে সম্পাদক মহাশয় এক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সম্পাদক মহাশয় বলেছিলেন, স্ত্রী বিয়োগের পরে পুরুষ বিবাহ করতে পারে, স্বামী মারা গেলে নারীও কেন পুনর্বিবাহ করতে পারবে না। তিনি আরও বলেছিলেন, স্বামী মারা গেলে আমাদের দেশে মেয়েরা নিতান্তই অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হয়। ঐ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে তার বিবাহ করাই দরকার। তাছাড়া কন্যা বিধবা হলে পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজন যেমন দুঃখিত হয়ে থাকে তেমনি শঙ্কিত হয়েও পড়ে। বিধবাবিবাহের প্রচলন থাকলে তাই ঐ অবস্থা থেকে তারা বহুলাংশে মুক্তি পাবে।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকার জন্যে ব্যভিচার কত ব্যাপক হয়ে উঠেছিল এবং আরও কত ব্যাপক হয়ে উঠতে পারে সে কথাও সম্পাদক মহাশয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছিলেন।

আলোচ্য সম্পাদকীয় নিবন্ধে যুক্তিনিষ্ঠ সম্পাদক মহাশয় বিধবাবিবাহের পক্ষে বেশ জোরালো যুক্তিই দিয়েছিলেন। ঐ যুক্তির মধ্যে তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতা ও বাস্তব বুদ্ধির গভীরতাই প্রকট হয়ে উঠেছিল।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে (১২৬২, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ) 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় "শ্রী স. দ. শিরোমণি" প্রেরিত একটি পত্রে বিধবাবিবাহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের কাছে একটি বিষয় জানতে চাওয়া হয়েছিল। পত্রদাতা রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে আগত পণ্ডিতদের অভিমত শুনে বুঝেছিলেন, সর্ববর্ণের মানুষের

বিবাহেই কুশণ্ডিকা মুখ্যকল্প। পত্রদাতা তাই বলেছিলেন, পণ্ডিতদের ঐ বক্তব্য সত্য হলে বলা যায়, যে সব অক্ষতযোনি বালবিধবার কুশণ্ডিকা হয়নি তারা পিতৃগোত্রেই রয়ে গিয়েছে। এহেন অবস্থায় তার 'স্বতন্ত্রপাত্রে বিধিপূর্ব্বক পাত্রান্তর করা অবশ্য বিধেয়।' [সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৪র্থ)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ; ১৯৬৬। পৃঃ ৭৬৩]

পত্রদাতা অবীরাদিগের মঙ্গলের জন্য ঐ ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছিলেন, "...অবীরাদিগের মধ্যে দুই শ্রেণীভুক্ত দেখিতেছি। যাহারদিগের কুশণ্ডিকা ও সপ্তপদী গমন প্রভৃতি হইয়াছে তাহারা স্বাধীনা। অবশিষ্ট যাহারদিগের প্রধান কল্প কুশণ্ডিকা হয় নাই তাহারা পিতৃগোত্রে আছে। এই স্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি নিবেদন ইহার সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ব্যবস্থা প্রকাশ না করিলে বিরোধীদিগের নিরস্ত করিতে পারি না এবং চিরকালের নিষিদ্ধ কর্ম্মের সম্প্রদানের মন্ত্রের বড় গোল উঠিয়াছে, অতএব বিধবাবিবাহের পদ্ধতি না পাইলে কোন্ মন্ত্রে কন্যা সম্প্রদান করিব ইহার বিধি আজ্ঞা হয়," (তদেব ; পৃঃ ৭৬৩-৬৪)

বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে ঐ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছিলেন।

এবার একটি বিশেষ রচনার আলোচনা করা যাক। ১৫ই বৈশাখ, ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দের সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ডঃ পশুপতি শাসমলের 'বিধবাবিবাহ সম্পর্কে রাখালদাস হালদার' শীর্ষক একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ আলোচনায় ডঃ পশুপতি শাসমল মহাশয় রাখালদাস হালদারের লেখা 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া অবশ্য উচিত' প্রবন্ধটি উদ্ধার করেছিলেন। তার আগে প্রবন্ধটি রাখালদাসের 'নোট বই'-এর মধ্যে বন্দী অবস্থায় ছিল। সেখানে তার রচনাকাল লেখা আছে ১০ই মার্চ ; ১৮৫৫। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তকের প্রতিবাদে প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় বার পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন ;—রাখালদাসের প্রবন্ধটি তারই প্রতিবাদে রচিত। প্রসন্নকুমারের রচনা হস্তগত হয় নি ; কিন্তু রাখালদাস তাঁর বক্তব্য নিজের ভাষায় তুলে ধরে উত্তর দিয়েছিলেন বলে প্রসন্নকুমারের বক্তব্য বুঝতে আমাদের আদৌ কষ্ট হয় না।

প্রসন্নকুমার বলেছিলেন, মনুস্মৃতিই সর্বকালে মান্য ; এবং সেখানে বিধবা-বিবাহের কথা বলা হয় নি। রাখালদাস তার উত্তরে জানিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর

'বাহুল্যরূপে' প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মনুশাস্ত্র সত্যযুগেই মান্য; অতএব মনুস্মৃতিতে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ হলেও সত্যযুগের জন্যেই তা নিষিদ্ধ বলতে হবে।

তাছাড়া, মনু যদি সর্বকালেই মান্য হতো তাহলে বর্তমানে মনুবিরোধী আচার-আচরণ কেন চালু রয়েছে!

প্রসন্নকুমার বলেছিলেন, পরাশর বচনে স্বামী মারা গেলে বাগ্‌দত্তা কন্যারই পুনর্বিবাহের কথা বলা হয়েছে। রাখালদাস হালদার এর বিরুদ্ধে খুব বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন, "যদি ইহাই যথার্থ হইত, তবে সেই হতভাগিনীকে মুখকল্পে (মুখ্যকল্পে?) সহমৃতা বা ব্রহ্মচারিণী হইতে হইত; কারণ পরাশর লিখিয়াছেন যে, বিধবাস্ত্রী হয় পুনর্ব্বিবাহ করিবেক, নয় ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন কিংবা স্বামীর সহগমন করিবেক। প্রসন্নবাবু কি এতদূর সম্মত হয়েন?"

[দেশ; ১৫ই বৈশাখ; ১৩৭৪। পৃঃ ১৩১৩]

প্রসন্নকুমার পরাশরের বিধবাবিবাহ বিধায়ক বচনকে কৃত্রিম মনে করেছিলেন। রাখালদাস হালদার তারও বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। প্রচলিত আচরণ নয় বলেও প্রসন্নকুমার বিধবাবিবাহ সমর্থন করেন নি। রাখালদাস বলেছিলেন, যা' সংযুক্তি গ্রাহ্য তাইই মেনে চলা প্রয়োজন। লোকাচার মেনে চলা কোন যুক্তিই নয়।

প্রসন্নকুমারের আরও কয়েকটি যুক্তির উত্তর রাখালদাস ঐ প্রবন্ধে দিয়েছিলেন; কিন্তু সেগুলি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। প্রসন্নকুমারের ঐ সব যুক্তির একটি ছিল, নারীর যৌবন যখন ক্ষণস্থায়ী তখন আর তার পুনর্বিবাহ কেন! রাখালদাস তার উত্তরে বলেছিলেন, জীবন ক্ষণস্থায়ী; "তবে বহুকাল মধ্যে সাংসারিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়ায় কি ফল?" (তদেব; পৃঃ ১৩১৬)

প্রসন্নকুমারের মত খণ্ডনে রাখালদাস যুক্তিনিষ্ঠা ও উদারতার পরিচয়ই দিয়েছিলেন; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিক শাস্ত্রীয় বিতর্কে অবতীর্ণ হতে পারেন নি (বা চান নি)। সে জন্যে তিনি বলেছিলেন—

"যে দুই একটি শাস্ত্রীয় তর্কের উপযুক্ত উত্তর দিতে পারি নাই, তাহাতে কিছুমাত্র হানিবোধ হইতেছে না। যাহারা যুক্তির অপেক্ষা শাস্ত্রকে বলবত্তর জানে, তাহারাই আমাকে তজ্জন্য না-হয় পরাভূত বলিয়া বোধ করুক।" ...(তদেব; পৃঃ ১৩১৬)

রাখালদাস ঐ প্রবন্ধে বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার মধ্যে তাঁর বাস্তববুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা এবং উদার মানবতাবোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগর রচিত বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তকের প্রতিবাদকারীদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন নন্দকুমার কবিরত্ন। তাঁর পুস্তকের নাম 'বৈধব্য ধর্ম্মোদয়'। বইটি দুইখণ্ডে বিভক্ত; বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তকের প্রতিবাদে রচিত হয়েছিল প্রথম খণ্ড; আর তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকের বিরুদ্ধে রচিত হয়েছিল দ্বিতীয় খণ্ড বা 'দ্বিতীয় পুস্তক'। বইটির প্রকাশকাল জানা যায় নি।

নন্দকুমার বলেছিলেন, বিদ্যাসাগার যে সব বচনের আলোকে বিধবাবিবাহের পক্ষতা করেছিলেন সে সব বচনের দ্বারা বিধবাবিবাহ সমর্থন করা যায় না। তাঁর মতে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র তা' সত্য নয়;—কলিযুগে পরাশর সংহিতাই মান্য তাই বলা যায় না। পরাশর সংহিতায় কলিযুগের ধর্ম যেমন তেমনি সকল যুগের সাধারণ ধর্মও কথিত হয়েছে। তাছাড়া "নষ্টেমৃতে" ইত্যাদি বচনে বাগ্‌দত্তা কন্যার বিবাহের কথাই রয়েছে; "এবং পুনর্বিবাহও যে যুগান্তরীয় বিষয় ইহা সমস্ত সংগ্রহকার ও ভাষ্যকারদিগের সিদ্ধান্তে স্থির হইয়াছে।" [বৈধব্য ধর্ম্মোদয় (১ম)—নন্দকুমার কবিরত্ন; পৃঃ ৫]

বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের বিরোধিতা করে নন্দকুমার আরও বলেছিলেন, বিধবাগর্ভজাত পুত্র ঔরসপুত্রের মর্যাদা পাবার যোগ্য নয়; কেননা বিধবাকন্যা কখনও ধর্মপত্নী হতে পারে না।

নন্দকুমার প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছিলেন, সর্বযুগে একই ধর্ম; অবশ্য নন্দকুমার ও তাঁর 'সহকারিগণে'র অন্যতম বক্তব্য ছিল, পরাশর সংহিতার মাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়েই কলিধর্ম আলোচিত হয়েছে—অন্যান্য অধ্যায়ে কলিভিন্ন যুগের ধর্মকথাই রয়েছে। বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তকেই ঐ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছিলেন; দ্বিতীয় পুস্তকে তাকে আরও বিস্তৃত করেছিলেন। তিনি প্রথমে বলেছিলেন, প্রতিবাদীরা অংশতঃ স্বীকার করেই নিয়েছিলেন, ঐ সংহিতা কলিযুগের জন্যে। তারপর তিনি "পূর্বতন গ্রন্থকর্তাদের" মত সংকলন করে দেখিয়েছিলেন, ঐ সংহিতার অন্যান্য অংশও কলিযুগের জন্যে রচিত হয়েছিল।

নন্দকুমারের মতে মনুসংহিতায় সর্বযুগেরই ধর্ম কথিত হয়েছে এবং কলিকালে মনুই মান্য। তিনি 'মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে" বচন উদ্ধার করে বলেছিলেন, অন্যস্মৃতির সঙ্গে মনুস্মৃতির বিরোধ ঘটলে মনুই মান্য হবেন। এই বক্তব্যের আলোকে নন্দকুমার বলতে চেয়েছিলেন, পরাশর সংহিতায় বিধবাবিবাহ থাকলেও মনুবিরোধী হওয়ায় কলিযুগে তা মান্য হতে পারে না।

নন্দকুমার আরও বলেছিলেন, পরাশর সংহিতার মাত্র প্রথম ও দ্বিতীয়

অধ্যায়েই কলিধর্মের কথা বর্ণিত হয়েছে ; অথচ 'নষ্টেমৃতে' বচন রয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। সুতরাং ঐ বচন কলিযুগের পক্ষে প্রযোজ্য নয়।

'নষ্টেমৃতে' বচনে স্বামী মারা গেলে নারীর অন্য পতি গ্রহণের যে কথা রয়েছে নন্দকুমার তার ভিন্ন অর্থ নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর মতে বিবাহ ছাড়াও পতি হ'তে পারে ; যেমন বিবাহিতা স্ত্রীর উপপতি ; তবে উল্লিখিত বচনে অন্য পতি গ্রহণ বলতে বাগ্‌দত্তা কন্যারই পতি গ্রহণ বোঝানো হয়েছে। বিধবাবিবাহ বিরোধী প্রায় সকলেই এই বক্তব্য রেখেছিলেন।

নন্দকুমারের মতে বিধবাবিবাহ বেদবিরুদ্ধও বটে। (দ্রঃ তদেব ; পৃঃ ৩৬) সেই জন্যে প্রথম থেকেই সহমরণ ও ব্রহ্মচর্যের বিধি দেওয়া হয়েছিল, অতএব পরাশর শাস্ত্রে বিধবাবিবাহের কথা থাকলেও তা বেদবিরুদ্ধ অর্থাৎ অবরণীয়।

মনুসংহিতাতেও বিধবাবিবাহের কথা নেই বলে নন্দকুমার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মনুর মতে কন্যাদান একবারই বিধেয়। তাছাড়া মনু নির্দিষ্ট বিবাহমন্ত্রেও বিধবাবিবাহের কথা পাওয়া যায় না। মনু একথাও বলেছিলেন, পতিলোক ও ব্রহ্মলোকের প্রার্থিনী হলে স্ত্রীকে পতির জীবিত বা মৃত কোন অবস্থাতেই তার অপ্রিয়কার্য করলে চলবে না। নন্দকুমার জানিয়েছিলেন, ঐ অপ্রিয়কার্য হলো আসলে ব্যভিচার ; কুল্লূকভট্ট আবার ঐ ব্যভিচার বলতে বুঝিয়েছিলেন 'ভর্ত্তান্তরের পাণিগ্রহণ'। অতএব নন্দকুমারের সিদ্ধান্ত, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়। তাঁর কথা, 'নষ্টেমৃতে' বচনের অন্যপতি আসলে দেবর এবং বাগ্‌দত্তা কন্যার স্বামী মারা গেলেও সে বিধবা হয় ; পরাশর বচনে ঐ বিধবারমনীরই দেবরকে বিবাহ করার কথা বলা হয়েছে।

দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "বিধবাবিবাহবাদ" গ্রন্থটিও বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তকের বিরুদ্ধে রচিত হয়েছিল। দীনবন্ধু ঐ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন "ধর্ম্মমর্ম্ম প্রকাশিকা সভা"র পক্ষে। ভূমিকায় তিনি জানিয়ে ছিলেন, বিধবাবিবাহ বিষয়ে কোন স্থায়ী সিদ্ধান্ত হয় নি দেখেই তিনি ঐ বিষয়ে সঠিক তথ্য নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

পুস্তকটি গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের রীতিতে রচিত হয়েছিল। দীনবন্ধু তাঁর বক্তব্য গুরুর মুখেই প্রকাশ করেছিলেন।

দীনবন্ধু বলেছিলেন, সত্য, দ্বাপর ও ত্রেতা এই তিন যুগেই বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ও প্রচলিত ছিল। সেই সময় বিবাহিতা বিধবারমনী পুনর্ভূ নামে পরিচিত হতো। তবে কলিতে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে দীনবন্ধু

মনে করেন নি। তাঁর বক্তব্য, বিধবাবিবাহ সর্বযুগে শাস্ত্রসম্মত ও কল্যাণকর হলে কালক্রমে তা অপ্রচলিত ও অধর্ম বলে গণ্য হবে কেন!

দীনবন্ধুও নন্দকুমারের মতো বলেছিলেন, 'নষ্টেমৃতে' বচনে বাগ্‌দত্তা কন্যার কথাই বলা হয়েছে। ঐ বচনে যে 'পতি' শব্দ রয়েছে তা আসলে 'বাগ্দানীয়' পতি। দীনবন্ধু বলেছিলেন, 'নষ্টেমৃতে' বচনের 'পতি' শব্দের ঐ অর্থ ধরলে আদিত্যপুরাণের বচনের সঙ্গে (যেখানে বলা হয়েছিল দত্তা কন্যার পুনর্দান অবিধেয়) পরাশর বচনের কোন বিরোধ দেখা দেবে না। পুরাণ ও স্মৃতির বিরোধে স্মৃতিই গ্রাহ্য এই বক্তব্যের জোরে বিদ্যাসাগর আদিত্যপুরাণীয় ঐ বচনকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। দীনবন্ধু তার জবাবে বলেছিলেন, সকল শাস্ত্রই মান্য; তবে "…শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ এই শাস্ত্রত্রয়ের মধ্যে বিরোধ হইলে বেদব্যাসোক্ত প্রমাণানুসারে এক শাস্ত্রের অর্থকে অপর শাস্ত্রের বিরোধি অর্থানুরোধে সঙ্কোচ অর্থাৎ অবিরোধি বিশেষ অর্থে উপপন্ন করিতে হয়."…

[বিধবাবিবাহবাদ—দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, পৃঃ ১০]

বৃহন্নারদীয় বচনে এবং আদিত্যপুরাণে কলিকালে দীর্ঘ ব্রহ্মচর্য নিসিদ্ধ এই কথা উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, কলিতে বিধবার বিবাহই প্রশস্ত দীনবন্ধু এই প্রসঙ্গের আলোচনায় পুরাণকথিত ব্রহ্মচর্য বিধবা রমণীর আচরনীয় কিনা তার বিচার করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন সাধারণভাবে ব্রহ্মচর্য বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে প্রকৃত ব্রহ্মচর্যের পার্থক্য অনেক। প্রকৃত ব্রহ্মচর্যে বেদের অধ্যয়ন এবং 'বেদব্রতাচরণ' দুটি বিষয় পালনীয়। বেদপাঠ স্ত্রীজাতির পক্ষে নিষিদ্ধ; -বেদব্রতও তাদের আচরণীয় নয়। অতএব এই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য বিধবার আচরণীয় হতে পারে না। বিধবার পালনীয় ব্রহ্মচর্য বলতে বোঝায় তাম্বুল গ্রহণ না করা, ভোজনে কাঁসার পাত্র ব্যবহার না করা। "সুতরাং কথিত পুরাণে ব্রহ্মচর্য্যের দীর্ঘকাল নিষেধে বিধবার অনুষ্ঠেয়াচার কোন ক্রমে নিষিদ্ধ হইতে পারে না।" (তদেব; পৃঃ ২৬)

দীনবন্ধুর এই সিদ্ধান্তে ভাবনার খোরাক রয়েছে। যুক্তিবিন্যাসের নৈপুণ্যও এখানে লক্ষ্য করা যায়।

বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তকের প্রতিবাদে পীতাম্বর সেনও একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাঁর 'বিধবাবিবাহ নিষেধঃ' পুস্তকের একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় একটি প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায়—

"শ্রীযুক্ত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন মহামহোপাধ্যায়

প্রভৃতিভিঃ সম্মতোবিশিষ্ট শিষ্টাচারাভিলাসি ধর্ম্মসংস্থাপনৈকাগ্রমতি শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নীলরত্ন বাবু শ্রীযুক্ত গোবর্ধন বাবু শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ন রায় শ্রীযুক্ত বাবু খেলচচন্দ্র ঘোষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর নিয়োগি মহাশয়ৈরনুমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়েন দেশ হিতৈষণানুজ্ঞয়া স্বীয়ামুঙ্গল্যেন মুদ্রাঙ্কিতঃ।

শ্রীপীতাম্বর সেনেন কবিরত্নেনধীমতা। নিবধ্যতে নিবন্ধোয়ং পুনরুদ্বাহবারণঃ।"

পীতাম্বর সেনও বলেছিলেন, 'নষ্টেমৃতে' বচন কলিযুগের জন্যে নয়; তাছাড়া বিধবাবিবাহের কথাও সেখানে নেই। পরাশর বচনে বাগ্‌দত্তা কন্যার কথাই বলা হয়েছে। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, পরাশর সংহিতায় পৌনর্ভব পুত্রের উল্লেখ না থাকায় বোঝা যায় বিধবা-গর্ভজাত সন্তানকে তিনি ঔরসপুত্রই বলতে চেয়েছিলেন। পীতাম্বর সেন তাঁর ঐ বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন এবং বলেছিলেন—

"যেহেতু পরাশর কলিতে বিধবাবিবাহ বিধিহ দেয়েন নাই তজ্জাত পুত্রেরহ সংজ্ঞা করেন নাই যদি কলিতে বিধবাবিবাহ তাহান বিধেয় হইত তবে তদ্গর্ভজাত পুত্রেরহ সংজ্ঞাভিধানে ক্ষান্ত হইতেন না এবং পুনরুদ্বাহ সংস্কার কি অসংস্কার তাহার বিধির উপস্কার কবা তিরস্কার করিতেন না।"

[বিধবাবিবাহ নিষেধঃ—পীতাম্বর সেন; (প্রকাশ কাল অজ্ঞাত); পৃঃ ১১]

অন্যান্য ব্যক্তির মত পীতাম্বরও বলেছিলেন, কোন মন্ত্রের দ্বারা পুনর্বিবাহ বিধিসম্মত না হওয়ায় পুনর্বিবাহিতা স্ত্রী সংস্কৃতা স্ত্রীর পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না এবং সেই কারণে তার গর্ভজাত পুত্রও ঔরসপুত্রের মর্যাদা পাবার যোগ্য নয়।

পীতাম্বরের মতে বিধবাবিবাহ কলিযুগের সূচনাতেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কলিযুগে তা বরণীয় নয়।

তিনি তাঁর পুস্তকে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে কি কি অনর্থ ঘটবে তারও আলোচনা করেছিলেন; কিন্তু দুর্বল যুক্তি আর অবাস্তব চিন্তায় সে আলোচনা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত বলেই মনে হয়।

কোঁড়কদি নিবাসী রামধন দেবশর্মার "বিধবাবেদন নিষেধক"ও বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তকের প্রতিবাদে রচিত। পুস্তকটির আরম্ভেই রয়েছে—"বিবাহিতায়াযোষিতঃ কলৌ পুরুষান্তরেণ সহপুনরুদ্বাহঃ শাস্ত্রনিষিদ্ধঃ।

অনুবাদ

বিবাহিতা স্ত্রীর কলিযুগে পুরুষান্তরের সহিত পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ ইতি।"

[বিধবাবেদন নিষেধক—রামধন দেবশর্মা ; (প্রকাশকাল অজ্ঞাত) পৃঃ ১]

বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তকে বিদ্যাসাগর পৌনর্ভব পুত্র ও কলিযুগে বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত সন্তানের স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন রামধনও তাকে মেনে নিতে পারেন নি। বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের বিরোধিতা করে তাই তিনি বলেছিলেন—

"প্রথম 'পৌনর্ভব পুত্র' যদি যুগান্তরীয় হইল তবে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হইলে তাহাতে যে পুত্র হইবে সেই পৌনর্ভব, অতএব পৌনর্ভব পুত্রের ঘটক বিধবাবিবাহ ইহা স্বীকার করিলেও, যে যে যুগে পৌনর্ভব পুত্র বিহিত ছিল সেই সেই যুগেই বিধবাবিবাহের বিধি স্বীকার করা উচিত। পৌনর্ভব পুত্র কলিযুগে স্বীকার না করিয়া তৎপ্রতিপাদক মনুবচন বিধবাবিবাহ প্রতিপাদক বলিয়া কলিযুগে বিধবাবিবাহে প্রমাণোপন্যাস করা কোন রূপেই সঙ্গত হইতে পারে না।" (তদেব ; পৃঃ ৪৬-৪৭)

এই যুক্তি কিন্তু খুব দুর্বল নয়। প্রসঙ্গক্রমে রামধন আরও বলেছিলেন, পৌনর্ভব আর ঔরসপুত্রের সংজ্ঞা সর্বযুগেই এক, অতএব কলিযুগে বিবাহিতা বিধবার পুত্র যে ঔরসপুত্র হবে তা বলা যাবে কি প্রকারে। তাছাড়া পৌনর্ভব পুত্রের উল্লেখ থাকলেই যে তা বিধবাবিবাহ সমর্থক হবে তাও বলা যায় না। রামধনের এই বক্তব্য বেশ চিন্তাপূর্ণ।

বিদ্যাসাগর মহাভারত থেকে দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে বলেছিলেন, বিবাহিতা বিধবা নারী উলূপীর গর্ভজাত অর্জুনপুত্র ঔরসপুত্ররূপেই অভিহিত হয়েছিল। রামধন তার বিরোধিতা করে বলেছিলেন, মহাভারতের অন্যত্র ঐ পুত্র সম্বন্ধে 'আত্মজ' শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে। মনু প্রভৃতি মনীষীরা ঔরস পদের যে মুখ্য অর্থ করেছেন তা সেখানে প্রযোজ্য নয়।

বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন করেছিলেন, ব্যাসদেবের বচন অনুসারে আদি পুরাণ ও পরাশর সংহিতার বিরোধে পরাশর সংহিতাই মান্য। রামধন এর জবাবে আদিপুরাণীয় বচনও যে দুর্বল নয় তাই প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ক্রতুসংহিতা ও কলিপ্রকরণীয় মনুসংহিতার সহিত এই পুরাণবচনের একবাক্যতা থাকা প্রযুক্ত ঐ দুর্ব্বলতা ঘটিতে পারে না।" (তদেব ; পৃঃ ৮১)

বিদ্যাসাগরের মতে কলিযুগে পরাশর শাস্ত্রই মান্য। কিন্তু রামধন বলেছিলেন, পরাশর শাস্ত্রে বিহিত 'কর্ম্ম বা ধর্ম্ম' যদি 'মন্বাদি শাস্ত্রাভিপ্রায়ের বিপরীত' হয় তাহলে কলিযুগে তা আচরণীয় হবে না।

এই যুক্তি আদৌ বলিষ্ঠ নয় ;—তাহলে আর পরাশর শাস্ত্রের প্রয়োজন কি !

রামধন পরাশরের 'নষ্টেমৃতে' বচনকে শঙ্খের বচন বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু এই বক্তব্যের পক্ষে সুযুক্তি দিতে পারেন নি।

বিদ্যাসাগর অর্জুনের বিধবা নাগকন্যা-বিবাহের ঘটনাকে কলিযুগের বিধবাবিবাহের নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু রামধন বলেছিলেন. পাণ্ডবদের জন্মই কলিতে নয়। তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন, দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিকালেই পাণ্ডবদের জন্ম হয়েছিল।

কিন্তু তাও যদি হয়, বড় হয়ে নানা ঘটনার আবর্তে ঘুরতে ঘুরতে অর্জুন যখন বিবাহ করে তখন কি কলিযুগ এসে যায় নি ?

বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকার দরুণ সমাজে ব্যভিচার দেখা দিয়েছিল. বিদ্যাসাগরের ঐ বক্তব্যও রামধন মেনে নেন নি। তাঁর মতে ব্যভিচার সধবাও করে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রেও রামধন কোন সবল যুক্তি দিতে পারেন নি ; কেননা যে কারণে এবং যত ব্যাপকভাবে বিধবা রমণীর পক্ষে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া সম্ভব সেই কারণে ততব্যাপকভাবে সধবা রমণীর পক্ষে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক নয়।

বিধবাবিবাহ অপ্রচলন হেতু উদ্ভূত ভ্রূণ হত্যা সমস্যাকেও রামধন লঘু করে দেখেছিলেন ; এবং ঐ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে অত্যন্ত দুর্বল যুক্তি বিস্তার করেছিলেন।

রামধন ক্ষত বা অক্ষতযোনি কোনরকম বিধবারমণীর বিবাহকেই শাস্ত্রসম্মত মনে করেন নি। আপন বক্তব্যের পক্ষে তিনি শাস্ত্রীয় যুক্তি যথেষ্ট পরিমানেই দিয়েছিলেন ; সময় সময় তাঁর যুক্তির মধ্যে সবলতা যে দেখা দেয়নি তাও নয় ; কিন্তু তবুও বলতে হয়, সবকিছুর উপর তাঁর রক্ষণশীলতাই প্রকটিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর রক্ষণশীলতার কাছে যুক্তি কিভাবে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল তার একটি দৃষ্টান্ত খুবই উল্লেখযোগ্য—

বিধবাবিবাহের পক্ষে বলা হয়েছিল. ঐ বিবাহ প্রচলিত থাকলে ঈশ্বরাভিপ্রেত প্রজাবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। রামধন তার বিরুদ্ধে বলেছিলেন, প্রজাবৃদ্ধিই যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত হবে তাহলে তিনি বন্ধ্যা নারী সৃষ্টি করলেন কেন ! নপুংসকই বা তিনি সৃষ্টি করেছেন কেন ! আসলে সবই অদৃষ্টের ব্যাপার। "বিধবা অদৃষ্টানুসারে হয়। বিনাশও অদৃষ্টানুসারেই হয়। সকল কার্যাই সমান। বিধবা-বিবাহ নিষেধাবলম্বনে ঈশ্বরের সৃষ্টি কার্য্যের ত্রুটি করা হয়। এমত বিবেচনা

করিলে মনুষ্যাদি সকল প্রাণি হত্যাও করিতে হয় যেহেতুক হত্যা না করিলে ঈশ্বরের বিনাশ কার্য্যের ত্রুটি করা হয়।" (তদেব ; পৃঃ ১৬৪)

বিদ্যাসাগর রচিত বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তকের বিরুদ্ধে আরও অনেকে পুস্তকাদি রচনা করেছিলেন ; কিন্তু ঐ সব পুস্তকের অধিকাংশই আজ হারিয়ে গেছে। দু' একটি হয়ত বা এখনও টিকে আছে, কিন্তু সে সব রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নি।

যাইহোক, সে যুগের বহু প্রতিবাদীর বক্তব্যের উত্তর দেবার জন্যে বিদ্যাসাগর সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন এবং খুব নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" (দ্বিতীয় পুস্তক) রচনা করেছিলেন।

সাধারণভাবে বলা যায়, বিদ্যাসাগরের সমালোচকেরা ছিলেন গোঁড়া রক্ষণশীল ব্যক্তি। তার ফলে যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে গেলে যে স্থৈর্য ও পূর্বধারণামুক্ত বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ থাকার প্রয়োজন তা তাঁদের খুব একটা ছিল না। এই কারণে তাঁদের প্রতিবাদপুস্তকে তত্ত্বনির্ণয় প্রচেষ্টা অনেক সময়ই লঘু হয়ে গিয়েছে। বিদ্যাসাগরও বলেছিলেন, অনেক প্রতিবাদ পুস্তকে 'কতকগুলি অলীক অমূলক আপত্তি উত্থাপন' করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাছাড়া রক্ষণশীলতার বশবর্তী হবার জন্যে ঐ সব প্রতিবাদকারীর অনেকে নিজ নিজ মতামত প্রতিষ্ঠার চেষ্টাতে শাস্ত্রীয় বচনের বিকৃতিও ঘটিয়েছিলেন। তার বঙ্গানুবাদের সময়েও তাঁরা কারচুপি করতেন।

বিদ্যাসাগরের বিতর্কমূলক রচনা ছিল এই সব ত্রুটি থেকে মুক্ত। শাস্ত্রীয় আলোচনায় বিদ্যাসাগর যুক্তি ও তত্ত্বের গাম্ভীর্য বজায় রাখবারই পক্ষপাতী ছিলেন। ঐ ধরনের আলোচনায় স্থূল ব্যক্তিগত আক্রমণ বা অশ্লীল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকে তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি।

বিদ্যাসাগরবিরোধীদের প্রায় সকলেরই কথা ছিল, 'নষ্টেমৃতে' বচনে বাগ্দত্তা নারীরই পুনর্বিবাহের কথা বলা হয়েছে—বিধবানারীর বিবাহের কথা ওখানে বলা হয় নি। বিদ্যাসাগর তার জবাবে প্রথম পুস্তকে ব্যক্ত নিজের মতকে আরও প্রমাণাদি দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'নষ্টেমৃতে' বচনে যে পাঁচটি আপদের কথা রয়েছে সেগুলি বিবাহিতা নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তিনি আরও বলেছিলেন, বিধবাবিবাহ বিরোধী মাধবাচার্যও পরাশরের ঐ বচনকে বিধবা বা বিবাহিতা নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে মনে করেছিলেন। বিদ্যাসাগর আপনার বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্যে নারদসংহিতারও

সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। 'নষ্টেমৃতে' বচনে যে পাঁচটি আপদের উল্লেখ করা হয়েছে সেই পাঁচটি অবস্থায় পুনর্বিবাহের আগে নারী কিছুকাল অপেক্ষা করবে বলে নারদসংহিতায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল; তবে সন্তান না হলে বিভিন্নবর্ণের নারীগণ সন্তানবতী নারী অপেক্ষা কম সময় অপেক্ষা করবে। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, নারদসংহিতার এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়, পরাশর বচন বাগ্‌দত্তা নারী সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারে না; কেননা বাগ্‌দত্তা নারীর সন্তান থাকা সম্ভবপর নয়। নিঃসন্দেহে এ যুক্তি বলিষ্ঠ এবং অকাট্য।

আপাতঃদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়, কোন কোন শাস্ত্রে বিবাহিতা নারীর বিবাহ যেমন নিষিদ্ধ হয়েছে তেমনি আবার কোন কোন শাস্ত্রে তা বিহিতও বলা হয়েছে; অর্থাৎ এই বিষয়ে শাস্ত্রগ্রন্থগুলির মধ্যে একটি বিরোধিতা রয়েছে। বিদ্যাসাগর এই বিরোধিতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তার সমাধান করেছিলেন এবং বলেছিলেন, কয়েকজন শাস্ত্রবেত্তা সকল যুগের জন্যেই বিবাহিতা নারীর বিবাহ নিষিদ্ধ বলেছিলেন; কয়েকজন আবার তাকে 'সামান্যাকারে' বা সাধারণভাবে শুধু কলিযুগের জন্যেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। পরাশর মুনি এই দুই মতের মধ্যে কোন বিরোধ না ঘটিয়ে বা তাদের অগ্রাহ্য না করে কলিযুগে মাত্র পাঁচটি বিশেষস্থলে বিবাহিতা নারীর পুনর্বিবাহের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের মতে এই বিশেষবিধি অমান্য হতে পারে না।

বিদ্যাসাগরের সমালোচকেরা তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পরাশর সংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্যের বক্তব্য অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, পরাশরের ঐ 'নষ্টেমৃতে' বচনটিকে মাধবাচার্যও কলিযুগ সম্বন্ধীয় নয় বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। মাধবাচার্যের মতে আদিপুরাণে কলিযুগে নারীর দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছে বলে পরাশরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক বচন কলিযুগে মান্য হতে পারে না।

বিদ্যাসাগর কিন্তু নানা যুক্তি দিয়ে তাঁর বিরোধীপক্ষের উত্থাপিত ঐ বক্তব্য খণ্ডন করেছিলেন এবং বলেছিলেন, মাধবাচার্য পরাশর সংহিতাকে কলিযুগের শাস্ত্রহিসেবেই মেনে নিয়েছিলেন; অতএব ঐ সংহিতার 'নষ্টেমৃতে' বচনটি সেই যুগ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হবে।

বিদ্যাসাগর এই প্রসঙ্গে আরও আলোচনা করেছিলেন। পরাশরের 'নষ্টেমৃতে' বচনটির পরে আরও কটি পংক্তি ছিল—

"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটি চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যাহনুগচ্ছতি॥"

[বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (২য়)—সাক্ষরতা প্রকাশন (১৯৭২) ; পৃঃ ২৬]

বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, বিবাহিতার পুনর্বিবাহের বিধি কলিভিন্ন অন্য যুগ সম্বন্ধীয় হলে ব্রহ্মচর্য ও সহমরণও নিশ্চয় কলিযুগ সম্বন্ধীয় হবে না। কিন্তু মাধবাচার্যের বক্তব্য অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য ও সহমরণই কেবল কলিযুগের জন্যে। এহেন অবস্থায় দেখা যায়, তাঁর ব্যাখ্যাতে অসঙ্গতিই ঘটেছে। পূর্বে উদ্ধৃত পরাশর বচনের নির্গলিত অর্থ অনুধাবন করলে দেখা যায়, কলিযুগে বিধবানারী বিবাহ করতে পারে বটে কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য পালনই অধিক ফলপ্রদ ; তবে সহগমনেই ফল পাওয়া যায় সর্বাধিক। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, এই বক্তব্য অনুসারে স্বামীর মৃত্যুর পরে নারীর পুনর্বিবাহ স্বীকার না করলে তার পরবর্তী ব্রহ্মচর্য এবং সহগমনকে কি করে তুলনাগত বিচার করা যাবে। ব্রহ্মচর্য ও সহগমনকে যার থেকে শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠতর বলা হয়েছে সেই পুনর্বিবাহকেও কলিযুগের পক্ষে স্বীকার করে নিতে হবে। এই পুনর্বিবাহ, ব্রহ্মচর্য ও সহগমন তিনটিই হয় কলিযুগের জন্যে নয় কলি ভিন্ন অন্য যুগের জন্যে নির্দিষ্ট বলে মানতে হবে। মোটমাট তিনটিকে একই যুগের হতে হবে। মাধবাচার্যের মতে পরাশর সংহিতা কলিযুগেরই শাস্ত্র; সুতরাং ঐ বচনের বক্তব্য কলিযুগের জন্যেই নির্দিষ্ট। ঐ বচনের একটি বিষয় এক যুগের হবে, অপর বিষয় আর এক-যুগের হবে তা কখনও হতে পারে না। বিদ্যাসাগরের এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধেয়।

বিদ্যাসাগর আরও একটি যুক্তিতে মাধবাচার্যের বক্তব্যের অসঙ্গতি দেখিয়ে তাঁর বিরোধীপক্ষের মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন—

মাধবাচার্য বলেছিলেন, কলিযুগের মানুষের পক্ষে কষ্টসাধ্য ধর্মীয় আচরণ পালন করা সম্ভবপর নয় বলে পরাশর মুনি কলিযুগের মানুষের জন্যে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ধর্মপালনেরই নির্দেশ দিয়েছিলেন। মাধবাচার্যের ঐ বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, পরাশর বচনে বিধবানারীর আচরণীয় তিনটি আচরণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজ পুনর্বিবাহই উল্লিখিত হয়েছিল সর্বপ্রথমে। পরে তার থেকে শক্ত ব্রহ্মচর্য এবং সর্বশেষে কঠিনতম সহগমনের কথা পরাশর উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু মাধবাচার্যই ঐ তিন ব্যবস্থার সহজটিকেই অর্থাৎ পুনর্বিবাহকেই বাদ দিয়ে অপর দুটিকে কলিযুগের ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

এর ফলে, বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্যকেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের এই যুক্তিও বরণীয়।

মাধবাচার্যের বক্তব্যের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর আরও যুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আদি পুরাণের যে বচন উদ্ধার করে মাধবাচার্য পরাশর বচন কলিযুগে প্রযোজ্য নয় বলেছিলেন আসলে তা আদিপুরাণেরই বচন নয়। তা' ছাড়া "আদিপুরাণের বচন সামান্য শাস্ত্র, পরাশর বচন বিশেষ শাস্ত্র। সামান্য শাস্ত্র দ্বারা বিশেষ শাস্ত্রের বাধ অথবা সঙ্কোচ না হইয়া বিশেষ শাস্ত্র দ্বারাই সামান্য শাস্ত্রের বাধ ও সঙ্কোচ হইয়া থাকে।"

[বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (২য়)—সাক্ষরতা প্রকাশন ; ১৯৭২। পৃঃ ৫৬]

বস্তুতঃ বিরোধীপক্ষ বিদ্যাসাগরের যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে মাধবাচার্যের যে বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন বিদ্যাসাগর তার বিরুদ্ধে সবল যুক্তিরই আঘাত দিতে পেরেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বিরোধী পক্ষের কেউ কেউ বলেছিলেন, পরাশরের 'নষ্টেমৃতে' বচন মনুস্মৃতির বিরোধী ;—মনু বিধবাবিবাহ সমর্থন করেন নি। অতএব পরাশরবচন গ্রাহ্য নয়। বিদ্যাসাগর তার 'দ্বিতীয় পুস্তকে' খুব বিস্তৃতভাবেই এই বক্তব্যের জবাব দিয়েছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন, পরাশর মনুশাস্ত্রকে সত্যযুগের বলে নির্দেশ করেছিলেন ; সত্যযুগেই তাই মনু-সংহিতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ছিল। ঐ যুগেই তার বিরুদ্ধ স্মৃতি গ্রাহ্য ছিল না। অতএব কলিযুগে যে মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ স্মৃতি গ্রাহ্য হবে না তা নয়। বরং "বিষয়বিশেষে মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি গ্রাহ্য হইতেছে, এবং তদনুযায়ী ব্যবহারও ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশে প্রচলিত আছে,"…… (তদেব ; পৃঃ ৫৯)

কিন্তু এহবাহ্য। মনু কি সত্যিই বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন ?—বিদ্যাসাগরের মতে মনু বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন না। তিনি দেখিয়েছিলেন, মনুসংহিতায় (৯।১৭৫) বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত সন্তানকে পৌনর্ভব বলা হয়েছে। ঐ পৌনর্ভব শব্দের ব্যবহারের মধ্যে মনুর বিধবাবিবাহ-সমর্থন রয়েছে বলে বিদ্যাসাগর মনে করেছিলেন। বিদ্যাসাগর-বিরোধীদের মধ্যে অনেকে, যেমন কালিদাস মৈত্র, বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে মনুর বক্তব্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, পৌনর্ভবপুত্রের সংজ্ঞা নির্ণয় করবার প্রসঙ্গেই মনু পৌনর্ভবপুত্রের উল্লেখ করেছিলেন ; কিন্তু ঐ পুত্র যে শাস্ত্রসম্মত তা তিনি বলেন নি। বিদ্যাসাগর তার বিরুদ্ধে বলেছিলেন, "মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য যখন

পৌনর্ভবকে শ্রাদ্ধাধিকারী ও ধনাধিকারী কীর্তন করিয়া গিয়াছেন, তখন পৌনর্ভব শাস্ত্রীয় পুত্র নহে, এ কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।" (তদেব ; পৃঃ ৬৬)

দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে মনুশাস্ত্রে পৌনর্ভব পুত্রের স্থান দশম হওয়ায় অনেকে তাকে নিকৃষ্ট বলে মনে করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তার উত্তরে বলেছিলেন, মনুসংহিতায় পৌনর্ভবের মর্যাদা উচ্চ না হলেও যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু এঁরা তার অতখানি অমর্যাদা করেন নি। তাছাড়া—

"মনুসংহিতা সত্যযুগের প্রধান শাস্ত্র ; সুতরাং সেই যুগেই পৌনর্ভব নিকৃষ্ট পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। সর্ব যুগের নিমিত্ত ঐ ব্যবস্থা হইলে, পৌনর্ভবকে যাজ্ঞবল্ক্য সপ্তম স্থানে, এবং বিষ্ণু ও বশিষ্ঠ চতুর্থ স্থানে, কদাচ গণনা করিতেন না। অতএব যখন মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু ও বশিষ্ঠ পৌনর্ভব ধর্মকীর্তন দ্বারা বিধবাদি স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ সংস্কারের বিধান করিতেছেন, তখন বিধবার বিবাহ মনু অথবা অন্যান্য মুনির মতের বিরুদ্ধ, এ কথা কোনও মতে সঙ্গত ও বিচারসহ হইতেছে না।" (তদেব, পৃঃ ৬৭-৬৮)

বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, বিধবার বিবাহ মনু এবং পরাশর কেউই নিষিদ্ধ বলে মনে করেন নি ; তবে পুনর্বিবাহিতা নারীকে মনু পুনর্ভূ এবং তার সন্তানকে পৌনর্ভব বলেছেন, কিন্তু কলিযুগে ঐরূপ বলা অভিপ্রেত নয় বলেই পরাশর পুনর্ভূ বা পৌনর্ভব শব্দ ব্যবহার করেন নি। ঐ নারী কলিযুগে পুনর্ভূ নয়—সাধারণ অর্থে স্ত্রী বা সহধর্মিণী বলতে যা বোঝায় তাই-ই ; এবং তার পুত্রও পৌনর্ভব নয়—ঔরসজাত পুত্রই।

এরপর মনুসংহিতার যে যে বচন বা বচনাংশের সাহায্যে বিরোধীরা বিধবা-বিবাহ মনুবিরুদ্ধ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন বিদ্যাসাগর সেই সব বচন বা বচনাংশের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করে তাদের বক্তব্য খণ্ডনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, প্রতিপক্ষ পরস্পর সঙ্গতিযুক্ত বচনসমূহ থেকে একটি অংশ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বক্তব্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, "ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে॥ ৫।১৬২। এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ পর পুরুষ সাধ্বী স্ত্রীদিগের পক্ষে কোনও শাস্ত্রে ভর্তা বলিয়া উপদিষ্ট নহে।"

(তদেব ; পৃঃ ৭০)

এই ভগ্নবচনের সাহায্যে বিরোধীপক্ষ বলতে চেয়েছিলেন, মনু বিধবাবিবাহ সমর্থন করেন নি। কিন্তু মনুসংহিতার ৫ম অধ্যায়ের ১৬০, ১৬১ ও ১৬২ সংখ্যক শ্লোকের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে এই বচনের সম্পূর্ণ অন্য অর্থ বা তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে

উঠবে। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, বিরোধীপক্ষ উদ্ধৃত বচনাংশের দ্বারা নারীর দ্বিতীয় বিবাহ হতে পারে না—এই কথা আদৌ বোঝা যায় না। তাহলে মনু-কথিত পৌনর্ভব সন্তান-বিধির সঙ্গে তার অসঙ্গতিই ঘটবে।

"ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ" (মনুসংহিতা ৯। ৬৫) বচনাংশের দ্বারাও প্রতিপক্ষ বিধবাবিবাহকে মনু বিরুদ্ধ বলতে চেয়েছিলেন। এরও জবাবে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, ঐ অর্থ ধরলে মনুকথিত পৌনর্ভব সম্বন্ধীয় বক্তব্যের সঙ্গে তার মিল থাকবে না। তাছাড়া যে প্রসঙ্গে ঐ বচনাংশ ব্যবহৃত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তার অর্থও দাঁড়াবে অন্য রকম।

বিদ্যাসাগর আরও একটি বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, নারদসংহিতা হলো মনুসংহিতারই একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। ঐ সংহিতাতেও পরাশর কথিত পাঁচ অবস্থায় নারীর পুনর্বিবাহের কথা পাওয়া যায়। অতএব ঐ পাঁচ অবস্থায় নারীর করণীয় বিষয় কি তা শুধু পরাশরই বলেন নি, মনুও বলেছিলেন। মাধবাচার্যও সেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন; সুতরাং বিধবাবিবাহ মনুবিরুদ্ধ একথা বলা যায় না।

নন্দকুমার কবিরত্ন, ভবানন্দ ন্যায়বাগীশ ইত্যাদি ব্যক্তির বক্তব্য ছিল, বেদবিরুদ্ধ হওয়ায় পরাশরপ্রোক্ত 'নষ্টেমৃতে' বচন মান্য হতে পারে না। ঐ বক্তব্যের সমর্থনে তাঁরা এই বেদবাক্য উদ্ধার করেছিলেন—

"যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দেত। যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্ যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত॥" (তদেব, পৃঃ ৭৭)

বিদ্যাসাগরকৃত এই বচনের অনুবাদ—

"যেমন এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে। যেমন এক রজ্জু দুই যূপে বেষ্টন করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না।" (তদেব ; ৭৮)

বেদবচনের এই অনুবাদের পরে বিদ্যাসাগর ঐ বচনের সারার্থ নির্ণয় করে বলেছিলেন, এককালে কোন স্ত্রী দুই পুরুষকে বিবাহ করতে পারে না, তবে পুরুষ পারে। এর সঙ্গে বিধবাবিবাহ বা নারীর দ্বিতীয় বিবাহের কোন সম্পর্ক নেই। বিদ্যাসাগর এই প্রসঙ্গে বিরোধীপক্ষকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—

"প্রতিবাদী মহাশয়দিগের ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক ছিল, যদি বিধবা-বিবাহ এককালেই বেদবিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগে বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকিত না।" (তদেব ; পৃঃ ৭৮)

বিদ্যাসাগর খুব নিপুণভাবেই বিষয়টি আলোচনা করেছিলেন ; কিন্তু বেদে যে বিধবাবিবাহের নির্দেশ ছিল তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি দেন নি।

বিধবাবিবাহের অনুকূলে পরাশরের 'নষ্টেমৃতে' বচনকে কেউ কেউ শঙ্খের বলে অভিহিত করেছিলেন। কৃষ্ণকিশোর নিয়োগীরও সেই মত ছিল। বিদ্যাসাগর কিন্তু তারও বিরোধিতা করেছিলেন।

তদানীন্তন ভবানীপুরের প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, পরাশর বৈধব্যের যন্ত্রণাকে দণ্ড বলে অভিহিত করেছিলেন ; বিধবাবিবাহের বিধান দিলে তিনি আর দণ্ডের কথা তুলবেন কেন! বিধবাবিবাহ বিধিসম্মত হলে বৈধব্যের যন্ত্রণাকে দণ্ড বলার প্রশ্ন ওঠে না। প্রসন্নকুমার আরও বলেছিলেন, স্বামী ক্লীব হলে স্ত্রী আবার বিবাহ করতে পাবে পরাশর সে কথা বলতে পারেন না, কেন না তিনি ক্ষেত্রজপুত্রের বিধান দিয়েছিলেন ; স্বামী ক্লীব হলে অপরকে যখন পুত্রার্থে নিয়োগ করা যেতে পারে তখন ক্লীব স্বামীর স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করবে কেন! বিবাহ করলে সে আর ক্লীব স্বামীর স্ত্রীই রইল না। এই জন্যে প্রসন্নকুমার বলেছিলেন, পরাশরের নামে প্রচলিত ঐ 'নষ্টেমৃতে' বচন আসলে কৃত্রিম এবং "ভারতবর্ষের দুরবস্থাকালে, হিন্দু রাজাদিগের ইচ্ছানুসারে, ঐ কৃত্রিম বচন সংহিতামধ্যে নিবেশিত হইয়াছে।" (তদেব, পৃঃ ৮৩)

বিদ্যাসাগর প্রসন্নকুমারের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে খুব জোরালো যুক্তি দিয়েছিলেন।

বিধবা যদি পুনরায় বিবাহ করে তাহলে তাকে যাবজ্জীবন বৈধব্যযন্ত্রণা পেতে হবে না বটে, তবে বিবাহের আগে পর্যন্ত কিছুদিন ঐ যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতেই হয়। কাজেই যে ভাবে হোক না কেন, নারীর কাছে বৈধব্য নিতান্ত বেদনাদায়কই হয়ে ওঠে। অতএব বৈধব্যদশাকে দণ্ড বলা সত্ত্বেও বিধবাবিবাহের বিধি দেওয়া পরাশরের পক্ষে অসঙ্গত হয়েছে সে কথা বলা যায় না। বিদ্যাসাগর প্রসন্নকুমারের অপর যুক্তির বিরুদ্ধে বলেছিলেন, ক্লীব স্বামী ত্যাগ করে পুনর্বিবাহিতা হবার বিধান এবং ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের বিধান এই দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ ঘটতে পারে না ; কেননা ক্লীব স্বামী পরিত্যাগ করে নারী অন্য পুরুষকে বিবাহ করতেও পারে, আবার নাও পারে। যদি না বিবাহ করে তাহলে পতির অনুমতিতে শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে তার ক্ষেত্রে অন্যে পুত্র উৎপাদন করতে পারে। এই অর্থে কোন বিরোধই ঘটে না। ক্লীব স্বামীর স্ত্রী অন্য

বিবাহের আগে পূর্ব স্বামীর বংশ রক্ষার জন্যেও ঐভাবে সন্তানধারণ করতে পারে। তাছাড়া "স্বামী পুত্রোৎপাদন না করিয়া মরিবার সময়, যদি স্ত্রীকে ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনের অনুমতি দিয়া যান, তাহা হইলেও, যদি ঐ স্ত্রী পুনর্বার বিবাহ করে, ঐ বিবাহের পূর্বে, পূর্বস্বামীর বংশরক্ষার্থ ক্ষেত্রজ পুত্রের উৎপাদন সম্পন্ন হইতে পারে।" (তদেব; পৃঃ ৮৬)

প্রসন্নকুমারের যুক্তির বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর একথাও জানিয়েছিলেন, পুত্র প্রকরণে পরাশর ক্ষেত্রজপুত্রের কথা আদৌ বলেন নি।

বিদ্যাসাগর আরও বলেছিলেন; 'নষ্টেমৃতে' বচন কোন সময়ে কোন হিন্দু-রাজার আমলে পরাশর সংহিতায় প্রবিষ্ট হয়েছিল একথাও সত্য নয়; কেননা বহু আগের মানুষ মাধবাচার্য ঐ বচনটিকে পরাশর বচন বলেই গ্রহণ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের আর একজন সমালোচক কালিদাস মৈত্র সিদ্ধান্ত করেছিলেন, "পতিরন্যো বিধীয়তে, এই স্থলে বিধীয়তে পদের পূর্বে অকার ছিল, লোপ হইয়াছে, তাহাতে ন বিধীয়তে এই অর্থলাভ হইতেছে।" (তদেব; ৮৭) অর্থাৎ 'নষ্টেমৃতে' বচনে নারীর পুনর্বিবাহের বিধি পরাশর দেন নি।

কালিদাস মৈত্রের এই সিদ্ধান্ত একেবারেই ভ্রান্ত। বিদ্যাসাগর মৈত্র মহাশয় উল্লিখিত পরাশর বচনের ঠিক পরেই যে প্রসঙ্গ রয়েছে তার বিচার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন, পূর্বোক্ত বচনে অ-বিধীয়তে হতেই পারে না। বিদ্যাসাগরের ঐ বিচার পদ্ধতিটি খুবই বৈজ্ঞানিক হয়েছে বলা যায়। ব্যাকরণের দিক দিয়েও যে বচনটিতে অ-বিধীয়তে হবার উপায় নেই বিদ্যাসাগর তাও প্রমাণ করেছিলেন।

প্রতিবাদী কালিদাস মৈত্র বলেছিলেন, বিধীয়তে অর্থধরলে অর্থাৎ পরাশরের ঐ বচনকে বিবাহ বিধায়ক প্রতিপন্ন করলে "পরাশর সংহিতার পূর্বাপর বিরুদ্ধ হইয়া উঠে"। তিনি বলেছিলেন, পরাশর বৈধব্যকে অপরাধীর অপরাধের শাস্তি (দণ্ড) হিসেবে দেখেছেন এবং ঋতুমতী নারীকে বিবাহ করবার মধ্যে দোষ রয়েছে বলে নির্দেশ দিয়েছেন। বিধবার বিবাহে মত থাকলে এই উভয় ব্যাপারে পরাশর এমন বক্তব্য রাখতেন না।

বৈধব্যকে দণ্ড বলার জন্যে পরাশর বিধবাবিবাহের নির্দেশ দিতে পারেন না; দিলে তা' অসঙ্গতিপূর্ণই হবে—এই কথা প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়ও বলেছিলেন। অতএব বিদ্যাসাগর তার জবাবে যে যুক্তি দিয়েছিলেন কালিদাস মৈত্রের বক্তব্যের বিরুদ্ধেও তা সমভাবে প্রযোজ্য।

ঋতুমতী বিবাহের নিষেধবিধি সম্বন্ধে মৈত্র মহাশয় যা বলেছিলেন, তার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর জানিয়েছিলেন, কন্যার প্রথম বিবাহের সময় সম্বন্ধেই ঐ দোষ কথিত হয়েছে,—বিধবার বিবাহ সম্বন্ধীয় বক্তব্য প্রসঙ্গে ঐ কথা বলা হয় নি।

বর (অজ্ঞাতপরিচয়) এবং কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাসদ্‌গণ মহাভারতের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বলেছিলেন। প্রতিবাদীগণ মহাভারতের আদি পর্বস্থিত দীর্ঘতমার নিম্নলিখিত বচনের—

"অদ্যপ্রভৃতি মর্য্যাদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা।
এক এব পতির্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম্ ॥৩১॥
মৃতে জীবতি বা তস্মিন্নাপরং প্রাপ্নুয়ান্নরম্।
অভিগম্য পরং নারী পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩২॥ (তদেব; পৃঃ ৯০)

বঙ্গানুবাদ করেছিলেন এইভাবে—

"মহর্ষি দীর্ঘতমা কহিয়াছেন। আমি অদ্যাবধি লোকেতে মর্যাদা স্থাপিতা করিলাম। নারীর কেবল এক পতি হইবেক, যাবজ্জীবন তাহাকে আশ্রয় করিবে। সেই পতি মরিলে কিংবা জীবিত থাকিলে নারী অন্য নরকে প্রাপ্তা হইবে না। নারী অন্য পুরুষকে গমন করিলে নিঃসন্দেহ পতিতা হইবে।"

(তদেব; পৃঃ ৯১)

বিদ্যাসাগর কিন্তু ঐ বচনের অর্থ করেছিলেন ভিন্নতর; তাঁর সিদ্ধান্তও হয়েছিল অন্যরকম—

"আজি অবধি আমি লোকে এই নিয়ম স্থাপন করিলাম যে, কেবল পতিই স্ত্রীলোকের যাবজ্জীবন পরায়ণ হইবেক, অর্থাৎ স্ত্রী পতিপরায়ণা হইয়াই জীবনকাল ক্ষেপণ করিবেক। স্বামী মরিলে, অথবা জীবিত থাকিলে, স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগতা হইবে না; অন্য পুরুষে উপগতা হইলে, নিঃসন্দেহ পতিতা হইবে। এ স্থলের তাৎপর্য এই যে, স্ত্রী কেবল পতিকে অবলম্বন করিয়া জীবন-যাপন করিবেক, স্বামীর জীবদ্দশায় অথবা মরণান্তর অন্য পুরুষে উপগতা অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হইলে পতিতা হইবেক।" (তদেব; পৃঃ ৯১)

বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, প্রাচীনকালে ব্যভিচারকে নিন্দনীয় বলে গণ্য করা হতো না। মহাভারতের এক জায়গায় পাণ্ডু কুন্তীকে বলেছিলেন, ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে নারী স্বাধীনা হতে পারে। এই বক্তব্যের মধ্যেই তার প্রমাণ মেলে। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, দীর্ঘতমার ঐ উক্তির মধ্যে নারীর ঐ স্বভাবই নিষিদ্ধ হয়েছিল। কাজেই, ঐ বক্তব্য থেকে একথা বলা যায় না, নারী "শাস্ত্রের

বিধানানুসারেও, পুরুষান্তরাশ্রয়ণ অর্থাৎ পত্যন্তর গ্রহণ” (তদেব ; পৃঃ ৯৪) করতে পারবে না।

এই প্রসঙ্গে মহাভারতে যে বিধবাবিবাহের নজীর রয়েছে তা বোঝাবার জন্যে বিদ্যাসাগর অর্জুনের বিধবা ঐরাবতকন্যা-বিবাহের উল্লেখ করেছিলেন।

অন্যভাবেও বিদ্যাসাগর প্রতিবাদীগণের বক্তব্য খণ্ডন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যদি ধরেও নেওয়া যায়, দীর্ঘতমা বিবাহিতা স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ করেছিলেন তাহলেও বলা যায়, “তিনি যুগবিশেষের নির্দেশ করেন নাই। সুতরাং, ঐ নিয়ম সামান্যতঃ সকল যুগের পক্ষেই স্থাপিত হইয়াছে, বলিতে হইবেক। কিন্তু পরাশর বিশেষ করিয়া কলিযুগের পক্ষে বিধি দিয়াছেন। সুতরাং, পরাশরের বিশেষ বিধি দীর্ঘতমার সামান্য বিধি অপেক্ষা বলবান্ হইতেছে।” (তদেব ; পৃঃ ৯৭)

বিদ্যাসাগর এ ছাড়াও বলেছিলেন, দীর্ঘতমা শুধু কলিযুগের জন্যে নিয়মস্থাপন করেছিলেন সে কথাও যদি বলা যায়, তাহলেও কোন ক্ষতি নেই ; কেননা দীর্ঘতমার বিধি হলো ‘সামান্য বিধি’ আর পরাশরের বিধি হলো ‘বিশেষ বিধি’। উভয়ের মধ্যে বিশেষ বিধিরই বলবত্তা বেশি।

বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর নানাভাবেই প্রমাণ করেছিলেন, কলিতে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ দীর্ঘতমার উক্তিতে তা বলা যায় না। ‘বর’ বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে বলেছিলেন, বৃহৎ পরাশর সংহিতায় পরাশর বিবাহিতা বিধবার দোষ নির্ণয় করে মন্তব্য করেছিলেন, বিধবার অন্ন ভক্ষণের যোগ্য নয়। বিদ্যাসাগর তার বিরুদ্ধেও সুন্দর যুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘বর’ কথিত বক্তব্যে বলা যায় না, কলিতে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ ; কেননা বিধবার বিবাহ ঘটতো বলেই তো তার অন্ন ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল।

বিদ্যাসাগর এই বিষয়ে খুব বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন এবং সবশেষে বলেছিলেন, বৃহৎপরাশর সংহিতা আসলে পরাশরের রচিত নয়। পরাশর সংহিতাই পরাশরের রচিত ; তার প্রমাণ আছে। অন্যদিকে বৃহৎপরাশর সংহিতা যে পরাশরের রচনা নয় তার প্রমাণও রয়েছে। উভয় সংহিতার মধ্যে পার্থক্যও অনেক।

নন্দকুমার কবিরত্ন ও তাঁর সহকারিবৃন্দ, কমলকৃষ্ণ দেবের সভাসদবৃন্দ, রামনিধি বিদ্যাবাগীশ, ঠাকুরদাস শর্মা, শশিজীবন তর্করত্ন এবং জানকীজীবন ন্যায়রত্ন—এঁরা বলেছিলেন, পরাশর সংহিতায় কলিযুগ ছাড়া অন্যযুগের কথাও

যখন রয়েছে তখন বলা যায়, বিধবাদির বিবাহ সেই সব যুগের পক্ষেই উপযুক্ত, কলিযুগের পক্ষে উপযুক্ত নয়। তাঁরা একথাও বলেছিলেন, কলিযুগে পরাশর নির্দিষ্ট কয়েকটি ধর্মাচরণ অন্যান্য শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয়েছিল। এর থেকেই বোঝা যায়, পরাশর সংহিতায় কলিভিন্ন অন্যযুগের কথা রয়েছে।

বিদ্যাসাগর এর জবাবে বলেছিলেন, পরাশরের কয়েকটি বিধানের সঙ্গে দু চারটি পুরাণের কলিযুগীয় বিধানের মিল না থাকলেও বলা যায় না, পরাশরের ঐ সব বিধান কলিযুগে মান্য নয়।

বিদ্যাসাগর প্রতিপক্ষের অন্যান্য যুক্তি খণ্ডন করেও প্রমাণ করেছিলেন, পরাশর সংহিতার সব অধ্যায়ই কলিযুগের জন্যে রচিত হয়েছিল।

পীতাম্বর সেন ছিলেন বিদ্যাসাগরের একজন বড় প্রতিপক্ষ। তিনিও বলেছিলেন, পরাশর সংহিতায় চার যুগের ধর্মই বর্ণিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর তাঁর বক্তব্যেরও জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগের মানুষের শক্তি ও ক্ষমতা এক নয়। এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন যুগের ধর্মও এক হতে পারে না। এই বক্তব্য বোঝাবার জন্যেই কয়েকটি বচনে বিভিন্ন যুগের ধর্মের কথা বললেও আসলে পরাশর কলিধর্মের কথাই বর্ণনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের এই বক্তব্যও অনাদরণীয় হবার নয়।

বিদ্যাসাগর তাঁর প্রথম পুস্তকে বলেছিলেন, মনুসংহিতায় শুধু নানা যুগের নানা ধর্ম এই কথাই রয়েছে, কোন যুগে কোন ধর্ম সে কথা নেই। পরাশর সংহিতাতেই সে কথা বলা হয়েছে। নন্দকুমার কবিরত্ন এবং তাঁর সহকর্মিবৃন্দ তার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, কোন যুগে কোন ধর্ম মনুই তা বলে গিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর প্রতিপক্ষের বক্তব্যের জবাবে বলেছিলেন, কোন যুগের কোনটি প্রধান ধর্ম মনু শুধু তাইই বলেছিলেন—কিন্তু নানা যুগের যাবতীয় ধর্ম তিনি আলোচনা করেন নি।

রামদয়াল তর্করত্ন নামে আর একজন প্রতিবাদী বলেছিলেন, পরাশর সংহিতাতে পতিতা স্ত্রী ত্যাগ নিষিদ্ধ হয়েছে; এবং তার ফলে পতিত স্বামী ত্যাগ করে নারী যে পুনর্বিবাহিতা হবে তার পথও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া ঐ একই সংহিতায় গলৎ কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত পতির প্রতি নারীকে অবজ্ঞা করতেও নিষেধ করা হয়েছিল। এই কারণে 'পতিত পতি' বর্জন করে দ্বিতীয় বিবাহ করা নারীর পক্ষে উচিত নয়।

প্রতিবাদীর বক্তব্যের জবাবে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, গলৎকুষ্ঠী ইত্যাদি রোগগ্রস্ত পতিকে নারী অবজ্ঞা করবে না একথা বলবার পরেও যদি পরাশর বলেন, পতিত পতিকে ত্যাগ করে নারী দ্বিতীয়বিবাহ করতে পারে তাহলেও তাতে বৈসাদৃশ্য ঘটে না। "কারণ, বিবাহবিধায়ক বচনে পতিত পতি ত্যাগ করিয়া বিবাহ করিবার বিধি আছে ; আর অপর বচনে গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি পতির প্রতি অবজ্ঞা করিতে নিষেধ আছে, পতিত শব্দের প্রয়োগ নাই ; সুতরাং বিষয়ভেদ ব্যবস্থা করিলেই বিরোধ পরিহার হইতে পারে ; অর্থাৎ, গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি পতি যদি পতিতের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা করিতে নিষেধ আছে ; কারণ, প্রায়শ্চিত্ত করিলে আর তিনি পতিত নহেন। আর যদি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া পতিতই থাকেন ; তাহা হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিতে পারে। সুতরাং উভয় বচনের আর বিরোধ থাকিতেছে না।" (তদেব ; পৃ: ১৩৮)

বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে একটি বড় যুক্তি ছিল, একবার দান করা হলে কন্যার ওপর আর পিতার স্বত্ব থাকে না ; অতএব কন্যা বিধবা হলে দ্বিতীয়বার তাকে দান করা শাস্ত্রসম্মত নয়। বিদ্যাসাগর এই বক্তব্যের জবাবে প্রতিপন্ন করেছিলেন, পিতার পক্ষে বিধবাকন্যা দান করায় কোন বাধাই নেই। তাঁর মতে, আলোচ্য ক্ষেত্রে কন্যাদানে কার স্বত্ব আছে বা নেই তা আদৌ বিবেচ্য নয়। তিনি জানিয়েছিলেন, "কন্যাদানস্থলের দান বাচনিক দান মাত্র ; ভূমি, ধেনু প্রভৃতির ন্যায় স্বত্বমূলক দান নহে।" (তদেব ; পৃঃ ১৪৬) বাচনিক ও স্বত্বমূলক দানের পার্থক্য নির্দেশ করে তিনি বলেছিলেন—

"যদি কন্যাদান, স্বত্বমূলক দান না হইয়া, বিবাহের অঙ্গ বাচনিক দান মাত্র হইল, তখন পিতা, এক বার এক ব্যক্তিকে দান করিয়া, সেই সম্প্রদানের মৃত্যু, অথবা অন্যবিধ কোনও বৈগুণ্য ঘটিলে, সেই কন্যাকে পুনরায় অন্য পাত্রে দান করিতে না পারিবেন কেন।" (তদেব ; পৃঃ ১৪৬)

বিদ্যাসাগর আরও বলেছিলেন, কাত্যায়ন বচনে বিবাহিতা কন্যার পুনর্দান বিহিত হয়েছে। এক বার দান করা কন্যাকে পুনরায় পিতার পক্ষে সম্প্রদান করা যদি সম্ভব না হতো তাহলে কাত্যায়ন নিশ্চয়ই এমন বিধি দিতেন না। তাছাড়া পিতা কর্তৃক বিধবা কন্যার পুনর্দানের দৃষ্টান্তও রয়েছে। মহাভারতের ৯১ অধ্যায়ে মহারাজ ঐরাবত তার বিধবা কন্যা অর্জুনকে দান করেছিলেন।

বিধবার পুনর্বিবাহে কার গোত্র উল্লেখ করে দানকার্য সম্পাদন করা হবে

সে আলোচনাও বিদ্যাসাগর করেছিলেন। নানা শাস্ত্রকারের বক্তব্যের সহায়তায় তিনি বলেছিলেন, গোত্র হলো আসলে বংশ। বিবাহে কিভাবে এই গোত্র উল্লিখিত হয়ে থাকে সে কথাও তিনি জানিয়েছিলেন ;—কন্যার বিবাহকালে সে কার পৌত্রী, কার কন্যা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেই গোত্র উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বিদ্যাসাগরের মতে বিধবা কন্যার দ্বিতীয় বিবাহকালেও ঐ একইভাবে গোত্রের উল্লেখ করা হবে। "অন্য গোত্রে বিবাহ হইয়াছে বলিয়া, দ্বিতীয় বার বিবাহকালে, পিতৃগোত্র উল্লেখের কোনও বাধা হইতে পারে না ;"··· (তদেব ; পৃঃ ১৪৮)

বিদ্যাসাগর এই প্রসঙ্গে কাত্যায়ন বচনের সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন, 'সপিণ্ডীকরণের পূর্ব পর্যন্ত' নারী পিতৃগোত্রেই থাকে। কাজেই তার পুনর্বিবাহকালে পিতৃগোত্র উল্লেখ করবার কোন বাধাই নেই।

বিধবাবিবাহে কোন মন্ত্র উচ্চারিত হবে সে কথাও বিদ্যাসাগর আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বিবাহের মন্ত্রে এমন কোন কথা নেই যে ঐ মন্ত্র শুধু প্রথমবার বিবাহেরই জন্যে দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্যে নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছিলেন, অনেক ঋষি বা মুনি "বিষয়বিশেষে স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহের অনুমতি" দিলেও ঐ বিবাহের জন্যে কোন "স্বতন্ত্র মন্ত্র নির্দেশ করিয়া যান নাই"···।

এই জন্যে বলা যায়, বিধবার বিবাহের কথা যখন বলা হয়েছে আর মন্ত্র দ্বারাই যখন নর-নারীর সংসর্গ শুদ্ধ হয়ে থাকে (যাকে বিবাহ বলা হয় এবং দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্যে যখন কোন স্বতন্ত্র মন্ত্রও রচিত হয় নি তখন প্রথম-বারের বিবাহ মন্ত্রই দ্বিতীয় বিবাহের মন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হবে।

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, অনেকে মনুবচন "পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ। / নাকন্যাসু ক্বচিন্নৃণাং লুপ্তধর্মক্রিয়া হি তাঃ॥৮। ২৬॥" অবলম্বন করে সিদ্ধান্ত করতে পারেন "কুমারীবিবাহের মন্ত্র বিধবা-বিবাহে খাটিতে পারে না।" কিন্তু অকন্যা বলতে যে বিধবা তা' নয়। কাজেই এর দ্বারা বলা যায় না, বিধবাবিবাহে কুমারী বিবাহের মন্ত্র পরিত্যজ্য।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় (১।৫২) অবিবাহিতা কন্যা বিবাহের নির্দেশ রয়েছে। এই বক্তব্য অনুযায়ী বিধবাবিবাহের বিধি পাওয়া যায় না—বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের বিরুদ্ধে একথাও একদল বলেছিলেন।

বিদ্যাসাগর তার উত্তরে জানিয়েছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ নির্দেশের অভিপ্রেত

অর্থ অবিবাহিতা কন্যা বিবাহই প্রশস্ত, আর বিবাহিতা কন্যা বিবাহ করা অপ্রশস্ত ;—এ ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব বিধবাবিবাহ যে নিবিদ্ধ এর দ্বারা তা বোঝা যায় না।

দেশাচার হিসেবে বিধবাবিবাহ গ্রাহ্য নয়, একথারও বিরোধিতা করে-ছিলেন বিদ্যাসাগর। এ বিষয়ে প্রথম পুস্তকে অভিব্যক্ত মতামত 'দ্বিতীয় পুস্তকে' আরও যুক্তি সিদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তকের বিরুদ্ধে সে যুগে যাঁরা বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের বক্তব্য খণ্ডনে বিদ্যাসাগর গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও তার্কিক ক্ষমতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। প্রতিবাদীদের যুক্তির বিরুদ্ধে যে যুক্তি তিনি দিয়েছিলেন তার তীক্ষ্মতাও ছিল বিস্ময়কর। বোধহয় এইকারণেই বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তকের প্রতিবাদে তেমন কোন সরবতা দেখা যায় নি। অল্প কয়েকজনই ঐ পুস্তকের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। যাই হোক, যাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন তদানীন্তন রক্ষণশীল পত্রিকা 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা'র সম্পাদক নন্দকুমার কবিরত্ন মহাশয়। তাঁর রচিত 'বৈধব্যধর্ম্মোদয়'-দ্বিতীয় পুস্তক বিদ্যাসাগরের 'দ্বিতীয় পুস্তকে'র জবাবে রচিত হয়েছিল। ঐ পুস্তক রচনায় তাঁর সহযোগী ছিলেন হারাধন বিদ্যারত্ন মহাশয়। দুষ্প্রাপ্য পুস্তকটির নামপত্র এইরূপ—

"শ্রীশ্রী হরিঃ।
শরণং।
বৈধব্যধর্ম্মোদয়।
দ্বিতীয় পুস্তক।
শ্রীরামপুর নিবাসি
শ্রীযুক্ত রমানাথ গোস্বামি মহাশয়ের
অনুমত্যনুসারে
শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন
ও শ্রীযুক্ত হারাধন বিদ্যারত্ন
সংগৃহীত

কলিকাতা।
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত।
শকাব্দা ১৭৭৮।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে অর্থাৎ যোড়াবাগানের ১৮/২৪ নং বাটীতে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।"

পুস্তকটির শেষপৃষ্ঠায় নন্দকুমার শর্ম্মা ও বিদ্যারত্ন মহাশয় জানিয়েছিলেন "শ্রীযুক্ত তারকনাথ তর্কবাগীশ ও শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ ন্যায় বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাচস্পতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণেরা এই পুস্তক প্রকটন বিষয়ে সম্মত আছেন।"

নন্দকুমার 'বৈধব্যধর্ম্মোদয়' প্রথম পুস্তকে যেমন তেমনি আলোচ্য দ্বিতীয় পুস্তকেও বলেছিলেন, পরাশর সংহিতা কলিভিন্ন যুগের। পরাশরের 'নষ্টেমৃতে' বচনকেও তিনি বিধবাবিবাহ বিধায়ক বলে মনে করেন নি। তিনি বলেছিলেন, ঐ বচনে অন্য পতি গ্রহণের কথা রয়েছে বটে তবে তারদ্বারা কোন বিবাহবিধির কথা বোঝা যায় না। এই সব বিষয় নিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর 'দ্বিতীয় পুস্তকে' যে আলোচনা করেছিলেন তাই-ই যথেষ্ট। বস্তুতঃ তার 'দ্বিতীয় পুস্তকে' নন্দকুমারের আর ঐ সব প্রসঙ্গ উত্থাপনের প্রয়োজন ছিল না।

'দ্বিতীয় পুস্তকে' বিদ্যাসাগর খুবই বলিষ্ঠ যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন, 'নষ্টেমৃতে' বচন বাগ্‌দত্তা বিষয়ক নয়—পাঁচটি বিশেষ স্থলে বিবাহিতা নারীর পুনর্বিবাহেরই কথা সেখানে বলা হয়েছে। নন্দকুমারের 'প্রথম পুস্তকে' ব্যক্ত মতের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর ঐ বক্তব্য বেশ স্পষ্টভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু তবুও নন্দকুমার আলোচ্য 'দ্বিতীয় পুস্তকে' বলেছিলেন, ঐ বচনে 'নিয়োগ দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনেরই বিধি' রয়েছে। তবে কলিযুগে নিয়োগও নিষিদ্ধ হয়েছিল। অতএব "পরাশরোক্ত নষ্টেমৃতে বচনের বিষয় বাগ্‌দত্তা কন্যাতেই বর্ত্তিতে পারে।"

[বৈধব্যধর্ম্মোদয় (দ্বিতীয় পুস্তক)—নন্দকুমার কবিরত্ন ও হারাধন বিদ্যারত্ন। ১৭৭৮ শকাব্দ। পৃঃ ৩১]

বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, বিধবা পাত্রীকে তার পিতাই দান করতে পারে। নন্দকুমার এবং বিদ্যারত্ন মহাশয় তার বিরুদ্ধে বলেছিলেন, বিবাহে কন্যামাত্রই দান করা যায়—বিধবাকন্যা বা বিধবা পাত্রী দান করা যায় না। বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের বিরুদ্ধে আরও বলা হয়েছিল, বিবাহের মন্ত্র শুধু কন্যা সম্প্রদানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নারী 'সপিণ্ডীকরণের পূর্ব পর্যন্ত' পিতৃগোত্রেই থাকে, সে বক্তব্যও সত্য নয়।

বিদ্যাসাগর বেদেও বিধবাবিবাহের নির্দেশ খুঁজে পেয়েছিলেন। বৈধব্য-

ধর্ম্মোদয়'-দ্বিতীয় পুস্তকে তারও বিরোধিতা করা হয়েছিল। এখানে বেদের 'যদেকস্মিন য়ূপে' ইত্যাদি বচনের সঙ্গে 'নৈকস্যাবহব : সহ পতয়ঃ' শ্রুতি বচনের সামঞ্জস্যবিধান করে প্রমাণ করবার চেষ্টা হয়েছিল 'নৈকস্যাবহব : সহ পতয়ঃ' শ্রুতি বচন আসলে নিয়োগ সম্পর্কিত।

বিদ্যাসাগর বিধবা নাগকন্যা উলূপীগর্ভজাত অর্জুন পুত্রকে তার ঔরসপুত্ররূপে অভিহিত করেছিলেন। আলোচ্য পুস্তকে ঐ প্রসঙ্গের সমালোচনা করে বলা হয়েছিল, বিদ্যাসাগর মহাভারতীয় শ্লোকের অংশ বিশেষ বর্জন করেই ঐ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। আসলে অর্জুন উলূপীকে বিবাহ করেন নি—অর্জুনকে শুধু নিয়োগ করাই হয়েছিল। স্ত্রী হলে অর্জুনের সঙ্গে উলূপীর আবার কখনও না কখনও দেখা হতো। তাছাড়া উলূপীগর্ভজাত ইরাবান অর্জুনের ঔরসপুত্র হলে পাণ্ডবদের ঔরসপুত্রের সংখ্যার মধ্যে সে গৃহীত হতো— কিন্তু তা হয় নি।

পুস্তকটিতে দেশাচার মান্যতা সম্পর্কেও বিদ্যাসাগর-বক্তব্যের বিরোধিতা করা হয়েছিল।

সাল তারিখের দিক থেকে বিচার করে এবার শ্যামাপদ দেবশর্মার 'ভ্রম নিরাকরণ। অর্থাৎ বিধবাধর্ম্মরক্ষা' পুস্তকের উল্লেখ করতে হয়। পুস্তকটির পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখক জানিয়েছিলেন—

"সহর শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিশচন্দ্র দে চৌধুরীর সাহায্যে কতিপয় পুস্তক প্রস্তুত করিলাম; সমাঙ্কে সমাজে দেওয়া হইবে। কিয়দ্দিবস বিলম্বে আমাদের ক্ষুদ্র সভা হইতে জনৈক সভ্য, পাঠক মহাশয়দের নিকট গমন করিলে, তৎকালে তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া নিম্নলিখিত কএক বিষয়ের পত্রিকাতে যাঁহার যে পক্ষে অভিমত তিনি সেই পক্ষেই স্বাক্ষর করিবেন।

বিবাহিতা বিধবার পুত্র. ঔরসপুত্র হইতে পারে কি না? পরাশর, চতুর্যুগের ধর্ম্মই কহিয়াছেন কি না? মাধবাচার্য্যের প্রতি দোষ দেওয়া সঙ্গত, কি অসঙ্গত? কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কি, সিদ্ধ? বিধবাবিবাহ কলিযুগে যুক্তিসিদ্ধ, কি না?—ইতি

শ্রীশ্যামাপদ-দেবশর্ম্মণঃ।"

সম্বৎ ১৯৩১—৬ ফাল্গুণ

[ভ্রমনিরাকরণ। অর্থাৎ বিধবাধর্ম্মরক্ষা শ্যামাপদ দেবশর্ম্মণঃ; 'বিজ্ঞাপন' অংশ। পৃঃ ৩]

শ্যামাপদের পুস্তক রচিত হবার সময় বিদ্যাসাগর জীবিত ছিলেন। বিদ্যাসাগরের

কাছে গিয়ে শ্যামাপদ বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের দু'চারটি ত্রুটি বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। ঐ আলোচনার সময়ে তাঁর মনে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল—

"......দেখিলাম তিনি পক্ষপাতির ন্যায় ব্যবহার করিলেন অর্থাৎ প্রস্তাবিত দোষের কোন সদুত্তর করিলেন না, তথাপি বিধবাবিবাহে অনুরাগ প্রকাশ করিতে থাকিলেন ;"......(তদেব ; পৃঃ ২)

শ্যামাপদেরও অন্যতম বক্তব্যছিল বিধবাগর্ভজাত সন্তান কখনো ঔরসপুত্র হতে পারে না। তাছাড়া পরাশর সংহিতা কেবল কলিযুগেরই শাস্ত্র নয়—সর্বযুগের ধর্মই সেখানে বর্ণিত হয়েছে। পরাশরের 'নষ্টেমৃতে' বচন যে কলিযুগের পক্ষে প্রযোজ্য নয় সে কথাও তিনি বলেছিলেন। শ্যামাপদ অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহও সমর্থন করতে পারেন নি। কিন্তু এই সব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে বিদ্যাসাগর অনেক আগেই যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

শ্যামাপদ দেবশর্মা ছিলেন ন্যায়ভূষণ। হুগলীর আঁটপুরে ছিল তাঁর চতুষ্পাঠী ও নিবাস। পূর্বে আলোচিত গ্রন্থের শেষে মুদ্রিত ঠিকানা থেকে তাই-ই জানা যায়। এই শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ পরে সংশোধিত আকারে তাঁর এই গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশ করেন। পুনঃ প্রকাশের সময় তিনি গ্রন্থনামের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। এই সংশোধিত ও পুনঃপ্রকাশিত গ্রন্থের টাইটেল পেজ তুলে ধরা হলো—

"বিধবাবিবাহের নিষেধক।

———

বিচার ঃ

শ্রীউমাকান্ত তর্কালঙ্কার সংশোধিত ঃ

—০০—

আঁটপুর নিবাসি দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক

শ্রীশ্যামাপদ ন্যায় ভূষণ প্রণীত ঃ

পুনঃ প্রকাশিতশ্চ।

(সীল)

কলিকাতা,—৬৬ নং বীডন ষ্ট্রীট।

বীডন যন্ত্রে

শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

———

১২৮৪"

'ভ্রমনিরাকরণ বা বিধবাধর্ম্মরক্ষা'রই সংশোধিত রূপ যে এই বইটি তার বড

প্রমাণ গ্রন্থটির ভূমিকায় ব্যক্ত একটি তথ্য। এই গ্রন্থের ভূমিকাতেও শ্যামাপদ জানিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগরের পুস্তক নিয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন; কিন্তু তার কাছ থেকে প্রত্যাশিত ব্যবহার তিনি পান নি। শ্যামাপদের ভাষায় "......তিনি পক্ষপাতীর ন্যায় ব্যবহার করিলেন অর্থাৎ প্রস্তাবিত দোষের কোন সদুত্তর করিলেন না, তথাপি বিধবাবিবাহে অনুরাগ প্রকাশ করিতে থাকিলেন,"...

[বিধবাবিবাহের নিষেধক—শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ ; ১২৮৪ পৃঃ ২]

পূর্বোক্ত পুস্তকটিতেও এই একই বক্তব্য ঐ একই পৃষ্ঠায় ব্যক্ত হয়েছিল।

'বিধবাগর্ভজাত পুত্র যে কখনও ঔরসপুত্র হতে পারে না' ন্যায়ভূষণ মহাশয় এই সংশোধিত পুস্তকে তা আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছিলেন। পরাশর তার শাস্ত্রে শুধু কলিধর্মের কথাই বলেছিলেন কিনা সে বিষয়ের আলোচনাও এখানে দীর্ঘতর হয়েছিল। এই সংশোধিত গ্রন্থে তিনি বলেছিলেন, পরাশরের 'নষ্টেমৃতে' বচনটি 'চতুর্যুগ ধর্ম্মের প্রকরণে' রয়েছে; সুতরাং তা কলি যুগের বিষয় হতেই পারে না।

শ্যামাপদ বিশুদ্ধ যুক্তির আলোকে বিধবাবিবাহের বিচার করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, কলিপূর্বযুগে এবং 'কলিযুগ প্রতিপন্ন হইবার সন্নিহিত পূর্বে' বিধবাবিবাহের প্রচলন থাকলেও কলিযুগের শুরু থেকে অদ্যাবধি ৪৪২৬ বৎসর বিধবাবিবাহের কোন ঘটনাই ঘটে নি। ঐ বিবাহবন্ধের কারণ হিসেবে শ্যামাপদ বেদব্যাসের মতানুযায়ী বলেছিলেন, কলিযুগের আদিতে 'মহাত্মা পণ্ডিতেরা' সভা করে প্রতিজ্ঞাপূর্বক নানা বিষয়ের সঙ্গে বিধবাবিবাহেরও নিষেধ বিধান করেছিলেন। শ্যামাপদ বলেছিলেন, ঐ কারণেই বিদ্যাসাগরের মত মেনে নিয়ে বলা যায় না, দেশাচারের জন্যেই বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছিল। আসলে লোকধর্মকে রক্ষা করবার জন্যেই পণ্ডিতেরা বিধবাবিবাহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

বিধবাবিবাহ বিষয়ে শাস্ত্রীয় আলোচনা করবার সময় শ্যামাপদ যতখানি যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন, ঐ বিষয়ের যুক্তিনির্ভর আলোচনাতে কিন্তু তিনি ততখানি যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারেন নি। বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকার জন্যে ভ্রূণ হত্যা ঘটছে বিদ্যাসাগরের ঐ বক্তব্যের বিরুদ্ধে শ্যামাপদ বলেছিলেন, ঐ বিবাহ প্রচলিত থাকলেই বরং ভ্রূণ হত্যা ঘটবে; কেননা বয়স্থা বিধবারা স্বেচ্ছানুযায়ী পাত্র দেখবে। তারা দেখবে পাত্রের রূপ, টাকাপয়সা আর রতিশক্তি। ঐ ব্যাপারে তারা অন্যের কথা শুনবে না।

"মধ্যবর্ত্তিনীর উদ্‌যোগে রতিশক্তির পরীক্ষাতে যতদিন মনোগত না হইবে, ততদিন প্রায়দিনই নূতন নূতন পুরুষের সহবাস সম্ভাবনা।" (তদেব ; পৃঃ ৯৮)

এ অত্যন্ত অবাস্তব যুক্তি। সমস্যাটিকে যে দিক থেকে বিচার করা প্রয়োজন সেদিকে শ্যামাপদ আদৌ দৃষ্টি দিতে পারেন নি বা দিতে চান নি। এই কারণেই তাঁর যুক্তি বলিষ্ঠ যুক্তির মর্যাদা থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে বলা যায়।

অবশ্য বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকার জন্যে ব্যভিচার যে আদৌ ঘটে না শ্যামাপদ তা বলেন নি ; তবে সুরক্ষিতা বিধবার দ্বারা তা ঘটে না বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন। ধর্মশীলা ও গৃহকার্যে নিযুক্তা বিধবার মনে কোন কুচিন্তার উদয় হয় না। কিন্তু এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শ্যামাপদ যে মূল সমস্যাটিকেই এড়িয়ে গিয়েছিলেন তা বোঝা যায়। বিধবাবিবাহ ঘটলে কি কি অনিষ্ট হবে তাও শ্যামাপদ বলেছিলেন ; কিন্তু তার মধ্যেও তাঁর যুক্তিহীন রক্ষণশীল মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা থাকলে স্বামীর প্রতি সতীনারীরও কর্তব্যে অবহেলা দেখা যাবে। তাছাড়া অপটু, জীর্ণ প্রভৃতি অবস্থার স্বামীকে পুনর্বিবাহের জন্যে হত্যাও করতে পারে। একথাও শ্যামাপদ বলেছিলেন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে পূর্বস্বামীর ঔরসজাত সন্তানদের কষ্টের সীমা থাকবে না। পরবর্তী স্বামী তাদের সহ্য করবে না। তবে তিনি বালবিধবার দুঃখে ব্যথা পেয়েছিলেন ; কিন্তু তার জন্যে বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করা ছাড়া তিনি আর কিছু করণীয় বলে মনে করেন নি।

অবশ্য একথাও সত্য, শ্যামাপদ বিধবাবিবাহ সম্পর্কে এমন দু'একটি কথা বলেছিলেন তৎকালীন সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে যাদের উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। তিনি বলেছিলেন, বিধবাপাত্রীর সৎপাত্র জুটবে না ; অনন্যোপায় হয়েই লোকে তাকে বিবাহ করবে। তিনি একথাও জানিয়েছিলেন, সামাজিক ব্যাপারে তাদের কোন মর্যাদাও থাকবে না। এই বক্তব্য একেবারে অসত্য নয়।

১৯৩৫ সম্বৎ-এ প্রকাশিত ভুবনেশ্বর মিত্রের 'হিন্দুবিবাহ সমালোচন' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'বিধবাবিবাহ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ গ্রথিত হয়েছিল। ভুবনেশ্বর বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন। শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করে তিনি বলেছিলেন, বৈদিককালে বিধবাবিবাহ চালু ছিল। সৌত্রিককাল এমন কি স্মৃতির যুগেও তার প্রচলন বন্ধ হয় নি। ভুবনেশ্বর

বলেছিলেন, বিধবাবিবাহ দিন দিন আদৃত হয়েই উঠেছিল। বিধবাপুত্রকে পৌনর্ভব বলা হতো। ঐ পৌনর্ভবকে মনু দশম স্থানে গণনা করেছিলেন; যাজ্ঞবল্ক্য তাকে দিয়েছিলেন সপ্তম স্থান; বিষ্ণু ও বশিষ্ঠ দিয়েছিলেন তাকে চতুর্থ স্থান। পরে কলিযুগে পরাশর তাকে ঔরসপুত্রেরই মর্যাদা দিয়েছিলেন।

ভুবনেশ্বর বলেছিলেন, পৌরাণিক যুগে এসেই দেখা যায়, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, আদিত্যপুরাণ ইত্যাদিতে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, একটা অস্থির অবস্থা দেখা দেওয়ার জন্যে সমাজকে শৃঙ্খলিত করবার প্রয়োজনেই পূর্বের অনেক বিধি সে সময় বর্জন করা হয়েছিল। বিধবাবিবাহের বিধি ছিল তাদেরই অন্যতম, অবশ্য পুরাণের ঐ নিষেধ যে মানুষ ব্যাপকভাবে মেনে নিয়েছিল তা নয়। তবে দীর্ঘকাল ধরে পুরাণের নিষেধগুলি ধীরে ধীরে মানুষের মনে প্রভাব ফেলেছিল বলে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের সঙ্গে বিধবাবিবাহও নিষিদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

ভুবনেশ্বর বিধবাবিবাহের সমর্থক হলেও সকল বিধবার বিবাহ যৌক্তিক বলে মনে করেন নি। তাঁর মতে 'অতৃপ্ত-ভোগলালসা এবং সন্তানবিহীনা অবলা'ই বিধবা হলে পুনর্বিবাহিতা হতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে ভুবনেশ্বর বিধবা নারীর ব্রহ্মচর্য পালনের ক্ষতির দিকগুলিও তুলে ধরেছিলেন। ঐ আলোচনার সময় তিনি বিশেষ একটি বাস্তব দিকের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাও করেছিলন—

'বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিলে মৃত পত্নীক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা কখনই অনূঢ়া বালিকার পাণি পীড়নে প্রবৃত্ত হইত না, সুতরাং অসম বিবাহজনিত বিস্তর অনিষ্টও সমাজে উদ্ভাসিত হইতে পারিত না।"

[হিন্দুবিবাহ সমালোচন (২য়)—ভুবনেশ্বর মিত্র; ১২৩৫ সম্বৎ, পৃঃ ১০০]

বিদ্যাসাগর বিধবাকন্যাকে দান করবার বিধি খুঁজে পেয়েছিলেন; কিন্তু ভুবনেশ্বর বিদ্যাসাগরের মত সমর্থন না করে বলেছিলেন, বিধবাবিবাহ গান্ধর্ব মতে সম্পাদিত হওয়াই বিধেয়। তবে একবার দান করা কন্যাকে আর দান করা যায় না বলে বিধবাবিবাহ যে অসিদ্ধ তা নয়; "কেননা, কথিত উদ্বাহে পিতা প্রভৃতি বান্ধববর্গ কর্তৃক সম্প্রদান ক্রিয়ার এককালে প্রয়োজনাভাব হইতেছে।" (তদেব; পৃঃ ১০৬)

ভুবনেশ্বরের মতে বিধবার পাত্র জোগাড় করে দেওয়াটাই শুধু অভিভাবক বা বান্ধবদের কাজ।

কিন্তু এই বিষয়ে ভুবনেশ্বরের যুক্তি অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের যুক্তিই বাস্তব ও শাস্ত্রসম্মত।

এই প্রসঙ্গে ভুবনেশ্বরের বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত মতামত সম্পর্কে একটি তথ্য পরিবেশন করা যেতে পারে। ভুবনেশ্বরের 'হিন্দু বিবাহ সমালোচন' (২য়) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৫ বঙ্গাব্দে; তার অনেক পরে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর আর একটি গ্রন্থ—'বিধবাবিবাহ-সমালোচন অর্থাৎ হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্র, যুক্তি, এবং বিজ্ঞানের অননুমোদিত বিধায় তন্নিষেধ বিষয়ক প্রস্তাব।' বইটি আমাদের আলোচ্যকালের বহির্ভূত হলেও বলা প্রয়োজন, প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে বিধবাবিবাহের প্রতি সমর্থন জানালেও এই বইতে ভুবনেশ্বর তার বিরোধিতা করেছিলেন।
সে যুগের বিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ১২৮৭, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাতে "দ্বিতীয়বার বিবাহ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছিল। প্রবন্ধটিতে বিধবার বিবাহ এবং বিপত্নীকের বিবাহ বিষয়ে প্রাবন্ধিক আলোচনা করেছিলেন।

প্রাবন্ধিক ছিলেন নিঃসন্দেহে রক্ষণশীল মনের মানুষ। ম্যালথসের মত অনুযায়ী দেশের উন্নতির জন্যে তিনি জনসংখ্যা কমানোর পক্ষপাতী ছিলেন। আর ঐ কারণে বিধবার বিবাহ অনুচিত বলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন। বিধবা নারীর দুঃখকেও তিনি দুঃখ বলে মানেন নি। অসহ্য হলেও তাকে দূর করবার কোন প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি। তিনি মনে করেছিলেন, এককালে প্রয়োজন থাকলেও এখন আর বিধবাবিবাহের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, জনসংখ্যার ভয়ে বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করলেও বিপত্নীকের দ্বিতীয় বিবাহ মেনে নিতে প্রাবন্ধিক দ্বিধা করেন নি। তাঁর কথা, প্রবৃত্তিগত মিল থাকলেও বুদ্ধি ও ক্ষমতার দিক থেকে নর ও নারীর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। অবশ্য প্রাবন্ধিক এ কথাও বলেছিলেন পুরুষ যে 'নিত্য নূতন বিবাহ' করবে তাও ঠিক নয়। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, অজ্ঞাত পরিচয় এই প্রাবন্ধিক নারীর দ্বিতীয় বিবাহ বিষয়ে আদৌ উন্নত চিন্তার পরিচয় দেন নি।

১২৯১ সালে 'যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা'র চতুর্থ বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ সভায় নবদ্বীপের স্মার্ত্তশ্রেষ্ঠ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য সংস্কৃত ভাষায় বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে এক ভাষণ পাঠ করেছিলেন। রক্ষণশীল সমাজপতিদের পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত ঐ ভাষণ পাঠ করে

বিদ্যাসাগর 'ব্রজবিলাস' পুস্তক রচনার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। বইটি লিখেছিলেন তিনি 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' নামের আড়ালে।

বিধবাবিবাহের পক্ষে আইন পাস হলেও তার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ বরাবরই সক্রিয় ছিল। এই কারণে 'নলডাঙার চেঙনা রাজা' যখন বিধবাবিবাহ দিতে শুরু করেছিলেন 'যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা' ঠিক তখনই বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচার করবার জন্যে ব্রজনাথকে পূর্বোক্ত ভাষণ দিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঐ ভাষণেরই বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন উপযুক্ত ভাইপো'।

অবশ্য শুধু তাই-ই নয়. 'যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা'র অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন জন্‌মেজয় বিদ্যাবাগীশ। বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে তিনিও ঐ চতুর্থ বাৎসরিক সভায় ভাষণ পাঠ করেছিলেন। 'হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা' তার ঐ ভাষণ পুস্তক আকারে প্রকাশ করেছিল। ঐ পুস্তকের প্রতিও উপযুক্ত ভাইপো কটাক্ষপাত করেছিলেন।

'ব্রজবিলাসে' (১৮৮৪, ৩ নভেম্বর) ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন প্রদত্ত বক্তৃতার 'আরম্ভভাগ' ও উপসংহার ভাগ' আলোচিত হয়েছে। কারণ 'এই দুই অংশই তাঁহার বক্তৃতার সারভাগ'। তবে উপযুক্ত ভাইপো বলেছিলেন, "পরে. ইস্তাহার দ্বারা সময় নির্ধারিত করিয়া, সে অংশেরও. মাফিক আইন. বিচারপূর্বক, চূড়ান্ত হুকুম দেওয়া হইবেক।"

বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (২য়)—সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭২। পৃঃ ৪৬৯]

ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের ভাষণে বিশেষ কোন নতুন যুক্তি ছিল না। বিদ্যাসাগরের জবাবেও তাই নতুন বক্তব্য কম। যাই হোক, ব্রজনাথও মনুবচন উদ্ধার করে বিধবা স্ত্রীর দ্বিতীয় দান নিষিদ্ধ বলতে চেয়েছিলেন। কন্যাপক্ষ কর্তৃক শাস্ত্রসম্মতভাবে কন্যাদান ও বরদ্বারা শাস্ত্রীয় পন্থায় তার গ্রহণ এরই নাম বিবাহ। মনুর এই বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করেই বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেছিলেন, শাস্ত্রীয়দান ও গ্রহণবিধি লঙ্ঘন হওয়ায় বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত হতে পারে না।

বিদ্যাসাগর এর জবাবে বলেছিলেন. পরাশরভাষ্য ও নির্ণয়সিন্ধুধৃত কাত্যায়ন বচনেও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় (বর ভিন্নজাতি, পতিত, ক্লীব ইত্যাদি হলে) বিবাহিতা কন্যাকে অন্যপাত্রে দান করার বিধান দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যাসাগর বিদ্যারত্ন কর্তৃক নির্নীত বিবাহলক্ষণকেও ভ্রান্ত বলেছিলেন। তাঁর মতে ঐ লক্ষণকে সত্য বলে ধরলে আটপ্রকার বিবাহের অনেকগুলিকেই (গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ) অশাস্ত্রীয় বলে মানতে হয়।

সে যুগের বহু বিধবাবিবাহ বিরোধীদের মত বিদ্যারত্ন মহাশয়ও বলেছিলেন, পরাশরের 'নষ্টেমৃতে' বচনে বাগ্‌দত্তা কন্যার পুনর্বিবাহের কথাই বলা হয়েছে। বিদ্যাসাগরও ঐ পুরনো বক্তব্যের জবাবে পুরনো বক্তব্যই রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, নারদ-সংহিতার বক্তব্য অনুযায়ী বহু কথিত পঞ্চ আপদে নারীর দ্বিতীয় বিবাহই বিধেয়, তবে সেখানে পুনর্বিবাহের সময় সম্বন্ধে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ঐ নির্দেশের কিছু অংশ,—"স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, ব্রাহ্মণ-জাতীয়া স্ত্রী আট বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক ; যদি সন্তান না হইয়া থাকে, তবে চারি বৎসর ; তৎপরে বিবাহ করিবেক।"......(তদেব ; পৃঃ ৪৭৩) শুধু এই অংশ থেকেই বোঝা যায়, পরাশর বচন বাগ্‌দত্তা সম্বন্ধে নয়, কেননা নিছক বাগ্‌দত্তার কথা থাকলে সন্তানহীনা ও সন্তানবতী নারীর অপেক্ষা করবার কথা উঠতো না।

বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করেছিলেন, পরাশর কথিত শুধু পাঁচটি স্থলেই বাগ্‌দত্তা কন্যার পুনর্বিবাহ সিদ্ধ হলে 'তদ্ভিন্ন স্থলে, কিরূপে বাগ্‌দত্তা কন্যার বিবাহ হইতে পারে'? (তদেব, পৃ ৭৭৪)

কাশ্যপবচন অনুযায়ী বাচাদত্তা, মনোদত্তা, কৃতকৌতুক মঙ্গলা, উদকস্পর্শিতা, পাণিগৃহীতিকা, অগ্নিপরিগতা, পুনর্ভূ প্রভবা কন্যা বিবাহের জন্যে পরিত্যাজ্য। এই কাশ্যপবচনের উল্লেখ করে বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেছিলেন, কাশ্যপ-প্রোক্ত এই বিষয়ে পরাশর শুধু বিশেষ নির্দেশই দিয়েছিলেন।"......বাগ্‌দত্তা প্রভৃতির বর ক্লীব প্রভৃতি স্থির হইলে, তাহাদের পুনর্বার বিবাহ হইতে পারিবেক, পরাশর এই বিধি দিয়াছেন।" (তদেব, পৃঃ ৪৭৫) বিদ্যারত্নের এই সিদ্ধান্তে দেখা যায়, পরোক্ষে তিনি বিধবাবিবাহ মেনেই নিয়েছিলেন,—কাশ্যপ যে সাতরকম কন্যা বিবাহ নিন্দনীয় বলেছিলেন তাদের মধ্যে উদকস্পর্শিতা পাণিগৃহীতিকা ও অগ্নিঃ পরিগতাকে বিবাহিতাই বলা যায়। এহেন অবস্থায় স্বামী মারা গেলে ইত্যাদি পাঁচটি ক্ষেত্রে পরাশর যদি তাদের পুনর্বিবাহ বিধিসম্মত বলে থাকেন তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বলতে হয় বিবাহিতা নারী বিধবা হয়েও পুনর্বিবাহ করতে পারে। কাজেই বিদ্যারত্ন নিজেই বিধবা-বিবাহ বিরোধিতা খণ্ডন করেছিলেন তাতে সন্দেহ কি! ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের বক্তব্যের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর এই বলিষ্ঠ যুক্তিই দিয়েছিলেন।

'যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা'র চতুর্থ বাৎসরিক অধিবেশনে প্রদত্ত বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত বক্তৃতার সমালোচনা করে বিদ্যাসাগর আরও একটি পুস্তক রচনা

করেছিলেন। পুস্তকটির নাম ‘বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা বিষয়িনী’ (১৮৮৪ ; ১১ নভেম্বর)। পরে দ্বিতীয় সংস্করণের সময় এর নাম দেওয়া হয়েছিল ‘বিনয়পত্রিকা’। ‘ব্রজবিলাস’ বিভক্ত হয়েছিল কয়েকটি ‘উল্লাসে’—আলোচ্য গ্রন্থটি বিভক্ত হয়েছিল কয়েকটি ‘প্রকরণে’। ‘ধর্মরক্ষিণী সভা’র কার্যবিবরণী অনুযায়ী দেখা যায়, প্রথম অধিবেশনের দিনে উক্ত সভা বিধবাবিবাহবাদীদের ক্ষোভ দূর করবার উদ্দেশ্যে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিল ; তাতে বলা হয়েছিল, “বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসংগত নহে, তৎসম্বন্ধে যদি কাহারও বাদ প্রতিবাদ করার ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি সভাস্থ হইয়া অবাধে স্বীয় মত সমর্থন করিতে পারেন”। (তদেব ; পৃঃ ৪৯৪)

নলডাঙার প্রমথভূষণ দেব বিধবাবিবাহ দিতে শুরু করলে তা শাস্ত্রসম্মত নয় এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্যে ‘ধর্মরক্ষিণীসভা’ পণ্ডিতদের কাছ থেকে বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে এক ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ (বা আদায়) করেন। ঐ ব্যবস্থাপত্রে ২১ জন পণ্ডিত স্বাক্ষর করেছিলেন। ‘তত্ত্বান্বেষী’ বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, পণ্ডিতেরা তাঁদের ঐ ব্যবস্থার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করেন নি। তিনি বলেছিলেন, ঐ ব্যবস্থার অবয়ব ছিল চারটি ; তার প্রথমটি হলো বিধবায়া বিবাহো ন শাস্ত্রসিদ্ধ ইতি।’ কিন্তু এর পক্ষে কোন যুক্তি নেই ; শুধু পণ্ডিতদের স্বাক্ষরের জোরে এই বক্তব্য সর্বজন গ্রাহ্য হতে পারে না।

ব্যবস্থাটির দ্বিতীয় অবয়বে বলা হয়েছিল “অতএব বিবাহের ছলে উপপতি করাতে, বিধবার পতিত্যপ্রয়োজক উৎকট পাপ অবশ্য হইবেক।”

(তদেব ; পৃঃ ৫০৩)

এই বক্তব্য ভয়ংকর। বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ এবং সেই জন্যে বিধবা যদি বিবাহ করে তাহলে তা তার উপপতি গ্রহণ বলেই গণ্য হবে। তত্ত্বান্বেষী বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, ঐ ব্যবস্থা স্মৃতিশাস্ত্রে অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। তিনি ‘বীরমিত্রোদয়’ এবং নারদ সংহিতার বচন উদ্ধার করে দেখিয়েছিলেন, বিধবার বিবাহকরণ তার উপপতিগ্রহণ বলে গণ্য হতে পারে না।

বিদ্যাসাগরের ‘ব্রজবিলাস’ এবং ‘বিধবাবিবাহ ও যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা বিষয়িণী’ বা ‘বিনয় পত্রিকা’ পুস্তক দুটিতে তেমন কোন গভীর যুক্তি-তর্কের অবতারণা দেখা যায় না। বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তকে বিদ্যাসাগর যা বলেছিলেন তার বাইরে আর কিছুই বোধ হয় বলার ছিল না ;—আর কিছু বলার প্রয়োজন ছিল বলেও মনে হয় না। এই কারণে পূর্বোক্ত বই

দুটিতে বিশেষ কোন নতুন বক্তব্যের সন্ধান আমরা পাই না। তবে ঐ বই দুটির বিরুদ্ধেও সে যুগে প্রতিবাদ পুস্তক রচিত হয়েছিল দেখা যায়।

'বিধবাবিবাহ বিধায়ক প্রবন্ধ সকলের সমালোচনা' নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। বইটিতে বিদ্যাসাগর-বক্তব্যের সমালোচনা ছিল। গ্রন্থটি 'শান্তিপুর হিতকরী-যন্ত্রে' ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। রচয়িতা কে ছিলেন তা জানা যায় না; তবে গ্রন্থে রচয়িতার নাম হিসেবে মুদ্রিত হয়েছিল 'শ্রী গণ্ডূষ জল সঞ্চারি সফরঃ'। বলাবাহুল্য, গ্রন্থটি তিনি ছদ্ম নামে রচনা করেছিলেন।

গ্রন্থকার এক সময়ে বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন। বিদ্যাসাগরের 'দ্বিতীয় পুস্তক' বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে তাঁকে নিঃসন্দেহও করেছিল; কিন্তু তার বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁকে বিধবাবিবাহের বিরোধী করে তুলেছিল। বিবাহের ব্যাপারে তিনি বিধবানারীর কাছ থেকেই সাড়া পান নি। কোন কোন বিধবানারী বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে তাঁকে উপদেশই দিয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতায় মাত্র একটি অসচ্চরিত্রের বিধবানারী বিবাহে রাজী হয়েছিল; কিন্তু কোন পুরুষই তাকে বিবাহ করতে চায় নি। লেখক এও বলেছিলেন, কয়েকটি ক্ষেত্রে বিধবাবিবাহের পরিণাম সুখকর হতে পারে নি। এইসব কারণে তিনি শুধু বিধবাবিবাহই নয়, নর-নারী উভয়েরই দ্বিতীয় বিবাহের বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন। বিধবাবিবাহের ব্যাপারে হতাশ হয়ে অনেকদিন তিনি নিশ্চেষ্টই ছিলেন; কিন্তু ঐ বিষয়ে নতুন করে আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় তিনি আর উদাসীন থাকতে পারেন নি। এই কারণেই তিনি আলোচ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থে 'সফর' মহাশয় বলেছিলেন, সত্যযুগের প্রথম দিকে চোদ্দটি অবস্থায় স্ত্রী পত্যন্তর গ্রহণ করতে পারতো; বৈধব্য ছিল তাদেরই অন্যতম। 'সফর' মহাশয় আরও বলেছিলেন, সে সময় নারী একই সঙ্গে অনেক পুরুষের স্ত্রীও হতে পারতো। ঋতু ভিন্ন অন্যকালে স্বামী ভিন্ন যে কোন পুরুষের সংসর্গেও লিপ্ত হতে পারতো। নিয়োগধর্ম, কানীন, সহোঢ়জ, গূঢ়োৎপন্ন, পৌনর্ভব পুত্র ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় সমাজে তখন চালু ছিল, কিন্তু অল্প সময় পরে তার মধ্যে পরিবর্তনও দেখা দিয়েছিল। কাশ্যপ মুনি 'সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জ্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ' বচনে বাক্য দ্বারা দান করা হয়েছে যে কন্যাকে, মনে মনেও দান করা হয়েছে যাকে, বিবাহের সূতো বাঁধা হয়েছে যে কন্যার

হাতে, যাকে বিবাহবিধি অনুযায়ী দান করা হয়েছে, পানিগ্রহণ ক্রিয়া যে কন্যার সম্পন্ন হয়েছে রীতি অনুযায়ী, কুশণ্ডিকা নিষ্পন্ন হয়েছে যে কন্যার এবং পুনর্ভূ গর্ভজাতা যে কন্যা তাদের বিবাহ ব্যাপারে পরিত্যাগ করবার কথা বলেছিলেন। গ্রন্থকার বলেছিলেন, কাশ্যপ বচনকে 'লাঘব করিবার জন্যই বোধ হয়' পরে নারদসংহিতার 'নষ্টেমৃতে' বচনে পঞ্চ আপদে নারীর পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। তিনি আরও বলেছিলেন, নারদবচনে পঞ্চ আপদে বিবাহের নির্দেশ থাকায় পূর্বোক্ত চোদ্দ স্থলের নয়টি স্থলে পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী, সত্যযুগেই পুনর্বিবাহের ক্ষেত্র সীমিত হয়ে পড়েছিল।

'সফর' মহাশয় এরপরে বিদ্যাসাগর ব্যক্ত মনুবচননির্ভর বক্তব্যের সমালোচনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের একশ পঁচাত্তর সংখ্যক শ্লোকের [বঙ্গানুবাদঃ "যে নারী, পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা হইয়া, স্বেচ্ছাক্রমে পুনর্ভূ হয়, অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মে তাহাকে পৌনর্ভব বলে।" বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (২য়) ; সাক্ষরতা প্রকাশন। ১৯৭২ পৃঃ ৬৫] 'পৌনর্ভব' শব্দের ব্যবহার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন, মনু বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন না। অন্যান্য আরও প্রতিবাদীর মতো 'সফর' মহাশয়ও ঐ বক্তব্যের বিরুদ্ধে বলেছিলেন, পৌনর্ভব শব্দের ব্যবহার দেখেই বলা যায় না, মনু বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পুনর্ভূ স্ত্রীকে মনু সাধ্বী নামে অভিহিত করেন নি। অক্ষতযোনি বিধবানারী পৌনর্ভব পুরুষকেও বিবাহ করলে সাধ্বীবাচ্য হয় না। মনুসংহিতায় ঐ কারণে পৌনর্ভব পুত্রের স্থানও খুব উচ্চে ছিল না।

বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, মনুসংহিতায় পৌনর্ভব সন্তানের উচ্চস্থান না থাকলেও পরবর্তীকালে তার মর্যাদার ক্রমোন্নতি ঘটেছিল। তাছাড়া সত্যযুগের শাস্ত্র বলে মনুর পৌনর্ভব সংক্রান্ত বক্তব্য সেই যুগেই মান্য ছিল ; ঐ বক্তব্য সর্বযুগে প্রযোজ্য নয়।

'সফর' মহাশয় বিদ্যাসাগরের সেই বক্তব্যের মধ্যে না গিয়ে বলেছিলেন, সত্যযুগেই "চ (১) পৌনর্ভব পুরুষের সহিত অক্ষতযোনি বিধবার, (২) পূর্ব্ব পতির সহিত গতপ্রত্যাগতার ও (৩) দেবরের সহিত দত্ত শুল্কা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ ব্যতীত সর্ব্বত্র বিধবার পুনর্ব্বিবাহ ; (ছ) পতি অনুদ্দেশ হইলে তাহার স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ ; (জ) দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান ;…"

(বিধবাবিবাহ বিধায়ক প্রবন্ধ সকলের সমালোচনা—শ্রী গণ্ডূষ জল সঞ্চারি সফরঃ ; ১৮৮৫। পৃঃ ২২) নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই বক্তব্যের পরেই তিনি বলেছিলেন, নারদ সংহিতাস্থ 'নষ্টেমৃতে' বচনও তখন রহিত বা অচল হয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগেও এই সব বিষয়ে কঠোর শাস্ত্রীয় নির্দেশ প্রচলিত হয়েছিল। 'সফর' বলেছিলেন, ক্রমশঃ বিলুপ্ত হতে হতে কলিযুগে এসে বিধবাবিবাহ একেবারেই নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বহু কথিত 'নষ্টেমৃতে' বচন সম্পর্কে বলেছিলেন, বচনটি "অন্য কতিপয় স্থলের ন্যায় কেবল তারতম্য দেখাইবার জন্য পূর্ব্বকালের বিধির স্মরণমাত্র উহা অনুবাদ বা উদ্ধৃত বচন যাহাকে ইংরাজিতে কোটেসন (Quotation) বলে।" (তদেব ; পৃঃ ৩৭) পরাশরবিধি বলে তিনি তাকে স্বীকার করেন নি।

বিদ্যাসাগর 'মৃতে ভর্ত্তরি' বচন অবলম্বন করে বলেছিলেন, বিধবার আচরণীয় তিনটি ; পুনর্বিবাহ, ব্রহ্মচর্য ও সহমরণ। কিন্তু 'সফর' মহাশয়ের মতে ঐ বিধান দুটি—ব্রহ্মচর্য ও সহমরণ। তিনি বলেছিলেন, সত্যাদি যুগেও ঐ দুটি বিধান ছিল। তবে বর্তমানে প্রচলিত মনুসংহিতায় সহমরণের কোন উল্লেখ নেই।

'সফর' বলেছিলেন, ক্রতু বচনে দত্তা কন্যার দান নিষিদ্ধ হয়েছিল। পরাশর সংহিতা স্মৃতিশাস্ত্র হলেও ক্রতুবচনকেও তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একথাও জানিয়েছিলেন, বৃহৎ পরাশর সংহিতায় বিধবাবিবাহ সমর্থন করা হয় নি। অতএব পরাশরের 'নষ্টেমৃতে' বচনের যে অর্থ বিদ্যাসাগর করেছিলেন তা' ঠিক নয়।

বিদ্যাসাগর কলিযুগে বিধবাবিবাহের দৃষ্টান্ত হিসেবে অর্জুনের নাগকন্যা-বিবাহের যে ঘটনা উল্লেখ করেছিলেন 'সফর' তার বিরোধিতা করে বলেছিলেন, ঐ ঘটনা ঘটেছিল আসলে কলিযুগ-সন্ধিতে। যুগসন্ধিতে পূর্বযুগের আচার-আচরণ অনেক অংশে প্রচলিত থাকে। তিনি আরও বলেছিলেন, ঐ বিবাহের সময় কৃষ্ণ বর্তমান থাকায় বলা যায়, ঐ বিবাহ কলিযুগের ঘটনা নয়। তাছাড়া, অর্জুনের পক্ষে যা আচরণীয়, সাধারণের পক্ষে তা আচরণীয় হতে পারে না।

'সফর' মহাশয় অপর যুক্তি দিতে গিয়ে বলেছিলেন, পরাশর কলিযুগে মাত্র ঔরস ও দত্তক পুত্রের কথাই বলেছিলেন. (বিদ্যাসাগরের মতে পরাশর ঔরস, দত্তক ও কৃত্রিম—এই তিন প্রকার পুত্রের কথা বলেছিলেন।) এবং প্রয়োজন বোধে অনেকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেও থাকতো। এই তথ্যের ওপর নির্ভর করে তিনি বলেছিলেন—

"দত্তক গ্রহণের অনুমতি থাকিলে বিধবাস্ত্রী পুনর্ব্বিবাহ করিবার পূর্ব্বে দত্তক গ্রহণ করিতে বাধ্য কিনা ও গ্রহণ করিলে সেই পরজাত পুত্রকে এবং ঔরসপুত্র ও দুগ্ধপোষ্য বা শিশু থাকিলে তাহাকে প্রতিপালন করিবার কাল প্রতীক্ষার নিয়ম অবধারিত না করিয়া অতীতানাগতজ্ঞ পরাশর যে কলিকালের ন্যায় জটিল কালে বিধবাবিবাহের বিধান করিয়াছেন ইহা আমার সামান্য বুদ্ধিতে লয় না।"

(তদেব ; পৃঃ ৭৩)

'সফর' একথাও বলেছিলেন, পুনর্বিবাহিতা হলে পূর্ব স্বামীর ধনে বিধবানারীর অধিকার থাকবে কিনা পরাশর সংহিতায় সে কথা নেই। তাঁর বক্তব্য, বিধবাবিবাহের পক্ষে মত থাকলে পরাশর ঐ বিষয়ে নিশ্চয়ই মতামত প্রকাশ করতেন।

'সফর' মহাশয় আরও বলেছিলেন, বেদব্যাস পরাশরের কাছে কলিধর্ম শ্রবণ করেছিলেন; 'নষ্টেমৃতে' বচনও তিনি শুনেছিলেন। কিন্তু ঐ বচনকে বিধবাবিবাহ বিধায়ক রূপে তিনি গ্রহণ করেন নি; গ্রহণ করলে কলিযুগে তিনি 'অন্যপূর্ব্বা' কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ বলতেন না; বৃহন্নারদীয় ইত্যাদি পুরাণে দত্তা কন্যার বিবাহকেও বিধিবহির্ভূত বলতেন না। 'সফর' একথাও বলেছিলেন, শাস্ত্রে রয়েছে অদৃষ্টের ফলেই বৈধব্য ঘটে। সেই জন্যে পরাশর বিধবাবিবাহের বিধি দিতে পারেন নি একথাও তিনি মনে করেছিলেন।

'সফরের' এইযুক্তি রক্ষণশীলতায় আচ্ছন্ন। একথাও তিনি বলেছিলেন, মনুর অনেক মত মান্য হয় না, পরাশর বচনে বিধবাবিবাহের কথা থাকলেও সে কথাও না হয় নাই-ই মানা হলো। পরাশরেরও অনেক বিধি সমাজে চালু নেই। এও ঠিক যুক্তি হলো না।

'সফর' মহাশয় আরও বলেছিলেন, বিদ্যাসাগরের মতেও বিধবার পক্ষে সর্বোত্তম হলো সহমরণ, তারপর ব্রহ্মচর্য; ব্রহ্মচার্যের পরেই বিবাহের স্থান। তাই যদি হয়, তাহলে আর জেনেশুনে বিধবারমণীকে নিকৃষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্ত করা কেন!

'সফর' কিন্তু এই যুক্তিতে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যকে ঠিকভাবে তুলে ধরেন নি বা তুলে ধরতে চান নি।

'সফর' মহাশয় বিধবাবিবাহের প্রচলন চান নি; তবে বিধবা-নারীর সংখ্যা যাতে না বাড়ে সেই দিকেই দৃষ্টি দিতে চেয়েছিলেন।

'সফর' মহাশয়ের মূলগ্রন্থ এই বক্তব্যের পরেই শেষ; কিন্তু গ্রন্থশেষে তিনি

ভূমিকাসহ এক দীর্ঘ পরিশিষ্ট সংযোজিত করেছিলেন। ঐ অংশে তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন আমরা শুধু তার সারসংকলনেরই চেষ্টা করবো—

'সফর' মহাশয় 'পরিশিষ্টের ভূমিকা'য় জানিয়েছিলেন, অপর ব্যক্তির দ্বারা কৃত কোন কোন শাস্ত্রীয় বচনের অর্থ গ্রহণ করে তিনি ভুল করেছিলেন। যেমন মনুর 'সাচেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ ইত্যাদি' বক্তব্যের 'পৌনর্ভব' শব্দের অর্থ ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকৃত অর্থ অনুযায়ী 'পুনর্ভূ'র পুত্র' ধরে ভ্রমে পতিত হয়েছিলেন। "তদ্রূপ নারদের "নষ্টেমৃতে ইত্যাদি" বচন সকলে যে অন্যপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিবার অনুজ্ঞা এবং অন্য গমনে দোষ না থাকার উক্তি আছে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার অর্থ বিবাহ অর্থাৎ মন্ত্র হোমাদি দ্বারা উদ্বাহসংস্কার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই ভ্রমাত্মক অর্থ আমিও গ্রহণ করিয়াছি। ঐ সকল বচন সাধারণতঃ পুনর্ভূ হইবার অনুজ্ঞা মাত্র কিন্তু তাহা আর পুনঃ সংস্কারতুল্য নহে। সত্যাদিযুগে ক্ষতযোনি এবং অক্ষতযোনি বিধবা উভয়েই কেবল দান কিম্বা স্থায়িভাবে আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা সাধারণতঃ সপিণ্ড অথবা সজাতীয় অন্য পুরুষের পুনর্ভূ'পত্নী হইতে পারিত কিন্তু কেবল অক্ষতযোনিরই মন্ত্র হোমাদি দ্বারা পুনসংস্কারের অর্থাৎ বিবাহের অনুজ্ঞা ছিল। ক্ষতযোনিরও সংস্কার হইতে পারিলে পৌনর্ভব পুত্রই অপ্রসিদ্ধ হইত কেননা সংস্কৃতা স্ত্রীতে উৎপাদিত পুত্র ঔরসপুত্র হয়। সাধারণতঃ পুনর্ভূ হওয়াকে ইংরাজীতে legal Concubinage বলিলে হয় এবং যে কালে রাক্ষস এবং পৈশাচ প্রকারে বিবাহ কানীন, সহোঢ়, গূঢ়োৎপন্নপুত্র এবং ঋতু ভিন্নকালে অন্যপুরুষের সঙ্গে সংসর্গেরও প্রথা ছিল সেইকালে এই প্রথা থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই প্রকার ভ্রম সকল পরিশিষ্টে সংশোধন করিলাম।"

[তদেব ; 'পরিশিষ্টের ভূমিকা' ; পৃঃ ১-২]

এই সংশোধন ছাড়াও 'পরিশিষ্টে'র অন্য উদ্দেশ্য ছিল। 'সফর' বলেছিলেন, "সাধারণ বিবাহের বিধি গৃহস্থাশ্রমের পক্ষে নিত্য হইলেও মূলে পরিসংখ্যাগত নিয়মবিধি, ক্ষতযোনির পক্ষে পাণিগ্রহণ মন্ত্রাদি পাঠ হইতেই পারে না, কলিযুগে পুনর্ভূ হওয়াও নিষিদ্ধ, পরাশরের উদ্ধৃত "নষ্টেমৃতে ইত্যাদি" বচন অন্য যুগের পূর্ব্বোক্ত প্রথার পুনস্মরণমাত্র কলিযুগে বিধবাবিবাহের অনুজ্ঞা নহে এই মতের প্রতিপোষক আরও যুক্তি এবং প্রমাণ এই সকল প্রদর্শিত হইল এবং অক্ষতযোনি বিধবার পুনসংস্কার বিধায়ক এবং কলিযুগে তাহার নিষেধক শাস্ত্র সকলের সমালোচনা করা হইল।" (তদেব ; পৃঃ ২)

'পরিশিষ্ট' অংশে 'সফর' মহাশয় আরও যুক্তি ও তথ্যের মাধ্যমে বলতে চেয়েছিলেন. কোন অবস্থাতেই ক্ষতযোনি বিধবার মন্ত্রাদিযুক্ত বিবাহ সম্ভবপর নয়। অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ সম্বন্ধেও তিনি এখানে আলোচনা করেছিলেন। নানা শাস্ত্রবচনের সাহায্যে তিনি দেখিয়েছিলেন, কন্যার সঙ্গে বরের সংসর্গ না ঘটলে কন্যার পতিগোত্র প্রাপ্তি ঘটে না। ঐ সংসর্গের আগে বরের যেমন পতিত্ব, কন্যার তেমনি পত্নীত্ব জন্মায় না, এই জন্যেই অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ হবে কিনা তার স্বতন্ত্র উল্লেখের প্রয়োজন শাস্ত্রকারেরা অনুভব করেন নি; কেননা তার বিবাহ শাস্ত্র সম্মত;—কেননা তার কন্যাত্ব ঘুচে যায় নি।

কিন্তু এই বক্তব্যের পরেই কলিযুগে অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ সম্ভবপর কিনা সেই বিষয়ে তিনি আলোচনায় মনোযোগী হয়েছিলেন। মনুর বক্তব্য অনুসারে প্রথমে তিনি বলেছিলেন, ঐ বিবাহ নিষিদ্ধ নয়; তবে কন্যার তা ইচ্ছাধীন। অবশ্য ঐ অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ 'দান সাপেক্ষ' নয়। কিন্তু এই বক্তব্যের পরেই দেখা যায়, 'সফর' মহাশয় অক্ষতযোনি বিধবাবিবাহের বিপক্ষে অনেক শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করেছেন; তবে অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ যে নিষিদ্ধ সে বিষয়ে তিনি খুব দৃঢ় মত পোষণ করেন নি। মনে হয় ঐ বিবাহকে তিনি স্বীকার করেই নিয়েছিলেন।

'নবজীবন' পত্রিকায় ১২৯২ সালের ফাল্গুন মাসে (৮ম সংখ্যা, ২য় ভাগ) রামদাস সেনের 'বিধবাবিবাহ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাবন্ধিক বলেছিলেন, "এই প্রস্তাবে আমরা বিধবাবিবাহের পক্ষাপক্ষ বিচার করিব, বাধক সাধক উভয়বিধ প্রমাণ আহরণ করিব; অনন্তর তাহার পদ্ধতি বা প্রাচীন প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা বর্ণনা করিব।" [নবজীবন; ফাল্গুন, ১২৯২; ২য় ভাগ, ৮ম সংখ্যা; পৃঃ ৪৭১]

প্রবন্ধটিতে রামদাস সেনের ব্যক্তিগত মতামত যা জানা যায় তাতে বোঝা যায়, বিধবাবিবাহের তিনি সমর্থক ছিলেন না। বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে ব্যক্ত মতামত বিশ্লেষণ করা হলেও প্রবন্ধটির শেষে এক পাদটীকায় আমরা প্রাবন্ধিকের ঐ মনোভাবের পরিচয় জানতে পাই।

সাবিত্রী লাইব্রেরী ছিল সে যুগের কলকাতার একটি বিখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা। ঐ লাইব্রেরীর ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে (১২৯২, ২৮ শে বৈশাখ) শ্যামাসুন্দরী দেবী বিধবাবিবাহ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। প্রবন্ধটির

নাম 'হিন্দুবিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা'। ১২৯৩ সালের আশ্বিন মাসে গোবিন্দলাল দত্ত প্রকাশিত 'সাবিত্রী' গ্রন্থে এই প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছিল। সংকলক জানিয়েছিলেন, পূর্বোক্ত অধিবেশনেবিধবাবিবাহ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে আলোচ্য প্রবন্ধটি 'তৃতীয় বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায়' 'প্রতিশ্রুত উপহার' প্রাপ্ত হয়েছিল।

শ্যামাসুন্দরী বিধবানারীর ব্রহ্মচর্য পালনেরই কথা বলেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত বক্তব্যের বিরুদ্ধে তিনি বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর "শাস্ত্রীয় প্রমাণ্ দ্বারা এরূপ প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই যে বিবাহ করাই বিধবাদিগের সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম, না করিলে কোনরূপ প্রত্যবায় আছে ; এবং ভরসা করি শাস্ত্রেও মহর্ষি পরাশরাদি মুনি ঋষিগণ বিধবাগণের বিবাহাপেক্ষা যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যেরই অধিক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তিনিও তাদৃশ ব্রহ্মচর্য্য পালনই শ্রেষ্ঠ মনে করেন।" (সাবিত্রী—গোবিন্দলাল দত্ত প্রকাশিত ; ১২৯৩। পৃঃ ২৪৪)

বলাবাহুল্য, শ্যামাসুন্দরী নিজে ব্রহ্মচর্য পালনের পক্ষপাতী ছিলেন বলেই বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের এমনি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

শ্যামাসুন্দরী তাঁর প্রবন্ধে একথাও বলেছিলেন, স্বামীর মৃত্যুর পরে বা আরও কয়েকটি অবস্থায় নারীর দ্বিতীয় পতি গ্রহণের নির্দেশ শাস্ত্রে রয়েছে বটে তবে নীচজাতি ভিন্ন উচ্চজাতির নারী পুনর্বিবাহ করে না। এই বক্তব্যের মধ্যে শ্যামাসুন্দরীর সংস্কারই প্রধান হয়ে উঠেছিল।

বিধবাবিবাহের অনুকূলে প্রবর্তিত আইনের তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, ঐ আইনে বিবাহ বাধ্যতা মূলক নয় বটে কিন্তু তা বিধবা নারীর কাছে প্রলোভনেরই পথ খুলে দিয়েছে। প্রলুব্ধ না হবার শিক্ষা না দিলে সংযত চরিত্র আশা করা যায় না। "দশমবর্ষীয়া বালিকার নিকট প্রলোভনের দ্বার খুলিয়া দিয়া কোন্ মূর্খ তাহার মহত্ত্ব পরীক্ষা করিতে যায়।"

(তদেব ; পৃঃ ২৫৭)

শ্যামাসুন্দরী সকল বয়সের বিধবানারীকেই বিবাহ না করবার উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্যামাসুন্দরী যে অধিবেশনে বিধবাবিবাহ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন সেই অধিবেশনে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের অন্যতম নেতা অক্ষয়চন্দ্র সরকারও ঐ একই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন। প্রবন্ধটির নাম 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না?' প্রবন্ধটি 'নবজীবন'-এ প্রকাশিত

হয়েছিল। তাঁর ঐ প্রবন্ধটিও তৎকালীন সমাজে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। বিভিন্ন মহল থেকে প্রবন্ধটির প্রতিবাদও করা হয়েছিল।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার হিন্দুবিবাহের মধ্যে উচ্চতর এক আধ্যাত্মিক ভাব লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি এও বলেছিলেন, "হিন্দুর বিবাহ একটি কুল-কর্ম। আত্মকৃতি নহে।"

(সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৪র্থ)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, ১৯৬৬। পৃঃ ৯৮৪)

বিবাহমন্ত্রের বক্তব্যের আলোকে এই কথা তিনি বেশ স্পষ্ট ভাবেই তুলে ধরেছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছিলেন, "হিন্দুর বিবাহে দুটি তারা দেখিতে হয় একটি অরুন্ধতী; আর একটি ধ্রুবতারা। অরুন্ধতীকে সাক্ষী করিয়া, আদর্শ করিয়া কন্যা বলেন, 'হে অরুন্ধতী আমি যেন তোমার মত পতিতে আবদ্ধ থাকি।...অর্থাৎ ইহকালে পরকালে যেন সমান আবদ্ধ থাকি। আর ধ্রুবকে সাক্ষী করিয়া বলেন, আমি যেন তোমার মত পতিকুলে চিরস্থির থাকি।" (তদেব; পৃঃ ৯৮৫) এই বক্তব্যের পরেই তিনি বলেছিলেন, ধর্মের দিক থেকে বিচার করলে নারীর পুনর্বিবাহ সম্ভবপর নয়।

অক্ষয়চন্দ্র 'নষ্টে মৃতে' বচন সম্পর্কে বলেছিলেন, ঐ বচনে উল্লিখিত আপদ পাঁচটিতে বিবাহ করার কথা থাকলেও প্রবৃত্তির নিবৃত্তিই হলো প্রকৃত ধর্ম। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানিয়েছিলেন, 'পৌনর্ভব' শব্দের উল্লেখ থেকেও বলা যায় না, বিধবাবিবাহ সঙ্গত। অক্ষয়চন্দ্র দত্ত বিধবানারীর পক্ষে নিষ্কাম ব্রহ্মচর্যপালন প্রশস্ত বলে মনে করেছিলেন।

বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে গিয়ে অক্ষয়চন্দ্র হিন্দুনারীর পাতিব্রত্যের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। "হিন্দুনারীরা জানেন, কেবল এক এবং অদ্বিতীয়ং; কাজেই তিনি পতিচারিণী হইলেই একচারিণী; সেই পতি যখন ব্রহ্মে লীন হইলেন, কাজেই তিনি ব্রহ্মচারিণী।" (তদেব; পৃঃ ৯৮৯) অক্ষয়চন্দ্রের এই বক্তব্যে যুক্তি অপেক্ষা বাগাড়ম্বর ও ভাবাবেগেরই প্রাধান্য ঘটেছিল। বস্তুতঃ ঐ বাগাড়ম্বর ও ভাবাবেগের আড়ালে তিনি তাঁর রক্ষণশীলতাকেই ঢাকবার চেষ্টা করেছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্রের বক্তৃতা দেবার সময় প্রগতিশীল যুবক বিপিনচন্দ্র পাল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বক্তব্য শোনবার পর বিপিনচন্দ্রের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল এবং সে জন্যে তিনি ঐ বক্তব্যের প্রতিবাদও করেছিলেন।

কিন্তু শুধু বিপিনচন্দ্রই নন, আরও অনেকেই সে যুগে অক্ষয়চন্দ্রের বক্তব্যের প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিলেন। ঐ সব প্রতিবাদের মধ্যে ১২৯২ সালের ২রা ও ৯ই আষাঢ়ের 'সোমপ্রকাশে' মুদ্রিত 'হিন্দুবিধবার আবার বিবাহ হইবে কিনা' রচনাটি খুবই উল্লেখযোগ্য।

প্রতিবাদকারী অক্ষয়চন্দ্রের বক্তব্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন। আলোচনার প্রথম কিস্তিতে তিনি বলেছিলেন, বিধবার পুনর্বিবাহ প্রচলিত থাকলে নারীর পদস্খলনের ভয় থাকে না—বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য পালন করা খুবই কঠিন।

অক্ষয়চন্দ্র বিবাহ মন্ত্রের আলোকে নারীর পুনর্বিবাহ অচিন্তনীয় বলেছিলেন। তার জবাবে প্রতিবাদকারী বলেছিলেন, "আমাদের এই ধারণা যে পতি বিদ্যমানে স্ত্রী পতিকুলে ধ্রুব থাকিবে, অরুন্ধতীর ন্যায় পতিতে আবদ্ধা থাকিবে. পতির সম্বন্ধে পতির পরিবাররূপ সাম্রাজ্যে সম্রাজ্ঞী হইবে। স্ত্রী ও পতি বর্ত্তমানেই এই সকল অঙ্গীকার বাক্যের কার্য্য হইবে। কিন্তু পতির অবর্ত্তমানে যে উহার কার্য্য হইবে, একথা উদ্ধৃত মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থে বোধ হয় না।"

(তদেব ; পৃঃ ৩৩৮)

অক্ষয়চন্দ্র বলেছিলেন, পরলোকগত স্বামীর সঙ্গেও স্ত্রীর আত্মার যোগ থাকে। স্বামী বিদেশে গেলে যেমন স্ত্রী বিবাহ করে না তেমনি স্বামী পরলোকে গেলেও আর বিবাহ করবে না। প্রতিবাদকারী এর বিরুদ্ধে বলেছিলেন. বিদেশগত আর পরলোকগত স্বামী এক ব্যাপার নয়।

প্রতিবাদকারী বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা খুব জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন ; কিন্তু ব্রহ্মচর্য এবং সহমরণের পথও তিনি বিধবানারীর সামনে উন্মুক্ত রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি একথাও বলেছিলেন, যে বিধবা রমণী ব্রহ্মচর্যপালন করবে সেই রমণীই অধিকতর সম্মানীয়া হবে। এই বিষয়ে অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে তার মতৈক্য দেখা যায়। অবশ্য অক্ষয়চন্দ্র বিধবাবিবাহের কথা আদৌ স্বীকার করেন নি। সহগমনের কথাও নয়।

অক্ষয়চন্দ্রের বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রতিবাদকারী ধর্ম-বিজ্ঞান-জীবন ও সমাজ সমস্ত বিষয়েই গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তার যুক্তিবাদও কম বলিষ্ঠ নয় ; কিন্তু তবুও বলবো, তার বক্তব্যে পিছুটানও ছিল।

অক্ষয়চন্দ্রের বক্তব্যের আরও প্রতিবাদ পাওয়া যায়। ৫০ নং সীতারাম

ঘোষ ষ্ট্রীটের 'আলোচনা' কার্যালয় থেকে "প্রতিবাদ নবজীবন সম্পাদক ও বিধবাবিবাহ।" শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। [illegible]কটিতে রচয়িতার নাম পাওয়া যায় নি। প্রকাশকালও জানা যায় না।

অক্ষয়চন্দ্রের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী বলেছিলেন, অক্ষয়চন্দ্র হিন্দুবিবাহের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা উচ্চ আদর্শেরই কথা —হিন্দুসমাজে সাধারণভাবে তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি বলেছিলেন, আমাদের দেশে বাল্য-বিবাহ হয়ে থাকে; ঐ বিবাহে অক্ষয়চন্দ্র কথিত আধ্যাত্মিকতা থাকতে পারে না। বহুবিবাহ প্রচলিত থাকার জন্যেও যে হিন্দুবিবাহে আধ্যাত্মিকতা থাকতে পারে না সে কথাও তিনি জানিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, সমাজ দেখে না নর-নারী স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হয় কি ভাবে; "প্রচলিত বিবাহপদ্ধতি অনুসারে তাহারা যুক্ত হইয়াছেন কিনা, সমাজ কেবল তাহাই দেখে। সুতরাং প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি অনুসারে যিনি যে রমণীর পতি হইয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুতেই সেই রমণী বিধবা হইলেন। কিন্তু এই বিবাহে যখন আধ্যাত্মিক অনাধ্যাত্মিক কথাই উঠে নাই তখন এইরূপ বিধবারমণীর বিবাহে অনন্তকাল স্থায়ী আধ্যাত্মিক বন্ধন ছিন্ন হয় বলিয়া, তাহার প্রতিবাদ করিতে পারা যায় না।"

[প্রতিবাদ নবজীবন সম্পাদক ও বিধবাবিবাহ (রচয়িতার নাম ও প্রকাশকাল অজ্ঞাত); পৃঃ ৮]

অবশ্য তিনি বলেছিলেন, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত গভীর প্রেমজনিত আধ্যাত্মিকতা থাকে সেখানে স্বামীর মৃত্যুতেও স্ত্রীর বৈধব্য ঘটে না। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে তা নেই সেই সব ক্ষেত্রেও স্বামীর মৃত্যুতে আত্মার ধ্বংস হয় না বলে হিন্দু নারীর পুনরায় বিবাহ অসম্ভব এই বক্তব্য প্রযুক্ত হতে পারে না।

অক্ষয়চন্দ্রের মতে বিবাহে ইচ্ছুক বিধবানারী তার 'নিকৃষ্ট বৃত্তির চরিতার্থ' নিমিত্তই ব্যস্ত হয়। প্রতিবাদকারী কিন্তু বলেছিলেন, প্রকৃত ভালোবাসা না থাকবার জন্যে স্বামীর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী যদি বিবাহ করতে চায় তা হলে তা দোষের হবে না। তাঁর মতে, যে সব বিধবা নারী সত্যিই স্বামী বিয়োগে শোকাতুরা তাদের পক্ষেই ব্রহ্মচর্য আচরণীয়; কিন্তু দেশে তেমন বিধবার সংখ্যা কম।

আলোচ্য 'প্রতিবাদ'-এ প্রতিবাদকারী অক্ষয়চন্দ্রের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন যে দৃষ্টিভঙ্গিতে তাকে অনেকটা উদারপন্থী বলা গেলেও ঠিক

বিজ্ঞাননিষ্ঠ বলা যায় না। তার বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, হিন্দুবিবাহ যথার্থ আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত হলে বিধবাবিবাহ তিনি সমর্থন করতেন না।

প্রথম খণ্ড 'সমাজ দীপিকা'র ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (কার্তিক ; ১২৯২) "বিধবাবিবাহ/দেবদূত ও সনৎকুমারের কথোপকথন" শীর্ষক একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে কাল্পনিক চরিত্রের মুখে খুব কৌশলে রচয়িতা বিধবাবিবাহের বিপক্ষে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন।

রচনাটিতে বলা হয়েছিল, কোন কোন শাস্ত্রে যেমন বিধবাবিবাহের বিধি আছে কোন কোন শাস্ত্রে তেমনি তার নিষেধও রয়েছে। তবে ঐ বিরোধের যে মীমাংসা করা যায় না তা নয়। রচয়িতার মতে, দেশ, কাল ও পাত্র অনুযায়ীই শাস্ত্র কার্যকরী হয়। এককালে এক নিয়ম প্রচলিত হলে তা' যে চিরকাল মানতে হবে বা মানা যায় তা নয়। এই কারণেই বলা যায়, প্রাচীনকালে বিধবাবিবাহের বিধি থাকলেও এখন তার নিষেধই শ্রেয়। রচয়িতা তাঁর এই সব বক্তব্য দেবদূতের মুখেই প্রকাশ করেছিলেন। দেবদূতও অন্য অনেক ব্যক্তির মত বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলেছিলেন, পরাশরশাস্ত্র কলিযুগের জন্যে নয়—বিধবাবিবাহ তাই কলিযুগে অশাস্ত্রীয়।

আলোচ্য কথোপকথন মূলক রচনাটিতে বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করতে গিয়ে অজ্ঞাতনামা লেখক বেশ হাস্যকর যুক্তি দেখিয়েছেন।

আগেই বলা হয়েছে, বিদ্যাসাগরের 'ব্রজবিলাস' ও 'বিনয় পত্রিকা'র প্রতিবাদেও কয়েকজন পুস্তক রচনা করেছিলেন। ঐ সব পুস্তকের মধ্যে মধুসূদন স্মৃতিরত্নের 'বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ' ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটিতে অবশ্য শুধু 'ব্রজবিলাস' এবং 'বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দু ধর্মরক্ষিণী-সভা বিষয়িনী' ('বিনয় পত্রিকা')-রই নয় বিদ্যাসাগরের অপর গ্রন্থে ব্যক্ত মতামতেরও সমালোচনা করা হয়েছিল।

স্মৃতিরত্নমহাশয় কেন কাদের প্রেরণায় তাঁর বই রচনা করেছিলেন নিজেই তা বলে গিয়েছেন—

"...উপযুক্ত ভাইপো কৃত, ব্রজবিলাস নামক অপূর্ব্ব কাব্য ও তত্ত্বান্বেষিকৃত (বিধবাবিবাহ, নামক কাব্য) এই দুইখানি বাহির হয়, এই উভয় কাব্যেরই প্রধান উদ্দেশ্য ভদ্রলোকের, বিশেষতঃ অধ্যাপক গণের নিন্দা, আনুষঙ্গিক বিধবাবিবাহের, অকিঞ্চিৎকর কিছু কিছু প্রমাণও উক্ত কাব্যে নিবেশিত হইয়াছে, ইহা দৃষ্ট করিয়া আমার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্তি হয়, বিশেষতঃ কৃষ্ণ-

নগরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় তথা শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ধনিগণের বিশেষ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এই প্রতিবাদ গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবর্ত্তমান হই।"

(বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ—মধুসূদন স্মৃতিরত্ন; ১৯৪২ সম্বৎ। "বিজ্ঞাপন" অংশ; পৃঃ ।০)

স্মৃতিরত্ন তার গ্রন্থের শেষভাগে 'ব্রজবিলাসে'র প্রতিবাদ করেছিলেন। বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু সেই প্রতিবাদেরই আলোচনা করা হবে।

বিদ্যাসাগর কাত্যায়নের—

"স তু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব বা।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োঽপি বা॥
ঊঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাভরণভূষণা।"

[বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ (২য়) সাক্ষরতা প্রকাশন; ১৯৭২। পৃ. ৪৭০]

এই বচনের অর্থ করেছিলেন নিম্নরূপ—

"যাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়, সে ব্যক্তি যদি অন্যজাতীয়, পতিত, ক্লীব, যথেচ্ছচারী, সগোত্র, দাস, অথবা চিররোগী হয়, তাহা হইলে, ঊঢ়া অর্থাৎ বিবাহিতা কন্যাকেও, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, অন্য পাত্রে দান করিবেক।" (তদেব; পৃঃ ৪৭০)

বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, একবার দান করা হলেও সেই কন্যা পুনরায় দান করা যায়। উক্ত বচন তারই প্রমাণ।

স্মৃতিরত্ন কিন্তু এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন। তার বক্তব্য 'ঊঢ়া' শব্দে বিধবা নয়, বাগ্‌দত্তা নারীকেই বোঝানো হয়েছে। কেননা স্বজাতি ভিন্ন অন্য জাতির কন্যা এবং সগোত্রকন্যা বিবাহ করলে সেই স্ত্রীকে মাতার ন্যায় পোষণ করাই বিধেয়। আর তাই যদি হয় তাহলে অনুরূপ অবস্থায় ঐ শ্রেণীর স্ত্রীর অন্যত্র দানও অশাস্ত্রীয়।

বিধবাবিবাহ যে শুধু শাস্ত্রেই নয়, সমাজেও প্রচলিত ছিল তার দৃষ্টান্ত হিসেবে বিদ্যাসাগর অর্জুনের নাগকন্যা-বিবাহের কথা উল্লেখ করেছিলেন। স্মৃতিরত্ন তার বিরুদ্ধে বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ৯১ অধ্যায়ের যে শ্লোক উদ্ধার করে অর্জুনের ঐ বিবাহের কথা বলেছিলেন সেই শ্লোকটির পূর্ণ বক্তব্য তিনি গ্রহণ করেন নি। এই জন্যে তিনি পূর্ণাঙ্গ শ্লোকটি উদ্ধার

করে দেখিয়েছিলেন সেখানে "অর্জ্জন কামপরতন্ত্র। ঐ কন্যাকে ভার্য্যার্থ পরিগ্রহ করেন, এইরূপে পরক্ষেত্রে অর্জ্জন কর্ত্তৃক এই পুত্রটী উৎপন্ন হইয়াছে।"

(বৈধবাবিবাহ প্রতিবাদ—মধুসূদন স্মৃতিরত্ন; ১৯৪২ সম্বৎ।

পৃঃ ৯২-৯৩)

স্মৃতিরত্ন বলেছিলেন, ঐ শ্লোকে 'পরক্ষেত্রে' শব্দের উল্লেখ থাকায় ঐ কন্যাদান যে নিয়োগেরই জন্যে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

'ব্রজবিলাসে' বিদ্যাসাগর ব্রজনাথ কথিত বিবাহ লক্ষণের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ঐ লক্ষণ মেনে নিলে শাস্ত্রে বিধেয় গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ অবিধেয় হয়ে পড়ে। স্মৃতিরত্ন মহাশয় তার জবাবে বলেছিলেন, শাস্ত্র-নির্দিষ্ট আটপ্রকার বিবাহেই বিধিসম্মত দান ও গ্রহণের কথা রয়েছে।

'ব্রজবিলাসে' 'নষ্টেমৃতে' বচন বাগ্‌দত্তা কন্যা বিষয়ক নয় বলতে গিয়ে বিদ্যাসাগর যে যুক্তি দিয়েছিলেন ব্রজনাথ স্মৃতিরত্ন তারও বিরোধিতা করে-ছিলেন। তিনি নারদসংহিতাস্থ 'নষ্টেমৃতে' বচনের পূর্ববর্তী বচন উদ্ধার করে বলেছিলেন, বিশেষ অবস্থায় সন্তানার্থে নারীর নিয়োগ ধর্ম অবলম্বনের কথাই সেখানে বলা হয়েছে। 'নষ্টেমৃতে' বচনটি ছিল এই বক্তব্যেরই পরে; এবং তার পরেই স্বামী অনুদ্দিষ্ট হলে কোন নারী কতকাল অপেক্ষা করবে নারদমুনি সেই কথা বলেছিলেন। 'নষ্টেমৃতে' বচনের পূর্ববর্তী বক্তব্যের উল্লেখ করবার পরে স্মৃতিরত্ন মহাশয় জানিয়েছিলেন, নারদসংহিতায় প্রথমে নিয়োগ ধর্মের কথা বলা হয়েছিল, পরে বলা হয়েছিল "অন্যগমনে স্ত্রীণাং এষু দোষো ন বিদ্যতে"। এর ফলে বোঝা যায়, পাচটি আপদে নারী যদি পরপুরুষ সংসর্গও করে থাকে তাহলে তার ব্যভিচারজনিত দোষ ঘটবে না। স্মৃতিরত্ন মহাশয় আরও বলেছিলেন, নারীর যদি বিবাহ হয়ে থাকতো তাহলে নারদমুনি কখনও নিয়োগ ধর্ম 'অভিযোক্তব্যা' বলতেন না, 'অন্যগমনে স্ত্রীণাং এষু দোষো ন বিদ্যতে' একথাও বলতেন না।

প্রসঙ্গক্রমে নারদের 'পতিরন্যোবিধীয়তে' বচনাংশের অর্থ যে বিবাহবোধক নয় তাও স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, মহর্ষি নারদের যে বচনে আটপ্রকার বিবাহের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে সেখানে 'কন্যা' শব্দেরই ব্যবহার রয়েছে; অতএব বিবাহিতার বিবাহ বিধেয় তা তিনি বলেন নি। নারদ তাই পুত্রের জন্যে নিয়োগ বিধিরই কথা বলেছিলেন। কিন্তু এ বক্তব্য ত্রুটি মুক্ত বলা যায় না। কেননা পুত্রহীনা নারীর ক্ষেত্রেই নিয়োগ প্রয়োজন;

পুত্রবতী নারীর ক্ষেত্রে তার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু সন্তানবতী নারীকেও যে নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করার পরে বিবাহ করতে বলা হয়েছিল।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের মতে পরাশর পাঁচটি আপদে বাগ্‌দত্তা কন্যারই বিবাহ-বিধি দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর ঐ পাচটি স্থল ভিন্ন অন্যস্থলে বাগ্‌দত্তা কন্যার বিবাহ সম্ভবপর কিনা ব্রজনাথের কাছে তা জানতে চেয়েছিলেন। ব্রজনাথ তার কোন উত্তর দেন নি; তবে মধুসূদন দিয়েছিলেন; কিন্তু তা অত্যন্ত দুর্বল।

'ব্রজবিলাসে'র বিরোধিতা করবার পরে স্মৃতিরত্ন মহাশয় 'বিনয় পত্রিকা'রও প্রতিবাদ করেছিলেন। ঐ পুস্তকে বিদ্যাসাগর 'বীরমিত্রোদয়' গ্রন্থের বচন উদ্ধার করে বিধবাবিবাহের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন। স্মৃতিরত্ন মহাশয় তার বিরুদ্ধে বলেছিলেন ঐ 'বীরমিত্রোদয়' গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের এবং তা অপ্রামাণিক।

মধুসূদন তার গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের 'ব্রজবিলাস' ও 'বিনয় পত্রিকা'র সমালোচনা করা ছাড়াও কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন। বিদ্যাসাগরের 'রত্নপরীক্ষা' এবং মহেশচন্দ্র চড়ামণির 'পত্র' আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা সেই বক্তব্য উত্থাপন করবো।

মধুসূদন স্মৃতিরত্নের 'বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ' প্রকাশিত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশের (১৮৫৫) বহুবছর পরে ১৮৮৬ (১৯৪২ সম্বৎ) খ্রীষ্টাব্দে। বিদ্যাসাগর তখন বেশ বৃদ্ধ। কিন্তু সেই বয়সেও তিনি এগিয়ে এসেছিলেন বিতর্কযুদ্ধে। মধুসূদনেরই বক্তব্যের বিরুদ্ধে রচিত হয়েছিল তার 'রত্নপরীক্ষা' (১৮৮৬, আগষ্ট)।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ও বলেছিলেন, 'নষ্টেমৃতে' বচনের 'পতিরন্যোবিধীয়তে' অংশে পুনর্বিবাহের কথা নেই। এই সিদ্ধান্তের জন্যে তিনি শাস্ত্রীয় বচনের সহায়তায় বিবাহের সংজ্ঞা ও প্রকারও নির্ণয় করেছিলেন এবং বলেছিলেন, বিধবাবিবাহকে কোন বিবাহেরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। বিবাহের মন্ত্র কেবলমাত্র কন্যার বিবাহেই প্রযোজ্য; বিধবা কন্যা নয়। বিধবার বিবাহবিধি থাকলে মন্ত্রে তার উল্লেখ থাকতো।

বলাবাহুল্য, মধুসূদনের এই বক্তব্য নতুন নয়; কিন্তু তা হলেও বিদ্যাসাগর এই বক্তব্যের জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কন্যা শব্দ শুধু কুমারীকেই বোঝায় না, দুহিতা ও স্ত্রীকেও বুঝিয়ে থাকে। তিনি আরও বলেছিলেন, 'অমরকোষে' কন্যা শব্দের অর্থ কুমারীই; কিন্তু 'বিশ্বকোষে' তার অর্থ

কুমারী ও নারী দুই-ই। সেখানে কুমারী ও নারী পৃথকভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এই কারণে নারী বলতে বিবাহিতাকেও বোঝা যায়। সুতরাং 'বিশ্বকোষ' অনুযায়ী কন্যা বলতে যখন বিবাহিতা নারীও বোঝায় তখন বিধবা নারীকে কন্যা বলতে বাধা কোথায়!

স্মৃতিরত্নের অপর একটি বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, ও রাক্ষস বিবাহের লক্ষণ বর্ণনায় কন্যা শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। কন্যাশব্দে কুমারী ও অকুমারী সকলকেই বোঝানো হয়ে থাকে; সুতরাং ঐ ছয় প্রকার নিয়ম অনুযায়ী কুমারীর ছয় প্রকার বিবাহ যদি সম্পন্ন হতে পারে তাহলে "বিধবার বিবাহ, ঐ ঐ নিয়ম অনুসারে সম্পাদিত হইলে, ব্রাহ্মপ্রভৃতি সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট না হইবেক কেন।"

[বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ (২য়), সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭২। পৃঃ ৪৪১]

উপর্যুক্ত ছয় প্রকার বিবাহ ছাড়া আরও দুই প্রকার বিবাহ রয়েছে—দৈব ও পৈশাচ বিবাহ। দৈব বিবাহের লক্ষণ নির্ণয়ে 'সুতা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তার দ্বারাও বিবাহিতা ও অবিবাহিতা উভয়কেই বোঝানো যায়। কাজেই বিবাহিতা সুতা বা বিধবার বিবাহও এতে আটকায় না। বাকি রইল যে পৈশাচ বিবাহ তার লক্ষণ বর্ণনায় কন্যা বা সুতা কোন পদেরই উল্লেখ নেই, যে কোন নারীর ক্ষেত্রেই তাই ঐ বিবাহ চলতে পারে। অতএব বলা যায় আট প্রকার শাস্ত্রসিদ্ধ বিবাহের লক্ষণে প্রত্যক্ষভাবে বিধবাবিবাহের কথা না থাকলেও ঐ সব বিবাহের লক্ষণের দ্বারা বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ তা বলা যায় না; বরং তাকে সমর্থনই করা যায়। বিদ্যাসাগরের এই যুক্তি অত্যন্ত বলিষ্ঠ। এখানে তাঁর সূক্ষ্ম চিন্তা-শক্তির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ এ কথা প্রমাণ করবার জন্যে মনুর 'নোদ্বাহিকেষু' (৯।৬৫) এবং ৮ম অধ্যায়ের ১২৬-১২৭ বচন উদ্ধার করেছিলেন। রঘুনন্দনের বক্তব্যও তিনি তুলে ধরেছিলেন। রঘুনন্দনের বক্তব্য অনুযায়ী কন্যার একবার বিবাহ সংস্কার হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার আর তার সংস্কার জন্মায় না। স্মৃতিরত্ন মহাশয় শাস্ত্রীয় বচনের সহায়তায় বলতে চেয়েছিলেন, কেবল কুমারীর (কন্যার) পাণি গ্রহণই বিধেয় এবং যেহেতু রঘুনন্দনের মত অনুযায়ী কন্যার প্রথম বিবাহেই সংস্কার জন্মে সেইহেতু অকুমারী ও একবার বিবাহিতা নারীর (বিধবার) বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হতে পারে না।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে মনুর 'নোদ্বাহিকেষু বচন উদ্ধার করে যা' বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তকে লিখিত ঐ বচন সম্পর্কিত আলোচনা উদ্ধার করে তার জবাব দিয়েছিলেন।

স্মৃতিরত্নের অপর বক্তব্যের বিরুদ্ধে জবাব দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, বিবাহ দ্বারাই কন্যাত্ব লোপ পায় না। তিনি মনু সংহিতার ৮।২০৫, ৮।২২৫ এবং ৮।২২৬ শ্লোকের দ্বারা দেখিয়েছিলেন, "উন্মাদ, কুষ্ঠরোগ, পুরুষসংসর্গ, এই তিনের অন্যতম দোষে দূষিত হইলে কন্যারা অকন্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপে যে সকল কন্যা অকন্যা বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাদের বিবাহে বৈবাহিক মন্ত্রের প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। দেখ, মনুসংহিতা অনুসারে, যে সকল দোষ ঘটিলে, কন্যা অকন্যাশব্দে নির্দিষ্ট হইতে পারে, বিবাহ তন্মধ্যে পরিগণিত দৃষ্ট হইতেছে না।" (তদেব ; পৃঃ ৫৪৯)

এই বক্তব্যের সমর্থন তিনি নারদ সংহিতার মধ্যেও পেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর এইভাবে প্রমাণ করেছিলেন, বিধবা অকন্যা নয় ; সুতরাং তার বিবাহে বৈবাহিক মন্ত্রের ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় নারীর পুনর্বিবাহকে প্রাসঙ্গিক ধর্ম বলে অভিহিত করেছিলেন। ব্যাসদেব পরাশরের কাছে চাতুর্বর্ণ্য ধর্মই জানতে চেয়েছিলেন। পরাশর প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ড ও চাতুর্বর্ণ্য ধর্ম বা ব্রাহ্মণদের কৃত্যাদি ধর্মই বলেছিলেন। এই দুই ধর্মই ছিল উদ্দেশ্য ধর্ম, প্রাসঙ্গিক ধর্ম নয় ; সাধারণ যুগের কোন ধর্ম যদি প্রসঙ্গক্রমে বলা হয় তাহলে তাকেই প্রাসঙ্গিক ধর্ম বলা যায়। পরাশর সংহিতায় পরাশর পরিবেদন ও অগ্ন্যাধান প্রকরণে প্রসঙ্গক্রমে 'নষ্টেমৃতে' বচনটি বলেছিলেন। সুতরাং তা প্রাসঙ্গিক ধর্মের পর্যায়েই পড়ে। একে তাই কলিধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তিনি এই বক্তব্যের পক্ষে আরও যুক্তি দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর এই বিষয়ে আপনার বক্তব্য রেখেছিলেন এবং আপনার পূর্বালোচিত সিদ্ধান্তকে আরও জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছিলেন।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের 'বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ' পাঠ করে সংস্কৃত কলেজের মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় পুস্তক রচয়িতার কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। মহেশচন্দ্র ঐ পত্রে 'বিধবাবিবাহ প্রতিবাদে'র বক্তব্য খণ্ডন করে আপনার মত জানিয়েছিলেন। বিতর্করচনার ইতিহাসে এই দীর্ঘ পত্রটিরও মূল্য অনেক। পত্রটি লেখা হয়েছিল বৈদ্যনাথে, ১২৯২ বঙ্গাব্দে। রাত্রি ৭টা থেকে ১১টা

এই ৪ খণ্ডের 'বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ' ইবটি পড়বার পরে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন কর্তব্যবোধে পরম আত্মীয় মধুসূদন স্মৃতিরত্নের ত্রুটি দেখিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন ঐ পত্রটিতে।

'পতিরন্যোবিধীয়তে' এই বচনাংশের বিদ্যাসাগরকৃত অর্থের বিরুদ্ধে স্মৃতিরত্ন 'নিয়োগপর' অর্থ নির্ণয় করেছিলেন। শাস্ত্রীয় বিধি ছিল, অপুত্রকতা দূর করবার জন্যেই নিয়োগ প্রযোজ্য; কিন্তু স্মৃতিরত্নের ব্যাখ্যা ছিল ভিন্নরূপ। মহেশচন্দ্র তাঁর ঐ ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেছিলেন। স্মৃতিরত্ন মহাশয় পূর্বোক্ত বচনাংশের 'পতি' বলতে 'পতিস্থানীয় সন্তানোৎপাদক' বুঝিয়েছিলেন। পত্রদাতা এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "পতিশব্দের এইরূপ অভূতপূর্ব্ব অর্থ করিবার পূর্ব্বে আপনার কি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল না যে 'অন্য', 'অপর' প্রভৃতি শব্দ বিশেষণ থাকিলে বিশেষ্যজাতীয় দ্বিতীয় ব্যক্তির সত্তা বুঝায়,.. "অন্যপতিঃ" বলিলে দ্বিতীয় পতি বুঝায়।" (তদেব, পৃঃ ২৫৩)

যুক্তিটি অকাট্য। ভাষাতাত্ত্বিক এই বিশ্লেষণ বিজ্ঞান সম্মতই হয়েছে। স্মৃতিরত্ন মহাশয় 'ঊঢ়া শব্দে বাগ্‌দত্তা, পুনরুদ্বাহ ও পুনঃসংস্কার শব্দে নিয়োগ সম্ম' অর্থ করেও যে ভুল করেছিলেন মহেশচন্দ্র তাও বলেছিলেন।

অর্জুন বিধবা নাগকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন বিদ্যাসাগরের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলেছিলেন, অর্জুন ঐ ক্ষেত্রে শুধু নিযুক্তই হয়েছিলেন। মহেশচন্দ্র এই বিষয়েও বিদ্যাসাগরের সমর্থনে বেদব্যাসব্যক্ত "ঐরাবতেন সা দত্তা," "ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ," "অর্জ্জুনস্য আত্মজঃ" অংশনিচয়ের উল্লেখপূর্বক বলেছিলেন, ঐগুলি "বিবাহ প্রতিপাদক"। তিনি আরও বলেছিলেন, "নিয়োগোৎপাদিত পুত্র ত ক্ষেত্রীরই পুত্র হইয়া থাকে।" কিন্তু ইরাবানকে ব্যাসদেব অর্জুনেরই পুত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, নাগকন্যাকে অর্জুন বিবাহই করেছিলেন।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মধুসূদনের বক্তব্যের আরও অনেক ত্রুটি আলোচনা করেছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্তে যে স্ববিরোধিতা রয়েছে তাও তিনি বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছিলেন। মধুসূদন যে নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্যে শাস্ত্রের জোর জবরদস্তি ব্যাখ্যা করেছিলেন সে কথাও মহেশচন্দ্র বলেছিলেন।

১২৯২ বঙ্গাব্দে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটির পরিকল্পনা প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, 'বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা' নামে তাঁর একটি

প্রবন্ধ 'প্রভাতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই প্রবন্ধ থেকে তাঁর এ নামেরই আলোচ্য গ্রন্থটি অনেক পৃথক।

দেবেন্দ্রনাথ বিধবানারীর সামনে ব্রহ্মচর্য ও বিবাহ দুই পথই খুলে রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে ব্রহ্মচর্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, শাস্ত্রে যে ধরণের ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশ আছে সেই ধরণের ব্রহ্মচর্য পালনে বিধবানারীর ক্ষতি হবে। যাঁরা ব্রহ্মচর্যকে নিষ্কামধর্ম বলে থাকেন, তাঁদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, "ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মও নয়, নিষ্কাম কর্ম্মও নয়।" (বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ; ১২৯২ ; পৃঃ ৭) তাঁর মতে বিধবা কামনা নিয়েই ব্রহ্মচর্য পালন করে, এই কারণে তার ব্রহ্মচর্য নিষ্কাম নয়। তিনি বলেছিলেন, "ব্রহ্মচর্য্য স্বর্গফল সাধক ক্রিয়া এবং স্বর্গফল সাধক কার্য্য মাত্রেই সকাম।" তদেব ; পৃঃ ১৫) কিন্তু এতসব বলবার পরেও দেবেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেছিলেন, সকাম বা নিষ্কাম যে ধরণের ব্রহ্মচর্যই হোক না কেন তার পালনে বিধবা যে স্বর্গে যেতে পারবে তাও সত্য নয় ; কেননা স্বর্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ রয়েছে।

পূর্বেই অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রবন্ধের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে অক্ষয়চন্দ্র ব্রহ্মচর্যের যে আদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ তা' মেনে নেন নি। তাঁর বক্তব্য, ব্রহ্মের সেবাকে ব্রহ্মচর্য বলা হলে বিধবানারী বিবাহিতা হয়েও ব্রহ্মের সেবা করতে পারে। যাই হোক, বিধবানারীর বিবাহকেই তিনি প্রশস্ত বলে মনে করেছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্র বলেছিলেন, বিবাহের সময় কন্যা অরুন্ধতীর মত পতিনিষ্ঠ হবার এবং ধ্রুবনক্ষত্রের মতো পতিকুলে অটল থাকবার বাসনা পোষণ করে। বিবাহমন্ত্রেই এই বাসনা পোষণের কথা রয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদে বলেছিলেন, "ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং" মন্ত্র কুশণ্ডিকা প্রকরণে রয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর জাতির কন্যাদের এই প্রতিজ্ঞা করতে হয় না। অতএব বলা যায়, বিধবা হলে তাদের পক্ষে বিবাহে কোন বাধা থাকতে পারে না। তাছাড়া যদি কোন কন্যার বিবাহে এই মন্ত্র উচ্চারিত না হয় তাহলে সেও বিধবা হবার পরে শাস্ত্রসম্মত উপায়েই পুনর্বিবাহিতা হতে পারে। দেবেন্দ্রনাথের এই যুক্তি খুবই বলিষ্ঠ। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছিলেন, কন্যা অরুন্ধতীর মত স্বামীনিষ্ঠ এবং ধ্রুবনক্ষত্রের মতো পতিকুলে অটল থাকবার প্রতিজ্ঞা করলেও দ্বিতীয় বিবাহে তার কোন বাধা থাকতে পারে না ; কেননা অবোধ কন্যা না বুঝেই ঐ প্রতিজ্ঞা

আর বুঝে প্রতিজ্ঞা করলেও বিধবা হবার পর যদি সে পতিকুলেরই কাউকে বিবাহ করে তাহলেও তা' অশাস্ত্রীয় বলে গণ্য হবে না; কেননা তখন সে পতিকুলেই অবস্থান করবে।

দেবেন্দ্রনাথ 'নষ্টেমৃতে' বচনকে বিধবাবিবাহ বিষয়ক বলেই মেনে নিয়েছিলেন। দেশাচারকেও তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষে কোন বাধা বলে মানেন নি।

নিছক যুক্তির দিক দিয়ে বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথ একটি মূল্যবান কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে জীবনের উদ্দেশ্য সফল করবার জন্যেই বিবাহের প্রয়োজন; বিধবা অবিবাহিতারই সামিল। বিধবাবিবাহের পক্ষে তিনি আরও বাস্তবধর্মী যুক্তি দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত বক্তব্যের বিরুদ্ধে লেখা সবচাইতে বড় বইটির রচনাকারী ছিলেন সম্ভবতঃ প্রসন্নকুমার শর্মা। ইনি ভবানীপুরের প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় নন। ইনি ছিলেন সম্ভবতঃ ময়মনসিংহের লোক;—তাঁর গ্রন্থ ময়মনসিংহের 'চারু যন্ত্রে' মুদ্রিত হয়েছিল বলেই এই অনুমান। প্রসন্নকুমারের গ্রন্থের নাম 'বিধবাবিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ'। গ্রন্থটির প্রকাশ কাল ১২৯৩ বঙ্গাব্দ।

বিদ্যাসাগর-বিরোধীদের অনেকেরই মতো প্রসন্নকুমারও বলেছিলেন, মনুস্মৃতিই প্রধান শাস্ত্র; পরাশরও মনুর প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন; বিদ্যাসাগরের মতের বিরুদ্ধে প্রসন্নকুমার আরও বলেছিলেন, কোন বিশেষ যুগের জন্যে কোন বিশেষ শাস্ত্র নেই; তবে মনুই সর্বযুগে মান্য। তাঁর মতে মনুশাস্ত্র আগে খুবই বৃহৎ ছিল; বিভিন্ন যুগের মানুষের ধর্মাচরণ ক্ষমতার দিকে নজর রেখে যুগে যুগে তাকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত মনুসংহিতা মূল মনুসংহিতার সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত রূপ। এই কথার পরেই তিনি আবার বলেছিলেন, সকল শাস্ত্রই চারযুগে মান্য। এর ফলে তাঁর বক্তব্যে সববিরোধিতা দেখা দিয়েছিল।

লঘুপরাশর সংহিতা এবং বৃহৎপরাশর সংহিতা—এই দুই প্রকার পরাশরসংহিতার প্রথমটিকে বিদ্যাসাগর এবং দ্বিতীয়টিকে প্রসন্নকুমার প্রামাণিক বলে মনে করেছিলেন। তাদের ঐ মনে করার কারণও তাঁরা বলেছিলেন। দু' জনেরই যুক্তি বেশ সবল। প্রসন্নকুমারের যুক্তি ছিল, বৃহৎপরাশর সংহিতায় লঘু পরাশরসংহিতার বিধবাবিবাহবিধায়ক 'নষ্টেমৃতে' বচন নেই; এই দিক থেকে মনুসংহিতার সঙ্গে বৃহৎপরাশরের কোন বিরোধ দেখা যায় না; কেননা মনুসংহিতাতেও বিধবাবিবাহ সমর্থিত হয় নি। প্রসন্নকুমারের মতে

মন্থর সঙ্গে বিরোধিতা না ঘটায় বৃহৎপরাশরই প্রামাণ্য গ্রন্থ। বিদ্যাসাগর অবশ্য বলেছিলেন, মনুসংহিতাতেও বিধবাবিবাহ সমর্থিত হয়েছিল। প্রসন্নকুমার তারও বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর ঐ বিরোধিতাও খুব দুর্বল নয়। প্রসন্ন-কুমার বলেছিলেন, মনু বিধবাবিবাহ সমর্থন তো করেন-ই নি, নিয়োগের বিধানও তিনি ঠিক দিতে চান নি। প্রসন্নকুমার প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন, মনু বিধবার দ্বিতীয় পতি এবং পুত্রের অছিলায় অন্যকোন পুরুষ সংসর্গ অনুমোদন করেন নি; পৌনর্ভব পুত্রের সামাজিক মর্যাদাও তিনি খুব একটা দিতে চান নি।

অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনা করেও তিনি দেখিয়েছিলেন, বিধবাবিবাহ কোথাও সমর্থিত হয় নি এবং পৌনর্ভব পুত্রকেও কেউ উচ্চস্থান দেন নি। পরাশর পৌনর্ভবকে ঔরস পুত্র বলেছেন বলেও তিমি মনে করেন নি।

'বিধবাবিবাহের পক্ষে অর্জুন ও নাগকন্যা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর যা বলেছিলেন প্রসন্নকুমার তার বিরুদ্ধেও বেশ জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'দত্তা' বা 'ভার্য্যার্থ গ্রহণ' শব্দ থাকলেই যে তা বিবাহ বোধক হবে তা নয়। ঐ শব্দের প্রয়োগে নিয়োগও বোঝানো হয়ে থাকে। ঐরাবতকন্যা ও অর্জুনের মিলন এবং ঐ মিলন সম্ভূত পুত্রের শ্রেণী নির্ণয় প্রসঙ্গে ব্যবহৃত 'দত্তা' আর 'ভার্য্যার্থ গ্রহণ' শব্দগুলি তিনি ঐ অর্থেই গ্রহণ করেছিলেন। আপনার বক্তব্যকে জোরালো করবার জন্যে তিনি মহাভারতের আর এক ঘটনারও উল্লেখ করেছিলেন—সত্যবতী কাশীরাজ কন্যাতে সন্তান উৎপাদনের জন্যে ভীষ্মকে ঐ কাশীরাজ কন্যাদের ভার্যার্থ গ্রহণ করতে বলেছিলেন। কিন্তু ঐ ভার্যার্থ গ্রহণ আদৌ বিবাহ নয়।

প্রসন্নকুমার ইরাবনকেও অর্জুনের ঔরস পুত্র বলেন নি। তাঁর মতে যুধিষ্ঠির আসলে পাণ্ডব; কিন্তু তবুও কখনো কখনো তাঁকে 'ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির' বলা হয়ে থাকে; ইরাবানকেও সেইভাবে 'অর্জ্জুনাত্মজ' বলা হয়েছে। তাছাড়া মহাভারত অনুযায়ী ইরাবানের পিতৃব্য হলেন অশ্বসেন—নকুল-সহদেব নন। এ থেকেও বোঝা যায়, ইরাবান অর্জুনের ঔরসপুত্র নয়।

প্রসন্নকুমার বেদের 'যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি' বচনের মধ্যে বিধবাবিবাহের কথা রয়েছে বলে মানেন নি। পূর্বে কথিত 'নৈকস্যবহবঃ' বচনের দ্বারা বিধবাবিবাহ সমর্থন করা যায় না বলেও তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ঐ বচনের সহায়তায় বলেছিলেন, নারী এককালে একাধিক পতি

গ্রহণ করতে পারে না; তবে স্বামীর মৃত্যুর পরে অন্যপতি গ্রহণ করতে পারে। প্রসন্নকুমার বিদ্যাসাগরের ঐ বক্তব্যের বিরুদ্ধে জানিয়েছিলেন, মহাভারতের ১৫৮ অধ্যায়, আদিপর্ব 'বকবধ পর্ব্বাণি'তে বেদব্যাস বলেছিলেন, "স্ত্রীদিগের পক্ষে পূর্ব্বপতি বিনা অন্যপতি গ্রহণ করা অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই।" (বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ—প্রসন্নকুমার শর্মা; ১২৯৩; পৃঃ ২০৭) প্রসন্নকুমারের মতে, বেদব্যাসের এহেন বক্তব্য স্বীকার করে নিলে বলা যায় না 'নৈকস্যবহবঃ' বচনের বিদ্যাসাগরকৃত ব্যাখ্যা সত্য। তাঁর মতে ব্যাসদেব সকলেরই মান্য।

প্রসন্নকুমার 'নষ্টেমৃতে' বচনকে নারদসংহিতার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেছিলেন। তাঁর মতে ঐ সংহিতা পূর্ণ ধর্ম শাস্ত্র নয়;—তা ব্যবহার শাস্ত্র। তিনি বলেছিলেন, "...ব্যবহার শাস্ত্রোক্ত যে কোন বিধিই যে সাধারণের আচরণীয় এমত নহে।...যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী তাহা অবশ্যই পরিত্যজ্য।" (তদেব; পৃঃ ২২৫) প্রসন্নকুমারের মতে 'নষ্টেমৃতে' বচনের নির্দেশ ধর্মশাস্ত্রসম্মত নয় বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। তাছাড়া লোকব্যবহারের দ্বারা অনুমোদিত নয় বলেও তা পরিত্যজ্য। একবার দান করা কন্যার পুনর্দান সম্ভবপর নয় বলেও তিনি বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন।

বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে তিনিও বলেছিলেন, বিধবাকন্যাকে তার পিতা দান করতে পারে না। স্বামী মারা গেলেও নারী বিধবা হয় না। মৃত স্বামীর স্ত্রীই সে থেকে যায়। এই কারণে পিতা হলেও অপরের স্ত্রীকে সে অন্যব্যক্তিকে দান করতে পারে না।

উপরে ব্যক্ত প্রসন্নকুমারের আপত্তিগুলি বহুকথিত; বহু আলোচিতও বটে। এইসব আপত্তির বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর বহু আগে যে উত্তর দিয়েছিলেন আমাদের কাছে তাই-ই যথার্থ বলে মনে হয়।

বিদ্যাসাগরের আরও কয়েকটি বক্তব্যের বিরোধিতা প্রসন্নকুমার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বিদ্যাসাগরের মত অনুযায়ী গোত্রের অর্থ বংশ হলেও সপ্তপদীর পরেই কন্যার পতিগোত্র প্রাপ্তি ঘটে। এই কারণে তার পুনর্বিবাহে পিতৃগোত্র উল্লেখের প্রশ্ন ওঠে না। প্রসন্নকুমার একথাও বলেছিলেন, বিবাহমন্ত্র দ্বারা কন্যাকে পিতৃকুল থেকে স্বতন্ত্র করে নেওয়া হয় এবং পতিকুলে তাকে অবিচল থাকবার কথা বলা হয়। এ থেকে বোঝা যায়, বিবাহিতাকে আর পিতৃকুলে ফিরিয়ে আনা যায় না। বিবাহিতা কন্যার বিবাহে তাই প্রথম বিবাহের মন্ত্রও প্রযোজ্য হতে পারে না।

প্রসন্নকুমার মনে করেছিলেন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে কতগুলি বাস্তব অসুবিধা দেখা দেবে। যেমন, দুই স্বামীর ঔরসে দুই পুত্র জন্মালে [illegible]র পক্ষ কোন গোত্র উল্লেখ করে তার শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্নহবে ? — শাস্ত্র ঐ বিষয়ে নীরব।

প্রসন্নকুমার আরও বলেছিলেন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে ব্রহ্মচর্য লুপ্ত হয়ে যাবে। স্ত্রীগণের মন খুব চঞ্চল ; ঐ বিবাহের প্রচলনে তারা স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে পড়বে। ভ্রূণ হত্যাও এতে বেড়ে যাবে। প্রসন্নকুমারের এই সব বক্তব্য নিতান্তই দুর্বল ও হাস্যকর।

প্রসন্নকুমার তাঁর 'বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ' গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের 'রত্নপরীক্ষা' গ্রন্থেরও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর গ্রন্থে বেদের 'উদীর্ষ্ব নার্য্যাভি' বচনকে বিধবাবিবাহের অনুকূলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রসন্নকুমার তার বিরুদ্ধে বলেছিলেন, সহমরণে উদ্যতা নারী যথার্থই পতিপ্রাণারূপে চিতারোহণ করছে কিনা তা যাচাই করবার জন্যে তাকে নানা প্রলোভনবাক্য শোনানো হতো ; বেদের ঐ বচন তেমন একটি প্রলোভনবাক্য মাত্র। অন্য যুক্তিতেও তিনি ঐ বচনকে বিধবাবিবাহ-বোধক বলে মানতে চাননি। বিদ্যাসাগর অথর্ব বেদের ' যা পূর্ব্বং পতিং' ইত্যাদি বচনকেও বিধবাবিবাহ সমর্থক বলেছিলেন ; প্রসন্নকুমার ভিন্নতর অর্থ করে সেই বচনকেও বিধবাবিবাহের সমর্থক নয় বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

প্রসন্নকুমার 'রত্ন পরীক্ষা'র প্রতিবাদ করতে গিয়ে এ কথাও বলেছিলেন, শাস্ত্রকারদের মতে পুনর্ভূ ও পুনর্ভূপতি অধঃগমন করে থাকে ; অর্থাৎ তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন, বিধবাবিবাহ নিন্দনীয় ব্যাপারই বটে।

বিদ্যাসাগর-বক্তব্যের বিরুদ্ধে অর্জুন-ইরাবান প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রসন্নকুমার নতুন বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ইরাবানের পিতৃব্য ছিলেন অর্জুন বিদ্বেষী। তিনি ইরাবানকে পরিত্যাগ করেছিলেন ; সেজন্যে তার মাতা তাকে মাতুলালয়ে রেখে পালন করেছিলেন। ঐ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, ইরাবানের পিতা ছিলেন না। অর্জুনের বীর্য্যে জন্মালেও সে ক্ষেত্রজপুত্র। অর্জুন-বীর্য্যে জন্ম হয়েছিল বলেই তার অর্জুন বিদ্বেষী পিতৃব্য তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। ইরাবান যদি অর্জুনের বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত হতো তাহলে তার ঐ দশা ঘটতো না।

কন্যাশব্দের বিদ্যাসাগর কৃত অর্থও প্রসন্নকুমার মেনে নেন নি তিনি কন্যা অর্থে শুধু কুমারীকেই বুঝেছিলেন

বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের পক্ষে 'রত্নপরীক্ষা'য় তন্ত্রবচন উদ্ধার করেছিলেন। প্রসন্নকুমার বলেছিলেন, স্মৃতিবিরুদ্ধ বলে 'শিবোক্তবিধি' প্রমাণ হিসেবে গণ্য নয়। এইপ্রসঙ্গে পরে গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' অংশে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, তন্ত্রে 'বেদোক্তবিধি' এবং 'শিবোক্তবিধি' উভয় বিধিই রয়েছে। তন্ত্রে বিধবার ব্রহ্মচর্যের যে কথা রয়েছে তা ঐ বেদোক্তবিধি এবং যে বিধবাবিবাহের কথা রয়েছে তা শিবোক্তবিধি। প্রসন্নকুমারের সিদ্ধান্ত "কুলধর্ম্মানুসারে যাহারা বৈদিক বিধি অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহাদিগের পক্ষে শৈবধর্ম্মানুসারে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ"···

(তদেব ; পৃঃ ৩২৭)

প্রসন্নকুমার একথাও প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন, মহানির্বাণ তন্ত্রেই শৈববিবাহের নিন্দা করা হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য ছিল, "শৈববিধি অনুসারে বিবাহিতা বিধবাকে তাহার পতি ও পিতৃকুলের কেহই প্রতিপালন করিতে দায়ী হইতেছে না, কেবল শৈবভর্ত্তাই প্রতিপালনের কর্ত্তা হইতেছেন।···ইহাতে স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে যে বিবাহিতা বিধবা শৈবপতি ভিন্ন পতিকুলের ও পিতৃকুলের সকলেরই পরিত্যাজ্য (!) হইতেছে। অতএব ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে সংকুলোদ্ভব ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিধবার বিবাহ সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ এবং লোকবিগর্হিত কার্য্য ইহার আর সংশয় নাই।" (তদেব ; পৃঃ ৩২৮)

প্রসন্নকুমার শেষে ঐ মহানির্বাণ তন্ত্রেরই সাহায্যে দেখিয়েছিলেন, বেদোক্ত ধর্মানুযায়ী কন্যার একবারই বিবাহ হয়ে থাকে। "দান ও কন্যার ব্রাহ্মোদ্বাহ" দুইবার হতে পারে না। অতএব বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়। প্রসন্নকুমারের এই যুক্তির মধ্যে গভীর চিন্তা স্পষ্ট।

বিদ্যাসাগর রচিত 'রত্নপরীক্ষা'র প্রতিবাদে লেখা আর একটি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। পুস্তকটির নাম 'রত্নপরীক্ষার প্রতিবাদ'। প্রাপ্ত বইটির টাইটেল পেজ না থাকায় তার রচয়িতার নাম জানা যায় নি। তবে বইটির 'বিজ্ঞাপন' অংশে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য রয়েছে। ঐ 'বিজ্ঞাপন' থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ উদ্ধার করছি—"রত্নপরীক্ষা পাঠে আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে নিশ্চয়ই স্মৃতিরত্ন মহাশয় ইহার উত্তর দিবেন পরম্পরা শ্রুত হইলাম, তিনি ইহার উত্তর দিবেন না·····

এক্ষণে আমরা কতিপয় খুড়ায় মিলিয়া বিবেচনা করিলাম, আমরা জীবিত থাকিতে "উপযুক্ত ভাইপো" ও "তৎসহচরের" অবমাননা কদাচ সহ্য করিতে

পারিব না। সুতরাং আমাদিগকে লেখনী ধারণ করিতে হইল। স্মার্ত্ত রত্ন মহাশয়ের প্রতিবাদে গ্রন্থের উপর ভাইপো সহচর যে প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ প্রতিবাদের প্রতিবাদ ঠিক কিনা, আমরা মধ্যস্থ হইয়া তাহারই বিচার করিব।" (রত্নপরীক্ষার প্রতিবাদ—'বিজ্ঞাপন'; পৃঃ /০)

'বিজ্ঞাপন' অংশে বিজ্ঞাপনদাতা হিসেবে নাম রয়েছে 'কেষাঞ্চিং মধ্যস্থীনাম্'।

রচয়িতা প্রথমেই "সহচর" প্রদত্ত প্রমাণ "সাগ্নিকের দাহমন্ত্র" "উদীর্ষ নার্য্যাভি" ইত্যাদি (দ্রঃ ৬ষ্ঠ প্রপাঠক, ১ম অনুবাক—১৪ মন্ত্র : তৈত্তিরীয় আরণ্যক) সম্বন্ধে আপনার মত ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "সহচর" ঐ মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করতে পারেন নি। তার মতে, এখানে স্বামিহীনা নারীকে দেবরই হাত ধরে তুলবে; তবে তার অবর্তমানে শিষ্য, শিষ্যের অভাবে প্রাচীন দাস ঐ কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে। এখানে ঐ হাত ধরে তোলা অর্থ পাণিগ্রহণ বা বিবাহ নয়। রচয়িতা আরও বলেছিলেন, ঐ মন্ত্রে যে দিধিষু শব্দ রয়েছে তার দ্বারা বিবাহবিধিদ্বারা সম্পন্ন পতি বলতে যা বোঝায় তা বোঝানো হয় নি। এই জন্যে ঐ মন্ত্র বিধবাবিবাহ সমর্থক বলে গণ্য হতে পারে না; বরং তা শ্রুতিস্মৃতি বিরুদ্ধ।

বিদ্যাসাগর 'রত্নপরীক্ষা'য় অথর্ববেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের যে সব বচন উদ্ধার করেছিলেন রচয়িতা তাদের কোনটিকেই বিধবাবিবাহ প্রতিপাদক বলে মনে করেন নি। ঐ পুস্তকে উদ্ধৃত পুরাণবচনকেও তিনি বিধবাবিবাহ সমর্থক বলে স্বীকার করেন নি। তবে 'নষ্টেমৃতে' বচন সম্পর্কে তিনি মধুসূদনের বক্তব্যকেই মেনে নিয়েছিলেন।

বিধবাবিবাহের পক্ষে উদ্ধৃত তন্ত্রবচনের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, তন্ত্র শ্রুতি ও বেদবিরুদ্ধ। মহানির্বাণতন্ত্রোক্ত শৈববিবাহও শ্রুতি-স্মৃতিবিরুদ্ধ। তার মতে শৈববিবাহ প্রকৃত বিবাহই নয়।

রচয়িতা বিদ্যাসাগরের অপর এক বক্তব্যের বিরুদ্ধে বলেছিলেন, 'বিবাহিতা নারী কখনও কন্যা হতে পারে না, এবং একমাত্র কন্যারই বিবাহ শাস্ত্রসম্মত।

'রত্নপরীক্ষা'র এই প্রতিবাদকারী মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বক্তব্যেরও প্রতিবাদ করেছিলেন। মহেশচন্দ্রের 'পত্র'টি 'রত্নপরীক্ষায় সংযোজিত হয়েছিল বলেই যে তিনি তার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন তা বোঝা যায়।

যাই হোক, মধুসূদনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে মহেশচন্দ্র বলেছিলেন, 'পতিরন্যো-

বিধীয়’ বাক্যাংশে নিয়োগর কথা আদৌ নেই। ‘রত্নপরীক্ষা’র প্রতিবাদকারী প্রতিবাদ জানিয়ে মধুসূদনের বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন।

‘রত্নপরীক্ষা’র প্রতিবাদকারী ‘নষ্টেমৃতে’ বচনের ‘পতি’ শব্দের ‘সন্তান উৎপাদক’ এবং পুনঃ সংস্কারের ‘নিয়োগধর্ম্ম’ এই অর্থ নির্দ্ধারণে মধুসূদনের বক্তব্যেরই পুনরুক্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, নাগকন্যাকে অর্জুন বিবাহ করেন নি; তিনি শুধু নিয়োগ ধর্মানুসারে নিযুক্তই হয়েছিলেন। পরাশর বচনকে তিনিও বাগ্‌দত্তা বিষয়ক বলে মনে করেছিলেন।

আসলে এই প্রতিবাদকারী নতুন কোন বক্তব্যই রাখেন নি; তবে বহুকথিত বা অন্যকথিত বক্তব্যের সমর্থনে কখনও কখনও যুক্তিবিন্যাসে কিছু দক্ষতা দেখাতে পেরেছিলেন।

এবার যোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণির গ্রন্থের আলোচনা করা যাক। দুষ্প্রাপ্য এই গ্রন্থটির নামপত্রে গ্রন্থের নাম এবং রচয়িতা সম্পর্কে লেখা ছিল—

"The

Remarriage of Aryan Ladies Confuted.

(Treslinguce)

By

Jogindra Nath Tarka Chudamani

Govt. Honor.

The Sanaskrit Lecturer, Author etc"

বাংলা ভাষাতে বলা হয়েছিল, "মেলেবেডি প্রভৃতি ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ কাশ্যধীতি শ্রীযোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি কর্তৃক কৃত।" গ্রন্থটির প্রকাশ ঘটে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে।

গ্রন্থটির প্রথমে রচয়িতা "The Nobles of England, The lieutenant Governors of India, And the Arya Rajas" সমীপেষু জানিয়েছিলেন, বিধবাবিবাহের রীতি অশাস্ত্রীয়, অনৈতিক এবং কোন দিক থেকেই তা গ্রাহ্য নয়। এই বক্তব্যের পরেই তিনি "আর্য্য মহিলাদের দুইবার বিবাহ কি রূপে?" এই শিরনামে মূল আলোচনার অবতারণা করেছিলেন।

যোগীন্দ্রনাথেরও বক্তব্য ছিল ‘নষ্টেমৃতে’ বচন আদৌ পরাশরের নয়। "ইহা বেদ সমালোচনায় নারদসংহিতার উদ্ধার,·· নারদ বেদাদি এক আধস্থল ও অন্যান্য দেখিয়া ও লোকের কথঞ্চিৎ ইচ্ছা বুঝিয়া ‘নষ্টেমৃতে’ আদি ব্যবস্থা দেন,···পরাশর

সেই ব্যবস্থা দর্শন করিয়া তা' তুলিয়া তাহার উপর নিজ প্রশস্তি মত দিতেছেন, মৃতে ভর্ত্তরি ইত্যাদি। পরাশরের যে একবারে নারদকর্ত্তনা, বিধবাবিবাহ উচিত নয় এমত স্থর আমি বলি না, তবে তিনি নারদীয় কথার উপরি ঐ ক… বলিলেন।…পরাশরের অভিপ্রায় বিধবাবিবাহ হইলে সুব্রত বৃহৎ পরাশরে তুলিতে বাকি রাখিতেন না,"…

(আর্য্যমহিলাদের দুইবার বিবাহ কিরূপে?—যোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি; ১৮৮৯। পৃঃ ১৩)

যোগীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বৃহৎ নারদসংহিতা ও আদিত্যপুরাণের মতে কলিতে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ। বৃহৎপরাশর সংহিতাতেও বিধবাবিবাহের কথা নেই। পুরাণকে তিনি ইতিহাসের মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং পুরাণ মিথ্যা কথা বলে না বলেই তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। এই কারণে তিনি বলেছিলেন, কলিতে বিধবাবিবাহকে শিষ্টরীতি বলে মনে করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বিধবাবিবাহকে মনুও সমর্থন করেন নি বলে তিনি জানিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, পরাশর কথিত বিধবাবিবাহ বেদ বিরুদ্ধ নয়। বিদ্যাসাগরের ঐ বক্তব্যের বিরোধিতায় অনেকেই প্রায় একইভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ কিন্তু এই প্রসঙ্গে কিছু নতুন কথা শুনিয়েছিলেন। তিনি উভয়পক্ষের বেদাধিকারকেই দুর্বল বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বেদে বিধবাবিবাহের কথা যে নেই তা নয়; তবে সেই বিবাহ ঘটবার অনুকূল শর্তপূরণ হওয়া সম্ভবপর ছিল না। এই জন্যে ঋষিগণ তার বিধান দিয়েও তাকে চালু করেন নি। দুই একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল এই যা।

বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, বিধবাকন্যার সম্প্রদানে পিতার গোত্রই উল্লিখিত হবে। তর্কচূড়ামণি বলেছিলেন, বিবাহ হলে তাই-ই হবে। তর্কচূড়ামণি বিদ্যাসাগরের কন্যা ও অকন্যার ব্যাখা গ্রহণ করতে পারেন নি।

নানা আলোচনার পর যোগীন্দ্রনাথ কঠোরভাবে বিধবানারীর ব্রহ্মচর্যেরই বিধান দিয়েছিলেন।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিপিনবিহারী ঘোষের 'বিধবা দর্শনে ও পুনর্ভূ' শীর্ষক গ্রন্থখানি বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। বলাবাহুল্য, বিদ্যাসাগর তার কয়েকবছর আগে পরলোকগমন করেছিলেন।

গ্রন্থটির প্রথম অংশে সংযোজিত 'বিধবা দর্শনে' নামে একটি পদ্যাংশে বিধবা

রমণীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। তার পরে সংযোজিত 'পুনর্ভূ' শীর্ষক প্রবন্ধে রচয়িতা বিধবাবিবহের যৌক্তিকতা বিচার করেছিলেন।

পাণিগ্রহণের পরে স্ত্রী-পুরুষ অভিন্ন হয়ে যায়; নারীর পুনর্বিবাহ তাই অসম্ভব, বিপিনবিহারী প্রবন্ধটিতে এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বিবাহের সময় নর-নারীর একীভূত হবার প্রার্থনাই শুধু করা হয়; কিন্তু ঐ প্রার্থনা যে দেবগণ মঞ্জুর করবেনই তার কোন অর্থ নেই। এই বক্তব্য তিনি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছিলেন। পরে মনুর বক্তব্য অবলম্বন করে তিনি বলেছিলেন, পুত্র জন্মাবার পরেই নর-নারীর মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

বিধবাবিবাহের বিষয়ে বলতে গিয়ে বিপিনবিহারী বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বচনের আলোচনা করেছিলেন; তবে তাঁর ঐ আলোচনা খুব একটা 'মেথডিকাল,' বা শৃঙ্খলাপূর্ণ হতে পারে নি। তাঁর আলোচনা যতটা 'রেফারেন্স' ধর্মী হয়েছিল ততটা বিশ্লেষণধর্মী হতে পারেন নি।

বিপিনবিহারী বিধবাবিবাহকে কদাচার বলে গণ্য করেন নি। প্রবন্ধটিতে তিনি বিধবাবিবাহ বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেছিলেন এই ভাবে—

"অতএব

১। অপ্রজাতা। ২ সতী

৩। অচতুর্ব্বিংশতি।

৪। বিবাহ নিষেধ যার করে নাই পতি॥

এরূপ বিবাহ মাত্র শাস্ত্রের বিধান।

৫। অন্যত্র সুসিদ্ধ যথা লোকাচার জ্ঞান॥"

[বিধবা দর্শনে ও পুনর্ভূ—বিপিনবিহারী ঘোষ। ১৮৯৬। পৃঃ ১২০]

:: কৌলীন্য ও বহুবিবাহ বিষয়ক বিতর্করচনা ::

বহুবিবাহের বিরুদ্ধে প্রকৃত আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল বিগত শতকের দ্বিতীয় অর্দ্ধে; কিন্তু কৌলীন্য ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধে বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয়ে গিয়েছিল তার অনেক আগেই। ঐ সব বাদ-প্রতিবাদ মূলক রচনাগুলির মধ্যে 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বহুবিবাহ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

প্রবন্ধটির প্রকাশকাল ১৭৬৪ শকাব্দের শ্রাবণ মাস। রচয়িতা বলেছিলেন, এক বিবাহই ঈশ্বরের অভিপ্রেত; এজন্যে তিনি আদিতে একনারী এবং এক পুরুষই সৃষ্টি করেছিলেন। শুধু তাই-ই নয়, পৃথিবীতে 'স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই তুল্য সঙ্খ্যা'। কাজেই বহুবিবাহের ফলে অনেক পুরুষই বিবাহ হতে বঞ্চিত হয়। আবার বহুবিবাহের ফলে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কেও অনিয়ম দেখা দেয়। তাছাড়া বহুবিবাহের জন্যে পারিবারিক শান্তিও বিঘ্নিত হয়। প্রাবন্ধিক বলেছিলেন, "অনেক রমণী ঐক্য পূর্ব্বক কদাপি এক স্বামীর প্রেমভাগ গ্রহণ করিতে তৃপ্ত হয়েন না, বরং কোনকালে সপত্নীর মুখাবলোকন না করিয়াও তাহার প্রতি দ্বেষাচরণ করেন।" [সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৩য়)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত; ১৯৬৪। পৃঃ ৫৫৮] এই কারণেই, প্রাবন্ধিকের মতে, বহুবিবাহ পরমেশ্বরের কাছে বাঞ্ছনীয় নয়। প্রাবন্ধিক আরও বলেছিলেন, বহুবিবাহের ফলে ব্যভিচার বৃদ্ধি পায়, স্ত্রীজাতির ঘৃণিত অবস্থা দেখা দেয় এবং নারী "জ্ঞান অভ্যাস প্রভৃতি জীবনের উচিত কর্ম্ম এবং উৎকৃষ্ট (!) আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহে।" (তদেব; পৃঃ ৫৫৮)

প্রজাবৃদ্ধির মাধ্যমে সৃষ্টিরক্ষার কাজ অব্যাহত রাখবার জন্যে সে যুগে অনেকেই বহুবিবাহ সমর্থন করতেন। প্রাবন্ধিক ঐ যুক্তির প্রতিবাদ করেছিলেন এবং বলেছিলেন বহু স্ত্রীতে বহু সন্তানের জন্ম হলেও বহুবিবাহ করণীয় নয়। বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয় বলেও প্রাবন্ধিক সিদ্ধান্ত করেছিলেন। সবশেষে প্রাবন্ধিক বলেছিলেন, বল্লাল সেন চালু করেছিলেন বলেই যে বহুবিবাহ প্রথা মানতে হবে তা নয়, কেননা "বল্লাল সেন সাধারণের ন্যায় একজন ভ্রমশীল মনুষ্য, বিশেষতঃ তিনি কুকর্ম্মান্বিত ছিলেন, অতএব তাহার মতের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধি এবং পরামর্শকে অবহেলা করা কি শ্রেয়ঃ বোধ হইতে পারে?" (তদেব পৃঃ ৫৬০)

১৭৬৪ শক, ভাদ্র, ৩য় সংখ্যা 'বিদ্যাদর্শনে' প্রকাশিত 'অধিবেদন' শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধেও বহুবিবাহ নিবারণের উপায়াদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছিল। প্রাবন্ধিক বহুবিবাহ নিবারণে রাজআইনকেই প্রশস্ত বলে মনে করেছিলেন। ঐ আইন প্রবর্তনে ভারতীয় ধর্মাচারে হস্তক্ষেপ ঘটবে না বলেও তিনি জানিয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বহু বিবাহের প্রথা চালু থাকায় নারীজীবন কিভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে চিত্রও তিনি তুলে ধরেছিলেন। দেশের নৈতিক অধঃপতন ঘটার জন্যেও তিনি ঐ প্রথাকে দায়ী করেছিলেন এবং বলেছিলেন,

দেশের ঐ নৈতিক অবনতি দূর করা সরকারেরই কর্তব্য। প্রাবন্ধিকের মতে, দেশের নৈতিক অধঃপতন বন্ধ করবার জন্যে আইন প্রবর্তিত হলে তাকে ভারতীয় ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ বলে গণ্য করা যায় না।

হিন্দুধর্মে আঘাত লাগবার আশঙ্কা করে সরকার ঐ আইন চালু করতে চান না এই কথার অযৌক্তিকতা প্রাবন্ধিক আরও একভাবে খণ্ডন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সরকার যে সব সময় হিন্দুশাস্ত্র মেনে চলেন তা নয়। হিন্দুশাস্ত্রে অনেক অপরাধের শাস্তি থেকে ব্রাহ্মণকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। যেমন শাস্ত্র অনুসারে খুনী হলেও ব্রাহ্মণকে প্রাণদণ্ড দেওয়া যেতো না। কিন্তু বিদেশী শাসনকর্তা তো তা মান্য করে চলেন না! এখানেই প্রমাণ হয়, "যে সকল বিধি ক্রমে সংসারের অমঙ্গল ও অত্যাচার সম্ভবে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট হিন্দু শাস্ত্রের গৌরব স্বীকার করেন না।" (তদেব, পৃঃ ৫৭০)

প্রাবন্ধিক একথাও বলেছিলেন, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন এবং সতীপ্রথা আইনের দ্বারাই নিষিদ্ধ হয়েছে। সুতরাং অকল্যাণকর ও কুৎসিত বহুবিবাহ-প্রথা নিষিদ্ধ করবার পক্ষে শাসন কর্তৃপক্ষের কোন বাধা থাকতে পারে না। যুক্তিটি নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠ।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছিলেন, শাস্ত্রে কৌলীন্যের কথা রয়েছে ঠিকই; কিন্তু সেখানে কুলীনের যে লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছিল ('আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।/নিষ্ঠাভক্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং॥') বর্তমান কৌলীন্যে তা কোথাও লক্ষিত হয় না। আধুনিক কৌলীন্য সমর্থনের কোন কারণই তিনি খুঁজে পান নি।

বহুবিবাহ নিবারণে রাজআইন-ই প্রশস্ত এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রাবন্ধিক যে সব যুক্তি দিয়েছিলেন সেগুলি নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠ।

সে যুগের 'বিদ্যোৎসাহিনী' পত্রিকায় সমাজসংস্কার বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। 'কৌলীন্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ তাদেরই অন্যতম। প্রবন্ধটির রচয়িতা কালীপ্রসন্ন সিংহ। 'বিদ্যোৎসাহিনী' পত্রিকার ২য় সংখ্যায় (১৮৫৫) মুদ্রিত ঐ প্রবন্ধটি ১৩৪৩ সালের ৩য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছিল, গুণ অনুসারে বল্লাল যে কৌলীন্যের প্রবর্তন করেছিলেন তা মন্দ নয়; কিন্তু পরবর্তী সময়ে কৌলীন্য একান্ত ভাবে বংশগত হয়ে পড়েছিল। বহুবিবাহের দরুণ নারীর যে দুঃসহ অবস্থা হয় তাও তিনি

বলেছিলেন। প্রাবন্ধিক সবশেষে লোকনিন্দা ভয়কে তুচ্ছ করে হিতকর কাজের জন্যে সকলকে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

১৭৭৮ শকাব্দের ভাদ্রসংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদকীয় নিবন্ধেও ('বহুবিবাহ') বহুবিবাহের সমালোচনা করা হয়েছিল। প্রবন্ধটিতে সম্পাদক মহাশয় বহুবিবাহের পক্ষে প্রেরিত আবেদনপত্রের বিরুদ্ধে যে আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছিল তারই আলোচনা করেছিলেন। ঐ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, বহুবিবাহ সমর্থন কারীরা যে সব শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করেছিলেন তা আদৌ বহুবিবাহ বিধায়ক নয়।

ঐ বহুবিবাহবাদীদের অন্যতম যুক্তি ছিল, শুধু সৎপাত্রে দান করবার জন্যেই এক কুলীন পুরুষের সঙ্গে অনেক কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়। এই বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে মনুর বচনও উদ্ধার করা হয়েছিল। মনু বলেছিলেন, কন্যাকে সৎপাত্রে দান করবার জন্যে পিতামাতা সব সময় সচেষ্ট থাকবে। উৎকৃষ্ট পাত্র পেলে অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যাকেও সেই পাত্রে সম্প্রদান করা বিধেয়; সৎপাত্র না পাওয়া গেলে অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার মৃত্যুও ভালো। সম্পাদক মহাশয় বলেছিলেন, মনুর ঐ বচন বহুবিবাহবিরোধী ব্যক্তিদের বক্তব্যকেই জোরালো করে থাকে; কেননা কুলীন ব্যক্তিরা যে সব পাত্রে কন্যাদান করে তারা আদৌ সৎপাত্র পদবাচ্য নয়। আসলে মনু কথিত সৎপাত্র রূপে আধুনিক কুলীন গণ্য হতে পারে না। এ বক্তব্য নিঃসন্দেহে সত্য।

বহুবিবাহ সমর্থনকারীদের মতে, কৌলীন্যের ফলে এমন কোন দোষ দেখা দেয় নি যার জন্যে রাজআইনের প্রয়োজন। সম্পাদক মহাশয় ঐ বক্তব্যের মধ্যেও কোন সারবত্তা খুঁজে পান নি।

বহুবিবাহের পক্ষে প্রেরিত ঐ আবেদন পত্রে আবেদনকারীরা বলেছিলেন, দেশে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই রয়েছে। অতএব বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন হলে তা' মুসলমানের ক্ষেত্রেও গিয়ে বর্তাবে। সম্পাদক মহাশয় ঐ বক্তব্যের অসারতা দেখাতে গিয়েও বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়েছিলেন—"কোন ভবন দগ্ধ হইবার সময় কোন ব্যক্তিকে সেই অগ্নি হইতে উদ্ধার করিতে গেলে সে ব্যক্তি যদি এরূপ আপত্তি করে, যে আমরা অনেকেই এককালে দগ্ধ হইতেছি অতএব কেবল আমি একাকী কি জন্য এ অগ্নি হইতে মুক্ত হইব, তাহা হইলেই প্রতিবাদীগণের পূর্ব্বোক্ত আপত্তির অবিকল উপমা হইতে পারে।"

[সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২য়)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত; ১৯৬৩। পৃঃ ১৯৫]

বিগত শতকের অন্যতম প্রভাবশালী পত্রিকা 'সমাজদীপিকা'তে (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২; ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা) 'কৌলীন্যপ্রথা' নামে একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল। কৌলীন্য বংশানুক্রমিক হওয়াতেই সমাজে অনর্থ ঘটেছে এই বক্তব্যই প্রাবন্ধিক সেখানে তুলে ধরেছিলেন। তিনিও বলেছিলেন, সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই বল্লালসেন কৌলীন্য চালু করেছিলেন; তবে পরবর্তীকালে তা সমাজকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। প্রাবন্ধিক একথাও বলেছিলেন, কৌলীন্যের ফলে মেয়েদের বয়স ক্রমশঃ বেড়ে যেত; অথচ তা আদৌ শাস্ত্র সম্মত নয়।

তিনি ঐ প্রথার উৎসাদনে পাঠকদের উদ্যোগী হতে বলেছিলেন।

'সমাজদীপিকা'র ঠিক পরবর্তী সংখ্যায় (আষাঢ়, ১২৯২; ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা) ঐ একই বিষয়ে 'বহুবিবাহ' নামে আর একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল। প্রাবন্ধিক সেখানে বলেছিলেন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং অর্থ উপার্জন এই দুটিই ছিল বহুবিবাহের কারণ। তিনি তাঁর প্রবন্ধে এক বিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয়বচন উদ্ধার করেছিলেন।

প্রাবন্ধিক অবশ্য এ কথাও বলেছিলেন, এক সময় এদেশে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল; ঐ বিবাহ করবার সামর্থ্যও পুরুষের ছিল। কিন্তু পুরুষের সে শক্তি আজ বিলুপ্ত।

প্রাবন্ধিকের এই বক্তব্যে মনে হয় সবল হলে বা প্রাচীন যুগের পুরুষের মত অবস্থা থাকলে বহুবিবাহ দোষের নয় বলেই যেন তিনি বিশ্বাস করতেন।

যাইহোক, প্রাবন্ধিক তাঁর সমকালে প্রচলিত বহুবিবাহের কয়েকটি ক্ষতিকর দিকের উল্লেখ করেছিলেন এবং বহুবিবাহের ফলে যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তার স্বরূপ তুলে ধরেছিলেন।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'সমাজ সংস্করণ' পুস্তকের প্রকাশ ঘটেছিল ১২৭৬ সালে। গ্রন্থটি আসলে কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। এই 'সমাজ সংস্করণ' গ্রন্থটিতে 'কৌলীন্য প্রথা' নামে একটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল। কৌলীন্য প্রথার পূর্বতন ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবার পর প্রাবন্ধিক এখানে কৌলীন্যের কুফল বিশ্লেষণ করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, ১৩ বা ১৪ বছরে মেয়েরা ঋতুমতী হয়, কিন্তু কুলীনের ঘরে ২০।২৫ বছর বয়সের যুবতীও অবিবাহিত থাকে। এ আদৌ অভিপ্রেত নয়।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃতি খণ্ড থেকে বচন উদ্ধার করে বলেছিলেন, বৃদ্ধ, গুণহীন ইত্যাদি পাত্রকে কন্যাদান করা অশাস্ত্রীয়, অথচ

কুলীন ব্রাহ্মণ তাদের কন্যাকে ঐ রকম পাত্রেই দান করে থাকে। কুলীনেরা পরের ওপর জীবন নির্বাহ করে বলে পরিশ্রম বিমুখ ও বিলাসী হয়ে পড়ে। কুলীন বলে যারা পরিচিত তারা বংশের নামেই মর্যাদা পেয়ে থাকে। আসলে তারা অপদার্থ। তিনি কৌলীন্যপ্রথা জনিত সামাজিক ক্ষতির নানাদিক আলোচনা করে ঐ প্রথা দূর করবার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের আগে কৌলীন্য ও বহুবিবাহ বিষয়ে অনেকেই প্রবন্ধাদি রচনা করেছিলেন, কিন্তু দেখা যায়, বিদ্যাসাগরের 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'ই সে যুগের জনচিত্তে সাড়া জাগিয়েছিল সর্বাধিক। পুস্তকটির প্রকাশকাল ১৮৭১ সালের আগষ্ট মাস, অবশ্য পুস্তকটির রচনাকার্য শুরু হয়েছিল তার বেশ কয়েক বছর আগেই ;—তবে নানা কারণে তা আর সমাপ্ত হ'তে পারে নি। পরে 'সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা' বহুবিবাহ বিষয়ে আন্দোলন সংগঠনে উদ্যোগী হলে তাকে সহায়তা করবার জন্যেই বিদ্যাসাগর আলোচ্য পুস্তকটির রচনাকার্য শেষ করেন।

পুস্তকটির প্রথমে তিনি বহুবিবাহ শাস্ত্র সম্মত নয় প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বিবাহ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই তিন রকমের। পুত্রলাভ ও ধর্মকার্য সম্পাদনের জন্যে গৃহস্থাশ্রমের প্রয়োজন ; এজন্যে বিবাহ অপরিহার্য। এই গৃহস্থাশ্রমের কার্য উদ্‌যাপনের সময় স্ত্রীবিয়োগ ঘটলে পুনরায় বিবাহ করা প্রয়োজন ; তবে ঐ বিবাহ স্ত্রী বর্তমানে নয়। অবশ্য কতকগুলি বিশেষ কারণে স্ত্রীবর্তমানেও বিবাহ করা যায়। কিন্তু তা নিছক ব্যতিক্রম মাত্র। কাম্য বিবাহকে বিদ্যাসাগর আবশ্যিক বলে মনে করেন নি। তাঁর মূল বক্তব্য এই—

"স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে, নির্দ্দিষ্ট নিমিত্ত ব্যতিরেকে, যদৃচ্ছাক্রমে পুনরায় সবর্ণাবিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত নহে। ফলতঃ, সবর্ণাবিবাহানান্তর যদৃচ্ছাক্রমে বিবাহ প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে অসবর্ণাবিবাহের বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, তাদৃশ ব্যক্তির তথাবিধ স্থলে সবর্ণাবিবাহ নিষিদ্ধ কল্প হইতেছে।"

[বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ (২য়)—সাক্ষরতা প্রকাশন ; ১৯৭২। পৃঃ ১৭৫]

বিদ্যাসাগর এইভাবে বলতে চেয়েছিলেন সমসাময়িক কালের 'যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড' শাস্ত্রসম্মত নয়।

অনেক মুনিবচনে বহু স্ত্রীর উল্লেখ রয়েছে দেখা যায় ; এজন্যে অনেকে বলতেন বহুবিবাহ অনুমোদিত না হলে মুনিবচনে ওরকম কথা থাকবে কেন!

বিদ্যাসাগর কিন্তু খুব সূক্ষ্ম বিচার করে দেখিয়েছিলেন, ঐ সব বচনে কোথাও বহুবিবাহকে বিধিসম্মত বলা হয় নি।

অনেকে একথাও বলে থাকতেন, পুরাণ ও ইতিহাসে কোন কোন রাজার একাধিক স্ত্রীর উল্লেখ রয়েছে। বিদ্যাসাগর তার বিরুদ্ধে বলেছিলেন, "সে সকল বিবাহ যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বিবাহ নহে।" (তদেব ; পৃঃ ১৭৮) অবশ্য একথাও ঠিক, কেউ কেউ যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়েও বিবাহ করেছিলেন ; তবে, বিদ্যাসাগরের মতে, ঐ নজীর থাকলেও বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়। রাজার কাজ মাত্রই যে শাস্ত্রানুগ হবে তা বলা যায় না। এ যুক্তি নিঃসন্দেহে মেনে নেবার মত।

বহুবিবাহ সমর্থনকারীদের দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল, ঐ বিবাহের বিলোপে কুলীন ব্রাহ্মণের 'জাতিপাত ও ধর্মলোপ' ঘটবে। এই আপত্তির জবাব দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর সংক্ষেপে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন তাঁর সময়ে কৌলীন্যমর্যাদা কোন পর্যায়ে এসে পড়েছিল। প্রকৃত কুলীন তখন ছিল না। অতএব ঐ অবস্থায় বহুবিবাহ প্রথার বিলোপ ঘটলে কুলীন ব্রাহ্মণের 'জাতিপাত ও ধর্মলোপ' হবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। কৌলীন্যের উদ্ভব ও পরিণতির ইতিহাস সংগ্রহ করে বিদ্যাসাগর যথার্থই বলেছিলেন—"প্রথমতঃ, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, বল্লাল-সেন তন্নিবারণাভিপ্রায়ে কৌলীন্যমর্যাদা সংস্থাপন করেন। তৎপরে, কুলীন-দিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া, দেবীবর তন্নিবারণাশয়ে মেলবন্ধন করেন। এক্ষণে, কুলীনদিগের মধ্যে যে অশেষবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, কুলাভিমান পরিত্যাগ ভিন্ন তন্নিবারণের আর সদুপায় নাই।"

(তদেব ; পৃঃ ১৯০)

কুলীনদের মঙ্গলের জন্যে বিদ্যাসাগর তাদের সর্বদ্বারী বিবাহকেই প্রশস্ত বলে মনে করেছিলেন।

বহুবিবাহ সমর্থনকারীদের তৃতীয় বক্তব্য ছিল, ঐ প্রথা রদ হলে ভঙ্গ-কুলীনদের বিপদ উপস্থিত হবে। তাদের কৌলীন্যমর্যাদাই ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়বে। এই আপত্তির জবাব দিতে গিয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ করে বিদ্যাসাগর ভঙ্গকুলীনদের নিন্দনীয় চরিত্রের পরিচয় তুলে ধরেছিলেন এবং বলেছিলেন ভঙ্গকুলীনদের কৌলীন্য বলতে কিছুই নেই ; অতএব কৌলীন্যমর্যাদাও তাদের থাকতে পারে না।

কেউ কেউ বিশ্বাস করতেন, কুলীন ব্রাহ্মণের বহুবিবাহরূপ অত্যাচার দিন

দিন কমে আসছে। অল্পদিনের মধ্যে তা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অতএব এমন অবস্থায় বহুবিবাহ রদকারী আইনের প্রয়োজন কোথায় !

বিদ্যাসাগর এই বক্তব্যেরও বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি তথ্যাদি সহকারে প্রমাণ করেছিলেন, বহুবিবাহকারীর সংখ্যা আদৌ কমে যায় নি। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বহুবিবাহকারীর একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ঐ তালিকার বাইরেও অনেক বহুবিবাহকারী ব্যক্তি রয়েছে ; তাছাড়া দুটি থেকে চারটি বিবাহ করেছে এমন ব্যক্তির নাম ঐ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর প্রদত্ত তালিকায় সামান্য ত্রুটি থাকতে পারে বলেও বিদ্যাসাগর জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাহলেও, তাঁর তালিকা থেকে বেশ বোঝা যায়, বহুবিবাহের ঘটনা সমাজে তখন আদৌ কমে যায় নি। বিদ্যাসাগর বরং বলেছিলেন, ঐ ঘটনা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।

বিরোধীপক্ষের আর একটি আপত্তি ছিল, বহুবিবাহের বিলোপে কায়স্থজাতির 'আন্তরসের ব্যাঘাত ঘটিবেক।' এই আপত্তির জবাব দিতে গিয়ে আন্তরসের স্বরূপ ও তজ্জনিত অবস্থার বর্ণনা করে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "রাজশাসন দ্বারা বহুবিবাহপ্রথা নিবারিত হইলে, আন্তরসের ব্যাঘাত ঘটিবেক, সন্দেহ নাই। কিন্তু, তদ্দ্বারা কতিপয় মৌলিকপরিবারের তুচ্ছ অভিমানসুখের ব্যাঘাত ভিন্ন, কায়স্থজাতির কোনও অংশে কোনও অসুবিধা বা অপকার ঘটিবেক, তাহার কোনও সম্ভাবনা লক্ষিত বা অনুমেয় হইতেছে না। আন্তরস, কায়স্থজাতির পক্ষে, অপরিহার্য ব্যবহার নহে।…যদি রাজনিয়ম দ্বারা, বা অন্যবিধ কারণে, অকারণে একাধিক বিবাহ করিবার প্রথা রহিত হইয়া যায়, তাহা হইলেও আন্তরসের এককালে উচ্ছেদ হইতেছে না। কুলীনের যে সকল জ্যেষ্ঠ সন্তানের স্ত্রীবিয়োগ ঘটিবেক, তাঁহারা আন্তরসের ঘরে দারপরিগ্রহ করিতে পারিবেন।"

(তদেব ; পৃঃ ২১২)

সমাজে সে সময় একদল মানুষ ছিলেন যাঁরা বহুবিবাহের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তার নিবারণে রাজআইন চাইতেন না। তাঁরা মনে করতেন, সামাজিক দোষের সংশোধনে সরকারী হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। বিদ্যাসাগর এই মতের বিপক্ষে তৎকালীন সমাজ ও সামাজিকদের স্বরূপ ও স্বভাব বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, সামাজিক দোষ সংশোধনে আমাদের দেশের মানুষ যে এগিয়ে আসবে বা সচেষ্ট হবে তা আশা করা যায় না।

কারও কারও বক্তব্য ছিল, ভারতবর্ষের সর্বত্র হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বহুবিবাহ চালু রয়েছে। কিন্তু কেবলমাত্র বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষই বহুবিবাহবিরোধী আইনের প্রার্থনা করেছে। এহেন অবস্থায় ভারতবর্ষের এক অংশের তুষ্টির জন্যে আইন পাস করে শাসন কর্তৃপক্ষ অন্য ভারতীয় প্রজাদের কেন অসন্তুষ্ট করবেন! বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, ঐ আইন বিধিবদ্ধ হলে বাংলার মুসলমান বা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থলের হিন্দু-মুসলমান কারও অসন্তুষ্ট হবার কারণ নেই।

বহুবিবাহ বিষয়ক বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তক প্রচারিত হবার পর বহুবিবাহের সমর্থনে তেরজন পণ্ডিত স্বাক্ষরিত এক পত্র প্রচারিত হয়েছিল। ঐ ত্রয়োদশ ব্যক্তির মধ্যে ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন ও নারায়ণ বেদরত্নও ছিলেন। এঁদের বক্তব্যের উত্তর বিদ্যাসাগর আলোচ্য গ্রন্থের 'ক্রোড়পত্র' অংশে সংযোজিত করেছিলেন। বহুবিবাহের সমর্থনে তাঁরা "মদনপারিজাতধৃতস্মৃতিঃ" ও "স্বতন্ত্রগার্হস্থ্যধর্ম্মপ্রস্তাবে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্"—বচন উদ্ধার করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁদের মত খণ্ডন করতে গিয়ে দেখিয়েছিলেন, ঐ বচন দুটিতে যে একাধিক বিবাহের কথা বলা হয়েছে তা আসলে কাম্যবিবাহ। কিন্তু "মনু কাম্যবিবাহ-স্থলে অসবর্ণাবিবাহের বিধি দিয়াছেন, এবং সেই বিধি দ্বারা তথাবিধ স্থলে সবর্ণাবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ হইয়াছে।" (তদেব ; পৃঃ ২২৭)

বিদ্যাসাগর আরও বলেছিলেন, ঐ ত্রয়োদশ ব্যক্তি উদ্ধৃত বচন দু'টিতে সবর্ণা বা অসবর্ণা বিবাহের কথা নেই—শুধু বিবাহ করতে পারে বলা হয়েছে। মনুবচন অনুসারে ঐ স্থলে অসবর্ণা বিবাহই বিধিসম্মত। অতএব বলা যায় না "যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড শাস্ত্রসম্মত"।

বহুবিবাহ সমর্থনকারীদের উদ্ধৃত অন্যান্য বচনেরও তিনি যথাযোগ্য উত্তর দিয়েছিলেন।

আলোচ্যগ্রন্থে আরও একটি 'ক্রোড়পত্র' সংযোজিত হয়েছিল। এই ক্রোড়পত্রে তিনি ১২৭৮ সালের ১৩ই ভাদ্রের 'সোমপ্রকাশে' বহুবিবাহ বিষয়ে প্রকাশিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতামতের উদ্ধার ও সমালোচনা করেছিলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতির সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিদ্যাসাগর জানিয়েছিলেন, তারানাথ বহুবিবাহবিরোধী আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন; সুতরাং তাঁর উদ্যোগ ও সহায়তায় বহু-বিবাহের সমর্থনে ত্রয়োদশ ব্যক্তির স্বাক্ষরিত পত্রিকা প্রচারিত হবে তা বিশ্বাস-

যোগ্য নয়। সেই বক্তব্যের সূত্র ধরে তারানাথ 'সোমপ্রকাশ'-এ পত্র প্রেরণ করে জানিয়েছিলেন, উপরিউক্ত বিষয়ে তিনি কোন সহায়তা করেন নি; তবে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মতই বটে। প্রসঙ্গক্রমে বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা বিষয়ে বিদ্যাসাগর যে বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন তারানাথ তার সমালোচনাও করেছিলেন। তিনি এও জানিয়েছিলেন, পাঁচ-ছয় বছর আগে রাজআইনের পক্ষে প্রেরিত আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করলেও পরে তিনি বুঝেছিলেন, "বিদ্যাচর্চ্চার প্রভাবে বা যে কারণে হউক ঐ কুৎসিত বহুবিবাহপ্রণালী অনেক পরিমাণে ন্যূন" (তদেব; পৃঃ ২৩১) হয়ে পড়েছে;—অনতিবিলম্বে তা একেবারেই লুপ্ত হয়ে যাবে, অতএব ঐ বিষয়ে আর আইনের কোন প্রয়োজন নেই।

বিদ্যাসাগর বাচস্পতি মহাশয়ের ঐ সব বক্তব্যের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিলেন, তারানাথ বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত করলেও তার অনুকূলে কোন প্রমাণ দেন নি। অবশ্য ধর্মরক্ষিণী সভায় প্রেরিত পত্রে বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি মদনপারিজাতধৃত স্মৃতিবাক্য উদ্ধার করেছিলেন। তারানাথের মতে ঐ বচনে পূর্বে পরিণীতা স্ত্রীকে অর্থদ্বারা সন্তুষ্ট করে কাম চরিতার্থ করবার জন্যে ইচ্ছুক পুরুষ পুনরায় বিবাহ করতে পারে।

তারানাথ পূর্বোক্ত পত্রে বহুবিবাহের সমর্থনে কয়েকজন দেব, ঋষি ও প্রাচীন রাজগণের বহুবিবাহ-আচরণের উল্লেখ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তার বিরুদ্ধে বলেছিলেন, পূর্বকালীন লোকের আচার মাত্রই অনুকরণযোগ্য নয়। সাধারণ মানুষকে বেদ ও স্মৃতি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ীই চলতে হবে। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, দেশে "যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহব্যবহার শিষ্টাচার বটে,···কিন্তু উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধস্মৃতিবিরুদ্ধ; সুতরাং, উহা অবিগীতশিষ্টাচারশব্দবাচ্য অথবা ধর্মবিষয়ে প্রমাণ বলিয়া প্রবর্তিত ও পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে।" (তদেব, পৃঃ ২৩৪)

তারানাথের বক্তব্যের জবাব দেবার পরে বিদ্যাসাগর দ্বারকা বিদ্যাভূষণের মতামতও খণ্ডন করেছিলেন—

দ্বারকানাথ বলেছিলেন, লোকব্যবহারই বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তার প্রধান প্রমাণ। অবশ্য ঐ প্রথার শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করবার জন্যে তিনি বেদ-পুরাণ-স্মৃতি ইত্যাদি থেকেও বচন উদ্ধার করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর এর জবাবে সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছিলেন, লোকব্যবহার দেখে বহুবিবাহকে শাস্ত্রসম্মত বলা খুবই অযৌক্তিক।

দ্বারকানাথ প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের স্বৈরাচারী পুরুষেরা 'স্বহস্তে শাসন কর্তৃত্বভার' পেয়ে স্ত্রীজাতির সুখ-দুঃখের কথা না ভেবে নিজেদের ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যে বহুবিবাহের ব্যবস্থা শাস্ত্রে করেই রেখেছিল। বিদ্যাসাগর এর জবাবে সুন্দর যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন, বহুবিবাহ শাস্ত্রকার সমর্থিত একথা বলবার জন্যে দ্বারকানাথ ভারতীয় শাস্ত্রকারদের "স্বার্থপর, যথেচ্ছচারী, ও ইন্দ্রিয় সুখপরায়ণ" রূপে অভিহিত করেছেন। শাস্ত্রকারদের প্রতি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ঐ মনোভাবকে বিদ্যাসাগর সঙ্গত কারণেই নিন্দা করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে স্ত্রীলোকের প্রতি যে সুন্দর ব্যবহার করবার কথা শাস্ত্রকারেরা বলেছিলেন তাও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর বিবাহ বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ দেখিয়ে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, বহুবিবাহ ঐ সব বিধিনিষেধ বহির্ভূত যথেচ্ছাচার ভিন্ন আর কিছুই নয়।

দ্বারকনাথ বেদের 'যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে' ইত্যাদি বচন উদ্ধার করে বহুবিবাহ সমর্থন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "এই বেদবাক্যদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে আবশ্যক হইলে, এক ব্যক্তি, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। ইহা দ্বারা যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ-কাণ্ডের শাস্ত্রীয়তা, অথবা শাস্ত্রকারদিগের স্বার্থপরতা ও যথেচ্ছচারিতা, কতদূর সপ্রমাণ হইল, বলিতে পারি না।" (তদেব ; পৃঃ ২৪২)

বিদ্যাসাগর দ্বারকনাথের উদ্ধৃত অন্যান্য শাস্ত্রীয়বচন বিশ্লেষণ করেও দেখিয়েছিলেন, ঐ সব বচন বহুবিবাহ সমর্থক নয়। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভাগবতবচন উদ্ধার করে বলেছিলেন, বসুদেব যদৃচ্ছাবশতঃ বহুবিবাহ করেছিলেন। বিদ্যা-সাগরও তার জবাবে বলেছিলেন, বসুদেবের ঐ রকম বিবাহও শাস্ত্রবহির্ভূত। বিদ্যাসাগরের এই যুক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর সংস্কারমুক্ত বিচারপ্রবণ বৈজ্ঞানিক মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' গ্রন্থে দ্বিতীয় ক্রোড়পত্রের পরে সংযোজিত 'উপসংহার' অংশে বিদ্যাসাগর তার মূলবক্তব্য খুব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি এখানে মনুবচনের সহায়তায় বলেছিলেন, সবর্ণাস্ত্রীর বেঁচে থাকা অবস্থায় যদৃচ্ছাবশতঃ অপর সবর্ণবিবাহ একেবারেই নিষিদ্ধ। বিদ্যাসাগর নানা যুক্তির দ্বারা এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তকটি প্রকাশিত হবার পর তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি মসীধারণ করেছিলেন। সংস্কৃত

ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তাঁদের পুস্তক রচিত হয়েছিল। তবে সে সব রচনার প্রসঙ্গে যাবার আগে বহুবিবাহ বিষয়ে অপর দু একটি রচনার আলোচনা করে নেওয়া যাক।

১৮৭১ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বহুবিবাহ ও কন্যাপণ নিবারণ বিষয়ে যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সভায় মধুসূদন ন্যায়রত্ন একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। ঐ ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "যেহেতু সর্ব্বপ্রধান মহর্ষি মনু কর্তৃক। মদ্যপাননিরতা দুশ্চরিত্রা ভর্ত্তার প্রতিকূল চারিণী হিংস্র স্বভাবা, কুষ্ঠাদিরোগগ্রস্তা, ও অপরিমিত ব্যয়শীলা এবং প্রথম ঋতুকালের পর অষ্টম বর্ষ পর্য্যন্ত অকৃত প্রসববন্ধ্যা, দশবর্ষ পর্য্যন্ত মৃতপ্রজা, একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কন্যা প্রসবকারিণী, পত্নী বর্ত্তমান থাকিলে ভার্য্যান্তর গ্রহণ কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইতেছে অতএব সুতরাং নির্দ্দিষ্ট পত্নী ভিন্ন দোষরহিতা পত্নীসত্ত্বে অপরদার গ্রহণ অকর্ত্তব্য ইহাই মহর্ষি মনুর অভিমত কহিতে হইবে।"

[সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী, ১৮৭১, জুন ; ৫১]

মধুসূদনের এই যুক্তিটিও বলিষ্ঠ। বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারার সঙ্গে এর মিলও লক্ষণীয়। যা হোক, মধুসূদন যাজ্ঞবল্ক্য ও দেবলমুনির বচন অনুযায়ীও একাধিক বিবাহ অস্বীকার করেছিলেন। আপস্তম্ববচন অনুযায়ীও তিনি বহুবিবাহ নিষিদ্ধ মনে করেছিলেন। যে সব বচনে বহুবিবাহের আভাস আছে বলে অনেকে মনে করতেন ন্যায়রত্ন মহাশয় বিচারবিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন, সেই সব বচনেও আসলে একাধিক বিবাহের কথা বলা হয় নি। (দ্র. তদেব, পৃঃ ৫২) মধুসূদন আরও বলেছিলেন, বহুবিবাহ করলে পুরুষ সকল স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালনে সক্ষম হয় না। তার ফলে পুরুষের পাপই ঘটে থাকে। তাছাড়া পুরুষের বহুবিবাহের ফলেই স্ত্রী ব্যভিচারগ্রস্ত হয়।

ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁর বক্তৃতায় যা বলেছিলেন তা অযৌক্তিক ও অবাস্তব নয়। তাঁর বক্তব্যে মনন ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দু'য়েরই পরিচয় পাওয়া যায়।

১২৭৮, ৩০ শ্রাবণের 'সোমপ্রকাশে' 'বহুবিবাহ হওয়া উচিত কি না?' শীর্ষক একটি আলোচনা মুদ্রিত হয়েছিল। ঐ আলোচনায় সামাজিক বিষয়ে রাজআইন প্রার্থিত নয় ব'লে বহুবিবাহ নিবারণেও রাজআইন অনভিপ্রেত বলা হয়েছিল। এই মত নিয়ে সমাজে তখন প্রবল বিতর্ক দেখা দিয়েছিল।

১২৭৮ বঙ্গাব্দের ৬ ভাদ্রের 'সোমপ্রকাশে' বহুবিবাহ রাজবিধির দ্বারা বন্ধ করা উচিত কিনা তার আলোচনায় স্ত্রী বা পুরুষের বন্ধ্যাত্ব নির্ণয় সম্পর্কে আশঙ্কা

প্রকাশ করা হয়েছিল। বিদ্যাসাগর সেই প্রসঙ্গে আপনার মতামত জানিয়ে সোমপ্রকাশে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। পত্রটিতে তিনি বলেছিলেন, শাস্ত্র-নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ব্যতিরেকে যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ করা পুরুষের পক্ষে নিষিদ্ধ হলেও সমাজে তা প্রবল হয়ে উঠেছিল। রাজবিধির দ্বারা ঐ অনিষ্টকর প্রথা রদ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। তাঁদের প্রার্থিত রাজআইনে স্ত্রী বন্ধ্যা ইত্যাদি না হলে তার জীবৎকালে পুরুষ অপর বিবাহ করতে পারবে না। এর ফলে শাস্ত্রও রক্ষিত হবে, বহুবিবাহও নিবারিত হবে। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, ঋতুদর্শনের শুরু থেকে আট বছরের মধ্যে সন্তান না হলেই স্ত্রীকে বন্ধ্যাজ্ঞানে পুরুষ দ্বিতীয়বার বিবাহ করবে; "স্ত্রী ও পুরুষ এ উভয়ের মধ্যে কাহার দোষে সন্তান হইতেছে না, তাহার নির্ণয় বা অনুসন্ধানের আবশ্যকতা রাখেন নাই।" [সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৪র্থ)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত; ১৯৬৬। পৃঃ ২৪৫] বিদ্যাসাগর জানিয়েছিলেন, শাস্ত্রনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নারী সন্তানবতী না হলে স্বামী হীনবীর্য হিসেবে নিজেকে দেখেও স্ত্রীকে বন্ধ্যা স্থির করে যদি অন্য বিবাহ করতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে কোন সরকারী নিষেধই বলবৎ হবে না।

১২৭৮ বঙ্গাব্দের ৩০ শ্রাবণের 'সোমপ্রকাশে' সম্পাদক মহাশয় বহুবিবাহ-কারীর কাছ থেকে ৫০০ টাকা ট্যাক্স নেবার কথা বলেছিলেন; কেননা তাতে সমাজ-বিষয়ে সরকারী হস্তক্ষেপও ঘটবে না, অন্যদিকে বহুবিবাহও বন্ধ হবে। বিদ্যাসাগর কিন্তু তার জবাবে বলেছিলেন, রাজআইনে সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ ঘটলে কর গ্রহণেও সেই একই হস্তক্ষেপ ঘটে থাকবে। এহেন অবস্থায় রাজবিধিই প্রশস্ত। তাছাড়া করধার্য করলে বহুবিবাহ যে সম্পূর্ণলোপ পাবে তাও সত্য নয়।

বিদ্যাসাগরের পত্র মুদ্রিত করে ঐ একই সংখ্যা 'সোমপ্রকাশে' সম্পাদকীয় উত্তর প্রকাশ করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, প্রস্তাবিত রাজবিধিতে শাস্ত্র রচয়িতাদের ওপর খোদকারিই করা হবে।

ঐ উত্তরে আরও বলা হয়েছিল, স্ত্রীকে বন্ধ্যা স্থির করে পুরুষ যদি আবার বিবাহ করতে চায় তাহলে যথার্থই সে বন্ধ্যা কি না তার খোঁজ নিতে হবে। এই জন্যে স্ত্রী বা স্বামীর মধ্যে কে বন্ধ্যা "তাহার নির্ণয় করিবার যুক্তিসিদ্ধ উপায় করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া আইন করিলে কতকগুলির সুবিধা করিতে গিয়া অপর কতকগুলির প্রতি অন্যায় করা হইবে, তাহাতে প্রত্যবায়ভাগী হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।" (তদেব ; পৃঃ ২৪৭)

রাজকর স্থাপন প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর কথিত বক্তব্যের জবাবও 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন. "কোন বিষয়ে কর গ্রহণ করিলে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হয়, এটী সিদ্ধান্ত বাক্য নহে।" (তদেব ; পৃঃ ২৪৮) তিনি বহুবিবাহ নিবারণের জন্যে ঐ কর স্থাপনের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "কর নির্ধারণ প্রস্তাবের অনুযায়ী কার্য্য হইলে মোহান্ধ কুলীনদিগের নিতান্ত হতাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা কষ্ট পাইয়াও অর্থ সংগ্রহ করিয়া কন্যা ভগিনী প্রভৃতির বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিবার চেষ্টা পাইবেন। সেই চেষ্টায় তাঁহাদিগের মনে কষ্ট ও অপমান বুদ্ধি প্রভৃতির উদয় হইয়া কৌলীন্যপ্রথার প্রতি ঘৃণা জন্মিলে বহুবিবাহপ্রথা আপনা হইতে উন্মূলিত হইয়া আসিবে।"···(তদেব ; পৃঃ ২৪৮) এই বক্তব্য কিন্তু যুক্তিযুক্ত নয় ; কেননা কৌলীন্য সম্পর্কে কুলীনদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হওয়া বিরল ব্যাতিক্রম ভিন্ন সম্ভবপর ছিল না।

'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক সবশেষে এমন একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যাতে করস্থাপন ও রাজআইন কোনটিরই প্রয়োজন হবে না। তাঁর মতে এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে "অপেক্ষাকৃত হীন ঘরে কন্যাদান করিলেও কুলমর্য্যাদার হানি হইবে না। তাহা হইলে বর সুলভ ও বহুবিবাহও ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে।" (তদেব ; পৃঃ ২৪৯) এই প্রস্তাবটি কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্মত নয়। প্রস্তাবটি শুনতে ভাল ; কিন্তু সেযুগে তা কার্যকরী হবার সম্ভাবনা ছিল না।

এই প্রসঙ্গে ১৩ ভাদ্র, ১২৭৮, সংখ্যা 'সোমপ্রকাশে' মুদ্রিত কৈলাসনাথ বসুর একটি পত্রের আলোচনা করাও প্রয়োজন। বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে ৩০ শ্রাবণের (১২৭৮) 'সোমপ্রকাশে' সম্পাদক মহাশয় যে বক্তব্য রেখেছিলেন তারই জবাবে ঐ পত্র প্রেরিত হয়েছিল। পত্রটিতে কৈলাসনাথ বসু বলেছিলেন, 'বিবাদভঙ্গার্নব' ও 'ব্যবস্থাদর্পণ' গ্রন্থদ্বয়ে যথাক্রমে তর্কপঞ্চানন এবং শ্যামাচরণ সরকার বহুবিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন। প্রয়োজনবোধে পত্রলেখক ঐ ঐ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিও দিয়েছিলেন।

সোমপ্রকাশ-সম্পাদক কৈলাসনাথের বিরোধিতা করে লিখেছিলেন, কৈলাসনাথের উদ্ধৃত অংশে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ এমন কথা নেই।

কৈলাসনাথ বসু ও উক্ত সম্পাদকের মধ্যে বহুবিবাহ এবং তৎসংক্রান্ত বিদ্যাসাগর-বক্তব্যের বিষয়ে আরও মতামত বিনিময় হয়েছিল।

এবার বিদ্যাসাগর রচিত বহুবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থের আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁর বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হবার পরে বাংলা-

দেশের পাঁচজন পণ্ডিত তার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন গঙ্গাধর কবিরত্ন, রাজকুমার ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, সত্যব্রত সামশ্রমী এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতি। বিদ্যাসাগর তাঁর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার—দ্বিতীয় পুস্তক' (১৮৭৩)—এ ঐ পাঁচজনেরই মতামত খণ্ডন করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর প্রথমে তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বক্তব্য খণ্ডনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তারানাথের পুস্তকের নাম 'বহুবিবাহবাদ', সংস্কৃত ভাষায় তা লেখা হয়েছিল।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি তার গ্রন্থে বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর মনুবচনের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করেন নি। বিদ্যাসাগর তার জবাবে তার নির্নীত অর্থই যে প্রকৃত অর্থ তা প্রমাণ করবার জন্যে যে মনুবচনে রতিকামনা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে অসবর্ণা বিবাহের কথা বলা হয়েছিল বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই সেই মনুবচনের অর্থ নির্ণয় করেছিলেন। তাঁর নিরূপিত অর্থ যে অভ্রান্ত তা প্রমাণ করবার জন্যে বিদ্যাসাগর মাধবাচার্য কৃত অর্থও উদ্ধার করেছিলেন; পরে উদ্ধৃতি ও উদাহরণ যোগে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারানাথই ঐ মনুবচনের অর্থ নির্ণয়ে ভ্রান্ত ছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, "সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মাণি/কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥" এই মনুবচনের তারানাথধৃত পাঠ 'ক্রমশোঃবরাঃ'র স্থলে "অবরা" পাঠই সঙ্গত। তারানাথ কুল্লূকভট্টের যে টীকা অবলম্বন করেছিলেন সেই টীকাতেও লিপিকর প্রমাদবশতঃ এমন পাঠ লেখা হয়েছিল যা কুল্লূকভট্ট ব্যবহার করেন নি। এই জন্যে ঐ টীকার অনুসরণে সিদ্ধান্ত করতে গিয়ে তারানাথ ভুলই করে ফেলেছিলেন। বস্তুতঃ নানা শাস্ত্র ও নানা ব্যাখ্যা অবলম্বন করে বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন করেছিলেন তিনি মনুবচনের বিকৃত অর্থ আদৌ করেন নি। তিনি উদ্ধৃতিসহ বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছিলেন, ধর্মের নিমিত্ত সবর্ণা বিবাহ ও কাম চরিতার্থ করার নিমিত্ত অসবর্ণা বিবাহের কথাই শাস্ত্রকারেরা বলে গিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর বহুবিবাহকে পারিসংখ্যাবিধি সম্মত বলে নির্দেশ করেছিলেন। যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ করা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক—কেউ তা করতে পারে, আবার কেউ নাও করতে পারে। তবে বিবাহ করলে অসবর্ণা বিবাহই তাকে করতে হবে। বহুবিবাহ অপূর্ববিধি ও নিয়মবিধি বহির্ভূত। তারানাথ কিন্তু বহুবিবাহকে

পরিসংখ্যাবিধি সম্মত বলতে নারাজ। বিদ্যাসাগর তার জবাবে বলেছিলেন, "কামার্থে অসবর্ণাবিবাহ রাগপ্রাপ্ত বিবাহ। রাগপ্রাপ্ত বিষয়ে বিধি থাকিলে. বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধবোধনার্থে ঐ বিধির পরিসংখ্যাত্ব অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং, রাগপ্রাপ্ত অসবর্ণাবিবাহবিষয়ক বিধির পরিসংখ্যাত্ব অপরিহার্য ও অবশ্যস্বীকার্য হইতেছে, তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য, অন্যবিধ প্রমাণের অণুমাত্র আবশ্যকতা নাই।"

[বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ (২য়) ; সাক্ষরতা প্রকাশন ; ১৯৭২। পৃঃ ২৬২]

তর্কবাচস্পতি মহাশয় বহুবিবাহ পরিসংখ্যারূপে গণ্য হতে পারে কিনা সেই প্রসঙ্গের আলোচনায় বিবাহকে একবার 'রাগপ্রাপ্ত' আর একবার 'রাগপ্রাপ্ত' হতে পারে না বলেছিলেন। তাঁর এই পরস্পর বিরোধী বক্তব্যকে বিদ্যাসাগর আপনার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগিয়েছিলেন।

তারানাথ বলেছিলেন, "বিহিত বিষয়ের অতিরিক্ত স্থলে নিষেধবোধনই পরিসংখ্যাবিধির উদ্দেশ্য, বিহিত বিষয়ের কর্তব্যত্ববোধন ঐ বিধির লক্ষ্য নহে ; যদি সেরূপ লক্ষ্য না হইল, তাহা হইলে বিধিবাক্যোক্ত বিষয় বিহিত হইল না, যদি বিহিত না হইল. তাহা হইলে উহা কর্তব্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না ;" (তদেব ; পৃঃ ২৬৭)

এই কারণেই "মনুবচনে কামার্থ বিবাহের যে বিধি আছে, ঐ বিধির পরিসংখ্যাত্ব স্বীকার করিলে, অসবর্ণাব্যতিরিক্তস্ত্রীবিবাহনিষেধ সিদ্ধ হইবেক, অসবর্ণাবিবাহবিধান ঐ বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইবেক না; যদি তাহা না হইল. তাহা হইলে অসবর্ণাবিবাহ বিহিত হইল না ;..."

(তদেব ; পৃঃ ২৬৮)

বিদ্যাসাগর কিন্তু তারানাথের এই সিদ্ধান্তের ত্রুটি দেখিয়ে বলেছিলেন—

"মনুর স্বদারগমনবিষয়ক সর্বসম্মত পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা পরদারগমনমাত্র নিষিদ্ধ হইবেক, স্বদারগমনের বিহিতত্ব প্রতিপন্ন হইবেক না, সুতরাং স্বদারগমন অবিহিত ও স্বদারগভসম্ভূত ঔরস সন্তান অবৈধ সন্তান বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক।" (তদেব ; পৃঃ ২৬৯)

বিদ্যাসাগর আরও বলেছিলেন. তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের উদ্দেশ্য ছিল যদৃচ্ছাক্রমে যে একাধিক সবর্ণা স্ত্রী গ্রহণ করা যায় তা প্রমাণ করা ; এজন্যে অসবর্ণাবিবাহবিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডনে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তা খণ্ডন করা আদৌ সম্ভবপর নয়।

বহুবিবাহ সম্পর্কিত প্রথম পুস্তকে বিদ্যাসাগর তিনরকম বিবাহবিধির কথা বলেছিলেন; তারানাথ তা' মেনে নেন নি। বিদ্যাসাগরও কিন্তু তারানাথের যুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাঁর গ্রন্থে বলেছিলেন, যেহেতু ইচ্ছার কোন নিয়ামক নেই সেইহেতু ইচ্ছামত বিবাহ করা অনুচিত।

বিদ্যাসাগর এই বক্তব্যেরও বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, রতিকামনা চরিতার্থ করবার জন্যে কামুক পুরুষদের অসবর্ণা বিবাহের কথা থাকলেও ঐ বিবাহের ক্ষেত্রে পূর্বস্ত্রীর সম্মতি নেবার কথাও বলা হয়েছে। এর ফলে "কাম্য বিবাহের পথ একপ্রকার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, বলিতে হইবেক;"…(তদেব ; পৃ: ৩০৯-৩১০) কেননা, পূর্ব স্ত্রীর অনুমতি পাওয়াটা আদৌ সহজ নয়। বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয়বচন উদ্ধার করে দেখিয়েছিলেন, "বস্তুতঃ, যখন পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত ঘটিলে, তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় সবর্ণাবিবাহের বিধি দৃষ্ট হইতেছে; তখন তাদৃশ নিমিত্ত না ঘটিলে, সবর্ণাবিবাহের স্পষ্ট নিষেধ লক্ষিত হইতেছে; এবং যখন উৎকট রতিকামনার বশবর্তী হইয়া, পূর্বপরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিতে উদ্যত হইলে, কেবল অসবর্ণাবিবাহের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে, তখন যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা সবর্ণা বিবাহ করা শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত কার্য, ইহা প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব।" (তদেব ; পৃ: ৩১১)

বিদ্যাসাগর অবশ্য একথাও বলেছিলেন, রতিকামনা চরিতার্থ করবার জন্যে যে অসবর্ণা বিবাহের কথা শাস্ত্রে রয়েছে সেই বিবাহ কেউ করতেও পারে আবার নাও পারে। কাজেই বিবাহ মাত্রই যে ঐচ্ছিক তা নয়। বিবাহবিষয়ে ইচ্ছার কোন নিয়ামক নেই তারানাথের ঐ বক্তব্য অসত্য। তারানাথের মত খণ্ডনে বিদ্যাসাগর যুক্তিবাদী শাস্ত্রবিদের পরিচয়ই দিতে পেরেছিলেন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বলেছিলেন, 'ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্ব্বেষাং শ্রেয়স্যঃ স্যুঃ।' বহুবিবাহের পক্ষে এই যে পৈঠীনসি বচন তার তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্যে দায়ভাগ রচয়িতা 'জাত্যবচ্ছেদেন' এই বক্তব্য রেখেছিলেন। তর্কবাচস্পতির কথায় "চারিজাতিতে বিবাহ করিতে পারে, এই ব্যবস্থা করিয়া, প্রত্যেক বর্ণেও পাঁচ প্রভৃতি স্ত্রীবিবাহ দূষ্য নয়, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন।" (তদেব ; পৃ: ৩২২)

বিদ্যাসাগর এই বক্তব্যেরও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন,

পৈঠীনসিবচনের ঐ তাৎপর্য আদৌ সত্য নয়। দায়ভাগ রচয়িতা ঐ বচনের ঐরূপ অর্থও করেন নি।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় আপস্তম্ববচনের অপব্যাখ্যা করে আপনার মনোমত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর সেই চেষ্টাও ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, আপস্তম্বের 'ধর্ম্মপ্রজাসম্পন্নে দারে নান্যাং কুর্ব্বীত।' (২।৫।১১।১২) এবং 'অন্যতরাভাবে কার্য্যা প্রাগগ্ন্যাধেয়াৎ।' (২।৫।১১।১৩)—এই বচন দুটিতে বহুবিবাহের কথা নেই। মিত্রমিশ্র, অনন্ত ভট্ট ও কুল্লূক ভট্ট নির্ণীত আপস্তম্ববচনের অর্থ ব্যাখ্যা করে বিদ্যাসাগর তাঁর বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। (দ্রঃ তদেব ; পৃঃ ৩৪৩) বিদ্যাসাগর খুব বিস্তৃতভাবে পূর্বোক্ত আপস্তম্ববচনের তর্কবাচস্পতি গৃহীত অর্থের অসঙ্গতি বিশ্লেষণ করেছিলেন ; ঐ বিশ্লেষণে তাঁর সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তর্কবাচস্পতির বহুবিবাহ-সমর্থনের বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে গিয়ে বিবাহবিষয়ে পাঁচটি শাস্ত্রীয় নির্দেশ উদ্ধার করেছিলেন এবং বলেছিলেন, ঐ নির্দেশ অনুসারে যদৃচ্ছাক্রমে একাধিক বিবাহ আদৌ শাস্ত্রসম্মত নয়। বহু-বিবাহ যে শিষ্টাচার সম্মত নয় তাও তিনি বলেছিলেন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতির মতামত খণ্ডন করবার পরে বিদ্যাসাগর রাজকুমার ন্যায়রত্ন রচিত 'প্রেরিত তেঁতুল' পুস্তকের জবাব দিয়েছিলেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় বহুবিবাহের সমর্থনে জীমূতবাহন রচিত দায়ভাগ গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের বক্তব্যের দোহাই দিয়েছিলেন। তার জবাবে বিদ্যাসাগর জানিয়ে-ছিলেন, ঐ গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে প্রকৃতপক্ষে যদৃচ্ছাক্রমে একাধিক বিবাহ করবার কথা নেই। তা'ছাড়া রাজকুমার দায়ভাগকারের বক্তব্যকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে মনুর 'কামতস্তু প্রবৃত্তা নামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো-২বরাঃ' বচনের প্রকৃত পাঠও গ্রহণ করতে পারেন নি। বিদ্যাসাগরের মতে, রাজকুমার 'অসবর্ণাবিবাহ বিধির পরিসংখ্যাত্ব খণ্ডনে' যে যুক্তি দিয়েছিলেন, তাও ঠিক নয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছিলেন, পরিসংখ্যাবিধি বলতে কি বোঝায় ন্যায়রত্ন মহাশয় তা জানেন-ই না। ন্যায়রত্ন মহাশয়কে সেই জন্যে তিনি পরিসংখ্যাবিধির লক্ষণ কি তা' বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন।

ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন মহাশয় বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তকের সমালোচনা করেছিলেন তাঁর 'বহুবিবাহ বিষয়ক বিচার' রচনায়। তিনি

বলেছিলেন, একই কর্ম অবস্থাভেদে প্রশস্ত বা অপ্রশস্ত হয়ে থাকে। এই বক্তব্যের প্রতিষ্ঠায় উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, দেবপূজা যদি পূর্বাহ্ণে ঘটে তাহলে তা প্রশস্ত, দুপুরে বা তার পরে যদি ঘটে তবে তা অপ্রশস্ত। 'ভিন্ন ভিন্ন কর্মের প্রথম কল্প অনুকল্প বা প্রশস্ত অপ্রশস্ত বলিয়া, কোন মীমাংসকের মীমাংসা দেখা যায় না।' (তদেব ; পৃঃ ৩৬৪) এই যুক্তিতে তিনি বলতে চেয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর কথিত সবর্ণাবিবাহ প্রশস্ত এবং অসবর্ণাবিবাহ অপ্রশস্ত এই বক্তব্য যথার্থ নয়। বিদ্যাসাগর সবর্ণাবিবাহকে নিত্য ও নৈমিত্তিক এবং অসবর্ণাবিবাহকে কাম্যবিবাহ বলে নির্দেশ করে কাম্য অসবর্ণাবিবাহকে অপ্রশস্ত বলেছিলেন—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য তিন রকম বিবাহকে তিনি এক কর্ম বলেও গণ্য করেছিলেন। কিন্তু স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের এ সব কথা যুক্তিযুক্ত মনে হয় নি।

বিদ্যাসাগর স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের বক্তব্যের জবাবে বলেছিলেন, "তাঁহার উদাহৃত দেবপূজারূপ কর্ম যদি পূর্বাহ্ণে অনুষ্ঠিত হইলে প্রশস্ত, আর তদিতর কালে অর্থাৎ মধ্যাহ্ণে বা অপরাহ্ণে অনুষ্ঠিত হইলে অপ্রশস্ত, শব্দে নির্দিষ্ট হইতে পারে, তাহা হইলে বিবাহরূপ কর্ম সবর্ণার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে প্রশস্ত, আর অসবর্ণার সহিত অনুষ্ঠিত হইলে অপ্রশস্ত, শব্দে নির্দিষ্ট হইবার কোনও বাধা ঘটিতে পারে না।"

(তদেব ; পৃঃ ৩৬৫)

তিনি সঙ্গতকারণে একথাও বলেছিলেন, "যদি নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এই সংজ্ঞাভেদ প্রযুক্ত এক বিবাহকে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে পৌর্বাহ্ণিক, মাধ্যাহ্ণিক, আপরাহ্ণিক এই সংজ্ঞাভেদপ্রযুক্ত এক দেবপূজা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম বলিয়া পরিগণিত না হইবেক কেন।"

(তদেব, পৃঃ ৩৬৫)

শেষ পর্যন্ত আরও বিচার-বিশ্লেষণ করে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, ন্যায়রত্ন মহাশয়কে হয় স্বীকার করতে হবে পূর্বে উল্লিখিত ত্রিবিধ বিবাহ অভিন্নকর্ম, নয় নিত্য ও নৈমিত্তিক বিবাহই প্রশস্ত এবং কাম্যবিবাহ অপ্রশস্ত।

বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তকের আর একজন প্রতিবাদকারী ছিলেন সত্যব্রত সামশ্রমী। তার গ্রন্থের নাম ছিল 'বহুবিবাহবিচার সমালোচনা।'

বিদ্যাসাগর 'সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তাদারকর্ম্মণি।' ইত্যাদি মনুবচনের ওপর নির্ভর করে বলেছিলেন, রতিকামনায় অসবর্ণা বিবাহই প্রশস্ত। কিন্তু সামশ্রমী মহাশয় ঐ বচনের অন্য অর্থ ক'রে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর নির্ণীত ঐ বচনের অর্থ ছিল "কামত অসবর্ণাবিবাহে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্যজাতির বিবাহকার্যে প্রথমতঃ সবর্ণা প্রশস্ত। এবং যথাক্রমে (অনুলোম) পাণিগ্রহণই প্রশংসনীয়"। (তদেব; পৃঃ ৩৬৯)

বিদ্যাসাগর খুব সূক্ষ্ম ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে সামশ্রমী মহাশয় নির্ণীত ঐ অর্থের অসারতা প্রদর্শন করেছিলেন। সামশ্রমী মহাশয় মনু বচনের ভুল অর্থ গ্রহণ করে বলেছিলেন, অসবর্ণাবিবাহে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সর্বপ্রথমে সবর্ণাবিবাহ করতেই হবে। তার পরে 'যথাযথ হীনবর্ণা বিবাহ করিবে'। কিন্তু বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, মনুবচনের প্রকৃত অর্থ অনুযায়ী সামশ্রমী মহাশয়ের ঐরূপ সিদ্ধান্তের কোন ভিত্তি নেই। তাঁর বক্তব্য, কাম চরিতার্থতার জন্যেই অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করার কথা মনু বলেছিলেন।

সামশ্রমী মহাশয় বহুবিবাহের পক্ষে প্রাচীন ভারতীয় রাজাদের বহুবিবাহের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর এক্ষেত্রেও বিচার-বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, "সর্ববিষয়ে প্রধান লোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হওয়া সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে,"...(তদেব, পৃঃ ৩৭৬-৩৭৭) তিনি বলেছিলেন, প্রধান ব্যক্তির সব আচরণই যে সদাচার তা নয়।

সামশ্রমী মহাশয় বহুবিবাহের পক্ষে 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'র 'যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে' ইত্যাদি বচন উদ্ধার করেছিলেন। ঐ বচনের অর্থ অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে পুরুষ স্ত্রীবর্তমানেও দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। ঐ বচন উদ্ধার করে সামশ্রমী মহাশয় সিদ্ধান্ত করেছিলেন—

"এ স্থলে যে দৃষ্টান্তে জায়াদ্বয় লাভ করিতে পারা যায়, ঐ দৃষ্টান্তে সমর্থ হইলে শত শত জায়াও লাভ করা যায়, সুতরাং ঐ দ্বিত্বসংখ্যা বহুত্বের উপলক্ষণমাত্র।" (তদেব; পৃঃ ৩৮০)

বিদ্যাসাগর খুব সঙ্গত কারণেই এর বিরোধিতা করে বলেছিলেন, ঐ বচনে একাধিক বিবাহের কথা থাকলেও তা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি কারণে বা কামনা চরিতার্থতার জন্যেই বিধেয় বলা হয়েছে, ঐ বিবাহ যদৃচ্ছামূলক নয়।

সামশ্রমী মহাশয় পূর্বোক্ত বেদবাক্যের সাহায্যে যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন তার অনুকূলে মহাভারত থেকে উদাহরণও সংগ্রহ করেছিলেন। দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের স্ত্রী হবেন যুধিষ্ঠির একথা দ্রুপদকে জানালে দ্রুপদ বলেছিলেন, পুরুষেরই এককালে বহুপত্নী বিহিত আছে একই সময়ে নারীর বহুপতি থাকার কথা তিনি কখনও শোনেন নি। যুধিষ্ঠির ও রাজা দ্রুপদের দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী প্রসঙ্গে এই

কথোপকথন অংশ উদ্ধার করে সামশ্রমী মহাশয় তাকে পূর্বোক্ত বেদবাক্যের সাক্ষাৎ উদাহরণ বলে অভিহিত করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর এর বিরোধিতা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, সামশ্রমী মহাশয় তাঁর অভিপ্রেত সিদ্ধ করবার জন্যে মহাভারতের উক্ত আখ্যানটির 'একদেশ মাত্র' উদ্ধার করেছিলেন। বিদ্যাসাগর সামশ্রমী উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত অংশের পরবর্তী অংশ বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, সেই অংশে পূর্বোক্ত বেদবাক্যের বিপরীত কথাই রয়েছে। ঐ অংশে যুধিষ্ঠির দ্রুপদকে জানিয়েছিলেন, প্রাচীনকালে জটিলা ও বার্ক্ষী একই সময়ে বহুপতি গ্রহণ করেছিলেন, অথচ সামশ্রমী উদ্ধৃত বেদবাক্যে বলা হয়েছে, একই সময়ে এক নারীর দুইপতি থাকতে পারে না, অতএব সামশ্রমী মহাভারত থেকে যে অংশ উদ্ধার করেছিলেন তারই পরবর্তী অংশে বেদবাক্যের বিরুদ্ধ বক্তব্য রয়েছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রসঙ্গ ক্রমে বিদ্যাসাগর একথাও বলেছিলেন, দ্রুপদের কথায় পুরুষের বহুবিবাহের কথা জানা যায় বটে; কিন্তু "ঐ একাধিক বিবাহ শাস্ত্রোক্ত নিমিত্তনিবন্ধন, অথবা যদৃচ্ছামূলক, তাহার কোনও নিদর্শন নাই।" (তদেব, পৃঃ ৩৮৩)

সামশ্রমী মহাশয় বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, কাম্য বিবাহের ক্ষেত্রে অসবর্ণা বিবাহ করতে হবে মনু সে কথা বলেন নি। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও ঐ একই কথা বলেছিলেন। এই কারণে বিদ্যাসাগর তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে দেওয়া জবাবের প্রতি সামশ্রমী মহাশয়কে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলেছিলেন। সেই আলোচনার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি।

সামশ্রমীর অপর এক যুক্তির বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর জানিয়েছিলেন, পুত্রবতী সবর্ণা স্ত্রী বর্তমানেও সবর্ণা অপর নারী বিবাহ করা যে সর্বদা অশাস্ত্রীয় তা নয়; কেননা ঐ পুত্রবতী স্ত্রী ব্যভিচারিণী বা চিররুগ্না বা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট অন্য অবস্থাযুক্ত হলে পুনরায় সবর্ণাবিবাহ করা যেতে পারে।

বহুবিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তকে বিদ্যাসাগর সবশেষে গঙ্গাধর রায় কবিরাজ কবিরত্ন রচিত 'বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়' পুস্তকের জবাব দিয়েছিলেন। যে মনুবচন অনুসারে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, প্রথমে সবর্ণাবিবাহই বিহিত – পরে কামনা চরিতার্থ করবার জন্যে অসবর্ণা বিবাহ প্রশস্ত, কবিরত্ন মহাশয় সেই মনুবচনের অর্থ করেছিলেন ভিন্নতর – "প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ অপ্রশস্ত, নিষিদ্ধ নহে;" (তদেব; পৃঃ ৩৯০) কিন্তু বিদ্যাসাগর নানা শাস্ত্রীয় বচনের আলোকে বলেছিলেন, "প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ করিলে, শাস্ত্রকারেরা, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া

পুনর্বার সবর্ণাবিবাহ ও সবর্ণারই সহিত সহবাস করিবার স্পষ্ট বিধি দিয়াছেন।"
(তদেব; পৃঃ ৩৯০)

কবিরত্ন এমন কজন ঋষির নাম করেছিলেন যাঁরা প্রথমে অসবর্ণাবিবাহ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তার জবাবে বলেছিলেন, ঋষিদের আচরণও দুষ্ট হয়ে থাকে—তাঁদের সব আচরণ শাস্ত্রসম্মত নয়।

কবিরত্ন মনুর 'কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ।' বচনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, কামতঃ শব্দের প্রয়োগে যে কাম্যবিবাহ বুঝাতে হবে তা নয়। বিদ্যাসাগর যুক্তি সহকারে তারও বিরোধিতা করেছিলেন।

কবিরত্ন বলেছিলেন, বিদ্যাসাগরের বক্তব্য অনুযায়ী পূর্বে দ্বিজাতিদিগের অসবর্ণাবিবাহ নিষিদ্ধ একথা বললে বিষ্ণুবচনের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটে থাকে, কেননা বিষ্ণুবচনে ব্রাহ্মণের অগ্রে অসবর্ণা বিবাহ এবং পরে সবর্ণা বিবাহ হতে পারে বলা হয়েছে। তবে কনিষ্ঠা স্ত্রী সবর্ণা বলে বিষ্ণু তারই সঙ্গে ধর্মাচরণের কথা বলেছিলেন।

বিদ্যাসাগর তার জবাবে বলেছিলেন, ঐ বিষ্ণুবচনে যে ভাবে ঐ বক্তব্য ব্যক্ত হয়েছে তা থেকে বলা যায় না, সেখানে প্রথমে অসবর্ণা বিবাহের বিধি দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেছিলেন, যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়, তবে শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ অবস্থায় একাধিক বিবাহ করা যেতে পারে। আর যদি কেউ কামনা চরিতার্থ করবার জন্যে বিবাহ করতে চায় তাহলে সে অসবর্ণা বিবাহই করবে। অবশ্য গার্হস্থ আশ্রম পালনের জন্যে প্রথমে সবর্ণাবিবাহই করণীয়। নানা যুক্তি ও দৃষ্টান্তের আলোকে এই বক্তব্যকেই তিনি স্পষ্ট করে তুলেছিলেন তাঁর বহুবিবাহ সংক্রান্ত গ্রন্থ দুটিতে।

বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তকের বেদনাদায়ক বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'বঙ্গদর্শনে' (৩য় সংখ্যা, ১২৮০, আষাঢ়) প্রকাশিত 'বহুবিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরকে তিনি খুব কঠোর ও নিন্দনীয় ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। তবে 'বিবিধ প্রবন্ধ' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে সংকলন করবার সময় ঐ আক্রমণের কিছু অংশ তিনি প্রবন্ধটি থেকে বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ খণ্ডিত প্রবন্ধেও বিদ্যাসাগর-আক্রমণ কম তীব্র নয়।

বঙ্কিম বলেছিলেন, বহুবিবাহ দেশ থেকে লোপ না পেলেও ঐ প্রথা যত প্রবল বলে বিদ্যাসাগর দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন ততখানি প্রবল নয়। তিনি জানিয়েছিলেন, "দশ সহস্র হিন্দুর মধ্যে একজনও অধিবেদনপরায়ণ কিনা

সন্দেহ।" (বঙ্কিম রচনাবলী (২য়)—সাহিত্য সংসদ; ৩য় মুদ্রণ; পৃঃ ৩১৫) বহুবিবাহ যে দিন দিন কমে যাবার মুখে তাও তিনি বলেছিলেন।

বঙ্কিমের এই বক্তব্য আদৌ যথার্থ ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেছিলেন, বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয় প্রমাণ করলেই যে তা দূর হয়ে যাবে তা নয়, কেননা মানুষ শাস্ত্রাচার অপেক্ষা লোকাচারই বেশি মেনে চলে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যে যে যুক্তি ছিল না তা নয়; কিন্তু তবুও বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণের চেষ্টা আদৌ অশ্রদ্ধেয় নয়। রাজনৈতিক দিক থেকেও তার প্রয়োজনীয়তা ছিল। বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা সম্পর্কে সরকার নিশ্চিত না হলে ঐ প্রথার বিরুদ্ধে আইন হওয়া আদৌ সম্ভবপর ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র যে তা বোঝেন নি তা নয়, কিন্তু তবুও তিনি বলেছিলেন, সেই উদ্দেশ্যেও ঐ শাস্ত্রীয় বিচার সমর্থনযোগ্য নয়।

বহুবিবাহ বিরোধী আইনের বিপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, দেশের হিন্দু-মুসলমান অর্দ্ধেক-অর্দ্ধেক। রাজআইন হলে উভয়ের ক্ষেত্রেই তা প্রযুক্ত হবে, কিন্তু তাতে অসুবিধা রয়েছে।

বিদ্যাসাগর কিন্তু বহুবিবাহ সংক্রান্ত তাঁর প্রথম পুস্তকে এই প্রসঙ্গে বক্তব্য রেখেছিলেন। সেই বক্তব্যের আলোকে বঙ্কিমীমতের গুরুত্ব কমজোরী বলেই মনে হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের বহুবিবাহ সংক্রান্ত প্রবন্ধটি সে যুগে অনেককেই ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করেছিল। অনেকে তার প্রতিবাদও করেছিলেন। এইসব প্রতিবাদের মধ্যে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লেখা 'বঙ্গদর্শন ও বহুবিবাহ' খুবই উল্লেখযোগ্য পুস্তিকাটির রচয়িতা বেশ যুক্তিবাদী। বঙ্কিম-মত খণ্ডনে তিনি বেশ পারদর্শিতা দেখাতে পেরেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধটিতে বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণের কোন প্রয়োজন নেই বলে যে মন্তব্য করেছিলেন প্রতিবাদকারী তার বিরোধিতা করেছিলেন এবং বলেছিলেন বহুবিবাহনিষেধক আইন প্রবর্তনে গভর্ণমেন্টকে উৎসাহিত করবার জন্যেই বিদ্যাসাগরের ঐ শাস্ত্রীয় বিচারের প্রয়োজন ছিল।

দেশে সুশিক্ষা ইত্যাদি প্রচারের ফলেই বহুবিবাহ ধীরে ধীরে লোপ পাবে বঙ্কিমের ঐ বক্তব্যেরও বিরোধিতা করে প্রতিবাদকারী বলেছিলেন, দেশে শিক্ষা, য়ুরোপীয় নীতির প্রচার বা সাধারণ উন্নতি এমন অবস্থায় আসে নি যাতে বহুবিবাহ ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত হতে পারে। বিদ্যাসাগরও এই মর্মে তাঁর প্রথম পুস্তকে বক্তব্য রেখেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, শাস্ত্রের বিধান যদি মানতে হয় তাহলে তার সমস্ত বিধানই মানা প্রয়োজন। আর তা মানতে হলে স্ত্রী বচসা করলে বা অপ্রিয়বাদিনী হলেও শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে পুনরায় বিবাহ পুরুষের কর্তব্য। অবশ্য ক্ষেত্র-বিশেষে অসবর্ণাবিবাহ করণীয়।

প্রতিবাদকারী বঙ্কিমের এই বক্তব্যেরও বিরোধিতা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, অসবর্ণাবিবাহ যে করতেই হবে তা শাস্ত্রকারেরা বলেন নি। তাছাড়া "সদ্যস্ত্ব প্রিয়বাদিনী" এই শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিতে হইলে অসংখ্য স্ত্রী বিবাহ করিতে হয়। ক্রুদ্ধ হইয়া পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলেই কি অপ্রিয়বাদিনী হয়? শাস্ত্রকারেরা নিশ্চয়ই "অবাধ্যা" এই অর্থে অপ্রিয়বাদিনী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যে স্ত্রী বশতাপন্ন নহেন অর্থাৎ যিনি স্বামীর বশবর্ত্তিনী না হইয়া পরের কথায় ভুলিয়া যান, তাহাকে পরিত্যাগ করা কি শ্রেয়স্কর নহে?"

[বঙ্গদর্শন ও বহুবিবাহ—(রচয়িতার নাম ও প্রকাশকাল অজ্ঞাত, পৃঃ ৮]

কৌলীন্য ও বহুবিবাহ বিষয়ক বিতর্করচনার আলোচনা প্রসঙ্গে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'কৌলীন্যসংশোধিনী' পুস্তকটির উল্লেখ করাও খুব প্রয়োজন।

পুস্তকটিতে বহুবিবাহজনিত সামাজিক অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল। কৌলীন্যের বিরোধিতা করে লেখক কুলীনদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, "...গৃহধর্ম্ম করা যে সুখ সম্মান ও পুণ্য সঞ্চয়ের কারণ, আপনাদিগের কৌলীন্যপ্রথায় তদ্বিরুদ্ধ ঘটনা দৃষ্ট হয়।" (কৌলীন্যসংশোধনী—রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, ১৮৭১। পৃঃ ৮)

কৌলীন্যপ্রথার জন্যে শ্রোত্রীয়রাও কম ক্ষতিগ্রস্ত ছিল না, সেই কারণে কৌলীন্যবিরোধী মনোভাব গড়ে তুলবার জন্যে লেখক তাদেরও সচেষ্ট হতে বলেছিলেন। সবশেষে লেখক কৌলীন্যপ্রথার কুফল নিবারণে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছিলেন।

'কুলকালিমা' নামে আর একটি গ্রন্থেও বহুবিবাহের কুফলের চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। কুলীনদের মধ্যে যে বিচিত্ররকম বিবাহ হতো তার বর্ণনা পুস্তকটির উল্লেখযোগ্য বিষয়।

পুস্তকটিতে একটি অভিনব বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। লেখক বলেছিলেন, ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভেদজ্ঞান আদৌ শাস্ত্রসম্মত নয়। ঐ ভেদসৃষ্টির জন্যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনৈক্যই দেখা দিয়েছিল লেখকের মতে, বল্লাল সেন ছিলেন হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী। এই কারণে হিন্দুধর্মের বিনাশের জন্যেই

সব জেনে শুনেও তিনি কৌলীন্যপ্রথার অসুবিধা সৃষ্টি করেছিলেন। লেখক বলেছিলেন, প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রের সঙ্গে এই কৌলীন্যপ্রথার যোগ নেই। হিন্দু-সমাজের নিয়মবিধি সম্বন্ধে বল্লাল সেন অজ্ঞই ছিলেন। বল্লাল-নির্দিষ্ট বিধি অক্ষরে অক্ষরে পালন করাও দুঃসাধ্য ছিল।

বহুবিবাহ-বিদূরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, আগে বহুবিবাহ বিনাশ করবার চেষ্টা করলে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে—কৌলীন্যকেই আগে বিনষ্ট করতে হবে। লেখক জানিয়েছিলেন, কৌলীন্য মরেও অন্যরূপে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। "সে মরিয়াছে, জীবিত নাই বটে কিন্তু পিশাচী ভাবে প্রেতিনী ভাবে অদ্য পর্য্যন্ত সমাজ মধ্যে দণ্ডায়মান।" [কুলকালিমা (রচয়িতার নাম ও প্রকাশকাল অজ্ঞাত), পৃঃ ৮৭] তিনি আরও বলেছিলেন, কৌলীন্যের তিনটি দিক 'বহুবিবাহ, দীর্ঘ কৌমার্য্য, কন্যাবিক্রয়।' (তদেব ; পৃঃ ৮৭)

এহেন অবস্থায় আইন দ্বারা যদি বহুবিবাহ রদ করা হয় তাহলে অপর দুটি দিক ঠিকই বলবৎ থাকবে। তার কুফলও ভয়ঙ্কর হবে। এই জন্যে বিদ্যা-সাগরের মতো তিনি শুধু বহুবিবাহ রদকারী আইন প্রার্থনীয় মনে করেন নি। তিনি মনে করতেন, দেশের লোককেই ঐ বিষয়ে স্বাধীনভাবে এগিয়ে আসতে হবে। লেখকের এই বক্তব্যের মধ্যে যুক্তি আছে। তার ঐ বক্তব্য সে যুগের সমাজ নেতারা নিশ্চয়ই ভেবে দেখেছিলেন।

ভুবনেশ্বর মিত্র 'হিন্দু বিবাহ সমালোচন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ; তার দ্বিতীয় খণ্ডে 'বহুবিবাহ' নামে একটি প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছিল। ঐ খণ্ডটির প্রকাশকাল ছিল ১৯৩৫ সম্বৎ।

ভুবনেশ্বর প্রবন্ধটিতে বৈদিক, সৌত্রিক প্রভৃতি যুগে বহুবিবাহের রূপ কেমন ছিল তা আলোচনা করেছিলেন। তিনি আধুনিক যুগের বহুবিবাহকে শাস্ত্রানুমোদিত বলে মনে করেন নি।

কি কি ভাবে বহুবিবাহ বিদূরণ সম্ভব ভুবনেশ্বর তাও বলেছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল "...২। সমাজে কেহ ইচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া একাধিক ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারিবে না, করিলে সামাজিক ও রাজ-দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। আর ঐ দ্বিতীয়া স্ত্রী ও তদ্গর্ভজাত সন্তানেরা উত্তরাধিকারিত্ব হইতে রহিত হইবে।

৩। দ্বিতীয় দার গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি রাজার ও সামাজিকগণের নিকট বিশিষ্ট কারণ প্রদর্শন করিয়া অনুজ্ঞাত হইলে দ্বিতীয় ভার্য্যা পরিগ্রহণ করিতে পারিবে। এই নিয়ম অধিবেদন পক্ষে প্রযোজ্য।"

[হিন্দুবিবাহ সমালোচন (২য় খণ্ড)—ভুবনেশ্বর মিত্র ; ১৯৩৫ সম্বৎ। পৃঃ ৪৬-৬৭]

ভুবনেশ্বর শাস্ত্র, নীতি, যুক্তি, সমাজ সব দিক দিয়েই বহুবিবাহকে বিচার করেছিলেন ; কিন্তু কোনদিক দিয়েই তার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। বহুবিবাহ সংক্রান্ত আলোচনায় তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তি নিষ্ঠা ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পেরেছিলেন।

কৌলীন্য ও বহুবিবাহ সংক্রান্ত বিতর্করচনা সম্পর্কে বলা যায়, ঐ বিতর্করচনার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রচয়িতারা গুরুগম্ভীর আলোচনা করবার চেষ্টা করেছিলেন, বাদবাকি রচনায় অন্ধ গোঁড়ামি আর দুর্বল যুক্তিই প্রাধান্য পেয়েছিল।

॥ ৪ ॥

ঃঃ স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক বিতর্করচনা ঃঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে ও বিপক্ষে পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হলেও প্রত্যক্ষভাবে ঐ বিষয়ে একে অপরের বক্তব্য খণ্ডনে প্রয়াসী হয়েছিলেন খুব কমই। তবে স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে ও বিপক্ষে রচিত পুস্তকাদির মধ্যে রচয়িতারা নিজনিজ পক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে সেইসব রচনাকেও ব্যাপক অর্থে বিতর্করচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এইসব রচনার মধ্যে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক'ই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে গৌরমোহনের এই বইটির একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। ঐশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যেই 'কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি' আলোচ্য বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছিল। [দ্রঃ সাহিত্যসাধক চরিতমালা (১ম)—গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পৃঃ ১২] নামপত্রে বা "টাইটেল পেজ"-এ পুস্তকটির নাম মুদ্রিত হয়েছিল এই ভাবে—"স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক। অর্থাৎ পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রীলোকদের শিক্ষার দৃষ্টান্ত ও কথোপকথন।"

'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' দুটি 'ভাগে' বিভক্ত। প্রথমভাগে লেখক দুই নারীর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে নারীশিক্ষার গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয় স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে গোঁড়াব্যক্তিদের এ ছিল একটি

প্রধান যুক্তি। গৌরমোহন সেই যুক্তির অসারতা দেখিয়েছিলেন। এ কথাও তিনি বলেছিলেন, মেয়েদের শিক্ষার জন্যে সে সময় কেউ আগ্রহীই ছিল না। দুই নারীর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে গৌরমোহন আরও বোঝাতে চেয়েছিলেন, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বাড়ির অন্য মেয়েদেরও লেখাপড়া শেখাতে পারবে। সাহেবদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখায় যে কোন ক্ষতি নেই সে কথাও তিনি জানিয়েছিলেন।

বইটির দ্বিতীয়ভাগে গৌরমোহন, 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসের প্রমাণ' সন্ধান করেছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা যে শাস্ত্র ও ব্যবহার বিরুদ্ধ নয় তা বলতে গিয়ে তিনি মৈত্রেয়ী, শকুন্তলা, লীলাবতী ইত্যাদি নারীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন ; সমসাময়িক যুগের রানীভবানী, হঠী বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি বিদুষী রমণীর কথাও তিনি বলেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, নারীরও বিদ্যা অর্জনের বুদ্ধি রয়েছে। গৌরমোহন ঘরের কাজ শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্‌বিবাহকালে মেয়েদের বিদ্যা শেখাতেও উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর কথা, সব বিদ্যা অল্পসময়ে শিখতে না পারলেও তাদের যে অক্ষরজ্ঞান হবে তাতেই অবকাশ মতো পূর্বে শেখা বিষয়ে কথাবার্তা বলতে পারবে। নিজেদের সন্তানকেও তারা ঘরেতেই বিনা খরচে লেখাপড়া শেখাতে সক্ষম হবে। লেখাপড়া শিখলে কেউ তাদের প্রতারিত করতে পারবে না। স্বামী-স্ত্রী শিক্ষিত হলে কথাবার্তা বলে উভয়ে সুখও লাভ করতে পারবে।

স্ত্রী-শিক্ষা শাস্ত্রসম্মত কিনা তার বিচারে গৌরমোহন বলেছিলেন, কেবলমাত্র 'সাবিত্রী ও প্রণব' পাঠ নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ ; অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়নে তার কোন বাধা নেই।

১৭৬৪ শকাব্দের আষাঢ় সংখ্যা 'বিদ্যাদর্শনে' প্রকাশিত 'হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধটিও একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। প্রাবন্ধিক এখানে বলেছিলেন, নর-নারী উভয়ের মধ্যেই জ্ঞানৈষা রয়েছে। সেই জ্ঞানৈষা যাতে পরিপূর্ণতালাভ করতে পারে তার জন্যে যত্নশীল হতে হবে।

প্রাবন্ধিকের মতে স্ত্রী-শিক্ষাবিরোধী কোন বচন শাস্ত্রে লক্ষ্য করা যায় না। এই প্রসঙ্গে তিনি মহানির্বাণতন্ত্রের 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। দেয়া বরায় বিদুষে' বচন উদ্ধার করেছিলেন এবং যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন "শুদ্ধ বেদ শ্রবণের নিবারণ বশতঃ অন্য অন্য বিদ্যায় স্ত্রী শূদ্রাদির সম্পূর্ণ অধিকার আছে।" [সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৩য়)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ;

১৯৬৪। পৃঃ ৫৭৭] আপন বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় প্রাচীন ভারতীয় বিদুষী নারীর উল্লেখও তিনি করেছিলেন।

প্রাবন্ধিক নিম্নলিখিত রীতিতে আপন বক্তব্যের সার সংকলন করেছিলেন—

"প্রশ্ন—হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন কি।

উত্তর—তদ্ব্যতীত এদেশ ঘৃণিত অসভ্য অবস্থায় পতিত থাকে।

প্র—বিবেচনা মতে তাহা উচিত কি না।

উ—যুক্তি সর্ব্বাগ্রেই ইহার পোষকতা করে।

প্র—শাস্ত্রের মত কি।

উ—শাস্ত্র এ বিষয়ের পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

প্র—তবে ইহা সম্পন্ন না হওনের কারণ কি।

উ—দেশীয় মনুষ্য দিগের অজ্ঞান এবং অযত্ন।

প্র—তাহারা এ বিষয়ে অবহেলা করাতে কি পাপ সঞ্চয় করিতেছে না।

উ—তাঁহারা অবশ্যই পাপ করিতেছেন, এবং তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকটে দণ্ডনীয় হইতেছেন।" [তদেব পৃঃ ৫৭৮]

বিগত শতকের স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের অন্যতম নেতা মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। 'স্ত্রী শিক্ষা' শীর্ষক ঐ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৭২ শকের আশ্বিন মাসে 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র দ্বিতীয় সংখ্যাতে।

মদনমোহন প্রথমে স্ত্রী-শিক্ষাবিরোধী ব্যক্তিদের মত ও যুক্তি সংকলন করেছিলেন। তাদের প্রথম যুক্তি, শিক্ষালাভের জন্যে প্রয়োজনীয় মানসিক সামর্থ্য ও বুদ্ধি মেয়েদের নেই। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী-শিক্ষা এদেশে লোকাচার ও শাস্ত্র উভয়েরই বিরোধী। তৃতীয়তঃ লেখাপড়া শিখলে নারীর দুঃখ হয় এবং পতি-বিয়োগ ঘটে। চতুর্থতঃ বিদ্যা অর্জন করলে নারী স্বেচ্ছাচারিণী ও মুখরা হয়ে পড়বে এবং বিদ্যাভিমানে মা-বাবা, স্বামী প্রভৃতি গুরুজনকে অবজ্ঞা করতে থাকবে; "এবং পরিশেষে স্বয়ং পতিত হইবেক ও স্বকীয় পবিত্রকুলকে পাতিত করিবেক;"…(তদেব; পৃঃ ৫৪২) পঞ্চমতঃ নারী অন্তঃপুরেই থাকবে—বাইরে চাকরী বা বাণিজ্য করতে পারবে না; তাই তাকে লেখাপড়া শেখাবার প্রয়োজন নেই। মদনমোহন দৃঢ়তার সঙ্গে এই সকল আপত্তি খণ্ডন করেছিলেন।

প্রথম আপত্তির বিরুদ্ধে তিনি বলেছিলেন, আকৃতিগত পার্থক্য ছাড়া 'মানসিক

শক্তি বিষয়ে' নর-নারীর মধ্যে কোনই প্রভেদ নেই ; বরং শিক্ষা অর্জনের ক্ষমতা ছেলেদের তুলনায় মেয়েদেরই বেশি দেখা যায়। মদনমোহনও আত্রেয়ী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতা ইত্যাদি অনেক বিদুষী নারীর দৃষ্টান্ত উত্থাপন করে দেখিয়েছিলেন, স্ত্রী-শিক্ষা প্রাচীনকালেও প্রচলিত ছিল। তিনি বলেছিলেন, শাস্ত্রে কোথাও স্ত্রী-শিক্ষা নিন্দিত হয়নি। অপর এক আপত্তি খণ্ডনে তিনি বলেছিলেন, শিক্ষার্জনের সঙ্গে নারীর বিধবা হবার কোনই কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। বিদ্যালাভে নারী বরং সৌভাগ্যেরই অধিকারিণী হয়ে থাকে।

বিদ্যালাভে নারী ব্যভিচারিণী হবে, গর্বিতা হবে মদনমোহন সে কথাও মেনে নিতে পারেন নি ; কেননা বিদ্যা অর্জন করে মানুষ সচ্চরিত্রই হয়—বিনয়ীই হয়।

মদনমোহন বলেছিলেন, চাকরী না করলেও মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে ; কেননা বিদ্যার্জন করলে নারীর মনুষ্যত্বের ও আত্মার সার্বিক বিকাশ ঘটবে। অবশ্য ইচ্ছা করলে যে শিক্ষিতা মেয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারবে না তা নয়। লেখাপড়া শিখলে সংসারের আয়ব্যয়ের হিসেবও মেয়েরা রাখতে পারবে। শিশুসন্তানকে শিক্ষাদানের জন্যেও মেয়েদের শিক্ষালাভের প্রয়োজন রয়েছে। সুস্থ ও সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্যেও নারীর শিক্ষা গ্রহণ প্রয়োজন। আরও নানা কারণে মদনমোহন নারীশিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন।

১৮৪৯ সালে "সংবাদ সাধুরঞ্জন" পত্রিকায় 'স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ে দুইজন স্ত্রীলোকের কথোপকথন' নামে জনৈক ব্যক্তির একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর সেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ঐ কথোপকথনের একটু অংশ উদ্ধার করছি—

"আমি কথক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কোরেছিলাম, তিনি বল্লেন, "ঈা শাস্ত্রে লেখা আছে, সকল কালেই মেয়েরা বিদ্যে শিখবে, সরস্বতী যিনি লেখাপড়ার কর্ত্তা তিনিই মেয়ে মানুষ.,"……

(সংবাদ সাধুরঞ্জন—১২৫৬ ; সোমবার, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ; ৯২ সংখ্যা ; ২৮শে মে, ১৮৪৯)

স্ত্রী-শিক্ষা সংক্রান্ত একটি বিখ্যাত পুস্তকের নাম 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা'। বইটির নামপত্রে রয়েছে—

"THE ZENANA OPENED,
OR
A BRAHMIN
ADVOCATING FEMALE EMANCIPATION

কন্যাপোবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

CALCUTTA
1851"

যে পৃষ্ঠায় মূলগ্রন্থ আরম্ভ হয়েছে সেই পৃষ্ঠাতে আলোচ্য বইটির 'ভারত-বর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' এই নাম মুদ্রিত রয়েছে। রচয়িতা তারাশঙ্কর তর্করত্ন।

আলোচ্য গ্রন্থটি কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে গ্রন্থকার স্ত্রীজাতি সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় বিধান এবং তাঁর সমসাময়িক যুগের নারীর অবস্থা, বিশেষ করে বিদ্যাহীনা নারীর অবস্থা কেমন ছিল তা' আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছিলেন, জন্মাবার পর থেকেই কন্যাসন্তান অনাদৃত হয়ে থাকে, তাদের বিদ্যাশিক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় না; অল্প বয়সেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়। এই জন্যে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনি আরও বলেছিলেন, শিক্ষা না থাকার জন্যে মেয়েরা ঈর্ষাপরায়ণা, কলহপ্রিয়া, পরশ্রীকাতরা ও ভ্রাতৃবিরোধ সৃষ্টিকারিণী হয়ে থাকে।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডে লেখক প্রাচীনকালের স্ত্রী-শিক্ষা এবং 'স্ত্রীলোকের বিদ্যা-শিক্ষা করিবার যুক্তি ও প্রমাণ' আলোচনা করেছিলেন। এই আলোচনায় অন্যান্য স্ত্রী-শিক্ষা সমর্থকের বক্তব্যের সঙ্গে লেখকের বক্তব্যের অনেক মিল পাওয়া যায়।

তৃতীয় খণ্ডে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে গিয়ে লেখক জানিয়েছিলেন, "লজ্জা লোকাচার ভয় স্নেহ দাক্ষিণ্য সরলতা সুশীলতা ও নম্রতা প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণ শরীর ও মনের ভূষণ তাহা কেবল বিদ্যার আলোকা-ভাবে এদেশের স্ত্রীলোকদের প্রকাশিত হয় না।" (ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা—তারাশঙ্কর তর্করত্ন; ১৮৫১। পৃঃ ২৫) গ্রন্থকার বলেছিলেন, লেখাপড়া শিখলে নারী অধর্মকে ঘৃণা করতে পারবে, কখন কখন পুরুষকে সাহায্য করে তার 'ক্লেশ ও শ্রম লাঘব' করতেও সমর্থ হবে। নারীশিক্ষার এমনি আরও অনেক সুফলের কথা তিনি বলেছিলেন।

চতুর্থ খণ্ডে লেখক 'স্ত্রীগণের বিদ্যানুশীলনের উপায়' আলোচনা করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, নানা কারণে সে সময় প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে অভিভাবকেরা মেয়েদের পাঠাতে চাইত না। তবে তিনি মনে করেছিলেন, শিক্ষিকা দ্বারা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে অভিভাবকদের হয়তো আপত্তি নাও থাকতে পারে। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছিলেন, "পিতামাতা একাদশ বা দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রকাশ্য বিদ্যাশালায় স্বীয় বালিকা-দিগকে বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করুন তদনন্তর পাত্রের কেবল ধনমাত্র না দেখিয়া বিদ্যাবত্তা সুশীলতা চতুরতা পরীক্ষা করিয়া বিবাহ দিলে তৎকর্ত্তৃক বিদ্যাভ্যাস অনায়াসে হইতে পারে এবং জায়াপতি উভয়ের সম্প্রীতির সম্ভাবনা হয়। অথবা কোন সুশিক্ষিতা নির্দোষা যোষাকে বেতন দিয়া রাখিলে অন্তঃপুর মধ্যেও বিদ্যা অসাধ্যা হয় না।" (তদেব, পৃঃ ৪৪-৪৫)

স্ত্রী-শিক্ষার উপায় সম্পর্কে তারাশঙ্কর আরও বলেছিলেন, ধনী ব্যক্তিরা যদি অর্থ ব্যয়ে শিক্ষিকা নিয়োগ করে নিজ কন্যাকে শিক্ষিত করে তোলে তাহলে ঐ শিক্ষিত কন্যাদের দ্বারা পার্শ্ববর্তীস্থানের গরীব মেয়েরা বিনা মূল্যেই বিদ্যার্জনে সক্ষম হবে। সহর ও গ্রামে ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা বিদ্যালয় স্থাপনের কথাও তিনি বলেছিলেন। শাসক গোষ্ঠীর কাছ থেকে ঐ বিষয়ে উৎসাহ পাবার আশাও তিনি পোষণ করেছিলেন।

তারাশঙ্কর নারীশিক্ষার পাঠক্রম নিয়েও আলোচনা করেছিলেন।

স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্পর্কে তারাশঙ্কর কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সবগুলি যে আজকের দিনে সমর্থনযোগ্য তা অবশ্য নয়। সে যুগে উচ্চবর্ণের অভিভাবকেরা চাইত না, নিম্ন বর্ণের মেয়েদের সঙ্গে একত্রে তাদের মেয়েরাও লেখাপড়া শিখুক। তারাশঙ্কর সে জন্যে বিদ্যালয়ের একদিকে ভদ্র বংশীয় ও অন্য দিকে ভদ্রেতর বংশের মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন। এই ব্যবস্থা মানবতা বিরোধী বলেই মনে হয়। তারাশঙ্কর আরও বলেছিলেন, ইতর কন্যাদের মধ্যে থেকেই শিক্ষিকা তৈরী করতে হবে; কেননা ভদ্রলোকের মেয়েরা শিক্ষিকা হবে না। বিয়ের পর তারা স্বামী গৃহে বাস করবে এবং স্বামীর বশীভূত হয়েই থাকতে হবে। তারাশঙ্করের এই বক্তব্যও ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়। ভদ্রেতর ব্যক্তির কন্যারা কি শ্বশুর বাড়ী বিয়ের পর যাবে না? তারা কি স্বামীর বশীভূত হয়েও থাকবে না?

কিন্তু এসব কথা মনে রেখেও বলা যায়, স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের ইতিহাসে আলোচ্য গ্রন্থটির ভূমিকা আদৌ কম নয়।

১২৬১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা 'সুলভ পত্রিকা'-তে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ধারাবাহিক ভাবে ; ঐ পত্রিকাটির কেবল পৌষ সংখ্যারই সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশে "স্ত্রীশিক্ষার আপত্তি খণ্ডন" করা হয়েছিল। ঐ আপত্তি খণ্ডন করতে গিয়ে অজ্ঞাত নামা রচয়িতা বলেছিলেন, স্ত্রী-শিক্ষা শাস্ত্রসম্মত। নানা শাস্ত্রীয় বচন ও প্রাচীন ভারতীয় বিদুষী রমণীর দৃষ্টান্ত সহযোগে তিনি ঐ বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সে যুগে স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে বহুকথিত নানা যুক্তির বিরোধিতাও তিনি করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছিলেল, "...স্বেচ্ছাচার পূর্ব্বক ব্যভিচারিণী হওয়া, ও পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে অবজ্ঞা করা, বিদ্যাশিক্ষার তাৎপর্য্য হইত, তবে সমস্ত পুরুষ বিদ্বান্ মাত্রেই স্বেচ্ছাচারী হইয়া পরনারী পরায়ণ হইতেন ; এবং সর্ব্বদাই পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে অবহেলা করিতেন।" (সুলভ পত্রিকা—১২৬১ ; পৌষ)

অনেক সময় বলা হতো, লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকলে নারীকে গৃহকার্য ও সন্তান পালনে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। এর জবাবে প্রাবন্ধিক বলেছিলেন, যাদের অবকাশ আছে তাদের লেখাপড়া শিখবার কোন বাধা থাকতে পারে না। তাছাড়া গৃহকর্ম করেও বিদ্যাচর্চা করা অসম্ভব নয়।

দ্বারকানাথ রায়ের 'স্ত্রীশিক্ষা-বিধান' পুস্তকটিতেও স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়েছিল। বইটির নাম পত্রের কিছু অংশ নিম্নরূপ—

"স্ত্রীশিক্ষা-বিধান।

FEMALE EDUCATION,

OR

AN ATTEMPT TO POINT OUT THAT THE NOT EDUCATING OUR FEMALES IS THE ROOT OF ALL THE EVILS ON OUR SOCIAL CONDITION.

BY

DWARAKA NAUTH ROY."

বইটি ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকটির পরিকল্পনা প্রসঙ্গে দ্বারকানাথ জানিয়েছিলেন, "পূর্ব্বে সুলভ-পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা প্রস্তাব একবার প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহার কিয়দ্ভাগ প্রকৃষ্টরূপে সংশোধন করিয়া ইহাতে

নিবিষ্ট করা গিয়াছে ; কিয়দ্ভাগ নূতন রচিত হইয়াছে। ফলে এই প্রস্তাব রচনা-কল্পে আমি বিস্তর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি।"

[স্ত্রীশিক্ষা-বিধান—দ্বারকানাথ রায় ; ১৮৫৭। পৃঃ ১]

মূল গ্রন্থের প্রথমেই দ্বারকানাথ স্ত্রী-শিক্ষা বিরোধী ব্যক্তিদের মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তখন অনেকে বলতেন, কন্যার দ্বারা 'বংশের নাম রক্ষা হয় না।' কন্যা সন্তানের জন্ম হলেও কেউ খুশী হয় না। অতএব তাদের শিক্ষিত করবার কোন দরকার নেই। দ্বারকানাথ এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রাচীন কালের বিদুষী মহিলাদের নাম উল্লেখ করে বলেছিলেন, তাঁরা বংশমর্যাদা রক্ষায় সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের অনেকের জন্যে স্বামীর মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

স্ত্রী-শিক্ষাবিরোধী ব্যক্তিদের যুক্তি হিসেবে সমাজে সাধারণভাবে যা' প্রচলিত ছিল, দ্বারকানাথ তা' আদৌ মেনে নিতে পারেন নি। তবে দেখা যায়, তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে পূর্ববর্তী রচয়িতাদের বক্তব্যের হুবহু মিল রয়েছে। স্ত্রী-শিক্ষা যে শাস্ত্রসম্মত সে কথা তিনি পূর্বে উল্লিখিত অন্যান্য ব্যক্তির মত প্রায় একই তথ্য সম্ভারে প্রমাণ করেছিলেন। অবশ্য স্ত্রী-শিক্ষার সুফল নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য রেখেছিলেন—

"সন্তানের বীর্য্য প্রভাবও জননীর বিদ্যাবত্তার প্রতি নির্ভর করে, কারণ, তাহারা বিদ্যা প্রভাবে স্বস্ব শারীরিক ও মানসিক নিয়ম পালনে অধিকারী হইয়া সুস্থ ও সবল সন্তান উৎপন্ন এবং প্রকৃষ্ট নিয়মে প্রতিপালিত হইলেই যে বীর্য্যবন্ত হইয়া উঠিবে, ইহা আর বলা বাহুল্য মাত্র।" (তদেব ; পৃঃ ১১)

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে তিনি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমাদের দেশের অধিকাংশ নিন্দনীয় ও অশুভকর দেশাচারের মূলে রয়েছে নারীর অজ্ঞতা। সুতরাং মেয়েদের শিক্ষিত না করলেই নয়। শিক্ষাই অজ্ঞতা দূর করে।

মেয়েদের শিক্ষা দেবার উপায় সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, ঐ শিক্ষাদানের জন্যে বিদ্যালয়ই প্রশস্ত ; তবে শিক্ষাদানের জন্যে শিক্ষিকা নিয়োগই শ্রেয়। অবশ্য একথাও তিনি বলেছিলেন, শিক্ষিকার অভাবে বৃদ্ধা মহিলার তত্ত্বাবধানে সচ্চরিত্র পুরুষ শিক্ষকও নিয়োগ করা যেতে পারে।

এবার একটি মুদ্রিত বক্তৃতার আলোচনা করা যাক। বক্তৃতাটি মুদ্রিত হয়েছিল "বর্ত্তমান ইং ১৮৬২ সালের ১১ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারের বেথুন-সমাজাধিবেশন সাময়িক বাঙ্গালা বক্তৃতা।" এই নামে। বক্তার নাম

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। যোগেন্দ্রনাথ উপরিউক্ত সভাতে পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতারই লিখিত রূপ পরে মুদ্রিত হয়েছিল; তবে বক্তৃতার সময় যা বলা হয়েছিল তার কিছু অংশ অনাবশ্যক বোধে যোগেন্দ্রনাথ বর্জন করেছিলেন।

বক্তৃতায় যোগেন্দ্রনাথ নির্ভয়ে খোলাখুলি ভাবে একটি বাস্তব সত্য তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মুখে অনেকে স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতিত্ব করলেও মনে প্রাণে তা সমর্থন করতো না; মেয়েদেরও তারা বিদ্যালয়ে পাঠাতো না।

যোগেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় স্ত্রী-শিক্ষাবিরোধীদের বক্তব্যখণ্ডন চেষ্টা আদৌ প্রাধান্য পায় নি; স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে যারা মুখে এক কাজে আর তাদের সমালোচনাই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছিল। কিভাবে প্রকৃত স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার সম্ভব হতে পারে তার ওপরও তিনি জোর দিয়েছিলেন।

১৭৮৫ শকে কৈলাসবাসিনী দেবীর 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে স্ত্রী-শিক্ষার তদানীন্তন অবস্থা সম্পর্কেও লেখিকা আলোচনা করেছিলেন। তবে তাঁর ঐ আলোচনায় অভিনবত্ব তেমন ছিল না।

এরপর 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি' শীর্ষক গ্রন্থটির কথা উল্লেখযোগ্য। এই পুস্তকটির রচয়িতাও কৈলাসবাসিনী দেবী। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৮৭ শকাব্দে। লেখিকা বলেছিলেন, প্রাচীনকালে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও পরবর্তীকালে ধীরেধীরে তা নানা কারণে অপ্রচলিত হতে থাকে। নিঃসহায় বিধবারাই তখন কেবল কিছু সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করতে পারতো। কিন্তু তারা কখনো অপর নারীকে পাঠাভ্যাসে পটু করতে চাইত না। অধিগত বিদ্যা পরহস্তগত হলে তাদের গুরুত্ব কমে যাবে এই ভয়ে তারা ভীত ছিল। তথ্যটি নিঃসন্দেহে মজার।

লেখিকা সে যুগের আরও অনেকের মত বিশ্বাস করতেন, ইংরেজদের চেষ্টাতেই স্ত্রী-শিক্ষার উন্নত পরিবর্তন সম্ভব হয়েছিল; তবে সমকালীন স্ত্রী-শিক্ষার সমালোচনাও তিনি করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, গৃহধর্ম পালন করাই নারীর প্রধান কর্তব্য। "কিন্তু বিদ্যাভিলাষিণী কামিনীগণের মতে কেবল তাঁহারা পুস্তক পাঠ করিবেন ও কার্পেট বুনিবেন। কিন্তু সেরূপ ইচ্ছাকেও নিতান্ত নিন্দা করা যায় না, যদি তাহা প্রকৃতরূপে সম্পাদিত হয়।···কিন্তু সেরূপ হওয়া তাঁহাদিগের অভিপ্রেত নহে কেবল কোন মতে গোলমাল করিয়া

সময় নষ্ট করাই তাঁহাদিগের অভিসন্ধি, নচেৎ তাঁহারা এরূপ ভাবের ভাবিনী কেন হইবেন।"

(হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি—কৈলাসবাসিনী দেবী ; ১৭৮৭ শকাব্দ। পৃঃ ২৭-২৮)

লেখিকার মতে, তারা নিজেদের বিদ্যাবত্তাই জাহির করতে চায় অথচ কিছুই শিখতে চায় না। এই বক্তব্যের মধ্যে সত্য কিছু ছিল ; তবে স্ত্রী-শিক্ষার সমালোচনায় তাঁর সংস্কারাচ্ছন্ন মনের পরিচয়ও কিছু প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু তাহলেও বলা যায়, প্রকৃত অর্থে তিনি স্ত্রী-শিক্ষা বিরোধী ছিলেন না।

কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থটির মুখবন্ধে রচয়িতা জানিয়েছিলেন—

"আমরা নারী জাতি বিষয়ক যাহা কিছু লিখিব, তাহাতে বিশেষ কোন দেশ আমাদিগের লক্ষ্যস্থল হইবে না। কিন্তু আমাদিগের ভারতবর্ষের আচার পদ্ধতি এবং অবস্থানুসারে যে সমস্ত কথা শুদ্ধ আমাদিগের দেশেই বর্ত্তিত (!) পারে, আমরা যথাস্থলে তাহারও উল্লেখ করিব।" (নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব—কালীপ্রসন্ন ঘোষ ; ১৯২৬ সম্বৎ। পৃঃ ১৩)

এই জন্যে প্রয়োজন বোধে গ্রন্থটির আলোচনায় আমরা অনেক তথ্য বর্জন করবো।

মেয়েদের আত্মিক বিকাশের জন্যে কালীপ্রসন্ন ঘোষও শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাছাড়া নারীর 'হৃদয়ের উৎকর্ষ সম্পাদন এবং শোভা পরিবর্দ্ধনের জন্য' তিনি মেয়েদের ধর্মশিক্ষা দানের কথাও বলেছিলেন। অন্যান্য ব্যক্তির মত তিনিও নারীর সবল জ্ঞানতৃষ্ণা ও বুদ্ধিশক্তিতে আস্থাশীল ছিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে কালীপ্রসন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন অনেক, তত্ত্বও পরিবেশন করেছিলেন কিছু কিছু। বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় যুক্তি নিষ্ঠারও তিনি পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার নিদর্শনও গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বলতে হয়, তাঁর আবেগময়তাও এখানে প্রবল হয়ে উঠেছিল অনেক সময়।

'স্ত্রী-শিক্ষা' নামে 'ভারতী' পত্রিকাতে ১২৮৮ সালের আষাঢ় মাসে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল। এখানে তিনি প্রকৃত স্ত্রী-শিক্ষার স্বরূপ নির্ণয় করেছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী প্রবন্ধটিতে স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ণয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন।

মেয়েদের দ্বারা রচিত এবং 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ সংগ্রহ করে ১৮৭২ সালে "বামা রচনাবলী" (১ম ভাগ) নামে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছিল। ঐ গ্রন্থের নানা প্রবন্ধে মেয়েরা তাঁদের শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কিছু আলোচনা করেছিলেন। শৈলজাকুমারী দেবী স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বলেছিলেন, "স্ত্রীগণ সুশিক্ষিতা হইলে আপন বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর পুত্রকন্যা গণকে বিদ্যানুরাগী করিতে সচেষ্টিত, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম সদসৎ কর্ম্ম বিবেচনা ইত্যাদি বিষয়ে সক্ষম হইবেন। অপর, পরিবার মধ্যে গৌরবান্বিত থাকিয়া, আপন অবস্থা উত্তমরূপ রাখিয়া এবং গৃহকার্য্যে উত্তমরূপ নিপুণ হইয়া জনসমাজে সুখ্যাতি ভাজন হইবেন।"

[বামারচনাবলী (১ম); ১৮৭২। পৃঃ ৪৩]

শ্রীমতী রমাসুন্দরী তাঁর প্রবন্ধে বলেছিলেন, "এদেশে যে নিতান্ত দোষাকর বাল্যবিবাহ ও বার্দ্ধক্যবিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে তাহারও প্রধান হেতু স্ত্রীশিক্ষাভাব।" (তদেব; পৃঃ ৫০)

শ্রীমতী মধুমতী মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে একটু বেশি আশাবাদী হয়ে বলেছিলেন, "এদেশের স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী হইলে পুস্তক রচনা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া ইচ্ছামত ব্যয় করিতেও পারেন, এবং দৈববশতঃ যদি দৈন্যদশায় পতিত হয়েন তাহা হইলে সংসার যাত্রাও নির্ব্বাহ করিতে পারেন।"

(তদেব; পৃঃ ৫৬)

'ভারত-সংস্কারক' ছিল বিশত শতকের অন্যতম বিখ্যাত উদারপন্থী পত্রিকা। ঐ পত্রিকাটিতে স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্ক বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল।

'প্রাচীন ও আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার প্রভেদ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন সেযুগের এক শিক্ষিতা মহিলা—শ্যামাসুন্দরী দেবী। প্রবন্ধটি ১২৯০ সালে পঠিত হয়েছিল সাবিত্রী লাইব্রেরীর পঞ্চম অধিবেশনে। প্রবন্ধটি পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।

শ্যামাসুন্দরী প্রাচীনকালের স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন; তবে সমকালীন স্ত্রী-শিক্ষার উপর তিনি খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি বলেছিলেন—

"মাঘমণ্ডল', 'পুণ্যিপুকুর', 'যমপুকুর' ইত্যাদি ব্রতগুলি খেলাচ্ছলে ধর্ম্মোপদেশ পূর্ণ; বালিকাকাল হইতেই এ প্রকার ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া রমণীগণ দেবীর ন্যায় সংসারে বিরাজ করিতেন। খেলার মধ্যেও নানা প্রকার সুনীতিপূর্ণ স্ত্রীকবিতা

ছিল ; যথা "পৃথিবীর মত ধৈর্য্যশীলা হই, সীতার মত সতী হই, গঙ্গার মত শীতলা হই" ইত্যাদি ; এই প্রকার শিক্ষায় যে এক সময় বিলক্ষণ সুফল ফলিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজি কালি বলিকাগণ যে ইংরেজি রীতির অনুকরণ করিয়া জন্মদিনে সঙ্গিণীগণ সহ ভোজন ও আমোদ করেন তাহা কি উল্লিখিত ব্রতাদির ন্যায় সর্ব্ব-বিষয়ে হিতকরী? ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ কি অর্থশূন্য আমোদ শ্রেষ্ঠ? যদ্দ্বারা খেলাচ্ছলে আমোদের সহিত ধর্ম্ম ও সমাজনীতি শিক্ষা হইত তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিব না। কেবল লুকোচুরি দৌড়াদৌড়ি ও তাসপাশা চৌপাড়কেই শ্রেষ্ঠ বলিব?"

[সাবিত্রী—গোবিন্দলাল দত্ত প্রকাশিত ; ১২৯৩। পৃঃ ২৩৫]

সে যুগের স্ত্রী-শিক্ষায় যে ত্রুটি ছিল না তা নয় ; কিন্তু তবুও বলা যায়, লেখিকার ঐ বক্তব্যে যেন একটু পিছু টানই ছিল। অবশ্য একথাও সত্য, আক্ষরিক অর্থে স্ত্রী-শিক্ষা বিরোধী বলতে যা বোঝায় তিনি তা ছিলেন না।

শ্যামাসুন্দরী সে যুগের স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে দুএকটি মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর মতে তদানীন্তন স্ত্রী-শিক্ষা ঠিক দেশোপযোগী ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, "এই শিক্ষা যখন দেশীয় স্বরীতি গ্রহণ করিয়া সাধিত হইবে, তখনই ভারতললনার প্রকৃত সুশিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে বলা যাইবে।"

(তদেব ; পৃঃ ২৩৯)

অবশ্য স্ত্রী-শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতিতে কিছু ত্রুটি থাকলেও ঐ শিক্ষার উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য যে মহৎ লেখিকা সর্বশেষে তা স্বীকার করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "ক্রমেই স্ত্রীশিক্ষার দোষ সমস্ত সংশোধিত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে।" (তদেব, পৃঃ ২৪২)

স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী নন অথচ সমকালে প্রচলিত স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুটা অসন্তুষ্ট এমন ব্যক্তির সংখ্যাও সে যুগে কম ছিল না। শরচ্চন্দ্র ধর "অবলা-বান্ধব" নামে মেয়েদের পাঠোপযোগী একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। ঐ পুস্তকের "কিরূপ স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন?" শীর্ষক রচনাংশে তিনি তাঁদেরই একজন হয়ে বলেছিলেন, "শিক্ষার ভাণ" করে অনেক বাঙ্গালী নারী "অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছেন।" তাঁর বক্তব্য, "পুরুষের দোষে ও শিক্ষার গুণে" মেয়েরা লজ্জাহীন হয়ে পড়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে কি ধরণের স্ত্রী-শিক্ষা তাঁর অভিপ্রেত তাও তিনি জানিয়েছিলেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'আর্য্যমিশন ইনষ্টিটিউশন' থেকে প্রকাশিত হয়েছিল "স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা" নামে একটি পুস্তিকা। রচয়িতার নাম জানা যায় নি।

পুস্তিকার রচয়িতা সমকালীন স্ত্রী-শিক্ষায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। অনেকের মতো তিনিও পুরুষের কাছে মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ বরদাস্ত করতে পারেন নি। স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে তাঁর একটু গোঁড়ামি ছিল বলেই মনে হয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছিলেন, "…আমাদের দেশে বালিকাদিগকে বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় কোন শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। বালিকার কেবলমাত্র পিতা-মাতার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া চলিবে।…বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিতামাতাই বালিকাগণের শিক্ষা পুস্তক।"

[স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা (আর্য্যমিশন ইনষ্টিটিউশন প্রকাশিত) ; ১৮৯১। পৃঃ ১৫।

তাঁর বক্তব্য, বিবাহের পরে নারী স্বামীর কাছে শিখবে আত্মবিদ্যা। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষালাভের উপায় কি একে বলা যায়? আর যে কোন স্বামীই কি আত্মবিদ্যালাভের সহায়ক হতে পারে?

আলোচ্য পুস্তকটির স্থানে স্থানে বিষয়গত গাম্ভীর্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে তাকে অন্তঃসার শূন্য ছদ্মগাম্ভীর্য ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। তিনি বলেছিলেন, অপরাবিদ্যায় নারীর প্রয়োজন নেই। তাঁর কথা, "স্ত্রী-জাতিকে যে অর্থাগমের জন্য অপরাবিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। স্ত্রীজাতির দ্বারা অর্থাগমের প্রত্যাশা করা নিতান্ত নীচ অন্তঃ-করণের পরিচয় দেওয়া মাত্র।" (তদেব ; পৃঃ ২২)

কিন্তু শুধু অর্থের জন্যেই কি অপরাবিদ্যার অনুশীলন করা হয়? তাছাড়া তিনি বলেছিলেন, অভাব দূর করবার জন্যেও অপরাবিদ্যা অর্জনের প্রয়োজন নেই, কেননা "আমার মন যখন ইন্দ্রিয়ের আসক্তি ছাড়িয়া আত্মায় আসক্ত হইবে, তখনই অভাব দূর হইয়া ভাবের উদয় হইবে ; সুতরাং অভাবও যাইবে। নচেৎ ধনাদির দ্বারা কিছুতেই অভাব যাইবে না। যদি নরনারীর অভাব দূর করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে অপরাবিদ্যার দ্বারা কোন রূপেই অভাব দূর ও সমাজের প্রকৃত হিতসাধন হইবে না ; বরং ব্যভিচারে দেশ উৎসন্ন যাইবে। সুতরাং বর্ত্তমান কালে যেরূপ স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা ব্যতীত ইষ্টের সম্ভাবনা নাই।"

(তদেব ; পৃঃ ২৫)

এই বক্তব্যকে বাগাড়ম্বর পূর্ণ এবং অবাস্তব বলেই মনে হয়।

॥ ৫ ॥

:: বাল্যবিবাহ বিষয়ক বিতর্করচনা ::

বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত বিতর্করচনার আলোচনায় বিদ্যাসাগরের 'বাল্যবিবাহের দোষ' শীর্ষক প্রবন্ধই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৭৭২ শকের ভাদ্রমাসে 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'য় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। এইটিই হলো বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার-মূলক প্রথম রচনা। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, গৌরীদানের পুণ্যলোভে মানুষ বাল্য বিবাহের রীতি চালু করেছিল। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, কন্যা যদি পিতৃগৃহে কন্যাদশাতেই ঋতুমতী হয় তবে তার পিতামাতার দুর্গতির অবধি থাকে না। এইজন্যে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, কারও ঐ শাস্ত্রীয় নির্দেশের প্রতি 'বিদ্বেষবুদ্ধি' জন্মালেও 'লৌকিক ব্যবহারের' বশবর্তী হয়ে ঐ বিষয়ে কাজের কাজ সে কিছুই করতে পারে না। তিনি আরও বলেছিলেন, বাল্যবিবাহের ফলে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে মধুর প্রণয় দেখা দেয় না। বাল্যবিবাহ বিদ্যাচর্চাতেও ব্যাঘাত ঘটায়। শরীরেরও ক্ষতি হয় এতে। পৃথিবীর মধ্যে বাঙালী এই কারণেই দুর্বলজাতিতে পরিণত হয়েছে। বিদ্যাসাগর আরও বলেছিলেন, বাল্যবিবাহের জন্যে পুরুষ অর্থ উপার্জনের আগেই সন্তানের পিতা হয়ে যায়; ফলে তার আর্থিক দুর্গতি ঘটে থাকে। ঐ দুর্গতিতে প'ড়ে অনেক সময় তাকে অর্থার্জনের জন্যে অবাঞ্ছিত পথও বেছে নিতে হয়। অর্থসংকটে পড়ায় প্রিয়জনও তার কাছে উপসর্গ বলে গণ্য হয়।

বাল্যবিবাহবাদীরা বলতেন, ঐ প্রথা চালু থাকলে বালক-বালিকার ব্যভিচারগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা কম থাকে। বিদ্যাসাগর ঐ বক্তব্যকে একেবারে অগ্রাহ্য করেন নি; তবে তিনি বলেছিলেন, ছোটবেলায় বিদ্যাচর্চায় মগ্ন থাকলে ঐ সম্ভাবনা থাকবে না।

বাল্যবিবাহের জন্যে সমাজে যে বিধবা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল বিদ্যা-সাগর সে কথাও বলেছিলেন।

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে গিয়ে বিদ্যাসাগর যেমন মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক জ্ঞানের তেমনি বাস্তব সামাজিক অভিজ্ঞতারও পরিচয় দিয়েছিলেন। এই কারণে তাঁর প্রবন্ধটির মূল্য আজও অনস্বীকার্য।

১২৬২ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা' "বাল্য-বিবাহ" নামে আর একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল। তবে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের সঙ্গে এই প্রবন্ধটির বক্তব্যের অনেক মিল রয়েছে।

দাক্ষিণাত্য বৈদিকদের মধ্যে বাল্যবিবাহের ফলে যে অভাবনীয় অবস্থার উদ্ভব ঘটতো প্রাবন্ধিক তার কথা আলোচনা করেছিলেন। বাল্যবিবাহের ফলে যে সুস্থ বলবান শিশুর জন্ম হয় না সে কথাও তিনি বলেছিলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহও 'বাল্যবিবাহ' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। ১৭৭৬ শকের ১০ মাঘ 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের বক্তব্যের মিল অত্যন্ত বেশি।

১২৮০ সালের ৪ শ্রাবণ (১৮৭৩, ১৮ জুলাই)-এর 'ভারত সংস্কারক' পত্রিকাতেও 'বাল্যবিবাহ' নামে একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটিতেও বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করা হয়েছিল।

বাল্যবিবাহের পক্ষে সে যুগে সাধারণভাবে কতকগুলি যুক্তি চালু ছিল। যাঁরা ঐ প্রথার বিপক্ষে সে সময় মসীযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই সেই সব যুক্তি প্রায় একই বক্তব্যের মাধ্যমে খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই কারণে ঐ বিষয়ক রচনাদিতে একই বক্তব্যের পুনরুক্তি বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল। আলোচ্য প্রবন্ধটির বক্তব্যের সঙ্গেও তাই পূর্বে আলোচিত প্রবন্ধাদির বক্তব্যের ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে।

যাই হোক, আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক বাল্যবিবাহের দোষ নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, অল্পবয়সে বিবাহের জন্যে সন্তান ধারণে নারীর ক্লেশ ঘটে; গর্ভবতী নারীর মৃত্যুও ঘটে সময় সময়। শিশু মৃত্যুও ঘটে থাকে। সুস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হয় না;—ভূমিষ্ঠ হলেও তার আয়ু কম হয়। প্রসূতির দুর্ভোগের শেষ থাকে না। বাল্যবিবাহের ফলে অনভিজ্ঞ বালিকা অক্ষম হলেও সাংসারিক দায় দায়িত্বের বোঝা বহন করতে বাধ্য হয়। তার ফলও ভাল হয় না।

বাল্যবিবাহে পুরুষের কি ক্ষতি ঘটে তাও তিনি আলোচনা করেছিলেন।

বাল্যবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি না সে আলোচনাও প্রবন্ধটিতে ছিল। তিনি বলেছিলেন, "শাস্ত্রে আছে "অজ্ঞাতপতি মর্য্যাদামজ্ঞাত পতিসেবনাম্ নোদ্বাহয়েৎ পিতাবালামজ্ঞাত ধর্ম্মশাসনাম্।"

যে কন্যা পতি মর্য্যাদা (!)—পতির প্রতি কর্ত্তব্য কিছুই জানে না, ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই এমত কন্যাকে পিতা বিবাহ দিবেন না।

ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু বলিয়াছেন "ত্রীণিবর্ষাণ্যুদীক্ষেত, কুমার্ব্যৃতুমতী সতী" কুমারীর যৌবন আরম্ভের পরও তিন বৎসর বিবাহের জন্যে প্রতীক্ষা করিবে।

বাল্যবিবাহের প্রতিকূলে ধর্ম্মশাস্ত্রের এরূপ অনেক বচন এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।" (ভারত সংস্কারক ; ১২৮০, ৪ শ্রাবণ ; পৃঃ ১৬৩)

'বাল্যবিবাহ ও অবরোধ-প্রথা' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন শ্যামাসুন্দরী দেবী। ১২৮৯ সালে সাবিত্রী লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ আলোচ্য রচনাটিকে পুরস্কার প্রদান করেছিলেন।

শ্যামাসুন্দরী বাল্যবিবাহকে সভাদেশ বহির্ভূত রীতি বলে মনে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, প্রাচীনকালে ভারতে ঐ প্রথা চালু ছিল না। বাল্যবিবাহ বিবেক-অনুমোদিত নয় বলেও তিনি জানিয়েছিলেন। শ্যামাসুন্দরী মনে করতেন, স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে আবশ্যক হলে অসৎ পথ থেকে সরিয়ে আনে। কিন্তু বাল্যবিবাহে তা সম্ভবপর হয় না।

বাল্যবিবাহের ফলে বালক-বালিকার চরিত্রে কলঙ্কস্পর্শ ঘটে না এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে লেখিকা বলেছিলেন, বিদ্যা অর্জনে নিরত থাকলে অল্পবয়স্ক ব্যক্তির চরিত্র অসৎ হতে পারে না। সংশিক্ষার অভাব ঘটলে অবশ্য আলাদা কথা। মেয়েরাও যদি বেশি বয়স পর্যন্ত পিতৃগৃহে থেকে সংশিক্ষা লাভ ক'রে পরে বিবাহিতা হয় তাহলেও তাদের চরিত্র খারাপ হবে না।

'বাল্য বিবাহ' নামে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯২ সালে ১ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা 'সমাজদীপিকা' পত্রিকাতে। প্রবন্ধরচয়িতা ছিলেন মধ্যমপন্থী। তিনি বলেছিলেন, আগে যুবতীর স্বয়ম্বর সভা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিশেষ দোষ ঘটেছিল বলেই একদিন যুবতীবিবাহ বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকেই বাল্যবিবাহ চালু হয়েছিল। আবার যখন একদল ঐ বাল্যবিবাহ নিবারণে সচেষ্ট হয়েছে তখন বুঝতে হবে তাতেও দোষ দেখা দিয়েছে। প্রাবন্ধিক এই কারণে নর-নারীর বিবাহের বয়স সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেছিলেন—

"আমরা না বালিকার, না যুবতীর বিবাহে পক্ষপাতী। আমাদের মত, দশ বৎসর হইতে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বিবাহের মুখ্যকাল।...স্ত্রীগণের দশ ও পুরুষের ষোড়শ বর্ষাবধি বিবাহই যুক্তিযুক্ত।"

("সমাজদীপিকা—১২৯২ ; ১ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা ; পৃঃ ১৪৫)

কিন্তু তিনি একথাও বলেছিলেন, স্ত্রী অপেক্ষা স্বামী বয়সে অন্ততঃ দশবছরের বড় হবে। আবার, দশ থেকে বার বছর বয়সের মধ্যেই যে নারীর বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয় সে কথাও তিনি জানিয়েছিলেন। অথচ স্ত্রী থেকে স্বামী যদি অন্ততঃ দশ বছরের বড় হয় তাহলে তার বয়স হবে কুড়ি থেকে বাইশের মধ্যে।

প্রাবন্ধিক বয়স সম্পর্কে অন্য বক্তব্যও রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কন্যাকে দশ থেকে বার এবং পুরুষকে যোল থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে বিবাহ দেওয়া দরকার। তবে এক আধ বছর এদিক-ওদিকে কিছু যায় আসে না। "কিন্তু, তৎকালে যেন সকলে, কন্যার দুই ও পুত্রের পাঁচ, এই সমানুপাতটী স্মরণ রাখেন, অর্থাৎ পুত্রের ছাব্বিশ বৎসর বয়সে যিনি যেমন উৎকণ্ঠিত হইবেন, কন্যার বারবৎসর চারি মাসেও তাঁহার তদ্রূপ উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিত।"...

(তদেব ; পৃঃ ১৪৮)

এইভাবে দেখা যায়, বিবাহের বয়স সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের বক্তব্যে অযথা এক জটিলতা ও অসঙ্গতি দেখা দিয়েছিল। তবে তাঁর বক্তব্য থেকে মোদ্দা কথা যা বোঝা যায় তা হলো, দ্বাদশ বছর বয়সেই কন্যার বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাল্যবিবাহের বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা করেছিলেন রামচন্দ্র দত্ত। পুস্তকটির নাম 'বাল্যবিবাহ'। ১২৯৪ সালে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল।

রামচন্দ্র বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মত, সংসারী হবার জন্যে স্ত্রীর প্রয়োজন ; কিন্তু স্ত্রীকে সংসারী হবার উপযুক্ত হতে হবে—বালিকা কখনও তেমন স্ত্রী হতে পারে না। বিবাহের সময় পাত্র-পাত্রীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বিচার করাও অপরিহার্য বলে তিনি মনে করেছিলেন।

বিবাহের বয়স সম্পর্কে রামচন্দ্র মনুর বচনের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত করেছিলেন,"...যে ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আপনাকে আপনি বুঝিতে না পারিবে সে পর্য্যন্ত উদ্বাহ শৃঙ্খলে তাহার আবদ্ধ হওয়া অনুচিত।"

(বাল্যবিবাহ—রামচন্দ্র দত্ত ; ১২৯৪। পৃঃ ৪)

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, আর্যগণ ৩৬ বৎসর গুরুগৃহে বাস করে 'আত্মজ্ঞান' লাভ করবার পরই বিবাহ করতো।

রামচন্দ্র বলেছিলেন, বাল্যবিবাহ সমর্থনের পশ্চাতে রয়েছে সমর্থনকারীদের হীন স্বার্থপরতা। অল্পবয়সে বিবাহ দিলে প্রাপ্ত সমুদয় বস্তুই পিতা লাভ করতে পারে। কিন্তু একথা কন্যার পিতার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। কাজেই রামচন্দ্রের এই বক্তব্য কিছু দুর্বল বলেই মনে হয়।

বাল্যবিবাহের ফলে পুরুষ, নারী এবং শিশুসন্তানের কি ক্ষতি হয় রামচন্দ্র তাও আলোচনা করেছিলেন। যে সব ক্ষতির তিনি উল্লেখ করেছিলেন তাদের অধিকাংশই বহু আলোচিত ; তবে রামচন্দ্রের বিশ্লেষণ নৈপুণ্য নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

নরনারীর বিবাহের বয়স সম্পর্কে রামচন্দ্রের শেষ কথা ছিল, ২৫ বছর বয়সের পরেই পুরুষের বিবাহ করা প্রশস্ত। ২৩ বছর পর্যন্ত শিক্ষা, ১ বছর বিশ্রাম ; পরে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা। তিনি বলেছিলেন, তিন বৎসর পরে পুরুষ কার্যে দক্ষতা অর্জন করে। এই কথা বলবার পরেই রামচন্দ্র লিখেছিলেন, "যদ্যপি ২৭ বৎসরের পাত্র দ্বাদশ কিম্বা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকার পাণি গ্রহণ করে তাহা হইলে বাস্তবিক সুখের ইয়ত্তা থাকে না।" (তদেব ; পৃঃ ১৩)

অর্থাৎ ২৭ বছরই, তাঁর মতে, পুরুষের বিবাহ করবার পক্ষে আদর্শ সময়।

১২৯৪ সালের শ্রাবণ মাসে ৪র্থ ভাগ ১ম সংখ্যা 'নবজীবন'-এ 'বাল্যবিবাহ' শীর্ষক একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাটিতে বাল্যবিবাহকে সমর্থন করা হয়েছিল কুশলতার সঙ্গে। রচনাটি কথোপকথনের রীতিতে লেখা। কথোপকথনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তিনজন—বিজয় ও বসন্ত নামে দুই বন্ধু এবং তাদের বৃদ্ধ অধ্যাপক রামচন্দ্র। প্রথমে বিজয় বলেছিল বসন্তকে, বাল্যবিবাহের ফলে তারা হীনবীর্য হয়ে পড়ছে ; অধ্যয়নের সময় বিবাহ করলে "বালকদের মন নারী-প্রেমের দিকে প্রধাবিত হয়।'...বিশেষতঃ অল্পবয়সে স্ত্রী-সম্ভোগ করিলে শরীর দুর্ব্বল ও মস্তিষ্ক তেজোহীন হইয়া পড়ে।"...

(নবজীবন—৪র্থ ভাগ ; শ্রাবণ, ১২৯৪, ১ম সংখ্যা , পৃঃ ১৭)

বিজয়ের এই বক্তব্য শুনে বসন্ত এক অদ্ভুত জবাব দিয়েছিল—

'আমার বিবেচনায় বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীই সমধিক অনিষ্টের কারণ বালকগণ অসময়ে আহার করিয়া বিদ্যালয়ে গমন করে, পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্য যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করে ; এই জন্যই আমাদের বালকগণ তেজোহীন হইয়া পড়ে। ইহার উপর বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের জলবায়ু ভাল নহে।"

[তদেব ; পৃঃ ১৮]

এই বক্তব্যে বিজয়ের প্রশ্নকে পাশ কাটিয়েই যাওয়া হয়েছে, অর্থাৎ বাল্য-বিবাহে লেখাপড়ার ক্ষতি হয়, শরীর দুর্বল হয়, বাল্যবিবাহ বিরোধীদের এই যুক্তির প্রকৃত উত্তর বসন্তের কথায় পাওয়া যায় না। বিজয়ের বক্তব্যের উত্তরে বসন্ত আরও বলেছিল, পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ করলে যে বালকেরা নারীপ্রেমে মগ্ন হয়ে যাবে তা সত্য নয় ; কেননা "বালকগণ পরীক্ষা দিবার জন্য এত ব্যস্ত হয় যে, কোন বাধাই তাহাদিগকে সে উৎসাহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না। আমার বিবেচনায় এ কঠোর পরিশ্রম হইতে বালকদের মন যদি

কিয়ৎপরিমাণে রমণীর বিশুদ্ধ প্রেমালাপে ব্যয়িত হয়, তাহা তাহাদের পক্ষে কল্যাণপ্রদ।" (তদেব ; পৃঃ ১৯)

বসন্তের এই যুক্তিও অত্যন্ত দুর্বল। আপাতঃ দৃষ্টিতে যুক্তিটিকে যতই গুরু-গম্ভীর বলে মনে হোক না কেন আসলে তা অন্তঃসারশূন্য।

বিজয়ের অন্য এক বক্তব্যের জবাবে বসন্ত বলেছিল, খুব বেশি বয়সে বিবাহ করা উচিত নয়; ঐ কারণে ইংরেজদের মধ্যে 'ঘোর অত্যাচার' দেখা দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে ঐ দৃষ্টান্তের কোন জোর আছে বলে মনে হয় না।

রক্ষণশীল মন কি দুর্বল যুক্তিতে বাল্যবিবাহ সমর্থন করেছিল তার আরও পরিচয় পাওয়া যায় এই রচনাটিতে। বিজয় বলেছিল, বাল্যবিবাহের ফলে অল্প বয়সে সাংসারিক দায়দায়িত্ব এসে পড়ে বলে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে চাকরীর চেষ্টায় ছেলেদের ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। তার জবাবে বসন্ত এক অদ্ভুত যুক্তি দিয়েছিল। তার কথা. অধিকাংশ শিক্ষার্থীই হলো সম্পন্ন ঘরের। তাছাড়া বাল্যবিবাহে এই বিষয়ে অনেকের সুবিধাও হয়ে থাকে ;—"কন্যার পিতা সম্পন্ন হইলে তিনি তাঁহার জামাতাকে উত্তমরূপে লেখাপড়া শিখাইয়া থাকেন।" (তদেব ; পৃঃ ২১)

দু চারটি ক্ষেত্রে যা হয় বা হতে পারে তার ওপর ভিত্তি করে বসন্তের এই যে সিদ্ধান্ত তা নিতান্তই বাস্তবতা বর্জিত। বসন্তও তা বুঝতে পেরেছিল; কিন্তু বুঝতে পেরে সে যে যুক্তি দিয়েছিল তাও বেদনাদায়ক।

(দ্রঃ তদেব ; পৃঃ ২১-২২)

বিজয় ও বসন্তের মধ্যে কথোপকথনের সময় তাদের অধ্যাপক রামচন্দ্র এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বাল্যবিবাহের সমর্থনে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণও দিয়েছিলেন। রচয়িতা এতক্ষণ বসন্তের মুখে কথা বলেছিলেন, এবার বললেন অধ্যাপকের মুখে —

"...আমাদের বাল্য-বিবাহ-পদ্ধতির সহিত ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রচলিত প্রণালীর তুলনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, হিন্দু সমাজ অনেক অংশে পবিত্র ভাব রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে।"... (তদেব ; পৃঃ ২৪)

তারপর অধ্যাপক বলতে চেয়েছিলেন, বাল্যবিবাহে রমণী ঘটিত ব্যভিচার কম ঘটে; তাছাড়া বাল্যবিবাহের ফলে বাঙ্গালী বীর্যহীন হয়ে পড়েছে সে কথা ঠিক নয়।

রামচন্দ্র শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন, বালক-বালিকার চরিত্র ভালো রাখবার জন্যে 'যৌবনের প্রারম্ভেই পুত্র কন্যার বিবাহ' দেওয়া প্রয়োজন।

আলোচ্য কথোপকথনটিতে প্রাচীনকালে অধিক বয়সের বিবাহে কেন দোষ দেখা দিতো না এবং আধুনিক কালেই বা কেন দোষ দেখা দিয়েছে তা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছিল।

'নবজীবন' ছিল রক্ষণশীল হিন্দুদের একটি বিখ্যাত পত্রিকা। কাজেই ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচ্য কথোপকথনমূলক রচনাটিতে যে রক্ষণশীল সমাজেরই কথা থাকবে তাতে আশ্চর্য কি! 'নবজীবনে' বাল্যবিবাহ বিষয়ে আরও অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

১২৯৪ সালের কার্তিক মাসে 'নবজীবন' পত্রিকার ৪র্থ ভাগ ৪র্থ সংখ্যাতে অক্ষয়কুমার সরকারের 'হিন্দুবিবাহ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল। পত্রিকাটিতে অবশ্য অক্ষয়কুমারের নাম মুদ্রিত হয় নি।

প্রবন্ধটির শীর্ষনাম থেকেই বোঝা যায়, অক্ষয়কুমারের আলোচ্য বিষয় শুধু বাল্যবিবাহ ছিল না; তবে প্রবন্ধটিতে বাল্যবিবাহ বিষয়ে যে বক্তব্য তিনি রেখেছিলেন আমরা শুধু তারই আলোচনা করবো।

অক্ষয়কুমার ছিলেন সংরক্ষণশীল মনোভাবের মানুষ; বাল্যবিবাহকে তাই তিনি অনেকটা অন্ধভাবেই সমর্থন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "...পত্নীকে আপন মহৎ উদ্দেশ্যের অনুগামিনী করিতে হইলে তাঁহার সমস্ত শিক্ষা আপনার হাতে রাখা আবশ্যক একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নিজে শিক্ষিতা নয় এমন বেশি বয়স্কা স্ত্রীলোকের মধ্যে সর্ব্বরকমে ও সকল অবস্থায় ও চির-কালের মতন নিজের অনুগামিনী হইতে পারে, এমন স্ত্রী যে একেবারেই পাওয়া যাইতে পারে না, এমন কথা বলি না। কিন্তু পাইবার সম্ভাবনা বড় কম।"...

(নবজীবন; ১২৯৪, কার্তিক; ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা; পৃঃ ২১০)

বাল্যবিবাহের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে অক্ষয়কুমার বাগাড়ম্বরও কম করেন নি। তিনি বলেছিলেন, বিবাহের একটি আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য আছে। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বিচার করতে গেলে ঐ আধ্যাত্মিকতা ক্ষুণ্ণ হয়। তাঁর কথা, "...উচ্চ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য রক্ষা করিতে হইলে এবং বিবাহ করিয়া সাধারণত সুখ সন্তোষ লাভ করিতে হইলে, বেশি বয়সে নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ না করাই উচিত।" (তদেব; পৃঃ ২১৩)

অক্ষয়কুমারের এই বক্তব্য ওজনে ভারী কিন্তু আসলে মূল্যহীন।

বাল্যবিবাহের বিপক্ষে সেযুগে প্রায় সকলেরই বক্তব্য ছিল, ঐ বিবাহের ফলে শিশুমৃত্যু ঘটে। অক্ষয়কুমার কিন্তু তা' স্বীকার করেন নি। তাঁর বক্তব্য, প্রসূতি-পরিচর্যার অভাবেই শিশুর মৃত্যু ঘটে ও নারীর শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেয়। বাঙ্গালী সন্তান পালন করতে জানে না বলেও অনেক বালক-বালিকার মৃত্যু লক্ষণাক্রান্ত দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। বাঙ্গালীর খাদ্যবস্তুও তার দুর্বলতার কারণ। ব্যায়াম না করা এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে অজ্ঞতা এ দুয়ের জন্যেও শরীর দুবল হয় বলে তিনি জানিয়েছিলেন। শিক্ষা প্রণালীর জন্যেও বাঙ্গালীর দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু অক্ষয়কুমারের এত কথা মূল সমস্যাকে ধামাচাপা দেবার অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। বাল্যবিবাহের ফলে শিশুমৃত্যু ও স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে ঐ বক্তব্যের প্রকৃত জবাব তিনি দিতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাল্যবিবাহ বিষয়ে অক্ষয়কুমারের যে মতভেদ ছিল প্রবন্ধটির শেষভাগে তাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

॥ ৬ ॥

: পণপ্রথা ও কন্যাবিক্রয় বিষয়ক বিতর্করচনা :

কন্যাপণ ও কন্যাবিক্রয় নিয়ে বিগত শতকে বড় আন্দোলন গড়ে তোলা হয় নি; তবে সমস্যা দু'টি সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে তুলবার অভিপ্রায়ে কিছু কিছু পুস্তক ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল।

১২৭১ সালের ১৪ বৈশাখের 'সোমপ্রকাশে' 'কন্যাদায়' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছিল, এদেশে কন্যা জন্মালে মা-বাবার সর্বনাশ ঘটে থাকে। তার কারণ কন্যাপণ। "উচ্চঘরে কন্যা সম্প্রদান না করিলে কুলক্ষয় হইবে এই শঙ্কায় কন্যার পিতা-মাতাকে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও অগত্যা সেই প্রার্থনা পরিপূরণ করিতে হয়।" [সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ-চিত্র (৪র্থ)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ; ১৯৬৬। পৃঃ ২০৬] প্রাবন্ধিক জানিয়েছিলেন, কন্যাপণের জন্যে অযোধ্যায় এক সময় কন্যা হত্যাও চালু হয়েছিল। বাংলা দেশে অবশ্য তা ছিল না।

প্রাচীন ভারতে যে আধুনিক পণপ্রথা চালু ছিল না রচয়িতা সে কথাও বলেছিলেন। সঙ্গতি অনুযায়ী মেয়ের বাপ-মা অলঙ্কারাদিতে সজ্জিত করে কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে দান করবে, শাস্ত্রে সেই নির্দেশই ছিল।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গকন্যাবিক্রয়' নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল।

পুস্তকটির যে কপিটি পাওয়া গিয়েছে তার নামপত্র বা টাইটেল পেজ নেই। লেখকের নাম তাই জানা যায় নি; তবে রচয়িতা যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলেন এবং তিনি যে সুরেন্দ্রনাথকেই তাঁর পুস্তকটি উৎসর্গ করেছিলেন পুস্তকটির উৎসর্গপত্র থেকে তা জানা যায়। পুস্তকটির 'বিজ্ঞাপনে' জানানো হয়েছিল—

"আজ প্রায় দেড় বৎসর হইল, এলাহাবাদের "বৈবাহিক রীতি নিবারিণী" সভার প্রস্তাব অনুসারে এই প্রবন্ধ প্রথম লিখিত হয়। কিন্তু নানা কারণে এতদিন মুদ্রিত হয় নাই। বিবাহকালে একপক্ষ হইতে দানপণ গ্রহণ যে শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ তাহা প্রমাণ করিতে আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছি।"

[বরকন্যাবিক্রয় ("বিজ্ঞাপন" অংশ) ; রচয়িতার নাম অজ্ঞাত ; ১৮৮৩]

পুস্তকটির প্রথমে রচয়িতা পণপ্রথাকে নানা ঘোরতর দুরবস্থার কারণ বলে আক্ষেপ প্রকাশ করে ঐ প্রথার উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস সন্ধান করেছিলেন। তার বিশ্বাস, পণপ্রথা প্রাচীন যুগে ছিল না; পণপ্রথা শাস্ত্র-সম্মতও নয়। মনুও শুল্ক গ্রহণ করে কন্যা বিবাহ সমর্থন করেন নি। যৌতুক অবশ্য প্রচলিত ছিল; তবে তা ছিল কন্যার পিতার ইচ্ছাধীন। আধুনিক পণপ্রথা বলতে যা বোঝায় তা তখন প্রচলিত ছিল না।

রচয়িতা বলেছিলেন, কৌলীন্য প্রথার সঙ্গে পণপ্রথার সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, সমাজে একসময় কুলীন পাত্রের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল; সেই চাহিদারই ফল এই পণপ্রথা। কুলীন কন্যারও বেশ চাহিদা ছিল তখন এক শ্রেণীর কুলীনদের মধ্যে। তার ফলেও সমাজে আর এক ধরণের পণ নেওয়া চালু হয়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে লেখক বলেছিলেন, "অনেক বংশজ পাত্রের বিবাহ হওয়া দুর্ঘট হইত, অপরিমিত ব্যয় করিয়াও এই ঠাকুরদের ঠাকরুণ প্রাপ্ত হওয়া দুঃসাধ্য হইত। পিতৃপিতামহের বহু কষ্টে সঞ্চিত ধন ব্যয় করিয়া পৈতৃক নিষ্কর জমি বিক্রয় করিয়াও যদি একটি স্ত্রীলোকের পাণি গ্রহণ করিতে পারিতেন তবে তাহাতেও তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইতেন না।"

(তদেব ; পৃঃ ১৬)

লেখক অবশ্য জানিয়েছিলেন, নিম্ন জাতির মধ্যেই এই কন্যা শুল্কের আধিক্য ছিল। শিক্ষিত পাত্রের পিতারা কন্যার পিতাদের কাছ থেকে কি ভাবে পণ গ্রহণ করতো তাও তিনি লিখেছিলেন।

লেখক পণপ্রথার পূর্ণ বিলোপই চেয়েছিলেন; তবে তা' নিতান্ত সম্ভবপর

না হলে তাকে নিয়ন্ত্রিত করবার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমরা আধুনিক কুলীনকে পণ সমেত কন্যাদান অপেক্ষা বিদ্বান্ পাত্রকে সালঙ্কৃতা কন্যাদানের পক্ষপাতী। কিন্তু আমাদের মতে এ প্রকার পণ সাধ্যায়ও হওয়া আবশ্যক।" (তদেব; পৃঃ ২৯) তিনি জানতেন, পণ নেওয়ায় পাপ রয়েছে; যারা পণ নেয়, শাস্ত্ররচয়িতারা তাদের অপত্য বিক্রয়কারী রূপেই অভিহিত করেছেন। "কিন্তু তথাপি যদি কিছুতেই হিন্দু সমাজ এই পণ গ্রহণ প্রথা উঠাইয়া দিতে প্রস্তুত না হন, তবে আমাদের মতে পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথার অনুবর্ত্তী হওয়া বিধেয়।" (তদেব; পৃঃ ৩০)

পণপ্রথা দূরীকরণের জন্যে তিনি শিক্ষিত যুবকদের কাছে আবেদনও জানিয়েছিলেন। বিবাহে পণ না নেবার জন্যে তিনি তাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে বলেছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছেও তিনি এক আবেদন জানিয়েছিলেন। বক্তব্যের অভিনবত্বের জন্যে ঐ আবেদনের কিয়দংশ উদ্ধার করছি—

"আপনারা আমাদের বিবাহে পুরোহিত; বলুন দেখি, যে বিবাহে এই প্রকার পণগ্রহণের প্রথা আছে, সেখানে কন্যা বা পুত্রের অভিভাবকেরা এইপ্রকার বলপূর্ব্বক অপর পক্ষ হইতে অর্থ গ্রহণ করেন, সে বিবাহকে আপনারা কি প্রকারে ব্রাহ্মবিবাহ বলিতে পারেন?···

"···আজ যদি আপনারাই গম্ভীর নিনাদে এই ঘোষণা করেন, আজ যদি এই প্রথার মূলোচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত আপনারাই অগ্রসর হয়েন, তবেই হিন্দু সমাজের পরিত্রাণ, তবেই আমাদের দেশে মঙ্গল।"······

(তদেব; পৃঃ ৪২—৪৪)

১২৯১ বঙ্গাব্দ, ১০ আষাঢ়ের ৩২ সংখ্যা 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত 'বঙ্গদেশে পুত্র বিক্রয়' শীর্ষক রচনায় পণপ্রথার বিরোধিতা করা হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধে বলা হয়েছিল, মনুকথিত আসুর বিবাহেই পণ গ্রহণ করা হয়—ঐ বিবাহ প্রশংসাহ নয়। আমাদের দেশে ঐ আসুর বিবাহই বহুদিন থেকে চলে আসছে।

প্রাবন্ধিক বলেছিলেন, লেখাপড়া শেখা ছেলের বাবার অহংকার অত্যন্ত বেশি; কন্যাপক্ষের কাছে তার ছেলের চাহিদা থাকায় অতিরিক্ত মাত্রায় পণ চাইতে তার কুণ্ঠা থাকে না। প্রাবন্ধিক ঐ অবস্থায় খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কন্যাপক্ষকে পীড়ন করলে বরপক্ষকে সামাজিক দণ্ড দেওয়া উচিত;—তাকে একঘরে করা উচিত।

১২৯২ বঙ্গাব্দে ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 'সমাজদীপিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত

'পুত্র বিক্রয়' শীর্ষক প্রবন্ধটিতেও পণপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছিল। প্রাবন্ধিক সেখানে পণপ্রথার বেদনাদায়ক পরিস্থিতি বর্ণনা করে ঐ প্রথা বিলোপে দেশের মানুষকে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রয়োজনবোধে দেশবাসীকে রাজদ্বারে আশ্রয় নেবার কথাও তিনি বলেছিলেন।

১২৯৪ বঙ্গাব্দে ৩য় সংখ্যা 'হিতসাধক' পত্রিকায় সিদ্ধেশ্বর রায়ের 'কন্যাভার' নামে একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল। সিদ্ধেশ্বর রায় পণপ্রথার ভয়ঙ্কর কুফল বিশ্লেষণ করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছিলেন, অর্থহীনতার জন্যে কন্যার বিবাহ না হলে সমাজই কলুষিত হয়ে পড়বে। তাছাড়া অর্থহীনতার জন্যে পিতা তার কন্যাকে অনেক সময় অযোগ্য বা নিম্নবংশীয় পাত্রে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। প্রাবন্ধিক নিম্নবংশে কন্যাদানকে সামাজিক অনিষ্টের কারণ বলে মনে করেছিলেন।

পণপ্রথা নিবারণের পন্থা নির্ণয়ে সিদ্ধেশ্বর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "…প্রতি সহরে বা গ্রামে অথবা কয়েকটি সহর বা গ্রাম একত্রিত হইয়া এক একটি করিয়া সমিতি সংস্থাপন করিবেন এবং সমিতির অন্তর্গত ব্যক্তিগণ এইরূপ স্বীকার করিবেন যে, তাঁহারা বিনা ব্যয় বাহুল্যে পরস্পর কন্যাপুত্রের আদান-প্রদান করিবেন।… এই প্রকার ক্ষুদ্রক্ষুদ্র কেন্দ্র হইতে আরম্ভ হইয়া এই মহৎ উদ্দেশ্য ক্রমে সমস্ত সমাজে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পারিবে, আমাদিগের এমত বিশ্বাস আছে।" (হিতসাধক : ১২৯৪; ৩য় সংখ্যা, ৪র্থ ভাগ)

এই প্রসঙ্গে তিনি সংবাদপত্রাদিকেও পণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও মতামত প্রকাশ করার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

কন্যাপণের আলোচনা প্রসঙ্গে কন্যাবিক্রয়ের কথাও এসে যায়। এই বিষয় নিয়েও প্রবন্ধাদি রচিত হয়েছিল সে যুগে।

১২৭৪ সালে 'হিতসাধক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আসুরবিবাহ—কন্যাবিক্রয়' নামে একটি প্রবন্ধে কন্যা বিক্রয়ের তীব্র নিন্দা করা হয়েছিল। প্রাবন্ধিক কন্যাবিক্রয়কে অশাস্ত্রীয় বলে অভিহিত করেছিলন। ঐ প্রথার সামাজিক দোষও তিনি তুলে ধরেছিলেন। প্রথাটি বাল্যবিবাহের কারণ হতে পারে বলেও তাঁর মনে হয়েছিল। তিনি আরও বলেছিলেন—

"অপত্যবিক্রয়ী ব্যক্তি সচরাচর নিজকন্যাকে নিতান্ত অপাত্রে বিন্যস্ত করিয়া তাহাকে চিরদুঃখিনী করে এবং তাহার ব্যভিচারদোষের সূত্রপাত করিয়া দেয়।" (হিতসাধক ; ১ম খণ্ড, ১২৭৪, ফাল্গুন, ২য় সংখ্যা)

প্রবন্ধকার কন্যাবিক্রয় রীতিকে বৈধব্যের কারণও বলেছিলেন। অধিক পণ দিয়ে কন্যা ক্রয় করে বৃদ্ধ ব্যক্তি যদি তাকে বিবাহ করে তাহলে ঐ কন্যার বৈধব্য ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

তিনি আরও বলেছিলেন, কন্যাবিক্রয়কারীর প্রতি তার জামাতার শ্রদ্ধাও থাকে না। তাছাড়া কন্যাবিক্রয়কারী তার কন্যাকে সুশিক্ষা দেয় না,—বাল্য-বিবাহের জন্যে শিক্ষা দেবার সুযোগও পায় না। ঐ কন্যা তাই সংসারে সুখদা স্ত্রী হতে পারে না। কন্যাবিক্রয় রীতির জন্যে ধনাভাবে অনেক ব্যক্তি কন্যা ক্রয় করে বিবাহ করতে পারে না; তাদের বংশধারা তাই বজায় থাকে না। অন্যদিকে অর্থ থাকার জন্যে পঙ্গু বা অযোগ্য পাত্রও পরমাসুন্দরী রমণীর পতি হয়ে থাকে। প্রাবন্ধিক সব শেষে বলেছিলেন, কন্যাক্রয়প্রথা দেশের বহুলোকের শিক্ষা ও অন্যবিধ গুণ অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে।

১৮০৭ শকাব্দে 'শ্রীরাম সর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত' 'হিন্দু বিবাহ ও কন্যা বিক্রয়' রচনাটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রচনাটিতে বিবাহ বলতে কি বোঝায়, পতি-পত্নীর লক্ষণই বা কি, বিবাহের প্রয়োজন কেন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে রচয়িতা বলেছিলেন, কন্যা বিক্রয় অত্যন্ত দোষের। মনুর মত (৩অধ্যায় ৫১ শ্লোক) উদ্ধার করে তিনি দেখিয়েছিলেন, কন্যার পিতা লোভে পড়ে সামান্য শুল্ক গ্রহণ করেও যদি কন্যা সম্প্রদান করেন তাহলেও তিনি অপত্যবিক্রয়ীর পর্যায়ে পড়বেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কন্যাবিক্রয়কারী পিতার নানা শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অবশ্য আর্যবিবাহে শুল্কগ্রহণ যে একেবারে নিষিদ্ধ তাও নয়; তবে সে শুল্ক হলো 'গোমিথুন'।

শুধু শাস্ত্র নয়, যুক্তির দ্বারাও তিনি কন্যাবিক্রয়কে নিন্দনীয় প্রতিপন্ন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অর্থের দিকে অভিভাবকের দৃষ্টি থাকে বলে "বরকন্যার ইচ্ছা রুচি কি সুবিধা অসুবিধা সুখ দুঃখের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না। এইটী মহৎ অনিষ্টের কারণ হইয়া পড়ে। বিবাহে যত দোষ আছে কিংবা ঘটিতে পারে সে সমুদয় এই পণ গ্রহণের দ্বারাই ঘটিয়া থাকে।" [হিন্দুবিবাহ ও কন্যাবিক্রয় (লেখকের নাম অজ্ঞাত) ; ১৮০৭ শকাব্দ, পৃঃ ৪৪]

পুস্তক রচয়িতা পুত্র-শুল্ক গ্রহণেও কোন যুক্তি খুঁজে পান নি। তিনি বলেছিলেন, "বরের নিকট অর্থ লইয়া কন্যা বিক্রয়ও যা কন্যার পিতা মাতার নিকট অর্থ লইয়া পুত্রের বিবাহ দেওয়াও তা।" (তদেব পৃঃ ৪৭) কেননা দুইক্ষেত্রেই 'প্রকৃত বিবাহ হইবার বাধা' থেকেই যায়। তিনি বলেছিলেন,

প্রকৃত বিবাহ নিষ্পন্ন হবার অনুকূলে যা অন্তরায় স্বরূপ "তাহাই দোষ"। অতএব সমাজে তা' নিষিদ্ধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দেশবাসীকে তাই তিনি ঐ প্রথা বিদূরণে বদ্ধপরিকর হবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

পণপ্রথা ও কন্যাবিক্রয় সম্বন্ধে খুব একটা লেখালেখি সে যুগে হয় নি; তবে যে সব রচনা হাতে এসেছে, বাংলা বিতর্করচনার ইতিহাসে সেগুলি নঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

॥ ৭ ॥

ঃঃ মদ্যপান সংক্রান্ত বিতর্করচনা ঃঃ

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। মদ্যপান সংক্রান্ত বিতর্করচনার আলোচনায় ঐ পত্রটির একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পত্রটির রচয়িতা 'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি' রামমোহনকে কটাক্ষ করে চারটি প্রশ্ন করেছিলেন। তাদের একটি—

"অনেক বিশিষ্ট সন্তান যৌবনধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া লোক লজ্জা ধর্ম্ম ভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল দুষ্কর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে তত্তৎ কর্ম্মানুষ্ঠাতৃ মহাশয়েরদিগের কালিকাপুরাণ মৎস্যপুরাণ মনুবচনানুসারে কি বক্তব্য।"

[সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম ; ৩য় সংস্করণ) —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত . পৃঃ ৩২৭]

রামমোহন ঐ পত্রলেখকের চারটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন তাঁর 'চারি-প্রশ্নের উত্তর' (১৮২২) গ্রন্থটিতে। গ্রন্থটিতে, বলাবাহুল্য, মদ্যপান সংক্রান্ত আলোচনাও ছিল। ঐ আলোচনারই মধ্যে দিয়ে বাংলাভাষায় যথার্থ মদ্যপান সংক্রান্ত বিতর্করচনার সূত্রপাত ঘটেছিল।

"ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি" তাঁর প্রশ্নে যে মনুবচন উদ্ধার করেছিলেন তার নির্গলিত অর্থ হলো, মোহবশতঃ সুরাপান অত্যন্ত গর্হিত ; সুরাপানে ব্রহ্মহত্যা পাতক হতে হয় ; সুরাপান করলে ব্রাহ্মণত্ব হারাতে হয়।

রামমোহন 'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি' উদ্ধৃত বচনের বক্তব্য অস্বীকার করেন নি ; তবে তিনি বলেছিলেন, সামান্যভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মদ্যপানের বিধিও রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি বলেছিলেন,

সৌত্রামনী যজ্ঞে সুরাপানের বিধি আছে। মনুরও মত, প্রবৃত্তি জন্মালে বিহিত মদ্যপান করা অন্যায়ের বিষয় নয়। কুলার্ণব এবং মহানির্বাণ তন্ত্র থেকেও তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃতি আহরণ করেছিলেন। রামমোহন নানা শাস্ত্র বচনের আলোকে দেখিয়েছিলেন, বিহিত মদ্যপান আদৌ নিন্দনীয় নয়। তাছাড়া 'আপন২ উপাসনানুসারে সংস্কৃত ও পরিমিত মদ্যপান'ও বিধিসম্মত।

রামমোহন তাঁর 'চারিপ্রশ্নের উত্তর' গ্রন্থে 'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি'র সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছিলেন ; কিন্তু 'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি' ঐ উত্তরের কোনটিতেই সন্তুষ্ট হন নি। 'পাষণ্ডপীডন' (১৮২৩) গ্রন্থে তাই তিনি 'চারিপ্রশ্নের উত্তর' গ্রন্থের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। গ্রন্থটিতে রামমোহনকে খুব অশালীন ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছিল। রামমোহন ঐ 'পাষণ্ডপীডন'-এরও জবাব দিয়েছিলেন ;—জবাব দিয়েছিলেন 'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থে। তবে 'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি' তার আর জবাব দেন নি।

রামমোহন তাঁর পুস্তকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মদ্যপান বিধিসম্মত এই বক্তব্যের পক্ষে দৃষ্টান্ত হিসেবে সৌত্রামণী যজ্ঞের উল্লেখ করায় 'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি' তাকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—

"ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী মহাশয় সৌত্রামণী যজ্ঞে সুরাপানে এক শ্রুতিকে প্রমাণ রূপে দর্শন করান, তাহাতে এই বোধ হইতেছে, যে তাহারা সর্ব্বদাই সুরাপানার্থে সৌত্রামনী যজ্ঞ মাত্র করিয়া সুরাপান করিয়া থাকেন,"…

[রামমোহন-গ্রন্থাবলী (৬ষ্ঠ) ; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত, ১৩৬২। পৃঃ ৬৯]

কিন্তু রামমোহনের বক্তব্য থেকে এমন অনুমান করা কোন মতেই সম্ভবপর নয় ; কাজেই 'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি'র এই জবাবে তার বিদ্বিষ্ট মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

বিহিত মদ্যপানে দোষ নেই ; তাছাড়া উপাসনা ভেদে সংস্কৃত মদ্যপানও ব্রাহ্মণের পক্ষে অবিধেয় নয়। রামমোহনের এই বক্তব্যের জবাবে 'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি' নিয়ম আর বিধির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে বলেছিলেন, মদ্যপান সংক্রান্ত শাস্ত্র বিধি নয়—নিয়ম মাত্র। "তাহার উল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রে দোষ শ্রবণ প্রযুক্ত নিষিদ্ধকালে ভোজনে ও পানে তদ্দ্রব্যের আঘ্রাণ মাত্র বিহিত হয়। অতএব কলিযুগে মদ্যপানে নিষেধ দর্শনে যে২ স্থানে মদ্যপান নিয়ম আছে, সে সকল স্থানে মদ্যের আঘ্রাণ গ্রহণই যুক্তিসিদ্ধ হয়,"… (তদেব ; পৃঃ ৬৯)

রামমোহন ঐ যুক্তি মানেন নি। তাঁর কথা "যেহেতু পুরুষের ইচ্ছাপ্রাপ্ত মদ্য মাংসাদি ভোজন বটে, তাহার পান ভোজন উদ্দেশ্যে সংস্কারাদি বিধি কহিয়া নিয়ম করিয়াছেন, অতএব ব্যক্তির রাগ প্রাপ্ত ঋতুকালীন ভার্য্যাগমনের আবশ্যকতার ন্যায় অধিকারিবিশেষের সংস্কৃত মদিরা পানে আবশ্যকতা রহিল।"

(তদেব ; পৃঃ ১৬০)

রামমোহনের এই যুক্তি অকাট্য। যা পুরুষের 'ইচ্ছাপ্রাপ্ত' তা পাবার জন্যে যে শাস্ত্র তাই-ই নিয়ম। মদ্য-মাংস ভোজন পুরুষের 'ইচ্ছাপ্রাপ্ত' ; তাকে পাবার জন্যেও শাস্ত্র রয়েছে। রামমোহন বলেছিলেন, সংস্কৃত মদ্যপানের (বা বিহিত মাংস ভোজনের) শাস্ত্র রয়েছে ; এবং নিজ নিজ উপাসনাভেদে ব্রাহ্মণ যে তা গ্রহণ করতে পারে সে শাস্ত্রও আছে। একে বিধি না বলে 'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি'র ভাষায় যদি 'নিয়ম'ই বলা হয়, তা হলেও বলতে হয়, ঐ নিয়ম মানবার জন্যেই সংস্কৃত মদ্যপানে কলিযুগে কোন বাধা থাকতে পারে না। শুধু 'আঘ্রাণ গ্রহণই যুক্তিসিদ্ধ' এই মতের অসারতাও তিনি খণ্ডন করেছিলেন এইভাবে।

রামমোহনের বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে 'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি' বলেছিলেন, পুরাণাদি ও তন্ত্রে রয়েছে, কলিযুগে চারি বর্ণেরই 'মদ্য অদেয়, অপেয় ও অগ্রাহ্য হয়'…এই কারণে মদ্যপান সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় নির্দেশ সব সত্যযুগেই প্রযোজ্য। রামমোহন যুক্তি ও তথ্যদ্বারা এই বক্তব্যও খণ্ডন করেছিলেন।

'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি' 'পাষণ্ডপীড়ন' গ্রন্থে আরও বলেছিলেন, কলিযুগে মদ্য নিষিদ্ধ হবার জন্যে নতুন ও পুরনো শাস্ত্রকারেরা মদ্যের স্থলে তার প্রতি-ভূ স্থানীয় দ্রব্যও নিষিদ্ধ করেছিলেন।

রামমোহন 'পথ্যপ্রদানে' তার জবাব দিতে গিয়ে বলেছিলেন —

"পশ্বাদি অধিকারে মদিরা পানের নিষেধ প্রযুক্ত তৎপ্রতিনিধির নিষেধও অবশ্যই যুক্ত হয়, সুতরাং গ্রন্থকারেরা এ অধিকারে প্রতিনিধির নিষেধ করিতেই পারেন, কিন্তু সেইরূপ সর্ব্বজন মান্য অন্য২ গ্রন্থকারেরা পশ্বাদি ভিন্ন অধিকারে বিহিত মদ্যের গ্রাহ্যত্ব ও তদ্ভাবে তাহার প্রতিনিধি দান এরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন, অতএব অধিকারিভেদে উভয়ের মীমাংসা অবশ্য কর্ত্তব্য হয়।"

(তদেব , পৃঃ ১৬১)

রামমোহন 'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি'র অপর এক অভিযোগের উত্তরে মনু-বচনানুসারে বলেছিলেন, মদ্যপান যেখানে বিহিত সেখানে তা' দোষাবহ নয়।

বিহিত মদ্যও যদি পান না করা যায় তাহলে মাংস বর্জন জনিত স্বর্গ লাভ হয় ; কিন্তু বর্জ্জন না করলে তা যে দোষের হবে তা সত্য নয়।

রামমোহন 'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি'র বক্তব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে কুলার্ণবতন্ত্রবচন উদ্ধার করে আরও বলেছিলেন, বীরদের পক্ষে মদ্যপান 'মহাফলজনক'। 'কুলার্চ্চন দীপিকা' রচয়িতার বচনের সাহায্যেও তিনি বলেছিলেন, ব্রাহ্মণের সুরাপান নিষিদ্ধ নয়। তবে অভিষিক্ত ব্রাহ্মণই মদ্যপানে অধিকারী। রামমোহন খুব বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন, মহানির্বাণতন্ত্র ছাড়াও আরও অনেক শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ব্রাহ্মণের মদ্যপানের কথা বলা হয়েছে।

'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি' 'পাষণ্ডপীড়নে' বলেছিলেন, রামমোহন 'কুলার্ণবাদি তন্ত্রমাত্র দর্শন করিয়া' 'শাস্ত্রান্তরে' না গিয়েই কলিযুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপান স্বীকার করে নিয়েছিলেন ; কিন্তু তিনি দেখেন নি—

"ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ অধিকার করিয়া কালীবিলাসতন্ত্রে মহাদেব কলিযুগে মদ্য শোধনের নিষেধ করিয়াছেন।" (তদেব ; পৃঃ ৭৩)

তাঁর মতে 'কালীবিলাসতন্ত্র' অনুসারে কলিযুগে মদ্য শোধন করা যায় না ; এজন্যে মদ্যপানও এই যুগে প্রশস্ত নয়।

রামমোহন এর জবাবেও বলেছিলেন, কলিযুগে শোধিত শাস্ত্রসম্মত পরিমিত মদ্যপানে কোন বাধা নেই। কলিতে মদ্য শোধনও পাপের নয় ; তবে সকলেই মদ্য শোধন করতে পারে না। রামমোহন নানা শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করে এ কথাও প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন, স্মৃতিতে মদ্যপান সাধারণ ভাবে নিষিদ্ধ হলেও বিশেষ ক্ষেত্রে দেবতা বিশেষের উদ্দেশে 'সংস্কার বিশেষে' তন্ত্রশাস্ত্রে মদ্য মাংস পান ভোজনের যে বিধান দেওয়া হয়েছে তা আদৌ স্মৃতিশাস্ত্রের বিরোধী নয়।

'ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি' এবং রামমোহনের মধ্যে মদ্যপান বিষয়ে আরও যুক্তিবিনিময় হয়েছিল ;—কিন্তু উভয়ের মূল বক্তব্য ছিল ঐ একই।

মদ্যপান বিষয়ে রামমোহন আরও একজনের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি হলেন 'জনৈক কায়স্থ'। ১৮২৬ সালে প্রকাশিত 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার' নামক একটি ক্ষুদ্র পত্রিকাতে (Leatlet) ঐ কায়স্থের বক্তব্যের বিরুদ্ধে রামমোহন বলেছিলেন, কোনটি ধর্ম আর কোনটি অধর্ম তা শাস্ত্রই নির্দ্ধারণ করে থাকে। খাদ্যাখাদ্যের বিচারেও শাস্ত্রকেই প্রমাণ

মানতে হবে। রামমোহন বলেছিলেন, শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে দেখা যায়, শূদ্রের মদ্যপানে কোন অধর্মই হতে পারে না। এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি মনুবচন, বৃহদ্‌যাজ্ঞবল্ক্য বচন, মিত-ক্ষরা ও প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক-বাক্য উদ্ধার করেছিলেন; এবং এও বলেছিলেন, ঐ শাস্ত্রীয় নির্দেশ মান্য করাই সঙ্গত অর্থাৎ শূদ্রের মদ্যপান করাই শাস্ত্রসম্মত; ঐ শাস্ত্রীয় নির্দেশ অমান্য করা ধর্মসম্মত নয়।

১৭৭২ শকাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় 'পান দোষ' শীর্ষক একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। ওখানে বলা হয়েছিল, প্রাচীনকালে হিন্দুরাজাদের আমলে মদ্যপান জনিত কুফলের আধিক্য ঘটে নি; সুসভ্য ইংরেজ শাসনেই মদ্যপান দেশে ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। প্রাবন্ধিক অবশ্য মদ্যপানের আধিক্যের জন্যে দেশের রাজা-প্রজা উভয়কেই দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন; তবে তিনি মনে করতেন, দেশ থেকে পানদোষ দূর করতে হলে রাজাকেই এগিয়ে আসতে হবে; কিন্তু অর্থের জন্যে রাজাই মদ্যব্যবসায়ের প্রশ্রয়দাতা হওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে ঐ বিষয়ে আরও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৭৭৪ শকের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'সুরাপান' শীর্ষক প্রবন্ধটি তাদেরই অন্যতম। ঐখানেও ইংরাজ সরকারের মদ্যবিক্রয় প্রচেষ্টাকে নিন্দা করা হয়েছিল।

মদ্যপান নিবারণী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা প্যারীচরণ সরকার 'মাদকসেবন' নামে একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। ১২৭৫ বঙ্গাব্দে 'হিতসাধক' (১ম খণ্ড, বৈশাখ) পত্রিকায় ঐ প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়েছিল। পত্রিকাটিতে প্রবন্ধরচয়িতা রূপে প্যারীচরণের নাম প্রকাশিত হয় নি; কিন্তু তাঁর জীবনীকার নবকৃষ্ণ ঘোষ 'প্যারীচরণ সরকার' (১৮৭৯) গ্রন্থে মদ্যপান বিষয়ে প্যারীচরণের বক্তব্য উদ্ধার করতে গিয়ে ঐ প্রবন্ধেরই অংশ বিশেষ উদ্ধার করেছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায়, প্রবন্ধটি প্যারীচরণেরই রচনা।

প্যারীচরণ তাঁর প্রবন্ধটিতে বলেছিলেন, প্রাচীনকালে আমাদের দেশে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার কোন কোন ক্ষেত্রে চালু ছিল; তবে 'মনুর সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে ভদ্রশ্রেণীস্থ ব্যক্তিরা সুরাপান করিত কিনা, তাহার মীমাংসা করা দুঃসাধ্য।' (হিতসাধক—১ম খণ্ড, ১২৭৫, বৈশাখ, পৃঃ ৭৫) প্যারীচরণ অবশ্য মনে করেছিলেন, ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে তখন সুরাপান নিষিদ্ধই ছিল। নিম্নশ্রেণীর

কোন কোন মানুষই তখন সুরাপান করতো। 'কিন্তু কোন জাতির মধ্যেই মাদক দ্রব্যাদির ব্যবহার সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল না।' (তদেব ; পৃঃ ৭৬)

প্যারীচরণের মতে মাদকদ্রব্যের মধ্যে সুরাপানেই ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক। তিনি 'মদ্যের মূল পদার্থ' অ্যালকোহলের প্রকৃতি উল্লেখ করে মদ্যের ক্ষতিকর দিকটি তুলে ধরেছিলেন।

প্যারীচরণ বলেছিলেন, মদ্যপান অশাস্ত্রীয়। কয়েকটি শাস্ত্রীয় বচন আলোচনা করেই তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। শুধু তাইই নয়, মদ্যপায়ীরা মদ্যপানের পক্ষে কি যুক্তি দিতে পারে তা অনুমান করে তিনি সেই সব যুক্তিও খণ্ডন করেছিলেন। প্যারীচরণ বলেছিলেন, অনেক মদ্যপ্রেমী বলতে পারে, মনুর সময়ের জলবায়ুর ও দেশবাসীর দৈহিক-মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, সুতরাং সে যুগে প্রযোজ্য সুরাপান বিরোধী মনুবচন আজকের দিনে মান্য হতে পারে না। প্যারীচরণ এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলেছিলেন, "বস্তুতঃ সুরাপান কোন কালেই বা কোন অবস্থাতেই প্রয়োজনীয় হওয়া অথবা উহা দ্বারা স্বাস্থ্য কিম্বা আয়ুর আধিক্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ;...কেবল দুই চারিটা উৎকট পীড়ার অবস্থায় অল্প পরিমাণে দুই চারি দিবস মাত্র ঔষধরূপে ব্যবহার করিলে, উহা দ্বারা শরীরের উপকার জন্মিতে পারে ; তদ্ভিন্ন সকল অবস্থাতেই সুরা অপকার জনক।" (তদেব ; পৃঃ ১০৩)

প্যারীচরণ এই প্রসঙ্গে আরও বলেছিলেন, মদ্যপানের যে অনিষ্টকারিতা তখন সমাজে দেখা দিয়েছিল তা থেকেই বোঝা যায় 'মদ্য বিষতুল্য।' ঐ প্রত্যক্ষ অনিষ্টকারিতা "সপ্রমাণ করিবার জন্য কোন শাস্ত্রের বচন অথবা কোন জাতিরই ব্যবহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।" (তদেব, পৃঃ ১০৪)

প্যারীচরণের এই বক্তব্য অত্যন্ত বলিষ্ঠ। এর বিরোধিতা করার কোন যুক্তি ছিল বলে মনে হয় না।

প্যারীচরণ সরকার পরিমিত মদ্যপানেরও ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পরিমিত পান প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আর পরিমিত পান থাকে না। তাছাড়া কতটুকু পান করলে পরিমিত পান হবে তা নির্ধারিত হবে কি ভাবে!

বিগত শতকে লিখিতভাবে একমাত্র রামমোহনই পরিমিত বা বিহিত বা সংস্কৃত মদ্যপানের পক্ষে বক্তব্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন ; কিন্তু তারপরে আর কেউই তা করেন নি। অন্ততঃ মদ্যপান সংক্রান্ত যে কটি রচনা পাওয়া গিয়েছে তাদের কোনটির মধ্যেই তা দেখা যায় না।

ভুবনেশ্বর মিত্রও মদ্যপানের বিরুদ্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর 'মদিরা' শীর্ষক এই গ্রন্থটি 'আশালতা' (Band of Hope)-র পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৭ বঙ্গাব্দে। ভুবনেশ্বর জানিয়েছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থটি হ্যারিসন সাহেবের যত্নে প্রতিষ্ঠিত সুরাপান নিবারণী সভার কোন এক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার সংস্কৃত রূপ। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ঐ অধিবেশনের সভাপতি। পুস্তকটিতে আলোচ্য বিষয় বিভক্ত হয়েছিল নিম্নলিখিত শিরোনামে—"মদিরার সূত্রনির্দ্দেশ ও প্রবন্ধস্থ অন্যান্য বিষয়ের শীর্ষবিভাগ; মদিরার উৎপত্তি, মনুষ্য কর্ত্তৃক সেবন, উত্তরোত্তর সংস্কার এবং জনসমাজে বিস্তৃতি; মদিরার প্রকারভেদ; মদিরার উপাদান; মদিরার বিকার; মদিরার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পদার্থ থাকায় উহা মদকর হয়, তাহার রাসায়নিক তত্ত্ব এবং মদিরা বিশেষে তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ; মনুষ্যদেহে মদিরার প্রভাব; সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় মদিরার প্রয়োজনীয়তা; সমাজে, বিশেষতঃ হিন্দুসমাজে মদিরার স্থল; উপসংহার।" [মদিরা—ভুবনেশ্বর মিত্র; ১২৮৭। দ্রঃ সূচীপত্র]

ভুবনেশ্বর মিত্রও পরিমিত পানের বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "সুস্থ অবস্থায় অতিমাত্রায় মদিরা সেবনের ত কথাই নাই, অল্প পরিমাণে (যাহাকে অনেকেই পরিমিত পরিমাণ বলিয়া থাকেন) সেবনের অভ্যাস করিলে শরীরের স্থায়িরূপ বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে।"

(তদেব ; পৃঃ ৬৯-৭০)

ভুবনেশ্বর মিত্র দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছিলেন, সাধারণ ভাবে সুস্থ বা অসুস্থ কোন অবস্থাতেই মদ্যপান স্বাস্থ্যপ্রদ নয়। মদ্যপান পরিশ্রমের সহায়ক বলে অনেকে বলে থাকেন; ভুবনেশ্বর তাও মানেন নি। মদ্যপানে শীতনিবারিত হয় সে যুক্তিও তিনি খণ্ডন করেছিলেন।

ভুবনেশ্বর মিত্র মদ্যপান নিবারণের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেই ব্যাপারে রাজশাসনই কাম্য বলে মনে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ঔষধরূপে সেবন ভিন্ন মদ্যপান নিষিদ্ধ করলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হবে সত্য কিন্তু সমাজের তাতে উন্নতিই ঘটবে। তাঁর বক্তব্য, "বর্ত্তমান উদার গবর্ণমেণ্ট মনে করিলে এই সামান্যক্ষতি স্বীকার অথবা উহার পূরণের অন্যবিধ সাধু উপায় অবলম্বন করিয়া বহু অনিষ্টের আকর এই মদিরাকে ভারত হইতে, অন্ততঃ হিন্দুসমাজ হইতে অক্লেশে দূর করিতে পারেন।" (তদেব ; পৃঃ ১৩৩-১৩৪)

মদ্যপানের বিরুদ্ধে তিনি জনগণের কাছেও আবেদন জানিয়েছিলেন।

ভুবনেশ্বর মিত্র তাঁর পুস্তকে বহু তথ্য পরিবেশন করেছিলেন এবং বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে যুক্তিপূর্ণভাবে মদ্যপানের ক্ষতিকর দিকটির চিত্র তুলে ধরেছিলেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মদ্যপানের বিরুদ্ধে 'সুরাপান বা বিষপান' নামে একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির টাইটেল পেজে লেখকের নাম নেই; শুধু লেখা আছে 'কলিকাতা আশাদলের জনৈক সভ্য কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত'। ইংরেজিতে অবশ্য 'প্রণীত' শব্দের স্থলে 'এডিটেড' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। বইটির ভূমিকায় জ্ঞানচন্দ্র বসাক জানিয়েছিলেন, আলোচ্য পুস্তকের 'স্থূল মর্ম্ম লইয়া ক্ষুদ্র আকারের এক পুস্তিকা' তিনি পরে সুলভ মূল্যে বিক্রয় করবেন। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকটিতে কোন কোন বিষয় সংযোজিত হবে তাও তিনি জানিয়েছিলেন। 'পরম শ্রদ্ধাস্পদ মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় শ্রীচরণেষু'। তিনিই পুস্তকটি উৎসর্গ করেছিলেন। এই সব কারণে সিদ্ধান্ত করা যায়, জ্ঞানচন্দ্র বসাকই ছিলেন পুস্তকটির রচয়িতা।

'সুরাপান বা বিষপানে'র বিষয় সূচী নিম্নরূপ—

"সুরাপানের সাধারণ ক্ষতি; সুরা ও সুরাপান সম্বন্ধে কতকগুলি কথা; মদ্যপানের ক্ষতির হিসাব; সুরাপানের ক্ষতির কতকগুলি দৃষ্টান্ত; পরিমিত পানও ভাল নয়; সুরা ব্যবসায় বন্ধ করা গভর্ণমেন্টের উচিত; সুরাপান নিবারণের চেষ্টা ও তাহার ফল; সুরাপান নিবারণের উপায়; প্রতিজ্ঞাপত্রের বিষয়; সুরাপানের বিরুদ্ধে মত; সুরাপান-নিবারিণী কবিতা ও সঙ্গীত; বঙ্গবাসিগণের নিকট নিবেদন; সুরাপান সম্বন্ধে কতকগুলি মনোহর ও প্রয়োজনীয় পুস্তক, পুস্তিকা, চিত্র ও সংবাদ পত্রের তালিকা।" [সুরাপান বা বিষপান—জ্ঞানচন্দ্র বসাক; ১৮৮৮। দ্রঃ সূচীপত্র]

জ্ঞানচন্দ্র বসাকও পরিমিত পানের বিরোধী ছিলেন। নানা যুক্তি দিয়ে তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন, পরিমিত পানও পরিত্যাজ্য। তিনি বলেছিলেন, "কেহ সুরার দাসত্ব করিবার জন্য মদ খায় না; কিন্তু পরিমিত পায়ীই ক্রমশঃ মাতাল হইয়া পড়ে।" (তদেব; পৃঃ ৬৯)

তিনি প্রসঙ্গক্রমে আরও বলেছিলেন, পরিমিত পায়ীর দৃষ্টান্ত দেখেই অপর ব্যক্তি মদ্যপান শুরু করে এবং পরে সে মাতালও হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া, মদ্যপান করলে যে সব রোগ সেরে যায়, "পরিমিত পায়ীদিগের সেই সকল রোগ উপস্থিত হইলে, সুরাদ্বারা প্রায় আরোগ্য হয় না।" (তদেব; পৃঃ ৭২)

বস্তুতঃ পক্ষে দেখা যায়, পরিমিত পানের বিরুদ্ধে তিনি যে যুক্তি দিয়েছিলেন তা বেশ বলিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত। পরিমিত পানের পক্ষে তখন যে সব যুক্তি দেওয়া হতো সেগুলির খণ্ডনেও রচয়িতা নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন।

মদ্যপান কিভাবে নিবারণ করা যায় সে বিষয়েও তিনি বলিষ্ঠ আলোচনা করেছিলেন। মদ্যপান নিবারণের উপায় সমূহকে তিনি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন ;—ব্যক্তিগত উপায়, পারিবারিক উপায়, সামাজিক উপায় ও রাজনৈতিক উপায়।

সুরাপানের নিবারণে গ্রন্থকার সরকারী সহায়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সর্বাধিক।

'কালনা-চরিত্রশোধনী' সভায় পঠিত ৬ষ্ঠ এবং ৭ম প্রবন্ধ 'সুরাপানের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক ফল কি এবং তন্নিবারণোপায়ই বা কি ?' প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯৯ বঙ্গাব্দে। রচয়িতার নাম তারাধন তর্কভূষণ। পুস্তকটির ভূমিকায় অচ্যুতানন্দ ভট্টাচার্য্য জানিয়েছিলেন, প্রবন্ধ দুটি পূর্বোক্ত সভায় পঠিত হয়েছিল ১২৯৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে।

৬ষ্ঠ প্রবন্ধের প্রথমে 'মদ্যপানের ফল' আলোচিত হয়েছিল। মদ্যপানের নানাবিধ ক্ষতির আলোচনায় তর্কভূষণ মহাশয় বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। তর্কভূষণ মহাশয় এই বক্তৃতায় তাঁর পূর্ববর্তী বক্তা জনৈক সূর্যনারায়ণ অধিকারীর বক্তব্যের সমালোচনা করেছিলেন।

যাইহোক, তর্কভূষণ মহাশয় মদ্যপান শাস্ত্রসম্মত কিনা তার আলোচনাতেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বাইবেল, কোরাণ এবং হিন্দুশাস্ত্র থেকে দৃষ্টান্ত ও বচন উদ্ধার করে মদ্যপানের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করবার চেষ্টায় তিনি বেশ সফল হয়েছিলেন।

৭ম প্রবন্ধের প্রথমে তর্কভূষণ মহাশয় বলেছিলেন, মদ্যপানের সামাজিক ফল নিবারণের জন্যে মদ্যপানের কারণ নির্ণয় ও সেই কারণের দূরীকরণই বাঞ্ছনীয়।

প্রাবন্ধিক বলেছিলেন, প্রকৃত ধার্মিক মদ্যপান করে না; সুতরাং 'সুরা-পাপস্পর্শ' থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্যে সকল মানুষকে ধার্মিক করবার চেষ্টা করা উচিত। এই বক্তব্যে অবশ্য বাস্তবতার অভাব রয়েছে। তবে

মদ্যপান নিবারণে তিনি 'সমাজশাসনের' ওপর যে জোর দিয়েছিলেন তার প্রয়োজন সত্যিই ছিল। তর্কভূষণ মহাশয় মদ্যপান নিবারণে রাজার সাহায্যও চেয়েছিলেন; তবে সেক্ষেত্রে তিনি খুব আশাবাদী ছিলেন না।

আলোচ্য পুস্তকটিতে '৬ষ্ঠ' ও '৭ম' প্রবন্ধ দুটি ছাড়া আরও কিছু বিষয় সংযোজিত হয়েছিল। ঐ সংযোজিত অংশে খোলা ভাটি উঠে যাওয়ায় প্রাবন্ধিক আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।

মদ্যপান সংক্রান্ত বিতর্করচনার ইতিহাসে 'মাদক সেবনের অবৈধতা ও অনিষ্টকারিতা' শীর্ষক জনৈক অজ্ঞাতনামা রচয়িতার পুস্তিকাটিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। এটিও অবশ্য একটি বক্তৃতা।

মদ্যপানের বিরুদ্ধে অজ্ঞাতনামা এই বক্তাও অনেক যুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মাদকতা শক্তি দ্বারা চিত্তের বিভ্রম ঘটে। তার জন্যেই শোকদুঃখাদি ভুলে থাকা যায়; কিন্তু মাদকমত্ততা অপসৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মনের সেই অবস্থা আর থাকে না। অতএব শোক-দুঃখ ভুলবার জন্যে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করার কোন অর্থই হয় না। অজ্ঞাতনামা এই বক্তাও পরিমিত পানের বিরোধী ছিলেন; তবে রোগমুক্তির জন্যে মদ্যপানে তাঁর আপত্তি ছিল না।

বক্তা মদ্যপান নিবারণের জন্যে দেশে শিক্ষা বিস্তারের কথাও বলেছিলেন। এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে বরণীয়।

এবার "The Bengal Branch of Thew. C. T. Union" থেকে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মাদকদ্রব্যের বিষয়ে প্রশ্নোত্তর' পুস্তকটির আলোচনা করা যাক—

প্রশ্নোত্তরের রীতিতে লেখা আলোচ্য পুস্তকটি কয়েকটি 'পাঠ'-এ বিভক্ত। পুস্তকটি নিঃসন্দেহে মাদকদ্রব্য নিবারণের উদ্দেশ্যে রচিত হয়; কিন্তু এর বক্তব্যের ধারায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করবার প্রবণতাও বেশ স্পষ্ট। যেমন—

"প্রশ্ন।—১। মাদকদ্রব্য একবারে খাইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করি কেন?

আমাদের নিজের নিজের মঙ্গলের জন্য, আমাদের ভ্রাতাদের মঙ্গলের জন্য; এবং আমাদের প্রভু যীশুর অনুরোধে।"

[মাদকদ্রব্যের বিষয়ে প্রশ্নোত্তর (রচয়িতার নাম অজ্ঞাত); ১৮৯৯; পৃঃ ১]

পুস্তকটিতে এমন দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যায়।

যাইহোক, আলোচ্য পুস্তকটিতেও পরিমিত পান সমর্থিত হয় নি এবং সব রকমের নেশারই বিরোধিতা করা হয়েছিল।

মদ্যপান সংক্রান্ত প্রাপ্ত পুস্তকাদির সবকটিতেই রচয়িতাদের যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। ঐ সব রচনায় মদ্যপানের (তা শাস্ত্রবিহিতই হোক বা পরিমিতই হোক) সমর্থনে একমাত্র রামমোহনকেই যুক্তি ও তথ্য উপস্থিত করতে দেখা গিয়েছে। আর কেউই মদ্যপান সমর্থন করেন নি; তবে ঔষধ হিসেবে মদ্যপানের কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

॥ ৮ ॥

ঃঃ জাতিভেদ বিষয়ক বিতর্করচনা ঃঃ

জাতিভেদ প্রথা নিয়েও বিগত শতকে বিতর্কমূলক পুস্তক-পুস্তিকা বা প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল; তবে তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

১২৮০ এবং ১২৮১ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাতে 'জাতিভেদ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ধারাবাহিকভাবে। পত্রিকায় রচয়িতার পূর্ণনাম ছিল না—ছিল 'শ্রী যঃ'। ঐ প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতে (দ্রঃ বঙ্গদর্শন, ২য় খণ্ড, ১২৮০) জাতিভেদ প্রথার আদি ইতিহাস বর্ণিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রাদি এবং বিদেশী গ্রন্থ ও মতবাদের সাহায্যে তিনি তাঁর বক্তব্য বেশ যুক্তির সঙ্গেই উত্থাপন করেছিলেন। 'শ্রী যঃ' জাতিভেদের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ নির্ণয় করেছিলেন;—মানুষ কয়েকটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নির্ধারিত আছে; ঐ শ্রেণীগুলির মধ্যে মর্যাদার তারতম্য রয়েছে।

প্রবন্ধটির দ্বিতীয় কিস্তিতে (দ্রঃ বঙ্গদর্শন; ৩য় খণ্ড, ১২৮১) জাতিভেদের 'নিগূঢ় মর্ম্ম' বর্ণিত হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে এখানে তিনি 'প্রাণিতত্ত্ব অনুসারে জাতিভেদের দোষগুণ বিচার' করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "কোন সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বা স্বাধর্ম্ম অক্ষতভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিলে তন্নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদিগের বিবাহ না করাই যুক্তিসঙ্গত; কারণ এতাদৃশ বিবাহ হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হইবেক তাহারা কথঞ্চিৎ নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ের দোষও অধিকার করিবে। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ এই বিষয়ের বিঘ্নদায়ক ছিল কিন্তু বোধ হয় স্বভাবসিদ্ধ বা প্রাচীন বলিয়া উহা সম্যকরূপে নিষিদ্ধ হয় নাই। কালে তাহা রহিত হইয়া জাতিভেদপ্রথার উন্নতি হইয়াছে।"

"কিন্তু যতদিন কোন সমাজের লোক সংখ্যা অল্প থাকে ততদিন এক এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম অন্যের অনায়ত্ত এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণ স্বশ্রেণী মধ্যে বিবাহার্থ পরিত্যজ্য হয়। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ে উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট লোক সর্ব্বশ্রেণীতে দৃষ্ট হয়। তখন প্রাগুক্ত উদ্দেশ্য রক্ষার্থ শ্রেণীর বিচার না করিয়া ব্যক্তি বিশেষের দোষগুণ বিচার পূর্ব্বক বিবাহ দিলেই ক্রমশঃ গুণবিশিষ্ট স্ত্রী পুরুষের সহযোগে বংশের উন্নতি সাধন হইতে পারে।" (বঙ্গদর্শন—৩য় খণ্ড, ১২৮১ ; ৩০০-১)

প্রাবন্ধিক এও মনে করেছিলেন, উচ্চবর্ণের ধর্ম বজায় রাখার জন্যে যেমন উচ্চবর্ণের মানুষ নিম্নবর্ণের মানুষের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হবে না তেমনি নিম্নবর্ণের মানুষের নিজেদের উন্নতির প্রয়োজনেই উচ্চবর্ণের মানুষের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এ কি বাস্তবে সম্ভবপর হবে ?

'শিক্ষালাভ বিষয়ে জাতিভেদ প্রথার দোষগুন বিচার'ও তিনি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জাতিভেদপ্রথা চালু থাকলে পিতার কাছে থেকে শিক্ষানবিশী করা খুব সহজ, অবশ্য প্রাবন্ধিক তার মধ্যে দোষও খুঁজে পেয়েছিলেন।

জাতিভেদকে 'সমাজ শাসন'-এর পরিপ্রেক্ষিতে রেখেও প্রাবন্ধিক তার গুণাগুণ বিশ্লেষণ করেছিলেন।

আলোচ্য দ্বিতীয় কিস্তির উপসংহারে প্রাবন্ধিক বলেছিলেন, ঐ প্রথার জন্যে 'বিভিন্ন বর্ণের হৃদ্যতা নাশ' হয়েছে খুব বেশি। জাতি বলতে তিনি 'নেশান' এবং বর্ণ বলতে 'কাস্ট' বুঝিয়ে ছিলেন।

প্রবন্ধকার তার দীর্ঘ প্রবন্ধের শেষভাগে সিদ্ধান্ত করেছিলেন,—

"(১) জাতিভেদ মঙ্গলজনক নহে। (২) প্রকৃতি সহজে পরিবর্ত্তন হইবার নহে। অতএব জাতিভেদ নির্ম্মূল করিবার জন্য উৎসাহিত হইবার সময়ে স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে এই উদ্যমে সহসা ফল লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই।…কিন্তু যদি কোন প্রথা দূরীকৃত করিলে জাতিভেদ অপনীত হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে সেই প্রথা বালিকা বিবাহ।" (তদেব ; পৃঃ ৪১৩)

জাতিভেদ প্রথার বিলোপসাধন যে সহজসাধ্য নয় সে কথা সত্য ; কিন্তু একমাত্র বাল্যবিবাহ দূরীভূত হলেই ঐ প্রথা বিলোপের সম্ভাবনা দেখা দেবে সে কথা সত্য বলে মনে হয় না।

১৭৯৬ শকের আষাঢ় সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল 'জাতি-ভেদ বিষয়ে বর্ত্তমান আন্দোলন' নামে একটি প্রবন্ধ। বর্তমান প্রসঙ্গে এই

প্রবন্ধটিও খুব উল্লেখযোগ্য। রচনাটিতে জাতিভেদ সম্পর্কে সে যুগের তিন ধরণের মতামত আলোচিত হয়েছিল। যাঁরা জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন তাঁদের মতে ঈশ্বরের সৃষ্ট এক মানুষের অন্য মানুষকে ঘৃণা করা উচিত নয়। তাঁরা মনে করতেন, নিম্নজাতির লোক যোগ্যতাসম্পন্ন হলেও জাতিভেদ প্রথার জন্যে তাদের উন্নতির পথ খোলসা হতে পারে না। তাছাড়া ঐ প্রথার জন্যে খাওয়া-দাওয়ায় নানা বিধিনিষেধ থাকায় সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়েছিল ; তাতেও দেশের উন্নতি ব্যাহত হয়েছিল। এইসব কারণে তাঁরা জাতিভেদের সমূল উচ্ছেদের কথাই বলেছিলেন।

অনেকে আবার প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার মধ্যে কিছু পরিবর্তন এনে তা'কে বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল—

"জাতি বংশগত হইবে অথচ নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি জ্ঞানী ও ধার্মিক হইলে উৎকৃষ্ট জাতিতে উন্নত হইবে এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি অধার্মিক ও মূর্খ হইলে স্বজাতির হইতে অধঃপাতিত হইবে, এইরূপ রীতি প্রচলিত থাকিলে জাতিভেদ প্রথার দোষ নিবারিত হইয়া তাহা হইতে কেবল শুভফল উৎপন্ন হইবে।"

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ; আষাঢ়, ১৭৯৬ শক ; পৃঃ ৪৪)

এই বক্তব্য আদৌ বাস্তব অভিজ্ঞতা নির্ভর ছিল না। তাছাড়া ঐ পরিবর্তন ঘটলেও জাতিভেদের সামাজিক কুফল তাতে দূরীভূত হতো না।

এই প্রসঙ্গে 'সাধারণী' পত্রিকায় (২য়ভাগ, ২রা আগস্ট, ১৮৭৪) প্রকাশিত 'জাতিভেদে সামাজিক উন্নতি' শীর্ষক প্রবন্ধটির কথা বলা যেতে পারে। রচয়িতা 'ক. ব্রাহ্মণ' ;—তাঁর পূর্ণ বা আসল নাম অজ্ঞাত। প্রবন্ধটিতে তাঁর রক্ষণশীল মনোভাব ও উচ্চবর্ণ মানুষের সুবিধাবাদ অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর বক্তব্য তাঁর ভাষাতেই শোনা যাক—

"আমাদের একান্ত ইচ্ছা, যে নিকৃষ্ট জাতীয়েরা বিদ্বান হউক, সভ্য হউক পরপোকারে (!) যত্নবান হউক, কিন্তু স্ব স্ব ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অনধিকার চর্চা করা কোন প্রকারে তাহাদের কর্ত্তব্য নহে।" (সাধারণী—২য়ভাগ, ২রা আগস্ট, ১৮৭৪)

তিনি বলেছিলেন, জাতিভেদে শৈথিল্য ঘটার জন্যেই বাংলা দেশে কষ্ট দেখা দিয়েছিল।

সে যুগের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও জাতিভেদের সমর্থন করেছিলেন ; তবে নগ্ন রক্ষণশীলতায় তা ততখানি নির্লজ্জ হয়ে ওঠেনি।

'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের অন্যতম প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষের কথা'। ঐ প্রবন্ধের 'সামাজিক রীতিবিষয়ক' অংশে ভূদেবের জাতিভেদ সম্পর্কিত মতামত জানা যায়। ভূদেবের মতে 'আমাদিগের সামাজিক প্রণালীর সারভূত কথা জাতিভেদ।' তিনি বিশ্বাস করতেন, কেবল বৃত্তিগত ভেদ থেকে আমাদের দেশে এই প্রথা প্রবর্তিত হয় নি ; তাহলে জাতিভেদ অনেক আগেই দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে যেতো।

জাতিভেদের জন্যে খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অনেক অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। তার ফলে সামাজিক মিলনেও বাধা ঘটেছিল ;—জাতিভেদ বিরোধীদের এই বক্তব্য ভূদেব সমর্থন করেন নি। তিনি ঐ বক্তব্যের বিরুদ্ধে বলেছিলেন, সামাজিক সম্মেলনের মূলে রয়েছে বশ্যভাব। খাওয়া-দাওয়া বা ঐ বৈবাহিক সম্বন্ধের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই।

জাতিভেদের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ঐ প্রথা সাম্যবিরোধী। ভূদেব তারও বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর মতে পৃথিবীতে সাম্য বলে কিছুই নেই। এই প্রসঙ্গে তিনি একথাও বলেছিলেন, সাম্যের ফলে বশ্যতা থাকে না এবং তার জন্যেও পূর্বকথিত সম্মিলন সম্ভবপর হয় না। এই বক্তব্য কিন্তু আদৌ সত্য নয়। মনে হয়, সাম্যবাদের প্রকৃত তাৎপর্য ভূদেবের কাছে ধরা পড়েনি। ভূদেব বলেছিলেন, বিবাহভেদের জন্যেই জাতিভেদের প্রয়োজন।

গ্রন্থকার ভূদেব শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন, অসময়ে যদি জাতিভেদ প্রথার বিলোপ-সাধন চেষ্টা করা হয়, তাহলে (১) "সমস্ত জাতির অপকর্ষ সাধন হইবে, (২) দেশের অন্তঃশাসনশক্তি আরও ন্যূন হইয়া পড়িবে, এবং (৩) লোকের স্বভাব হইতে শান্তি-প্রবণতা তিরোহিত হইয়া রাজ্যের সুশাসন কঠিনতর হইয়া উঠিবে।" [সমাজিক প্রবন্ধ—ভূদেব মুখোপাধ্যায় ; ৬ষ্ঠ সংস্করণ ; ১৩৪৪। পৃঃ২৭২]

ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে যতই গুরুগম্ভীর আলোচনা করুন না কেন জাতিভেদ সম্পর্কে তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে প্রকাশ পায় নি। যে বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি জাতিভেদের গুরুত্ব নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁর সেই বিশ্বাসে দুর্বলতা ও অনুদারতাই নিহিত ছিল।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই কলকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদ বিষয়ে আলোচনার জন্যে এক সভার আয়োজন করেছিল। ঐ সভায় শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ পাঠিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি 'জাতিভেদ' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯১ বঙ্গাব্দে।

শিবনাথ শাস্ত্রী প্রথমে জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তির ইতিহাস সন্ধান করেছিলেন। যুক্তির আলোকে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে তিনি দেখিয়েছিলেন, ঋগ্বেদের আমলে কোন জাতিভেদ ছিল না। তিনি বলেছিলেন, কর্ম বা বৃত্তিভেদের ওপর ভিত্তি করেই আধুনিক জাতিভেদ প্রথা গড়ে উঠেছিল। অবশ্য তার মধ্যে আধুনিক জাতিভেদের কোন দুর্লক্ষণই বর্তমান ছিল না। তবে ধীরে ধীরে আর্যসমাজে একজাতি অপেক্ষা অপর জাতি ভাল বা মন্দ এই বোধ দেখা দিতে থাকে। ঐ জাতিভেদের ওপর প্রথম আঘাত এসেছিল বুদ্ধদেবের কাছ থেকে। মুসলমান আমলেও তার ওপর আঘাত এসেছিল। তবে ইংরেজ আমলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে জাতিভেদ বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছিল অপেক্ষাকৃত প্রবলভাবে। জাতিভেদ প্রথার দিন দিন দুর্বল হবার অন্য কারণ, মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছিলেন, মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হবার পরে শাস্ত্র গ্রন্থগুলি মুদ্রিত হয়ে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই প্রচারিত হয়েছিল; তার ফলে সাধারণ মানুষ নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হবার সুযোগ পেয়েছিল।

শিবনাথ শাস্ত্রী জাতিভেদ প্রথার ক্ষতিকর দিকগুলির আলোচনায় সূক্ষ্ম বিচারক্ষমতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন; ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় সেখানে স্পষ্ট। তিনি বলেছিলেন, জাতিভেদের ফলে ভারতবর্ষে মানুষের মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে ওঠা সম্ভবপর হয় নি। ঐ প্রথার ফলে ভারতবাসীদের মধ্যে যে আত্মীয়তা ও ঐক্যের অভাব দেখা দিয়েছিল তাই-ই ছিল তাদের দুর্গতির বড় কারণ; ঐ কারণেই তারা পরজাতির অধীন হয়েছিল সহজে। এই বক্তব্য যথার্থই ইতিহাস সম্মত।

শিবনাথ শাস্ত্রী আরও বলেছিলেন, জাতিভেদ প্রথার জন্যেই শ্রমসাধ্য কার্য একেবারেই মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছিল। এই বক্তব্যের বিরুদ্ধেও কিছু বলবার নেই।

শাস্ত্রীমহাশয় আরও বলেছিলেন, ঐ প্রথা ভারতবর্ষে দারিদ্র্যেরও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐ প্রথার জন্যে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়েছিল বলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারও ঘটতে পারে নি।

জাতিভেদের আর একটি ক্ষতিকর দিকও তিনি তুলে ধরেছিলেন। ঐ প্রথার জন্যে বিবাহবিষয়ে মানুষকে নিজের জাতির মধ্যে নির্ভর করতে হতো ব'লে এদেশের মানুষের মধ্যে রক্তের মিশ্রণ ঘটাও সম্ভবপর হয়নি। এইজন্যে আমাদের দেশের মানুষের স্বাস্থ্য সবল হয়ে ওঠে নি। মানসিক সবলতা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়েছে।

শিবনাথ শাস্ত্রী আরও বলেছিলেন, জাতিভেদের ফলেই আমাদের দেশের মানুষ মনুষ্যত্বহীন ও কাপুরুষ। আমাদের বিবাহরীতিও ঐ প্রথার জন্যে অদ্ভুত ও ক্ষতিকারক। বাল্যবিবাহেরও অন্যতম কারণ জাতিভেদ। শিবনাথের মতে জাতিভেদ প্রথা অধর্মের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। এইসব কারণে তিনি তার সমূল উচ্ছেদই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রীর 'জাতিভেদ' শীর্ষক বক্তৃতায় সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণে আমরা একটি বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা লক্ষ্য করে থাকি। এই নিরপেক্ষতার জন্যেই তাঁর বক্তব্য ব্যক্তিগত বিশ্বাসান্ধতা বা আবেগময়তায় আচ্ছন্ন হতে পারে নি। সার্থক বিতর্করচনা হিসেবে আলোচ্য পুস্তকটির তাই এক বিশেষ মূল্য রয়েছে।

॥ ৯ ॥

:: সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক বিতর্করচনা ::

বিগত শতকে সমুদ্রযাত্রা বিষয়েও বিতর্কপুস্তকাদি রচিত হয়েছিল, তবে তাদের সংখ্যা ছিল সব চাইতে কম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজসংস্কার আন্দোলনে "হালিসহর পত্রিকা'র একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ডিসেম্বরে ঐ পত্রিকায় সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক বিতর্করচনাদির আলোচনায় এইটিই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

সম্পাদক মহাশয় সমুদ্রযাত্রার সমর্থক ছিলেন; দেশ ও দেশের মানুষের উন্নতির জন্যে সমুদ্রযাত্রাকে তিনি অপরিহার্য বলেই মনে করতেন। সমুদ্রযাত্রার অপ্রচলনে তাই তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন।

সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হবার মূলে জাত্যভিমান ছিল বলে সম্পাদক মহাশয় অনুমান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যখন থেকে 'জাতিভেদের ঘৃণিত প্রথা বলবান হইয়াছে তদবধিই এতদ্দেশীয় লোকদিগের বিদেশ গমনের নিয়ম রহিত হইয়া থাকিবেক, কারণ পুরাণাদি শাস্ত্রে ও ইতিহাস পুস্তকে এমত প্রমাণ অনেক প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে পূর্ব্বতন নৃপতি ও বণিকগণ অনায়াসে জাহাজারোহণ পূর্ব্বক স্বমুদ্র (!) পার হইয়া বহুদেশে গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারদিগের জাতিনাশ অথবা অন্য কোন প্রকার হানি হয় নাই কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ঐ প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্ট করা যাইতেছে।" (হালিসহর পত্রিকা; ১৮৫২; ৮ই ডিসেম্বর)

সম্পাদক মহাশয় দেশের 'সৌভাগ্য' ও 'বিদ্যাবৃদ্ধির' জন্যে ঐ অবস্থার পরিবর্তন চেয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্যে উদারপন্থী মানুষের বস্তুমুখী চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

সুরেন্দ্রদেব গুপ্ত মজুমদার 'আর্য্যসমাজ সংস্করণ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০৬ শকাব্দে। ঐ গ্রন্থে 'বিলাত বা অপরাপর দেশ বিদেশ গমন' শীর্ষক একটি আলোচনা সংযোজিত হয়েছিল। সেখানে সুরেন্দ্রদেব সমুদ্রযাত্রাকে সমর্থন করেছিলেন কয়েকটি শর্তে। তাতে মনে হয়, সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে সংস্কারমুক্ত বলতে যা বোঝায় তিনি তা ছিলেন না। তাঁর বক্তব্য—

"অপরাপর বিদেশীয় জাতি যেরূপে আপনাপন চেষ্টা, যত্ন, বলবুদ্ধির কৌশল ও অর্থব্যয় দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান প্রস্তুত পূর্ব্বক আপনাদিগের নিজ নিজ সামাজিক নিয়মের অধীন থাকিয়া দেশ বিদেশে স্বাধীনভাবে গতিবিধি ও তদ্দ্বারা স্বদেশের, স্বজাতির ও স্বসমাজের উন্নতি সাধন এবং গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, অথচ দেশ দেশান্তরে যাইয়া ও তথায় বিভিন্ন জাতির সহবাসে থাকিয়াও বিভিন্ন সমাজের নিয়মাধীন বা তাহাদিগের স্বীয় সামাজিক ধর্ম্মকর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী হয়েন না, তদ্রূপ নিয়মাধীনে থাকিয়া, হে ভারতবাসী আর্য্য সন্তানগণ! আপনারাও অনায়াসে দেশবিদেশ গমনাগমনের উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। এরূপ প্রণালীবদ্ধ হইয়া দেশবিদেশ গমনাগমন আর্য্য সমাজের অনুমোদিত ও শাস্ত্রসঙ্গত হইলেও হইতে পারে।"

(আর্য্যসমাজ-সংস্করণ - সুরেন্দ্রদেব গুপ্ত মজুমদার; ১৮০৬ শকাব্দ। পৃঃ ৭৪)

লেখক আসলে সমুদ্রযাত্রাকে ঠিক হিন্দুধর্মসম্মত বলে মনে করেন নি। বিলাত ফেরত যুবকদের দ্বারা দেশের উন্নতি হবে বলেও তিনি বিশ্বাস করতেন না। অবশ্য তাদের কারও দ্বারাই যে উপকার হবে না সে কথাও তিনি বলতে চাননি। কিন্তু সে যাই-ই হোক না কেন, সমুদ্রযাত্রা তিনি সমর্থন করেন নি।

অক্ষয় কুমার দত্ত রচিত এবং রজনীনাথ দত্ত সম্পাদিত ও পরিবর্ধিত 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার' গ্রন্থেও সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল; বইটি সম্পর্কে রজনীনাথ দত্ত জানিয়েছিলেন "আমার পরম পূজনীয় স্বর্গীয় পিতা ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহার আকার ন্যূনাধিক ৩৬ পৃষ্ঠা হইবে। সেই প্রবন্ধটি এই পুস্তকের মেরুদণ্ড।"......

[সাহিত্য সাধক চরিত মালা (১ম)—"অক্ষয় কুমার দত্ত"; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত। পৃঃ ৩৮]

অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত ঐ প্রবন্ধটি মূল প্রেরণা হওয়ায় বর্তমান প্রসঙ্গে এই পুস্তকটির আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

পুস্তকটির 'দ্বিতীয় টিপ্পনী'তে সমুদ্র যাত্রার বিরুদ্ধে সংস্কার কি ভাবে আমাদের দেশে দেখা দিয়েছিল সেই প্রসঙ্গে 'সংযোজনী' ছিল। ঐ অংশে বলা হয়েছিল, পারসীকেরা ধর্মবিরুদ্ধ বলে সমুদ্রযাত্রা করতো না। ঐ পারসীকেরা আর্য জাতিরই বিশেষ শাখা ছিল। কালক্রমে ভারতীয় আর্য এবং এই পারসীকদের মধ্যে মনান্তর-বিদ্বেষভাব দেখা দিলেও অনুমান করা হয়েছিল, "সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধীয় কুসংস্কার পারস্য হইতেই আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়া থাকিবে।"... (তদেব ; পৃঃ ১৯০)

পুস্তকটিতে সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যযাত্রার ইতিহাস বেশ সুন্দর ভাবেই বিশ্লেষিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগেও যে সমুদ্রযাত্রার চল ছিল তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন। প্রয়োজনবোধে তিনি শাস্ত্রেরও সাহায্য নিয়েছিলেন। কাব্যাদি এবং বৈদ্যগ্রন্থের দৃষ্টান্তও তিনি তুলে ধরেছিলেন। (দ্রঃ তদেব ; পৃঃ ৭৭-৮৩)

পুস্তকটিতে সমুদ্রযাত্রার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করতে গিয়ে বলা হয়েছিল, "প্রায় সার্দ্ধাধিক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি হিন্দু সন্তানগণ বৌদ্ধদিগের সহিত একাদিক্রমে তিন চারি মাস সমুদ্রযাত্রা করিয়াও নিন্দনীয় বা জাতিভ্রষ্ট হইত না।" (তদেব ; পৃঃ ৯৪)

আলোচ্য পুস্তকটির কোথাও সমুদ্রযাত্রাকে অশাস্ত্রীয় বলা হয় নি।

এবার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত একটি বিখ্যাত বক্তৃতার আলোচনা করা যাক—

বক্তৃতাটি 'হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা' নামে ১২৯৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথও প্রাচীন ভারতে প্রচলিত সমুদ্রযাত্রার বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। ঋগ্বেদে, মনুসংহিতায়, রামায়ণ-মহাভারতে এবং আরও নানাবিধ গ্রন্থে সমুদ্রযাত্রার যে উল্লেখ ও নজীর রয়েছে দেবেন্দ্রনাথ সে সব শ্রোতাদের শুনিয়েছিলেন। তিনি প্রমাণসহ এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, ঔরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রার চল ছিল। তিনি আরও বলেছিলেন, "ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা যতদূর নিরূপণ করা যায়, তাহাতে মোগল ও ইংরাজ শাসনের

মধ্যস্থলে কোন না কোন সময়েই" (হিন্দুর সমুদ্র-যাত্রা—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ; ১২৯৯। পৃঃ ৮) সমুদ্রযাত্রায় জাতিপাত ঘটে সেকথা প্রচারিত হয়েছিল। সমুদ্রযাত্রাকে যে সব কারণে রক্ষণশীল মানুষ নিষিদ্ধ বলে মনে করতো দেবেন্দ্রনাথ তথ্যপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সেই সব কারণের অসারতা প্রমাণ করেছিলেন।

সমুদ্রযাত্রা বিরোধী ব্যক্তিদের অন্যতম বক্তব্য ছিল, বৃহৎনারদীয় পুরাণের 'সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং' বচন অনুযায়ী কলিযুগে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ। দেবেন্দ্রনাথ ঐ যুক্তির বিরুদ্ধে রঘুনন্দনের টীকাকার কাশীনাথ ভট্টাচার্য এবং তারানাথ তর্কবাচস্পতির ব্যাখ্যা অনুসরণ করে দেখিয়েছিলেন, ব্যবসা বা অন্যকোন কারণে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ নয়। তিনি বলেছিলেন, "ব্রাহ্মণবধ নিবন্ধন মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তোদ্দেশে সমুদ্র সলিলে প্রাণ বিসর্জ্জনের জন্য যে সমুদ্রযাত্রা, কলিযুগে তাহারই নিবারণ করিবার নিমিত্ত বৃহৎ নারদীয় পুরাণকার এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।" (তদেব. পৃঃ ১০)

দেবেন্দ্রনাথ অন্য যুক্তিও দিয়েছিলেন। শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণের মধ্যে বিরোধ বাঁধলে শ্রুতির প্রাধান্য ; আর স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধে স্মৃতিই গ্রাহ্য। এই শাস্ত্রীয় নির্দেশের বলে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, পুরাণের 'সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ' বচন বরণীয় নয় ; কেননা স্মৃতি শাস্ত্র মনু সংহিতাতে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয় নি। মনুর বিপরীত কথা অগ্রাহ্য করা যায় না।

বিরোধীপক্ষের অন্য যুক্তি তিনি খণ্ডন করেছিলেন এবং বলেছিলেন, ব্যবসাবাণিজ্যের জন্যে সমুদ্রযাত্রা অপরিহার্য।

বিরোধীপক্ষের অপর যুক্তি, ম্লেচ্ছদের জাহাজে চড়তে হয় বলে সমুদ্র যাত্রায় ম্লেচ্ছ সংস্পর্শ ঘটে থাকে। দেবেন্দ্রনাথ তার জবাবে বলেছিলেন, ম্লেচ্ছের যানে না চড়লেই তো হয়। তাছাড়া, জাহাজ রেঙ্গুণে গেলে যখন হিন্দুদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না, তখন আরব সাগর পার হবার পরে জাহাজ সুয়েজ খালে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কেন? ষ্টীমার, নৌকো, রেল এইসব ম্লেচ্ছ যানে যাতায়াত করলেও তো হিন্দুদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না!

সমুদ্রযাত্রা চালু থাকলে ম্লেচ্ছ দেশে যাতায়াত করা হবে এবং সেখানে অবস্থানও করতে হবে। সমুদ্রযাত্রা বিরোধী পক্ষের এই যুক্তির বিরুদ্ধে তিনি বলেছিলেন, ম্লেচ্ছ সংস্পর্শ বাঁচাতে হলে জল ও স্থল উভয় শ্রেণীর পথেই যাত্রা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতে হবে।

বিরোধীপক্ষের আপত্তির বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ আরও জানিয়েছিলেন, বিদেশে গিয়ে যে ম্লেচ্ছখানা খেতেই হবে তা সত্য নয়। তাছাড়া প্রয়োজনবোধে জীবনধারণের জন্যে যদি ঐ খাদ্য খেতেই হয় তাহলেই বা কি !

সমুদ্রযাত্রার বিরোধীরা কেউ কেউ একটি অদ্ভুত যুক্তি দেবার চেষ্টা করতো। তারা বলতো, সমুদ্রযাত্রায় ঐহিক উন্নতি ঘটলেও আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে না ; ঐহিক উন্নতি নিতান্তই মিথ্যা। অতএব, 'পারত্রিক উন্নতি' যখন ঘটে না তখন আর সমুদ্রযাত্রায় প্রয়োজন কি ! দেবেন্দ্রনাথ এর বিরোধিতা করে ঠিকই বলেছিলেন, "এ আপত্তিটা নিতান্তই অর্বাচীনোচিত।" তাছাড়া ঐহিক উন্নতি আদৌ মিথ্যা নয়। বরং দেশী-বিদেশী শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে "ইহলৌকিক উন্নতি পারলৌকিক উন্নতির অনুকূল।" (তদেব, পৃঃ ৩৭)

দেবেন্দ্রনাথ ইউরোপ বা অন্যকোন দেশে যাওয়াকে পাপ কাজ বলে মনে করতেন না ; সেই জন্যে ঐ সব দেশে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে সে কথাও ভাবেন নি।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতায় বিরোধীপক্ষের যুক্তি খণ্ডনে যথার্থ জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রদত্ত যুক্তিগুলি অগ্রাহ্য হবার মতো নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ছাড়া রাজনৈতিক কারণেও তিনি সমুদ্রযাত্রার গুরুত্ব মেনে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, দেশের শাসন কর্তৃপক্ষের বাস ইংলণ্ডে ; সুতরাং দেশের জন্যে দরবার করতে হলে সেখানে যাবার প্রয়োজন রয়েছে। সভ্যতার বিস্তার, শিল্পের উন্নতি এসব ক্ষেত্রেও সমুদ্রযাত্রার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তাছাড়া সমুদ্রে ভ্রমণ ও সমুদ্রবায়ু সেবনের গুরুত্বও কম নয়।

দেবেন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক কারণেও সমুদ্রযাত্রা সমর্থন করেছিলেন। তাঁর মতে সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করলে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন ; অবশ্য একটি চিঠিতে। শোভাবাজারের বিনয়কৃষ্ণ দেব সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। তাঁর এবং আরও কয়েকজনের উদ্যোগে বাংলাদেশে সমুদ্রযাত্রা আন্দোলন সংগঠনের জন্যে একটি 'ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি' গঠিত হয়েছিল ; বিনয়কৃষ্ণ দেব ছিলেন তারই সম্পাদক। সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি ক'টি প্রশ্ন করেছিলেন। তারই উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ পত্র লিখেছিলেন। পত্র

রচনার কাল ছিল ১৮৯২ সাল। পত্রটিতে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছিলেন, যা লোক রক্ষাকারী বা লোকহিতকর তাই-ই প্রকৃত ধর্ম। তাঁর মতে ধর্ম আর ধর্মশাস্ত্র এক নয়। এই জন্যে ধর্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ হয়েও কোন কিছু ধর্মসম্মত হতে পারে। এই বক্তব্যের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, লোকহিতকর যদি হয় তাহলে সমুদ্রযাত্রাও ধর্মসম্মত। বঙ্কিমচন্দ্র সমুদ্রযাত্রাকে লোকহিতকর বলেই মনে করতেন, এবং সেইজন্যে তিনি তাকে ধর্মসম্মত বলেই অভিহিত করেছিলেন। তিনি একথাও বলেছিলেন, ধর্ম আর হিন্দু ধর্মে কোন বিরোধ নেই; সমুদ্রযাত্রা তাই হিন্দুধর্ম বিরোধী নয়। [দ্রঃ বঙ্কিম রচনাবলী (২য়); সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত। ৩য় মুদ্রণ; ১৩৭১]

সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে সে যুগের বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি একটি ব্যবস্থাপত্র রচনা করেছিলেন। মূল ব্যবস্থাপত্রটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত, তবে তার বঙ্গানুবাদও প্রচারিত হয়েছিল। ঐ ব্যবস্থাপত্রের মূল কথা –

"বাণিজ্য রাজাজ্ঞাদি নিমিত্ত সমুদ্রে নৌকা-যানারোহণ করিলে এবং স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে এবং ম্লেচ্ছাদির সহিত গুরুতর সংসর্গ না করিলে দ্বিজের (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের) প্রায়শ্চিত্ত এবং অব্যবহার্য্যতা হইবে না। ধর্ম্ম নিমিত্ত সমুদ্রযানে গমন করিলেও স্বধর্ম্ম ত্যাগ এবং ম্লেচ্ছাদির সহিত গুরুতর সংসর্গ করিলে কৃত প্রায়শ্চিত্ত দ্বিজেরও ব্যবহার্য্যতা হইবে না, কিন্তু শূদ্রদিগের প্রায়শ্চিত্ত করিলে ব্যবহার্য্যতা হইবে, এই মাত্র বিশেষ।" [The Hindu Sea-Voyage Movement in Bengal (1894), p-11]

যুক্তি প্রমাণাদির দ্বারাই তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। বৃহন্নারদীয় পুরাণে আছে 'সমুদ্রযাত্রা, কমণ্ডলু ধারণ'...ইত্যাদি আরও কিছু 'ধর্ম' কলিযুগে বর্জনীয়। তারানাথ ঐ পুরাণের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন "ধর্ম্মরূপ সমুদ্রযাত্রা স্বীকারই কলিযুগে নিষিদ্ধ, বাণিজ্য বা রাজাজ্ঞাদি নিমিত্ত সমুদ্রযাত্রা স্বীকার নিষিদ্ধ নহে।" (তদেব, পৃঃ ১২) তারানাথ জানিয়েছিলেন, সর্বস্থানেই স্বধর্মানুষ্ঠান পালন করা সম্ভব; এজন্যে স্বধর্ম আচরণ করতে পারলে সমুদ্রযাত্রাতে পাপের কোন কারণ ঘটে না।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি যে গোঁড়ামি মুক্ত ছিলেন তা নয়; কিন্তু তাহলেও দেখা যায়, সে যুগের একজন সংস্কৃত পণ্ডিত হয়েও সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে তিনি যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

ব্যক্তিত্বের উন্মেষ আর বুদ্ধির বিকাশ হলো নবজাগরণের দুটি দিক। উন্নত জীবন ধর্মী শিক্ষার স্পর্শে মানুষের মনে বিকশিত হয় ব্যক্তিত্বের দীপ্তি জাগ্রত হয় বুদ্ধির শক্তি। ঐ ব্যক্তিত্বের আলোয় আর বুদ্ধির শক্তিতে মানুষ চিনতে পারে নিজেকে, বুঝতে পারে তার স্বাতন্ত্র্যকে। সমাজের কাছে মানুষ হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে কতখানি সে চিন্তাও জেগে ওঠে তার মধ্যে। সমাজ কি অত্যাচারী? সমাজ কি কোন বিশেষ গোষ্ঠী? এ সব প্রশ্নেও সে উদ্বেল হয়ে ওঠে তার ফলে। যদি মনে হয়, সমাজে প্রবল হয়ে উঠেছে অশুভ দেশাচার, অন্ধ কুসংস্কার, তখনই হয়ে ওঠে সে উদ্দাম চঞ্চল। মানবতার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে, নতুন সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে এই নবজাগ্রত মানুষেরই দল। কুসংস্কারের জঞ্জাল সরিয়ে মানবজীবনের পথ প্রশস্ত করবার কাজেই তারা হয় সচেষ্ট।

কিন্তু এতো গেল একশ্রেণীর মানুষের কথা। নবজাগ্রত সমাজে আর এক শ্রেণীর মানুষও থাকে; গতানুগতিকতাকে মেনে চলাই হলো তাদের কাজ। শুধু তাই নয়, যারা গতানুগতিক জরাজীর্ণ জীবনধারার সংস্কারক তাদের দমিত করাই হলো তাদের প্রধান কাজ। প্রগতিশীল শক্তির বিরুদ্ধে-ই আত্মরক্ষার কাজও তাকে বলা যায়।

নবজাগরণের এই সামাজিক পট ভূমিতেই দেখা যায় বাদবিতণ্ডার প্রচণ্ড ঝটিকা। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত বাংলাদেশেও এই অবস্থা দেখা দিয়েছিল। বিগত শতকের বিতর্করচনা থেকে জানা যায়, কোন কোন বিষয়ে সে সময় ঐ বাদ-বিতণ্ডার ঝড় বয়ে গিয়েছিল বাংলা দেশে।

নবজাগরণের ফলে সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম সকল বিষয়েই বিতর্কমূলক পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হয়েছিল। ঐ সব পুস্তক-পুস্তিকায় তৎকালীন প্রগতিশীল মানুষের উন্নত চিন্তা, ব্যক্তিত্ববোধ ও যুক্তি নিষ্ঠার পরিচয় বেশ স্পষ্ট। নবজাগ্রত মানুষের আত্ম প্রতিষ্ঠা আর রক্ষণশীলতার অন্ধকারে ঘুমন্ত মানুষের আত্মরক্ষার চেষ্টা এই উভয়ের সংঘাত রেনেসাঁসের একটি বড় দিক। বস্তুতঃ পক্ষে, রক্ষণশীলতার নিরেট অন্ধকারের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেই রেনেসাঁসকে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। তার আলো থাকলেও অন্যের অন্ধকারও কম নয়।

এই আলো ও অন্ধকারের সংগ্রামের দলিলই হলো আলোচ্য বিতর্করচনা। নবজাগরণের ইতিহাস সন্ধান করতে হলে তাই বিতর্করচনার পৃষ্ঠা-উন্মোচন অপরিহার্য। নবজাগ্রত মানুষ কোন কোন বিষয়ে কি কি ভেবেছে, সমাজ ও দেশের উন্নতিকে কোন দিকে কোন উপায়ে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছে, রক্ষণশীল সামাজিকেরা নবজাগরণের সূর্যালোকের মধ্যেও কি ভাবে মেঘ-কালিমায় আচ্ছন্ন থাকতে চেয়েছে সেই সব না জানলে নবজাগরণের প্রকৃত ইতিহাস জানা সম্ভবপর নয়। বিতর্করচনা থেকে এই সবই বহুলাংশে জানা যায়। এই রচনায় প্রগতিশীল ও সংরক্ষণশীল উভয় শ্রেণীর মানুষেরই চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছিল। এই জন্যে যুক্তি, তর্ক ও মননের পাল্লা কোন দিকে ভারী তার খবরও পাওয়া যায় এর মধ্যে। যুক্তিতর্ক ও মনন যে নবজাগরণের লক্ষণ সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

মানবতাবোধ বা 'হিউম্যানিজম্' নবজাগরণের আর একটি বিশেষ দিক। রেনেসাঁসের মননচর্চার মধ্যে দিয়ে এই মানবিকতারই জয় ঘোষিত হয়ে থাকে। এই কারণে বিতর্করচনায় আমরা তার্কিক লেখকদের মানবচিন্তা ও মানবতারও পরিচয় পেয়ে থাকি।

বিতর্ক সাধারণতঃ দুইভাবে হয়ে থাকে ; এক মৌখিক, দুই লৈখিক। সামাজিক সমস্যা নিয়ে সে যুগে এই দু'রকমের বিতর্কই প্রবল ছিল। এই উভয় শ্রেণীর বিতর্কে সে যুগের সাধারণ মানুষের ভূমিকাও কম ছিল না। এই সাধারণ মানুষ অনেক সময় কোন ব্যক্তির মত বা তাঁর পুস্তকের বিরুদ্ধে বা পক্ষে মতামত জানিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় চিঠি লিখে থাকতো ; সে গুলি অনেক সময় মুদ্রিতও হতো। ঐ সব পত্রের অনেকগুলিকেই নির্দ্বিধায় বিতর্করচনার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সাধারণ মানুষের সমাজ চিন্তার দলিল হিসেবে সেই পত্র গুলির মূল্য অপরিসীম। সমাজের যাঁরা নেতা তাঁরাও অনেকে বিতর্ক-পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাঁদের সমাজ চিন্তার পরিচয়ও সেই সব পুস্তকে পাওয়া যায়। সুতরাং বিতর্করচনার পত্রপুটে সাধারণ মানুষ ও সমাজ নেতা উভয় গোষ্ঠীরই সমাজ ভাবনা সঞ্চিত হয়ে আছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

রামমোহনের নেতৃত্বে ও তাঁর সহযোগীদের সহায়তায় সতীদাহের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল তখন চিন্তাশীল সাধারণ মানুষও ঐ আন্দোলনের সামিল হয়ে মতামত ব্যক্ত করতে এগিয়ে এসেছিল ; অবশ্য 'সতী'-বিরোধী আন্দোলনের বিপক্ষেও তখন রায় দিয়েছিল অনেকে।

'সমাচারদর্পণ' পত্রিকা সে যুগে সতীপ্রথা ও সতীপ্রথা বিরোধী আন্দোলন বিষয়ে পাঠকের মতামত প্রকাশ করে থাকতো। ১৮২৭ সালের ৫ মে'র 'সমাচারদর্পণে' জনৈক পাঠক এক আশ্চর্য ঘটনার বর্ণনা করে মন্তব্য করেছিলেন—

"... শাস্ত্রের ভাল মন্দ পরমেশ্বর জানেন আপাতত শাস্ত্র দেখাইয়া এমত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওন কিম্বা করাণ বিশিষ্ট লোকের অনুচিত।"

[সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খণ্ড; ৩য় সং)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। পৃঃ ২৮৮]

এই ব্যক্তি বিশুদ্ধ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে সতীপ্রথার বিরোধিতা করেছিলেন। রামমোহনের 'সতী' বিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রকাশের পর ধীরে ধীরে সতীপ্রথাবিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল; কিন্তু পরে আবার তা স্তিমিত হয়েও পড়েছিল। ঐ আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়েছিল বলে উল্লিখিত পত্রপ্রেরক সমাজনেতাদের মৃদু কটাক্ষ করেছিলেন—

"পূর্ব্বে সহমরণ ও অনুমরণের বিষয়ে অনেক বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোক দ্বারা বহুবিধ বিচার ও উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়াছে এক্ষণে যদ্যপি তাবতেই এতকাল ক্ষান্ত হইয়াছেন (পুনর্ব্বার তত্ত্বদ্বিষয়ে কোন বাক্যব্যয় করণ ঐ পণ্ডিত বিচক্ষণগণকে সুপ্তদশা হইতে জাগ্রৎ করণ) তথাপি অদ্ভুত সমাচার অপ্রকাশ রাখা এবং বৃহৎ আড়ম্বর দেখাইয়া এককালে নিরস্ত হওন উচিতবক্তার অনুচিত"...

(তদেব; পৃঃ ২৮৭)

এই মন্তব্য বা কটাক্ষ থেকে বোঝা যায়, তৎকালীন সাধারণ মানুষও সতীপ্রথা আন্দোলন সম্বন্ধে বেশ সচেতন ছিলেন।

রামমোহন ছিলেন সতীপ্রথা বিরোধী আন্দোলনের প্রধান বাঙালী নেতা। তাঁর বিতর্কপুস্তকে তাঁর সমাজমনের কি পরিচয় পাওয়া যায় এবার তারই সন্ধান করা যাক। রামমোহন ধর্ম এবং সমাজ উভয়েরই সংস্কার করেছিলেন। কিন্তু গভীর ভাবে ভেবে দেখলে বোঝা যায়, রামমোহনের ধর্মবোধ ও ধর্মসংস্কার চিন্তাই ছিল তাঁর সমাজ সংস্কারের মূল প্রেরণা। রামমোহনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'তুহ্‌ফত্‌-উল্‌-মুওয়াহিদ্দিন্‌' (১৮০৩ বা ১৮০৪); এই গ্রন্থে রামমোহন-মানসিকতার অনেক বৈশিষ্ট্য আভাসিত হয়ে উঠেছিল। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাস কি সে বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এখানে পৌত্তলিকতা জনিত ভ্রান্ত আচার-আচরণের প্রসঙ্গ উত্থাপন

করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায়, ধর্মসংস্কার কার্যের বাসনাই রামমোহনকে সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত করেছিল।

ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তি কি সেই প্রসঙ্গে রামমোহন বলেছিলেন, "ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি রয়েছে দুইটী সত্যের উপর, (১) আত্মার বর্ত্তমানতার সত্যতার উপর,—যে আত্মা এই দেহ পরিচালনার কারণ, আর (২) পরকালের উপর—যে পরকাল দেহমুক্ত আত্মার ইহলোকের সুকৃতি দুষ্কৃতির দণ্ড পুরস্কারের স্থল।...

কিন্তু এই দু'টী অপরিহার্য্য বিশ্বাসের সঙ্গে যে আবার পানাহার শৌচাশৌচ এবং শুভাশুভ ব্যাপার নিয়ে শতশত কষ্টকর ও নিরর্থক বিধি নিষেধ লেজুড়ের মত লাগিয়ে দে'য়া হয়েছে, আর এ গুলোই সমাজের উন্নতি না করে অনিষ্টের কারণ হয়েছে, এবং সামাজিক উন্নতি না করে সাধারণ লোকেদের উদভ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত করেছে।"

[রামমোহন রচনাবলী (হরফ প্রকাশনী) ; ১৩৮০। পৃঃ ৭২০]

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, ধর্মবিশ্বাসের মূলে যে সত্য রয়েছে তার সঙ্গে লেজুড় হিসেবে জুড়ে দেওয়া বিধি নিষেধেই সমাজের অবনতি ঘটে বলে রামমোহন বিশ্বাস করতেন। ধর্মকে কেন্দ্র করে সামাজিক কুসংস্কার দেখা দিয়ে থাকে, রামমোহনের সেই বিশ্বাস এখানে খুব স্পষ্ট। তিনি মনে করতেন, একমাত্র মুক্ত মন ও জ্ঞান নিয়ে বিচার করলেই অসত্য ও আরোপিত উপসর্গমুক্ত ধর্মের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করা যায়; এবং সেই উপলব্ধিতে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হয়। অতএব প্রকৃত ধর্ম প্রতিষ্ঠার ওপরই সমাজের মুক্তি ও উন্নতি নির্ভর করে। ধর্মকে কেন্দ্র করে বা ধর্মের নামে কতগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের ইচ্ছা অনেক সময় মানুষকে পেয়ে বসে। তার ফলেই সমাজে নানা কুসংস্কার বা ভ্রান্ত আচার দেখা থাকে। সতীদাহ প্রথা সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য।

সহমরণ বা অনুমরণ ছিল একান্ত ভাবেই একটি কামনামূলক ধর্মীয় আচরণ। প্রধানতঃ স্বর্গ প্রাপ্তির কামনা নিয়েই নারী সহমৃতা বা অনুমৃতা হয়ে থাকতো। কাজেই জ্ঞানমার্গের সাধক পৌত্তলিকতা বিরোধী রামমোহনের পক্ষে ঐ প্রথা সমর্থন করা সম্ভবপর ছিল না। সতীপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি যে প্রতিবাদ পুস্তকাদি রচনা করেছিলেন সেখানে তিনি তাই কামনামূলক বলে ঐ প্রথাকে নিম্ন শ্রেণীর ধর্ম্মীয় আচরণ রূপে গণ্য করেছিলেন।

কিন্তু সতীপ্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের চিন্তা শুধু যে তাঁর ধর্ম্মীয় বিশ্বাস

থেকেই প্রসূত তা নয়; তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্জাত বেদনাবোধও তাঁকে 'সতী' বিরোধী করে তুলেছিল। তবে এ কথাও সত্য, জ্ঞানবাদী রামমোহনের ধর্মচিন্তা হয়েছিল এ বিষয়ে বেশী কার্যকরী। বস্তুতঃ কামনামূলক ধর্মবোধ প্রসূত ভয়ঙ্কর এবং ভ্রান্ত সংস্কার থেকে বাঙালী সমাজকে রক্ষা করবার জন্যেই তিনি এগিয়ে এসেছিলেন।

'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'-এ কাশীনাথের বক্তব্যের বিরুদ্ধে সতীপ্রথার অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রামমোহন বলেছিলেন—

"স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে যে ব্যক্তির ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহারদিগকে পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন করিয়া সাংসারিক অত্যন্ত দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত শাস্ত্রে বিধি দিয়াছেন, আর যাঁহারদের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা না হইয়া থাকে, তাঁহারদিগের প্রতি কামনারহিত হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক জ্ঞানাভ্যাস করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, অতএব সেই শাস্ত্রানুসারে বিধবারদিগকে নিন্দিত এবং অচিরস্থায়ী যে স্বর্গসুখ তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস এবং পরমপদকে প্রাপ্ত করেন, যে জ্ঞানাভ্যাস তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে উদ্‌যোগ করি,"......

[রামমোহন-গ্রন্থাবলী (৩য়; ৩য় সং); বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত। পৃঃ ৩৭]

এখানে কামনামূলক ক্রিয়া সতী হওয়া অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর লাভের পথে চলাই যে বিধবানারীর উচিত সেই কথা বলা হয়েছে।

রামমোহনের সমাজচিন্তায় দেশাচারের স্থান কি ছিল তাও প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে। রামমোহন দেশাচারের বিচারে বুদ্ধি বৃত্তিকে সক্রিয় রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন। দেশাচার বললেই যে তাকে মানতে হবে তা তিনি মনে করতেন না। এজন্যে দেখা যায়, রামমোহনের সামাজিক চিন্তায় দেশাচারের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কোন স্থান ছিল না। রামমোহনের বক্তব্য ছিল,"... বিশেষত কোন ব্যক্তি যাহার লোক ভয় ও ধর্ম্মভয় আছে সে এমত কহিবেক না যে পরম্পরা প্রাপ্ত হইলে স্ত্রীবধ মনুষ্যবধ ও চৌর্য্যাদি কর্ম্ম করিয়া মনুষ্য নিষ্পাপে থাকিতে পারে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ পরম্পরাকে মান্য করিলে বনস্থ এবং পর্ব্বতীয় লোক যাহারা২ পরম্পরায় দস্যুবৃত্তি করিয়া আসিতেছে তাহাদিগ্যে নির্দ্দোষ করিয়া মানিতে হয় এবং এ সকল কুকর্ম্ম হইতে তাহাদিগ্যে নিবর্ত্তকরণে প্রয়াস পাওয়া উচিত হয় না"...

(রামমোহন রচনাবলী (হরফ প্রকাশনী) ; ১৩৮০। পৃঃ ১৭৪]

দেশাচারের আলোচনা প্রসঙ্গে রামমোহন বলেছিলেন, কোনটি ধর্ম, আর কোনটি অধর্ম তার বিচার করা হবে শাস্ত্রেরই সাহায্যে। এই জন্যে তিনি শাস্ত্রীয় যুক্তির সাহায্যে দেখিয়েছিলেন, সতী হবার প্রথা একেবারেই অশাস্ত্রীয়। আবার একথাও বলেছিলেন, "যুক্তিতেও অবলাকে স্বর্গাদি প্রলোভ দেখাইয়া বন্ধনপূর্ব্বক বধ করা অত্যন্ত পাপের কারণ হয়।" (তদেব ; পৃঃ ১৭৪)

আগেই বলা হয়েছে, রামমোহনের সমাজচিন্তার মধ্যে শুদ্ধ ধর্মজ্ঞান ও নির্মল বুদ্ধিবাদ থাকবার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক উপলব্ধিও কার্যকরী ছিল। সতীদাহ সম্পর্কিত প্রথম পুস্তিকায় আমরা তার প্রমাণ পেয়ে থাকি। সতীপ্রথার বিরুদ্ধে যুক্তি বিন্যাস করেও তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, "অন্য২ বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে এ যথার্থ বটে কিন্তু বালককাল অবধি আপন প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্য২ গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক স্ত্রীদাহ পুনঃ দেখিবাতে এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে এই নিমিত্ত কি স্ত্রীর কি পুরুষের মরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না।"…(তদেব ; পৃঃ ১৭৫) এখানে তাঁর মানবিকবোধ ও হৃদয়ধর্মেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

সে যুগের অধিকাংশ সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মূলে ছিল নারীজাতির মঙ্গল সাধন চেষ্টা। নারীজাতির ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির ওপর প্রগতিশীল সমাজ-নেতাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। তারা মনে করতেন, সমাজে নারীজাতি সর্বাধিক নির্যাতিত ; সেই কারণেই তারা এগিয়ে এসেছিলেন নারীজাতির উন্নতিবিধানের আন্দোলনে। নারীজাতির প্রতি রামমোহনের শ্রদ্ধাও ছিল অপরিমেয়। নারীজাতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার পরিচয় সতীদাহ সংক্রান্ত তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকে খুবই স্পষ্ট। সেখানে তিনি বলেছিলেন, জ্ঞানমার্গের পথিক হয়ে নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য পালনের অধিকার ও শক্তি নারীরও আছে। বিরোধী পক্ষের বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে তিনি নারীর বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্যান্য গুণের ক া ঘোষণা করেছিলেন। (দ্রঃ তদেব , পৃঃ ২০২-৩)

সতীদাহের পক্ষে এবং রামমোহনের বিরুদ্ধে 'বিপ্র' নামধারী ব্যক্তি বলেছিলেন, সকাম লোকের সংখ্যাই সমাজে বেশি ; সুতরাং সকামকর্ম সতী হওয়া নিন্দনীয় হতে পারে না। এই বক্তব্যে গতানুগতিকতাকে মেনে চলার মনোভাব স্পষ্ট। কিন্তু এর জবাবে রামমোহন যা বলেছিলেন তার মধ্যে

আমরা বলিষ্ঠ প্রগতিশীল সমাজচিন্তার সন্ধান পেয়ে থাকি।

(দ্রঃ তদেব পৃঃ ৩১৮)

তিনি বিশ্বাস করতেন, অধিক সংখ্যক লোক যা করবে তাই-ই যে ভালো তা' নয়। 'বিপ্র' ও 'মুগ্ধবোধ ছাত্র' কাম্য ও নিষ্কাম কর্মের স্বরূপ বিচার করে সহমরণের প্রয়োজন আছে কিনা তা আলোচনা করেছিলেন। শাস্ত্রীয় যুক্তির মধ্যে তা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। তবুও বলা যায়, সহমরণ-সমর্থনের মধ্যে তাঁদের অযৌক্তিক রক্ষণশীল সমাজমনেরই পরিচয় ফুটে উঠেছে।

রামমোহন-আমলের অনেক পরেও সতীপ্রথা নিয়ে আবার বিতর্ক শুরু হয়েছিল। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'সতীদাহ' প্রবন্ধ এবং নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রতিবাদ' শীর্ষক আলোচনা ঐ বিতর্কের সাক্ষ্য বহন করে। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল ব্যক্তি; সতীপ্রথা-রদের আটচল্লিশ বছর পরেও তিনি বলেন, ঐ প্রথারদের আইন বিধিবদ্ধ করা বেন্টিঙ্কের পক্ষে ঠিক হয় নি। তাঁর বক্তব্য "সহমরণ উঠাইয়া দেওয়ায় হিন্দু বিধবার কি লাভ হইয়াছে? এইমাত্র যে তখন একদিন পুড়িত, এখনও পুড়িতে পায়, কেবল মরিতে পায় না।" (বঙ্গদর্শন; ১২৮৪, আষাঢ়)

এই বক্তব্যের প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছিলেন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত মনের মানুষ। সেই মন নিয়েই তিনি সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণ বিচার করতেন। চন্দ্রশেখরের বক্তব্যের বিরোধিতা করে তাই তিনি বলেছিলেন, "শোকাবেগ সম্বরণে অক্ষম হইয়া মুহূর্ত মধ্যে শরীর ভস্মসাৎ করা অপেক্ষা, কি দীর্ঘ জীবনের পরোপকার, ইন্দ্রিয়দমন, সহিষ্ণুতা, ও পবিত্রতার দৃষ্টা (!), শ্রেষ্ঠতর নহে?"··· (বঙ্গদর্শন; ১২৮৪, কার্ত্তিক)

বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিতর্কমূলক পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হয়েছিল সব চাইতে বেশি। এই জন্যে ঐ বিষয়ক বিতর্করচনাতে সে যুগের সমাজনেতা ও শিক্ষিত মানুষের সমাজমনের পরিচয় ফুটে উঠেছিল সর্বাধিক।

প্রথমে বিদ্যাসাগরের কথা বলা যাক। সমাজসংস্কার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে বিদ্যাসাগরীয় যুগ বলা যায়। ঐ দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম বছরেই ঘটেছিল বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারের শুভ সূচনা। সমাজসংস্কারমূলক প্রথম রচনা 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধটিতে বাল্যবিবাহের দোষ নির্ণয় প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর দেশের স্বাস্থ্য, নারীর শিক্ষা,

বিধবার দুঃখজনক অবস্থা, সামাজিক দুর্নীতিবৃদ্ধির কারণ সব কিছুরই কমবেশি উল্লেখ করেছিলেন। এই কারণে এখানে তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সমাজচিন্তার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগর ছিলেন প্রকৃত অর্থে 'হিউম্যানিষ্ট'। মানবকেন্দ্রিক চিন্তা ও মানবিক অনুভূতির গভীরতাই ছিল তাঁর সর্ববিধ সংস্কার আন্দোলনের মূল প্রেরণা। বিধবাবিবাহ আন্দোলন সম্বন্ধে একথা তো বিশেষ ভাবেই সত্য।

এই প্রসঙ্গে যেসব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিদ্যাসাগরকে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদের দুএকটির উল্লেখ করা যেতে পারে—

বিদ্যাসাগর বাল্যকালে এক বিধবা নারীর স্নেহ-সান্নিধ্যে এসেছিলেন; তাঁর নাম রাইমণি। ঐ স্নেহময়ী, শুশ্রূষাপরায়ণা, মাতৃসমা রাইমণির সংস্পর্শে এসে বিদ্যাসাগর সমগ্র নারীজাতির প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তাই বৃদ্ধবয়সে কৃতজ্ঞ চিত্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি বলেছিলেন—

"যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।" [বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (৩য়); সাক্ষরতা প্রকাশন; ১৯৭২। পৃঃ ৪২২]

বেশ বোঝা যায়, সমগ্র নারী জাতিরই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন; এবং তাঁর ঐ পক্ষপাতের মূলে ছিলেন এক দুঃখিনী বিধবা নারী— রাইমণি। সুতরাং বিধবা নারীর বেদনা দূর করে বিদ্যাসাগর যে রাইমণির স্নেহের ঋণ কিছু মেটাতে চান নি তা কি বলা যায়?

বিদ্যাসাগর বৈধব্যের মূর্তি দেখে বারবার বেদনায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। কৈশোরকালে তাঁর এক বাল্য সহচরীর বৈধব্য দেখে তিনি খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। বিহারীলাল সরকার জানিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর ঐ সহচরীর বৈধব্য দেখেই বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। (দ্রঃ বিদ্যাসাগর— বিহারীলাল সরকার; ১৩০১। পৃঃ ৩০৩) যৌবনকালেও একজন নারীর অকাল-বৈধব্য দেখে বিদ্যাসাগর বিশেষভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়ের কাছে বিদ্যাসাগর বেদান্তের পাঠ নিয়েছিলেন কিছুদিন। পণ্ডিত-মহাশয় তখন বেশ বৃদ্ধ। কিন্তু ঐ বয়সেও তিনি বিবাহ করেছিলেন এক অল্পবয়স্কা নারীকে। ছাত্র হলেও প্রিয় ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে তিনি ঐ বিবাহের

বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাকে বিবাহ করতে নিষেধ করলেও তিনি তা শেষ পর্যন্ত শোনেন নি। ঈশ্বরচন্দ্র তখন ঐ অল্প বয়স্ক মেয়েটির আশু বৈধব্যের আশঙ্কায় ব্যথিত হয়ে উঠেছিলেন; এবং কিছুদিনের মধ্যে তাঁর ঐ আশঙ্কা সত্যি বাস্তবে ফলে গিয়েছিল। মনে হয় ঐ ঘটনাও তাঁকে বিধবাবিবাহের প্রবর্তন বিষয়ে ভাবিয়ে তুলেছিল।

দৃষ্টান্ত আর বাড়িয়ে লাভ নেই; এর মধ্যে থেকেই আমরা বুঝতে পারি, নারীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম; বিধবানারীর দুঃখমোচনে ঐ শ্রদ্ধাই তাঁকে প্রবৃত্ত করেছিল অনেকখানি। তাঁর হৃদয় ছিল করুণায় পূর্ণ—নারীর দুঃখ তিনি সইতে পারেন নি কখনও। সেই বেদনাবোধও বিধবানারীর দুঃখমোচনে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বহুবিবাহ-বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বেদনাবোধ প্রেরণা-স্বরূপ হয়েছিল।

কিন্তু তবুও বলবো, বিধবাবিবাহ (বা বহুবিবাহ) সংক্রান্ত আন্দোলনে তিনি যে শুধু এই কারণেই ,নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা' নয়, সমসাময়িক যুগের প্রভাবেও তিনি ঐ আন্দোলন সংগঠনে এগিয়ে এসেছিলেন।

উনিশ শতকের গোড়া থেকেই আমাদের দেশে নব্যশিক্ষা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ মানুষ কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠনের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রামমোহনের 'আত্মীয়সভা'। ঐ সভা প্রতিষ্ঠার পর থেকে রামমোহনের নেতৃত্বে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা কুসংস্কারমুক্তির আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সহমরণ সংক্রান্ত আন্দোলন ছিল সে যুগের প্রথম জোরালো সামাজিক আন্দোলন। অবশ্য বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি বিষয়েও, সমাজে তখন আলাপ-আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সে সব ক্ষেত্রেও রামমোহনের পৃষ্ঠপোষণা কম ছিল না। ১৮৩৩ সালে মৃত্যুর আগে তিনিই ছিলেন সে যুগের অবিসংবাদিত সমাজনেতা;—মৃত্যুর পরেও তাঁর প্রভাব ছিল বেশ সক্রিয়। এই জন্যে বলা যায়, উনবিংশ শতকের প্রথম অর্ধের প্রধান সমাজ নেতা ছিলেন রামমোহন রায়।

রামমোহনের প্রভাব বিদ্যাসাগরের ওপরও এসে পড়েছিল। সতীপ্রথা নিষেধক আইন প্রবর্তিত হয়েছিল ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে। বিদ্যাসাগরের বয়স হবে তখন নয় বছর থেকে সামান্য কিছু বেশি। কাজেই ঐ আন্দোলনের প্রভাব সেই বয়সে তাঁর ওপর কার্যকরী হওয়া সম্ভবপর নয়। তবে সতীপ্রথারদ আইন বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় সমাজ তখন বেশ কয়েক বছর ধরে মুখর ছিল।

তাছাড়া রামমোহনের মৃত্যুর পরেও তাঁকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল নতুন প্রেরণায়। বিদ্যাসাগর তখন কৈশোর অতিক্রান্ত। সামাজিক ও যুগগত অবস্থা বুঝবার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে তখন কিছুটা দেখা দিয়েছিল। বস্তুতঃ পক্ষে নব্যবঙ্গের পীঠস্থান কলকাতার বুকের ওপর অবস্থিত হিন্দুকলেজের পাশে সংস্কৃত কলেজের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মেধাবী তীক্ষ্ণবুদ্ধি কৈশোর অতিক্রান্ত বিদ্যাসাগরের পক্ষে রামমোহন-ভাবনা থেকে দূরে থাকা সম্ভবপর ছিল না। ঐ বয়সে যে তিনি সতীপ্রথারদ আইন সমর্থন করেছিলেন তাও অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়; কেননা বাল্য বয়সেই তিনি রাইমণির সংস্পর্শে এসে সমগ্র নারীজাতির প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। কাজেই ঐ আইনে নারীজাতির—বিশেষ করে বিধবা-নারীর মঙ্গল হবে অন্ততঃ সেটুকু ভেবেও যে তিনি খুশী হয়েছিলেন তা মনে করা অসঙ্গত নয়।

শুধু রামমোহনের প্রভাব নয়, সে যুগের সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রভাবই বিদ্যাসাগরের মানসগঠনে কার্যকরী হয়েছিল; কারণ নব জাগ্রত বাংলাদেশের আন্দোলন-কেন্দ্র কলকাতার ওপর বসে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সেখানেই শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর যুগকে চিনতে পেরেছিলেন। সমাজে তখন রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে—যুক্তিহীনতার নিধনে প্রগতিশীল চিন্তা আঘাত হেনেছিল প্রচণ্ডভাবে। বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন কোমল-হৃদয় বিদ্যাসাগর ঐ আঘাত হানার কাজকেই সমর্থন করেছিলেন; এবং শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীল শক্তির বিরুদ্ধে নিজেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের সমাজমন গঠনে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সমসাময়িক যুগপ্রেরণা উভয়ই কার্যকরী হয়েছিল; তবে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও মানবিক বেদনাবোধ ছিল এক্ষেত্রে প্রধান। বিদ্যাসাগরের দুর্বার হৃদয়বত্তা ও প্রবল দয়াশীলতার কথা মনে রেখে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের সমাজমন গঠনে ধর্মের কি কোন ভূমিকা ছিল?—এক কথায় এর উত্তর, না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোন সমাজ সমস্যাকে তিনি বিচার করেন নি; বিচার করতে চানও নি। বস্তুতঃ ধর্মের প্রসঙ্গ থেকে তিনি সব সময় দূরে থাকতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ধর্ম যে কি, তাহা মনুষ্যের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই।". [বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ—শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন (বুকল্যাণ্ড সংস্করণ); পৃঃ ২৩১]

অবশ্য বিদ্যাসাগরের ধর্মচিন্তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে; কিন্তু আমরা তার মধ্যে না গিয়েও বলতে পারি, ধর্মচিন্তা বিদ্যাসাগরের মধ্যে থাকলেও অন্তত: সমাজসংস্কার আন্দোলনে তার কোন প্রভাব পড়ে নি। প্রশ্ন উঠতে পারে, বিধবাবিবাহের পক্ষে বা বহুবিবাহের বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে তিনি তাহলে কেন শাস্ত্রীয় যুক্তির অবতারণা করেছিলেন? এর উত্তর—আধ্যাত্মিক বিশ্বাস না থাকলে যে শাস্ত্রীয় আলোচনা করা যাবে না তা নয়। তাছাড়া শাস্ত্রভীরু মানুষকে শাস্ত্রের সাহায্যে বোঝাবার জন্যেই তিনি শাস্ত্রের সহায়তা নিয়েছিলেন। বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তকে তিনি সে কথা জানিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের সামাজিক অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম বইটির একেবারে শুরুতে তিনি বলেছিলেন—

"বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে, ইহা এক্ষণে অনেকেরই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অনেকেই স্ব স্ব বিধবা কন্যা ভগিনী প্রভৃতির পুনর্বার বিবাহ দিতে উদ্যত আছেন। অনেকে ততদূর পর্যন্ত যাইতে সাহস করিতে পারেন না; কিন্তু এই ব্যবহার প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়া থাকে।"

[বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (২য়); সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭২। পৃঃ ২১]

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, সমাজ ও যুগ ভেতরে ভেতরে বিধবাবিবাহকে মেনে নিতে চাইছিল। সমাজসচেতন বিদ্যাসাগর যুগের এই দাবী মেনে নিয়েই ঐ বিষয়ে নেতৃত্ব দেবার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। অবশ্য বিধবানারীর জন্যে তাঁর বেদনাবোধ ছিল এই এগিয়ে আসার প্রধান কারণ। যাই হোক, বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত দুটি বইতে তাঁর এই যুগ সচেতনতা ও হৃদয়বত্তার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নারীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধার কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। নারীজাতির ব্যক্তিত্বের প্রতিও তাঁর আস্থা কম ছিল না। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, পুরুষ প্রাধান্যের জন্যে সমাজে নারীজাতি নির্জিত হয়ে আসছে। শাস্ত্রে যেখানে নর-নারীর সমান অধিকারের কথা রয়েছে সেখানে পুরুষ তাকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করে চলেছে। তাঁর বক্তব্য, "…দুর্ভাগ্যক্রমে, পুরুষজাতির অনবধান দোষে, স্ত্রীজাতি নিতান্ত অপদস্থ হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষের ইদানীন্তন স্ত্রীলোকদিগের দুরবস্থা দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

স্ত্রীজাতিকে সমাদরে ও সুখে রাখার প্রথা প্রায় রহিত হইয়া গিয়াছে। ক্রমে ক্রমে এতদূর পর্যন্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, অনেকানেক বিজ্ঞ মহাশয়েরা স্ত্রীজাতিকে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখা মূঢ়তার লক্ষণ বিবেচনা করেন।" [বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (২য়) ; সাক্ষরতা প্রকাশন ; ১৯৭২। পৃঃ ১৫৭]

সমাজসচেতন বিদ্যাসাগর নারীজাতির এই অবহেলিত হবার দিকটি দেখে খুব ব্যথিত হয়েছিলেন। বিধবাবিবাহ ও অন্যান্য সমাজ সংস্কার আন্দোলনে মুখ্যত এই কারণেই তিনি এগিয়ে এসেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের সমাজ-চেতনার আর একটি দিক, যুগানুযায়ী জীবনধারার পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক রীতিতে তাঁর অবিচল বিশ্বাস। এই বিশ্বাস প্রগতিশীল মানুষ ব্যতীত অপর কারও থাকতে পারে না। সমাজ জীবনে এককালের আচার অন্যযুগে পরিবর্তিত হয়। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে মেনে নেওয়াই উচিত। বিদ্যাসাগর তাই-ই মনে করতেন। ভ্রান্ত মানুষকে এই জন্যে তিনি বলেছিলেন, "যদি এই সকল স্থলে নূতন শাস্ত্র অথবা শাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা দেখিয়া, পূর্ব প্রচলিত আচারের পরিবর্তে, যে নূতন নূতন আচার প্রচলিত হইয়াছে, আপনারা তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন ; তবে, হতভাগা বিধবাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মতি প্রদানে এত কাতরতা ও এত কৃপণতা প্রদর্শন করিতেছেন কেন।"··· (তদেব ; পৃঃ ১৬২)

দেশাচার সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের চিন্তাভাবনা কি ছিল তাঁর বিতর্কপুস্তক থেকে তাও জানা যায়। দেশাচারকে তিনি কখনও শাস্ত্রীয় নির্দেশ অপেক্ষা বড়ো মনে করেন নি। তাছাড়া প্রয়োজনবোধে সমাজের উপকারের জন্যে দেশাচারের পরিবর্তন করবারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। দেশাচার মানবার সময় বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত রাখবার কথাও তিনি বলেছিলেন।

বিধবাবিবাহের সমর্থনে মসী হাতে বিদ্যাসাগরের পাশে এসে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন তাঁদের অন্যতম। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (ফাল্গুন, ১৭৭৬ শক) বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' প্রস্তাব প্রকাশিত হবার পরে ঐ পত্রিকার ঠিক পরবর্তী সংখ্যায় অক্ষয়কুমার দত্ত বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করে একটি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন, একথা আগেই বলা হয়েছে। অক্ষয়কুমার ছিলেন যুক্তিমার্গের পথিক। বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকার দরুন যে অবস্থা সমাজে দেখা দিয়েছিল তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেই তিনি বিধবাবিবাহ সমর্থন করেছিলেন। বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকার

সমস্যা বিশ্লেষণে তাই অক্ষয়কুমারের সামাজিক অভিজ্ঞতা ও বস্তুধর্মী চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সমাজচিন্তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদই প্রবল।

অবশ্য মানবিক বোধ ও অনুভূতি যে তাঁর সমাজচিন্তার মূলে একেবারে অনুপস্থিত ছিল তা নয়; সেই জন্যেই যুক্তির দ্বারা আপনার বক্তব্য প্রতিষ্ঠার পরেও মানবিকতার কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেছিলেন—

"যাঁহার কিছুমাত্রও হিতাহিত বোধ আছে, ও যাঁহার অন্তঃকরণে কস্মিন কালে কারুণ্যরসের সঞ্চার হয়, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা?" যিনি কোন নব-বিধবা তরুণী স্ত্রীকে সগুমৃত প্রিয় পতির শোক-মোহে মুহ্যমানা, ধরাতলে লুণ্ঠমানা ও অহর্নিশ রোরুদ্যমানা দর্শন করিয়া কাতর হইয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা?"...[সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২য়)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত; ১৯৬৩। পৃঃ ১৬১]

বিধবাবিবাহের সমর্থনে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা' গ্রন্থেও প্রগতিশীল সমাজচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি শাস্ত্র ও যুক্তি উভয় দিক থেকেই বিচার করে দেখেছিলেন। অবশ্য শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তিই ছিল তাঁর কাছে বড়। তাই তিনি বলেছিলেন—"যুক্তিযুক্ত যাহা তাহাই শাস্ত্র এবং অযৌক্তিক কথাই অশাস্ত্র।" (বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; ১২৯২। পৃঃ পাঁচ আনা) এই মানসিকতা নিয়েই তিনি বলেছিলেন, "বিধবার বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত না হইলেও উচিত, কেননা যদি তাহা যুক্তির অনুমোদিত হয়।" (তদেব; পৃঃ সাত আনা)

যুক্তিবাদী দেবেন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা এই মানসিকতার জন্যেই গোড়ামি-মুক্ত।

বিরোধীপক্ষের অন্যতম বক্তব্য ছিল, বিধবাবিবাহ চালু থাকলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটবে। তার জবাবে দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"দেশের লোকবৃদ্ধির উপর হিতৈষীর যদি এত ভয়, তবে এমন একটা রাজাদেশ (Law) প্রচার করিয়া দেওয়া উচিত যাহাতে প্রত্যেকেই একটির অধিক সন্তান উৎপন্ন করিলে কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হইবেন। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, দেশের দরিদ্রতা নিবারণের কি কোন উপায় নাই? দেশের

দরিদ্রতা নিবারণের শত শত উপায় আছে।...রত্নগর্ভা বহু শস্যশালিনী ভারত ভূমি এমন স্থান নয় যে, ইহাতে জনসংখ্যা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইলে তাহাদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ অসাধ্য হইয়া উঠিবে।" (তদেব ; পৃঃ ৪৭)

এই বক্তব্যের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানসম্মত ও বস্তু ভিত্তিক চিন্তার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে দেশের লোকসংখ্যা বেড়ে যাবে, এ কি একটা যুক্তি! উদ্ধৃত অংশে দেবেন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার সঙ্গে অর্থনৈতিক চিন্তাও যুক্ত হয়েছিল।

বিধবাবিবাহের পক্ষে দেওয়া যুক্তিগুলির মধ্যেও দেবেন্দ্রনাথের বাস্তব অভিজ্ঞতাপুষ্ট সমাজচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ যুক্তিগুলির একটি হলো, বিধবাবিবাহের প্রচলনে পারিবারিক অশান্তি দূর হয়। বাংলাদেশে বিধবানারীর সঙ্গে সহাবস্থানের ফলে অধিকাংশ পরিবারেই অশান্তি দেখা দিত (এখনও যে দেখা দেয় না তা নয়)। অপর যুক্তি হলো, বিধবাবিবাহ চালু থাকলে বয়স্ক পুরুষ বয়স্কা নারীকে বিবাহ করবার সুযোগ পেতে পারে। সে সময় বয়স্ক পুরুষকে অনন্যোপায় হয়ে বালিকা বিবাহ করতে হতো। তার ফলে বেশ সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

এবার দেখা যাক, বিধবাবিবাহ-বিরোধীদের পুস্তক-পুস্তিকায় তাঁদের সমাজচিন্তার কি পরিচয় পাওয়া যায়।

পীতাম্বর সেন ছিলেন ভয়ানক রক্ষণশীল মনোভাবের মানুষ। বিধবানারীর সমস্যা তাঁর কাছে কোন সমস্যা বলে স্বীকৃত হয় নি। তাঁর রক্ষণশীল মানসিকতার কাছে মানবিকতার কোন স্থানই ছিল না। পীতাম্বরের অন্যতম বক্তব্য ছিল, পূর্বজন্মের পাপের জন্যে নারী বিধবা হয়ে থাকে—এহেন অবস্থায় আর তার পুনর্বিবাহের প্রয়োজন কি! [দ্রঃ বিধবাবিবাহ নিষেধঃ— পীতাম্বর সেন ; (প্রকাশকাল অজ্ঞাত) পৃঃ ৮] শুধু পীতাম্বর সেনই নন, সে যুগের আরও অনেক রক্ষণশীল মানুষ এই যুক্তিতে বিধবানারীর সমস্যাটিকে লঘু করে দেখেছিলেন।

দেশাচার সম্পর্কেও পীতাম্বর সেনের চিন্তা প্রগতিশীল ছিল না। দেশাচারকে তিনি শাস্ত্র অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন। দেশাচারের তুচ্ছতা ও পরিবর্তনশীলতা সম্বন্ধে প্রগতিশীল সমাজ নেতারা যে সব শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করেছিলেন, সেগুলি তিনি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর

সিদ্ধান্ত "...শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম লোকদ্বিষ্ট হইলে করিবে না এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মই লোকাচার হইলে কর্ত্তব্য। যেহেও লোকে যাহা বিদ্বেষ করে সে কদাপি স্বর্গ্য (!) নহে যথা অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং। এতদ্বাক্য দ্বারাই নূতন প্রথা সর্ব্বথা অসিদ্ধা।" (তদেব ; পৃঃ ১৯-২০)

সংরক্ষণী মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে যুগসচেতন হওয়া সম্ভবপর নয়। যুগের প্রয়োজন ও চাহিদাকে তারা চোখ বুজেই অস্বীকার করতে চায়। নন্দকুমার কবিরত্ন ছিলেন এমনই একজন। বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তকে জানিয়েছিলেন, সমাজের এক অংশ ভেতরে ভেতরে বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল ; অনেকে তাদের বিধবা ভগ্নি-কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত ছিল ; তবে সংস্কারের ভয়ে তারা এগিয়ে আসতে পারে নি। রক্ষণশীলতার পৃষ্ঠপোষক নন্দকুমার বিদ্যাসাগরের ঐ বক্তব্যের জবাবে লিখেছিলেন—

"...বিধবাকন্যা ভগিনী প্রভৃতির বিবাহ না দিলে আর কোন মতে ধর্ম্মরক্ষা হয় না ; তাঁহারদিগের এ পথ দূরতর নহে বরং অতিনিকট হইয়াছে শুভ যাত্রা করিলেই পাবেন,...যদি কেহ আপনার গলদেশে রজ্জু প্রদানে ; বা ; বিষাদি পানে আত্মপ্রাণকে নিতান্তই নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে তাহাকে রক্ষা করিতে কে শক্ত হয়।"

[বৈধব্য ধর্ম্মোদয় (১ম পুস্তক)—নন্দকুমার কবিরত্ন ; প্রকাশ কাল বা সংস্করণ অজ্ঞাত ; পৃঃ ৭]

এই বক্তব্যে যুগমানসকে নির্লজ্জভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। এই নির্লজ্জতার মূলে, বলাবাহুল্য, নন্দকুমারের রক্ষণশীল সমাজচিন্তাই সক্রিয়।

প্রচলিত সংস্কার বা সামাজিক প্রথাকে মেনে চলার অন্ধতা নন্দকুমারের (এবং আরও অনেকের) এত বেশি ছিল যে আপনার রক্ষণশীলতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার অছিলায় শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। 'নষ্টে মৃতে' বচনে যে 'পতি'র কথা রয়েছে তাকে নন্দকুমার 'উপপতি' বলতে চেয়েছিলেন এই একই কারণে। (তদেব ; পৃঃ ৩৩) কিন্তু 'পতি' শব্দে 'উপপতি' বুঝবার কোন কারণ নেই।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকার জন্যে সমাজে যে অধঃপতন ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি দেখা দিয়েছিল নন্দকুমার তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন ; কিন্তু আশ্চর্য, তবুও তিনি বিধবাবিবাহ সমর্থন করতে পারেন নি। ঐব্যভিচার নিবারণের

পন্থা সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, নারীপুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে "স্ত্রীলোকের নাসাকর্ণ ও পুরুষের শিশ্ন ছেদ্য হইবে।" এ কি কোন যুক্তি? ঐ ভাবে কি ব্যভিচার কোন দিন দূর হয়? তাই বলা যায়, ঐ যুক্তির মধ্যে রক্ষণশীল নন্দকুমারের অবৈজ্ঞানিক সমাজচিন্তাই নিহিত রয়েছে।

'বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ' গ্রন্থে প্রসন্নকুমার শর্মার সমাজচিন্তাও বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাঁর মতে কোন ধরণের আচার-আচরণ করলে মানুষের সৎপ্রবৃত্তির প্রবলতা ঘটে এবং কোন ধরণের আচরণ মানুষকে অধঃপতিত করে শাস্ত্র রচয়িতৃগণ তার নির্দেশ করে সৎ প্রবৃত্তির উদ্বোধন সাধক আচরণ পালনের বিধান দিয়ে থাকেন। তবে প্রসন্নকুমারের মতে, মানুষের মধ্যে সৎপ্রবৃত্তির জাগরণ ঘটলেই মানুষ শাস্ত্রীয়বিধি মেনে চলতে পারে;—মেনে চলবার প্রবৃত্তিও তখন জন্মে থাকে। কিন্তু "যখন লোকসমাজে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফেলে, তখন সমাজের ধর্ম্মশক্তি দুর্ব্বল, কাজেই সকল বৈধ আচার সর্ব্বাঙ্গীন অনুষ্ঠান করিতে অক্ষম সুতরাং শাস্ত্রোক্ত বিহিত আচারগুলির মধ্যে যেগুলি সম্পূর্ণ শক্তিসাধ্য, সেগুলি তদবস্থার অনোপযোগী বলিয়া পশ্চাৎ রাখিয়া যাহা সুলভ সাধ্য অথবা তদবস্থার উপযোগী, তাহাই আচরণীয় হইয়া উঠে। এমত স্থলে সমাজের অবস্থা বিশেষ প্রণিধান করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিহিত কার্য্যগুলির মধ্যে যে গুলি সহজসাধ্য এবং যাহাতে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি ক্রমশঃ পুনঃ সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা সমাজ সংস্কারক দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।"

(বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ—প্রসন্নকুমার শর্মা; ১২৯৩। পৃঃ ২২)

প্রসন্নকুমারের সমাজচেতনা এখানে স্পষ্ট ভাবেই ধরা পড়েছে। সমাজে ন্যায় শক্তি বা অন্যায় শক্তির জাগরণ ঘটলে কি হয়ে থাকে এবং তখন সমাজ সংস্কারকদের সমাজরক্ষার জন্যে কি করা উচিত সে সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য একেবারে অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। কিন্তু ঐ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যখন বলেন, বিধবাবিবাহ আচরিত হলে সমাজ অধঃপতিত হবে তখন আর তাঁকে সমাজোন্নতি সাধক বলে ভাবা যায় না। বিধবানারীর কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাতে বিধবানারীর সামাজিক সত্তা অস্বীকৃত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, বিধবার কর্তব্য দেবপূজা, আচারাদি পালন এই সব। ঘরের কাজে তাকে আটকে রাখলে তার কর্তব্যে ব্যাঘাত ঘটবে এই

মনোভাব বিধবানারীকে সমাজ থেকে দূরেই সরিয়ে রাখে; কিন্তু তা' কি বাঞ্ছনীয়?

বিগত শতকে এমন অনেক ব্যক্তিও ছিলেন যাঁরা বিধবাবিবাহ সমর্থন না করলেও বিধবানারীর প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করতেন, নারী যাতে বিধবা না হতে পারে বিবাহের আগে সে দিকেই দৃষ্টি রাখতে হবে। অকালমৃত্যু এসে যাতে পুরুষকে ছিনিয়ে নিতে না পারে তার জন্যে পাত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া প্রয়োজন। যোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি এই মতের পোষক ছিলেন (দ্রঃ আর্য্যমহিলাদের দুইবার বিবাহ কি রূপে?—যোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি; ১৮৯৯; পৃঃ ৪১) কিন্তু এইভাবে কি বৈধব্য ধ্বংস করা যায়? আসলে বিধবানারীর প্রতি সহানুভূতি থাকলেও যোগীন্দ্রনাথ রক্ষণশীল মনের মানুষ ছিলেন। বিধবার ব্রহ্মচর্য পালনের কথাই তিনি বলেছিলেন।

কৌলীন্য ও বহুবিবাহ বিষয়ক বিতর্কমূলক রচনাগুলিতেও সে সময়ের মানুষের সমাজভাবনার পরিচয় ফুটে উঠেছিল।

বহুবিবাহ নিবারণ আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যাসাগর তাঁর অন্যতম নেতা ছিলেন। পরবর্তীকালে ঐ আন্দোলনকে জোরদার করবার জন্যে তিনি বহুবিবাহ বিষয়ক পুস্তক রচনা করেছিলেন। বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তকে তাঁর যে সমাজভাবনার পরিচয় পেয়েছি এখানেও সেই একই সমাজভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মনে করতেন, পিতৃকেন্দ্রিক সমাজে পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে নারীজাতিকে অনেক দুর্ভোগের মধ্যে ফেলেছিল। পৃথিবীর সর্বত্র এমনটি দেখা গেলেও বিদ্যাসাগরের মতে, বাংলাদেশে স্ত্রীজাতির দুঃখ ঐ কারণেই সব চাইতে বেশি। বিদ্যাসাগর পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবস্থা চিন্তা করে স্ত্রীজাতির ওপর সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিলেন। এই মনোভাব তাঁর সমাজচিন্তার একটি বিশেষ দিক। বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তিকাতেও তাঁর এই মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। তবে দেখা যায়, বহুবিবাহ বিষয়ক রচনা দুটিতে তিনি যেন একটু হতাশাক্লিষ্ট। বহুবিবাহের বিলোপ বিষয়ে রাজআইনের প্রয়োজন আছে কিনেই তার আলোচনায় বিদ্যাসাগরের এই মনোভাব বোঝা যায়। (দ্রঃ বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ (২য়); সাক্ষরতা প্রকাশন; ১৯৭২। পৃঃ ২১২)

বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ বিষয়ে রাজআইন প্রার্থনা করেছিলেন। সহরের শিক্ষিত মানুষ দেখে তিনি গোটা দেশটার প্রকৃতি বিচার করতে চান নি। পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাবে বহুবিবাহ কমে আসছে এবং ধীরে ধীরে তা বিলুপ্ত হবে; অতএব বহুবিবাহ নিবারণের জন্যে রাজআইনের প্রয়োজন নেই—এই মত তিনি আদৌ সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর কথা, কলকাতা বা তার নিকটবর্তী স্থান বাদ দিলে বৃহত্তর পল্লীসমাজে অর্থাৎ প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতার আলো প্রবেশ করতে পারে নি। এই কারণে কলকাতা বা তার আশেপাশের অঞ্চলের কথা মনে রেখে পল্লীবাংলার বিচার করা সঙ্গত হবে না। বিদ্যাসাগরের এই বক্তব্যের মধ্যে সামাজিক অভিজ্ঞতা ও বাস্তব চিন্তার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

১৭৭৭ শকাব্দের চৈত্র, ১৫২ সংখ্যা, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'বহুবিবাহ' শীর্ষক দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধে সম্পাদক মহাশয় বলেছিলেন, দেশের মানুষ যুক্তি দিয়ে বিচার করে যাকে সমর্থন করতে পারে না, সংস্কারবশতঃ তারই বশ্যতা মেনে চলে। বহুবিবাহ সম্পর্কেও দেশের মানুষের এই মনোভাব দেখা যায়। বহুবিবাহের বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন, সমাজে নারীর অবস্থা কি মর্মান্তিক। পুরুষের অন্যায় ব্যবহারই তার কারণ। ঐ সামাজিক সমস্যাটির বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছিলেন, বহু-বিবাহের ফলে পারিবারিক স্নেহপ্রেমের স্ফূরণ ঘটতে পারে না। তার ফলে পরিবারে প্রবেশ করে ব্যভিচার। পরে পারিবারিক সমস্যাই ব্যাপকতা লাভ ক'রে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। সম্পাদক মহাশয় ঐ সমস্যার বিশ্লেষণে মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানেরও পরিচয় দিয়েছিলেন; অবশ্য সেযুগের অন্যান্য প্রগতিশীল সমাজনেতাও এই দিকটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে লেখক কিন্তু দেশের মানুষকেই বহুবিবাহের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে বলেছিলেন—এ বিষয়ে সরকারী বিধিনিষেধ তিনি সমর্থন করতে পারেন নি।

পরবর্তীকালে ১৭৭৮ শক, ভাদ্র, ১৫৭ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'বহুবিবাহ' শীর্ষক অন্য একটি প্রবন্ধে রাজআইনের পক্ষে বক্তব্য রাখা হয়েছিল; তবে তখন সম্পাদক ছিলেন নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্বে ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত।

বহুবিবাহ-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে তিনি যে পুস্তক রচনা করেছিলেন তার মধ্যে তাঁর সমাজ ভাবনা বিধৃত হয়ে আছে। রাসবিহারী নিজে ছিলেন একজন ভঙ্গকুলীন। কিন্তু তাহলেও, কৌলীন্যের ভয়াবহ রূপ দেখে তিনি ঐ প্রথার পরিবর্তন চেয়েছিলেন। কুলীনদের ঘরে ঘরে গিয়ে তিনি যে ভাবে তাদের কৌলীন্যের বিরুদ্ধে সংগঠিত করবার চেষ্টা করেছিলেন তা বিস্ময়কর। কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথার কুফল সম্বন্ধে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, কৌলীন্য ও বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন সংগঠনে তাই-ই ছিল তাঁর মুখ্য প্রেরণা। তার সঙ্গে অবশ্য রাসবিহারীর সামাজিক অভিজ্ঞতাও যুক্ত হয়েছিল। কুলীনকন্যাদের অবস্থা বর্ণনায় তাঁর এই অভিজ্ঞতার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। (দ্রঃ কৌলীন্যসংশোধিনী—রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়; ১৮৭১। পৃঃ ২) রাসবিহারী বহুবিবাহ নিবারণে রাজআইনের পক্ষপাতী ছিলেন। ঐ আইন প্রার্থনার যে কারণ তিনি দেখিয়েছিলেন তার মধ্যে রাসবিহারীর বস্তুধর্মী চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে 'কুলকালিমা' নামক সে যুগের বিখ্যাত গ্রন্থটিতে অজ্ঞাতনামা রচয়িতার সামাজিক চিন্তার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা করা যেতে পারে।

গ্রন্থটিতে কৌলীন্য ও বহুবিবাহ জনিত সামাজিক অধঃপতনের ভয়ঙ্কর চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। রচয়িতা বলেছিলেন, কৌলীন্যের প্রচলন একদিন ঘটলেও সামাজিক কল্যাণের জন্যে এখন তার পরিবর্তন প্রয়োজন। তিনি এ কথা বলেছিলেন, কৌলীন্যপ্রথার মধ্যে কালে কালে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে; বর্তমানে আবার তার মধ্যে পরিবর্তন আসা দরকার। এই বক্তব্যের মধ্যে যুক্তিবাদী বস্তুনিষ্ঠ সমাজমনের সন্ধান পাওয়া যায়।

কিন্তু বহুবিবাহ নিবারণের উপায় হিসেবে তিনি রাজআইনের বিরোধিতা করেছিলেন। ঐ বিরোধিতায় তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতার অভাব লক্ষিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বহুবিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে আমরা তাঁর যে সমাজচিন্তার পরিচয় পাই তা খুব বিজ্ঞান সম্মত নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক-বিচ্ছুরণের ফলে বহুবিবাহ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তার জন্যে কোন আন্দোলনের প্রয়োজন নেই, এই ছিল বঙ্কিমের বহুবিবাহ নিবারণ সম্পর্কে মূল বক্তব্য। এই বক্তব্যে সত্যতা কিছু থাকলেও বঙ্কিম আসলে মূল সমস্যাকে পাশ কাটাতেই

চেয়েছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, সমগ্র বাংলা দেশের কথা মাথায় রেখে এই বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র রাজআইন প্রসঙ্গে বলেছিলেন, দেশে যেমন হিন্দু আছে তেমনি মুসলমানও রয়েছে। "হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল, এমত নহে। কিন্তু বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া, মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধি দ্বারা নিষিদ্ধ হইবে ?" [বঙ্কিম রচনাবলী (২য়) ; সাহিত্য সংসদ ; ১৩৭১। পৃঃ ৩১৮]

বঙ্কিমের এই বক্তব্যে বৃহত্তর সমাজদৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায় বলে আপাততঃ মনে হলেও আসলে কিন্তু তা সত্য নয়। কেননা, বহুবিবাহ রদ করে যে আইন করবার প্রার্থনা জানানো হয়েছিল তাতে ঐ প্রশ্ন ওঠার কোন সম্ভাবনা ছিল না। উঠলেও তার জবাব ছিল। আসলে আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বিদ্যাসাগরের প্রতি যতখানি বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় বঙ্কিমের সমাজচিন্তার পরিচয় ততখানি পাওয়া যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধটির প্রতিবাদে প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন ও বহুবিবাহ' শীর্ষক পুস্তিকাটিতে কিন্তু রচয়িতার প্রগতিশীল সমাজচিন্তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। তিনি রাজআইনের পক্ষপাতী ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ও বহুবিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে তিনি বলেছিলেন—

"মুসলমানদিগের বিষয় পরে হইবে তজ্জন্য এত উৎকণ্ঠা কেন ? সম্প্রতি, কিসে এই কুপ্রথা হিন্দু সমাজ হইতে উঠিয়া যায় সেই জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এত যত্ন। পাঠক মহাশয়েরা মনে করিবেন না, আমরা এমনই স্বার্থপর ; আমাদিগের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, মুসলমানদিগের মধ্য হইতেও এ প্রথা উঠিয়া যাউক, "……

[বঙ্গদর্শন ও বহুবিবাহ ; রচয়িতার নাম ও প্রকাশকাল অজ্ঞাত ; পৃঃ ১০]

'হিন্দুবিবাহ সমালোচন' (২য় খণ্ড) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বহুবিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে ভুবনেশ্বর মিত্র বহুবিবাহ দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে বলেছিলেন, একাধিক বিবাহ করলে পুরুষ সামাজিক দণ্ড ও রাজদণ্ড উভয়ই ভোগ করবে। শুধু তাই-ই নয়, দ্বিতীয় স্ত্রী ও তার গর্ভজাত সন্তান তার সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হবে। সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে তাঁর এই কঠোরতা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বলিষ্ঠ উদারপন্থী সমাজচিন্তার সঙ্গে এর যোগ রয়েছে।

বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা নিয়ে বিদ্যাসাগর যে পাঁচজন রক্ষণশীল তার্কিক

লেখকের সঙ্গে মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, বলাবাহুল্য, তাঁদের সমাজচেতনা রক্ষণশীলতায় দুষ্ট। সামাজিক কুপ্রথার কাছে তাঁরা নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এই কারণে নিজেদের সংস্কারান্ধতাকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে শাস্ত্রীয় বচনের অপব্যাখ্যা করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হন নি।

স্ত্রী-শিক্ষা সংক্রান্ত বিতর্কমূলক রচনাগুলিতেও আমরা রচয়িতাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়ে থাকি। রচয়িতৃগণ নারীকে যে সামাজিক মর্যাদা দিয়ে তার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তাকে বিশ্লেষণ করেছিলেন তার আলোচনা করলেই ঐ পরিচয় পাওয়া যাবে।

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার তাঁর 'স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক' গ্রন্থটিতে স্ত্রী-শিক্ষার সামাজিক প্রয়োজনের দিকটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন। এখানে তাঁর উদার সমাজ-ভাবনা বেশ স্পষ্ট।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা' নামের নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটিতেও প্রাবন্ধিক নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর মতে সমাজের কোন সদনুষ্ঠানই স্ত্রী-শিক্ষা ব্যতিরেকে সফল হতে পারে না। তিনি জানিয়েছিলেন—

"রমণীগণের জ্ঞানবিরহে দেশের কি অসঙ্খ্য অনিষ্ট ঘটিতেছে, দুষ্কর্ম্ম, কুব্যবহার, এবং নির্লজ্জতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা সভা, পাঠশালা, প্রকাশ্য পত্র সংস্থাপন দ্বারা দেশের সুখ, সভ্যতা, সৎকর্ম্ম, ও জ্ঞানোন্নতির নিমিত্তে যত্ন করিতেছি, কিন্তু স্ত্রীলোকের শিক্ষার প্রতি অযত্ন সত্ত্বে সে অভিপ্রায় কদাপি সুসম্পাদ্য নহে।"

[সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৩য়)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত; ১৯৬৪। পৃঃ ৫৭৮]

স্ত্রী-শিক্ষার যে সামাজিক গুরুত্ব এখানে তুলে ধরা হয়েছে, সে যুগের সকল প্রগতিশীল ব্যক্তি তা কমবেশি মেনে নিয়েছিলেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার ছিলেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র;—বিদ্যাসাগরের বন্ধু ও সহকর্মী। তৎকালীন প্রগতিশীল সমাজের প্রভাবে এবং সৎশিক্ষার স্পর্শে গোঁড়া ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে হয়েও তিনি স্ত্রী-শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। অন্য প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তবে স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রেই তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন সর্বাধিক। বেথুনের স্কুল চালনায় তাঁর সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিনা

বেতনে সেখানে তিনি অধ্যাপনাও করেছিলেন। উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনাতেও তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। উদার সমাজচিন্তাই ছিল এসবের মূলে। 'স্ত্রীশিক্ষা' শীর্ষক বিখ্যাত নিবন্ধটিতে তাঁর এই উদার সমাজচিন্তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। সমগ্র সমাজের উন্নতির কথা চিন্তা করে তিনি স্ত্রী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

মদনমোহন সমাজে নারীকে বিদ্যাবতী রূপে দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি চাননি, নানা ব্রত অনুষ্ঠানে এবং তুচ্ছ ও নিন্দনীয় কাজে অন্তঃপুরে তারা বন্দী হয়ে থাকুক। সমাজে শিক্ষিত হয়ে নারী নানাভাবে নিজেকে বিকশিত করতে পারে এ বিশ্বাস মদনমোহনের ছিল। নারীকে তিনি সমাজে পূর্ণবিকশিত অবস্থাতেই দেখতে চেয়েছিলেন।

সে যুগের অন্যতম সমাজসচেতন ব্যক্তি তারাশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয়ও স্ত্রী-শিক্ষার সামাজিক গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মেয়েদের লেখাপড়া শেখালে সমাজজীবন থেকে অনেক কুসংস্কার দূর হয়ে যাবে। তিনি তাঁর 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' গ্রন্থে লিখেছিলেন, শিক্ষিত হলে কৌলীন্য মর্যাদা বজায় রাখবার জন্যে পিতামাতা অযোগ্য মূর্খ পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে উদ্যত হলেও কন্যা তার প্রতিবাদ করতে সক্ষম হবে। শুধু তাই নয়, লেখাপড়া জানলে মাতা কন্যার বাল্যবিবাহও পছন্দ করবে না। স্ত্রী-শিক্ষার এই সামাজিক গুরুত্ব নির্ণয় করে তারাশঙ্কর তাঁর উন্নত সমাজচিন্তারই পরিচয় দিতে পেরেছিলেন।

স্ত্রী-শিক্ষা সমর্থক দ্বারকানাথ রায়ও সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রে স্ত্রী-শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তবে দেখা যায়, মেয়েদের চাকুরীর তিনি সমর্থক ছিলেন না। শিক্ষিত হলে মেয়েরা পুরুষ অপেক্ষাও ভালভাবে কাজকর্ম সম্পন্ন করতে পারে একথা স্বীকার করে নিয়েও 'কষ্টসাধ্য রাজকর্ম্মে' তিনি তাদের প্রেরণ করতে চান নি। তিনি এর যে সব কারণ দেখিয়েছিলেন তাদের মধ্যে দুটি হলো—

"গৃহলক্ষ্মীকে কি পরশুশ্রূষায় নিযুক্ত করা বুদ্ধিবৃত্তিধারী জীবের কর্ত্তব্য ?"

"বিশেষতঃ বহুজন সমাকীর্ণ প্রকাশ্য কর্ম্মস্থলে অবলাদিগকে প্রেরণ করা বিহিত নহে ; কি জানি কোন সময়ে কি মতি হইতে পারে, বলা যায় না।"

(স্ত্রীশিক্ষাবিধান—দ্বারকানাথ রায় ; ১৮৫৭। পৃঃ ৫)

দ্বারকানাথের এই বক্তব্যে কিন্তু কিছুটা গোঁড়ামির ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষিত মেয়েদের চরিত্রের ওপর তাঁর আস্থার অভাব বাঞ্ছনীয় নয়।

কিন্তু মেয়েদের চাকরী করার ব্যাপারে পেছুটান থাকলেও, স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়ে তিনি উদারপন্থীই ছিলেন। সমাজের অধিকাংশ কুৎসিত দেশাচারের প্রচলন হয়েছে নারীজাতির অজ্ঞতার জন্যে—অনেকের মতো দ্বারকানাথও এ কথা বিশ্বাস করতেন।

স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে রচিত 'নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থের লেখক কালীপ্রসন্ন ঘোষ ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। দেশবিদেশের খবরাখবর তিনি রাখতেন। নারীর উন্নতি সম্বন্ধে তিনি পাশ্চাত্য মানুষের উদার দৃষ্টিভঙ্গি কাম্য মনে করেছিলেন। কালীপ্রসন্নের মতে বিশ্ব যেমন রৌদ্র চায়, তেমনি চায় জ্যোৎস্নাও। নর ও নারী হলো এই রৌদ্র ও জ্যোৎস্না। সমাজের উন্নতি উভয়ের উন্নতির ওপরই নির্ভরশীল।

স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ কি ভাবে উন্নত সমাজচিন্তার আলোকে স্ত্রী-শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিলেন এতক্ষণ তাই বিচার করা গেল। অবশ্য এঁদের সমাজসচেতনতা আলোচনা করবার সময় রক্ষণশীল ব্যক্তিদের চিন্তাধারারও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে লেখা গদ্য রচনা বেশি পাওয়া যায় নি; তবে স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থক তার্কিক লেখকেরা স্ত্রী-শিক্ষাবিরোধী বক্তব্যের যে উত্তর দিয়েছিলেন তার মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষাবিরোধী ব্যক্তিদের সমাজ-চেতনার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৪৯ সালের মে মাসের 'সংবাদ প্রভাকরে' 'স্ত্রীবিদ্যা এবং চন্দ্রিকা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। 'সমাচারচন্দ্রিকা' ছিল রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র। সমাজের যে কোন প্রগতিমূলক কাজের বিরোধিতা করা ছিল তার কাজ। স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়েও এই পত্রিকায় নির্লজ্জ রক্ষণশীলতা প্রকাশ পেতো। পূর্বে উল্লিখিত তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় 'সমাচারচন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত বক্তব্যেরই সমালোচনা করা হয়েছিল। মেয়েদের পাঠশালায় পাঠানো সম্বন্ধে 'চন্দ্রিকা'য় লেখা হয়েছিল, "বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলে ব্যভিচার সংঘটনের শঙ্কা আছে, কেননা বালিকাগণ কামাতুর পুরুষের দৃষ্টিপথে পড়িলে অসৎ পুরুষেরা তাহারদিগকে বলাৎকার করিবে, অল্প বয়স্ক বলিয়া ছাড়িবে না, কারণ খাদ্যখাদক সম্বন্ধ।" [সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (১ম)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত; ১৯৬২। পৃঃ ৩১১] 'চন্দ্রিকা' সম্পাদকের এহেন উক্তি শুধু রক্ষণশীল সমাজভাবনারই পরিচায়ক নয়, তা' নীচ মনো-বৃত্তিরও পরিচয় বহন করে।

বাল্যবিবাহ বিষয়ক বিতর্করচনাতেও বিভিন্ন রচয়িতার সমাজচিন্তার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। 'বাল্যবিবাহের দোষ' শীর্ষক প্রবন্ধটি বিদ্যাসাগরের প্রথম সমাজসংস্কার মূলক রচনা একথা আগেই বলা হয়েছে। এই প্রথম রচনাটিতেও বিদ্যাসাগরের উদার প্রগতিশীল কুসংস্কার-বিরোধী সমাজচেতনার বলিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়।

'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা'য় (১২৮২, কার্ত্তিক) প্রকাশিত 'বাল্যবিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে বাল্যবিবাহ জনিত সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। প্রায় সব প্রগতিশীল প্রাবন্ধিক বা পুস্তকরচয়িতাই বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বাল্যবিবাহকে সামাজিক অধঃপতনের কারণ বলে অভিহিত করেছিলেন। কেউ বাল্যবিবাহকে 'ব্যভিচার' বলেছিলেন, কেউবা তাকে অসভ্য দেশের রীতি বলে মনে করেছিলেন। দেশের দারিদ্র্যবৃদ্ধির কারণ রূপেও অনেকে বাল্যবিবাহকে দায়ী করেছিলেন। এই সব বক্তব্যের মধ্যে বক্তাদের উন্নত সমাজভাবনাই ফুটে উঠেছিল।

'বাল্যবিবাহ' (১২৯৪) নামের বইটিতে রামচন্দ্র দত্তের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বস্তুধর্মী বিচার প্রবণতাই ধরা পড়েছে। গ্রন্থরচনার শুরুতেই তিনি বলেছিলেন—

"আমাদের মধ্যে আজকাল বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গটী অতি গুরুতর রূপে আন্দোলিত হইতেছে। কি বৃদ্ধবৃদ্ধা, কি প্রৌঢ়প্রৌঢ়া, কি যুবকযুবতী, কি বালকবালিকা বিবাহ কার্য্যে সকলেরই সমভাবে সম্বন্ধ আছে। সুতরাং ইহাদের প্রত্যেকের নিজনিজ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া উচিত।" (বাল্যবিবাহ—রামচন্দ্র দত্ত ; ১২৯৪। পৃঃ ১)

রামচন্দ্র যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সামাজিক প্রথার বিচার করতে অগ্রসর হয়েছিলেন এখানে তা বেশ বোঝা যায়। লেখক বাল্যবিবাহ প্রথার পেছনে তৎকালীন সমাজের এক নির্লজ্জ স্বার্থপরতা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অল্প বয়সে ছেলের বিবাহ দিলে প্রাপ্ত বরপণ ইত্যাদি লাভ করা পিতার পক্ষে সহজ হয় ; লেখাপড়া শিখিয়ে সাবালক অবস্থায় ছেলের বিবাহ দিলে ঐ বরপণ ইত্যাদি থেকে পিতার বঞ্চিত হবার সম্ভাবনাই বেশি।

বাল্যবিবাহের সমর্থক গোষ্ঠীও সে যুগে কম শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু ঐ গোষ্ঠীর চিন্তাধারা না ছিল বৈজ্ঞানিক না ছিল মানবতাসম্মত।

'হিন্দুবিবাহ' নামক প্রবন্ধটিতে অক্ষয়কুমার সরকার বলেছিলেন, সামাজিক

শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে বাল্যবিবাহের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এই বক্তব্যে সত্যতা আছে কি ?

'নবজীবনে' প্রকাশিত 'বাল্যবিবাহ' শীর্ষক কথোপকথন মূলক রচনাটিতেও রক্ষণশীল সমাজচিন্তার প্রকাশ ঘটেছিল ; ঐ রচনাটিতে অধ্যাপক রামচন্দ্রের মুখে রচয়িতা তাঁর নিজের কথা বলেছিলেন।

তাঁর মতে, বাল্যবিবাহ দেশে ব্যভিচার রোধ করেছে। তিনি 'যৌবনের প্রারম্ভেই পুত্রকন্যার বিবাহ' দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এজন্যে তিনি যে সব যুক্তি দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কোন বলিষ্ঠতা ছিল না।

কন্যাপণ ও কন্যাবিক্রয় নিয়ে যে সামান্য প্রবন্ধাদি বিগত শতকে রচিত হয়েছিল সে সবের মধ্যেও তৎকালীন মানুষের সমাজভাবনার বিশিষ্টতা ধরা পড়েছে।

'বরকন্যাবিক্রয়' রচনাটিতে পণপ্রথাজনিত সামাজিক ক্ষতির কথা আলোচিত হয়েছিল। ঐ প্রথার ফলে ভবিষ্যতে কি ভয়ঙ্কর সামাজিক অবস্থা দেখা দিতে পারে সে কথাও তিনি বলেছিলেন—

"আমাদের ভয় হয় যে এই কুপ্রথা যদি আরও কিছুদিন বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকে তবে অচিরাৎ কন্যাবধের প্রথা হিন্দুসমাজে প্রচলিত হইবে। এই প্রকারে সর্ব্বস্বান্ত হইবার ভয়ে রজঃপুত পিতামাতা সদ্যোজাত তনয়ার জীবনরত্ন হরণ করিতেন এবং এই লোমহর্ষণ অনিষ্ট নিবারণ জন্য আমাদের দয়ালু গবর্ণমেণ্টকে অশেষ কষ্ট পাইতে হয়।"

[বরকন্যাবিক্রয় (রচয়িতার নাম অজ্ঞাত)। ১৮৮৩ ; পৃঃ ৩৮]

ভবিষ্যতের এই সামাজিক অবস্থার কথা চিন্তা করে সমাজ-কল্যাণকামী রচয়িতা পণপ্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ চেয়েছিলেন ; তবে তা যদি সম্ভবপর না হয় তাহলে তার ভয়ঙ্করতা কমাবার কথাও বলেছিলেন। এতে মনে হয়, তৎকালীন সমাজজীবনে ঐ প্রথার আধিপত্য তিরোহিত হবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান ছিলেন।

'সমাজদীপিকা'য় (১২৯২, ১ম খণ্ড ; ৩য় সংখ্যা) প্রকাশিত 'পুত্রবিক্রয়' শীর্ষক প্রবন্ধটিতেও পণপ্রথার সামাজিক কুফল দেখানো হয়েছিল। প্রাবন্ধিক ঐ প্রথা নিবারণে রাজআইনের সাহায্য নিতে চেয়েছিলেন।

কন্যাবিক্রয় সম্পর্কিত যে সব রচনা পাওয়া গিয়েছে সেগুলির কোনোটিতেই ঐ প্রথার প্রশংসা করা হয় নি। সমাজের দুষ্ট ব্যাধি বলে সকলে তাকে বর্জনীয় মনে করেছিলেন।

সুরাপান সংক্রান্ত বিতর্কমূলক পুস্তক-পুস্তিকা বা প্রবন্ধেও সে যুগের সমাজ-মনের পরিচয় ফুটে উঠেছিল। সুরাপানের বিষয়ে বাংলাভাষায় প্রথম আলোচনা, যতদূর মনে হয় রামমোহনই করেছিলেন। তবে সুরাপানের কথায় তাঁর কোন সামাজিক ভাবনা ছিল না। তিনি পরিমিত মদ্যপানের সমর্থক ছিলেন; মদ্যপানের সামাজিক সুফল বা কুফল তিনি বিচার করেন নি। তবে 'পরবর্তী কালে সুরাপান-বিরোধী ব্যক্তিগণ সুরাপান তথা মাদকদ্রব্য সেবনের সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির চিত্র তুলে ধরেছিলেন নিজেদের রচনায়।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় সুরাপানের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৫০ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত 'পানদোষ' প্রবন্ধে বলা হয়েছিল, ইংরেজ আমলে মদ্যপানের বৃদ্ধি ঘটেছে এবং তা নিয়ন্ত্রিত না হলে দেশ অচিরেই বিনষ্ট হবে। সমাজ রক্ষায় মদ্যপান দমনের জন্যে রাজার সহায়তার কথাও এখানে বলা হয়েছিল। প্রাবন্ধিক জানতেন, ঐ ব্যাপারে রাজার সহায়তা পাওয়া যাবে না। রাজার তাতে অর্থক্ষতি স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তবুও তিনি বিদেশী রাজার কাছে 'প্রজাদিগের পাপের দমন ও মহৎ অমঙ্গলের কারণ নিবারণ জন্য' আর্থিকক্ষতি স্বীকার করবার আবেদন জানিয়েছিলেন।

বাংলাদেশে মদ্যপান নিবারণে রাজনারায়ণ বসু ও প্যারীচরণ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে প্যারীচরণ লৈখিক বিতর্কে এগিয়ে এসেছিলেন। সমাজকল্যাণের চিন্তাই তাঁকে মদ্যপানবিরোধী আন্দোলন সংগঠনে প্রবৃত্ত করেছিল।

'মদিরা' গ্রন্থের ভুবনেশ্বর মিত্র, 'সুরাপান বা বিষপান' গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা রচয়িতা এবং "সুরাপানের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক ফল কি এবং তন্নিবারণোপায়ই বা কি?" পুস্তিকার লেখক তারাধন তর্কভূষণ—এঁরাও সকলে সমাজরক্ষার কথা চিন্তা করে মদ্যপান নিবারণ করতে চেয়েছিলেন।

জাতিভেদ বিষয়ক বিতর্করচনাতেও রচয়িতাদের তথা তৎকালীন সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের সমাজভাবনা ধরা পড়েছিল। জাতিভেদ দূরীকরণের আন্দোলনকে জোরদার করবার নেতৃত্ব নিয়েছিলেন উদারপন্থী ব্রাহ্মগণ। অবশ্য মানবতাবাদী শিক্ষিত অব্রাহ্ম ব্যক্তিও ঐ আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বিখ্যাত 'জাতিভেদ' শীর্ষক বক্তৃতাটিতে জাতিভেদের বিরুদ্ধে বলেছিলেন—

"এই জাতিভেদ হইতে সমূহ অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জাতিভেদ প্রথা ভারতে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত করিয়াছে; ইহাতে ভ্রাতৃবিদ্বেষ ঘটাইয়াছে; কায়িক শ্রমকে নিকৃষ্ট করিয়াছে; শিল্প-বাণিজ্যের দুর্গতি করিয়াছে; দারিদ্র্য-যাতনা বৃদ্ধি করিয়াছে; শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা আনয়ন করিয়াছে; সামাজিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইয়াছে;"...

[জাতিভেদ—শিবনাথ শাস্ত্রী (১৩৭০); শ্রীদিলীপ কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত; পৃঃ ৫২]

কোন সামাজিক মন নিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী একথা বলেছিলেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আশ্চর্য, রক্ষণশীল ব্যক্তিদের কেউ কেউ বলেছিলেন, "...জাতিভেদ এখনও আছে, কেবল বঙ্গদেশেই জাতিবিভেদ বন্ধনের শৈথিল্য হইয়াছে। তাহাতেই এখানে কষ্ট।" (জাতিভেদে সামাজিক উন্নতি—দ্রঃ সাধারণী; ২য় ভাগ, ২রা আগস্ট, ১৮৭৪)

সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে রচিত পুস্তক বা প্রবন্ধেও জাতির কথা এসে গিয়েছিল। গোঁড়ামি যাঁদের ছিল তাঁরা বলেছিলেন, সমুদ্রযাত্রায় জাতরক্ষা সম্ভব নয়; অপর পক্ষের বক্তব্য ছিল, জাত বজায় রেখেও সমুদ্রযাত্রা করা যায়। সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক রচনাও খুব কম। এই স্বল্প সংখ্যক রচনার মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা' সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। খুবই বিস্তৃতভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সমুদ্রযাত্রার গুরুত্ব বিচার করেছিলেন। সামাজিক, বাণিজ্যিক, রাজনীতিক সবদিক থেকেই সমুদ্র যাত্রার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রও সমুদ্রযাত্রাকে সমাজের পক্ষে শুভকর বলে বিশ্বাস করতেন।

এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করা গেল তার ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, সমাজসংস্কারমূলক বিতর্করচনায় সে যুগের সমাজভাবনার অনেক পরিচয়ই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। বিগত শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলনে সে যুগের মানুষের সমাজ-চিন্তার কোন দিকটি কতখানি প্রবল হয়েছিল এবং ঐ চিন্তার কোন দিকটির জয় বা পরাজয় ঘটেছিল তার ইতিহাস সংগ্রহের জন্যে তাই আলোচ্য বিতর্করচনা পাঠ করতেই হবে।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

॥ ১ ॥

বাংলাগদ্যের চর্চা শুরু হয় উনিশ শতকের প্রথমে। অবশ্য গদ্যের অস্তিত্ব যে তার আগে ছিল না তা নয়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকেও গদ্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তার পরবর্তী শতক দুটিতে ঐ গদ্যরচনার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হয়েছিল; কিন্তু তবুও বলতে হয়, প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাগদ্যের অনুশীলন বলতে যা বোঝায় তার সূচনা ঘটেছিল ঐ গত শতকেরই শুরুতে। শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজগোষ্ঠীর রচনাতেই বাংলাগদ্যের এই পরিকল্পনামাফিক অনুশীলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। অবশ্য একথা সত্য, বাংলাগদ্যের নিঃস্বার্থ উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্য কোন গোষ্ঠীরই ছিল না। শ্রীরামপুর মিশন-গোষ্ঠীর কাছে বড় ছিল খ্রীষ্টধর্মপ্রচার আর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-গোষ্ঠীর কাছে প্রধান ছিল বিদেশী রাজ-কর্মচারীদের এদেশের ভাষা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া। বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য কোন গোষ্ঠীরই ছিল না। কিন্তু তবুও বলতে হয়, উভয় গোষ্ঠীর চেষ্টায় বাংলাগদ্যে সংস্কৃত বা অপর ভাষার বিষয়াদির যে অনুবাদ হয়েছিল সাহিত্যিক লক্ষণের আভাস সেখানে একেবারে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। তাছাড়া ঐ সব অনূদিত রচনায় বাংলাগদ্য ভারবহনের ক্ষমতাও কিছু লাভ করেছিল। কিন্তু এসব কথা মনে রেখেও বলতে হয়, মননশীল সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তার সূচনা ঘটে নি সে সময়। অবশ্য শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তকাদির মধ্যে 'সাহিত্য' না থাকলেও 'মননে'র সাক্ষাৎ কিছু মেলে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীর রচনায় তাও ছিল না। একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় কিছু বিষয়গাম্ভীর্য লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীর বেশ কিছু রচনায় প্রবন্ধরীতি অবলম্বনের চেষ্টা করা হয়েছিল। 'দিগ্‌দর্শন'-এ প্রকাশিত রচনা, রামরামবসুর 'লিপিমালা' প্রভৃতিতে এর সাক্ষ্য মেলে। কিন্তু তবুও বলতে হয়, মননধর্মী সাহিত্যের প্রকৃত সূচনা ঐ সব রচনায় ঘটে নি। মননধর্মী সাহিত্যের 'আরম্ভেরও আরম্ভ'-এর দলিল হিসেবেই শুধু লেখাগুলির কিছু মূল্য আছে।

প্রসঙ্গক্রমে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী গদ্যে মননচর্চা দেখা দিয়েছিল কিনা সে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এবার সেই বিষয়েই আলোচনা করা যাক।

উনবিংশ শতাব্দীর বহু বৎসর আগে থেকেই অপুষ্ট গদ্যে যে সব পুস্তক রচিত হয়েছিল তাদের মধ্যে বৈষ্ণব কড়চা এবং খ্রীষ্টানী প্রচারপুস্তিকাই ছিল প্রধান। সপ্তদশ শতকের একটি বৈষ্ণব কড়চা গ্রন্থের নাম 'দেহ কড়চা'; তার কিছু অংশ নিম্নরূপ—

"শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। অথো আপ্ত জিজ্ঞাসা। তুমি কে! আমি কে। আমি জীব। তুমি কোন জীব। আমি তটস্থ জিব॥ থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপ হইল। তত্ত্ব বস্তু হইতে। তত্ত্ব বস্তু কি কি। পঞ্চ আত্মা। একাদশেন্দ্র। ছয় রিপু ইচ্ছা এই সকল একযোগে ভাণ্ড হৈল॥"

[বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (দ্বিতীয় পর্যায়)—ভূদেব চৌধুরী, ১৩৬৬। পৃঃ ৪৯]

এখানে এবং এই জাতীয় অন্যকিছু গ্রন্থেও এমনি বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য সামান্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মননপ্রধান বিষয়বস্তু থাকলেও সে সব রচনা সাহিত্যের ধারেকাছে আসবারই উপযুক্ত নয়। অপুষ্ট অক্ষম গদ্যে রচিত ঐ সব পুস্তক সম্পর্কে তা আশা করাও অবশ্য ঠিক নয়।

খ্রীষ্টান পাদ্রীদের গ্রন্থগুলিরও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার। ঐ গ্রন্থগুলিতে প্রায়সময়ই হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করা হতো। অবশ্য ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করার চেষ্টা যে এসব গ্রন্থে ছিল না তা নয়। সেই জন্যে বিষয়গাম্ভীর্য এসব রচনাতেও কখনও কখনও দেখা যায়; তবে ঐ গাম্ভীর্য প্রায় সব সময়ই উদ্দেশ্য-প্রবণতা ও গদ্যভঙ্গির অপটুতায় লঘু ও অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—

"ব্র।—ভালো, যশোদা যে কৃষ্ণের পেটে ব্রম্মাণ্ডো দেখিলো সে কি?

রো।—ভালো যশোদা যে কৃষ্ণের পেটে ব্রম্মাণ্ডো দেখিলো, সে যে যশোদা কোন স্থানে দারাইয়া দেখিলো।

ব্র।—গোকুলে, বাড়ীতে উঠানে দারাইয়া দেখিলো; যে ত্রভুবোন বালোকের পেটে বিতর।

রো।—তবে বুঝিও, এ ত্রভুবোন নহে, যাহা দেখিলো, যেমত বোজের বাজি।

ব্র।—এমত বালোকে বাজি কোথাএ শিখিলো?

রো।—সকোল এহা কহি, প্রথোম সৃষ্টি যখোন পুর্ণো ব্রর্মো করিলেন; তাহাতে

বিস্তর দেবতা সকোল জর্মাইলেন, তাহা ক্রেপার শাস্ত্রো জানিবা, তাহাতে দুই ভাগ হইলো, যাহারা আস্থা রাখিলো, তাহারা তাহান সেবোক দেবোগণ সাধু মতি কহি: যাহারা আস্থা না রাখিলো; তাহারা শাপে ভুত হইয়া মহা নরোকে পরিলো: ভুত প্রেত পিচাশ জর্মো দানোব কহি; তাহারা প্রোব্বে নৈরাকারে জানে, যে পুর্ণো ব্রর্মো সাকার হইয়া প্রথিবী উধার করিবেন, দৈবোবাণী মুনিয্যো শুনিয়াছে, তবে মুনিয্যো এমত অধম হইয়া সর্গে যাইবেক? আমোরা দেবেগণ হইয়া নরোকে ভুতগণ হইলাম? এমত মায়া করি, যেনো মুনিয্যের ভুম জর্মে, এ কারোণ বস্থদেবের বেটার শরীরে প্রবেশ গর্ভো সঞ্চার গিয়া মুনিয্যো শরীরে ভুত প্রবেশ করিয়া দুইএ এক মতি হইয়া, এতো এতো যুর্ধ, এতো [৫৮] কামোম্ভাব, এতো পৈশুন্যতা; এতো মায়া, আর যেতো কার্য্যো করিয়াছো বরো নাম করিলো; এ সকোল কার্য্যো দেখিয়া মুনিয্যো জানিবেক, যে এই সাকার পরমো ব্রর্মের; মুনিয্যো ধর্মাধর্মো না বুঝে, এই রূপ ভজিলে প্রথিবীর, যে কালা মহা নরোক, তাহাতে নরের আশা নিতে পারিবো; এবং যদি এ দেশে সাকার পরমো ব্রর্মের শাস্ত্রো আইসে, তথাচো এহার বিচার করিতে করিতে কতো লোক নরোক নিবো, যেতো দিনে প্রচার হএ; অতোএব সেই ব্যতি (?) কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করিয়া সকোল সপ্তো মহা পাতোক করিয়াছে, পাপ শরীর দোষ হইলো; তাহার আত্মাম সেই ব্যতি মহা কালেতে লইয়া গেলো; পাপ অনুসারে তারোণা সর্বো কালে, সেই বুঝিতে পারে ধর্মোবন্ত; যাহার মহা গ্যান পরমেশর পরাচএ ভেদ থাকে, সেই সে পারিবে ভীতি মু[কৃ]তির নিরুপণ, আর কি তন কৃষ্ণের আছিলো?"

[ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ—সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত; (১৯৩৭) পৃ: ৫০-৫২]

প্রচারধর্ম্মিতা এখানে বেশ স্পষ্ট। এই কারণে তত্ত্ব আলোচনা এখানে লঘুতায় পর্যবেসিত হয়েছিল। ভাষাও এখানে অপটু; বক্তব্য তাই অপরিস্ফুট। সত্যি কথা বলতে কি, এই সব ধর্মপ্রচারমূলক গ্রন্থে মননশীলতার গাম্ভীর্য মাঝে মাঝে শুধু দেখা দিয়েই হারিয়ে গিয়েছে।

আসলে যুক্তির বন্ধনে সুবিন্যস্ত গভীর ভাবনার তথ্যভিত্তিক ও সাহিত্যিক প্রকাশকেই যদি সংক্ষেপে মননধর্মী সাহিত্য বলে অভিহিত করা যায় তাহলে বলতে হয়, তার আবির্ভাব ঘটেছিল আরও অনেক পরে; তবে রামমোহনের রচনায় ঐ মননধর্মী সাহিত্যের কিছু আভাস পাওয়া যায়।

আগেই বলা হয়েছে, খ্রীষ্টান পাদ্রীরা ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে অনেক সময় হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করে থাকতেন। তাঁদের অনেক পুস্তক ও পত্রিকায় ঐ আক্রমণের স্বরূপ লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ঐ আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দুরাও পরে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছিলেন। তবে শুধু যে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গেই হিন্দুদের ধর্মীয় বিরোধ বেঁধে ছিল তা নয়; হিন্দুদের নিজেদের মধ্যেও ধর্মীয় বিরোধ প্রবল হয়ে উঠেছিল। সে যুগে রামমোহনের প্রচারিত মত অনেক হিন্দুকে অসন্তুষ্ট করেছিল। সেজন্যে তাদের মধ্যেও কেউ কেউ রামমোহনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাঁদের ঐ মসীযুদ্ধের মধ্যে দিয়েই আলোচ্য বিতর্ক-রচনা সূচনার ঘটেছিল।

ঊনবিংশ শতকে আবির্ভূত এই রচনায় বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল রেনেসাঁসের যুক্তিবাদ;—প্রাধান্য পেয়েছিল তাতে নব্যশিক্ষিত মানুষের সযত্ন মননচর্চা। সমাজজীবনে বিশুদ্ধ মনন ও জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত না ঘটলে মননধর্মী সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটা সম্ভবপর নয়, একথা আগেই বলা হয়েছে। বাংলাদেশে মধ্যযুগীয় তামসিকতার বিরুদ্ধে এই মনন ও জ্ঞানের অনুশীলন শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের গোড়াতেই। নবজাগরণের নতুন চেতনাই ছিল এই অনুশীলনের মূলে। রেনেসাঁসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যুক্তিবাদের প্রেরণাতেই আলোকপ্রাপ্ত যুক্তিবাদী মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল জ্ঞানের চর্চায়। এই যুক্তিবাদী জ্ঞাননিষ্ঠ নবজাগ্রত মানুষের মন মধ্যযুগীয় আবেগ ও সংস্কারের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে যুক্তিশুদ্ধ চিন্তার উদার ক্ষেত্রে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল মুক্তির কামনায়। অবশ্য সকলের মধ্যেই যে ঐ মনোভাব দেখা দিয়েছিল তা নয়; তবে তাদের সঙ্গে মত ও পথ নিয়ে যুক্তিবাদী মানুষের যে লড়াই বেঁধেছিল সেই লড়াই-এ জেতবার জন্যে তারাও দুর্বল বা সবল যাই হোক, ঐ যুক্তিকেই আশ্রয় করেছিল। বিতর্করচনায় এই উভয় শ্রেণীর যুক্তিবাদ, জ্ঞানানুশীলন বা মননচর্চার স্বরূপ তাই স্পষ্ট। আর এই কারণেই বলা যায়, বাংলা মননধর্মী সাহিত্যের সূচনা এই বিতর্করচনাতেই ঘটেছিল।

বাংলা ভাষায় রামমোহন ছিলেন বিতর্কমূলক রচনার প্রথম স্রষ্টা। সমকালে তো বটেই, পরবর্তীকালেও বাংলা বিতর্করচনায় তাঁর ঐ রচনাদর্শ অনুসৃত হয়েছিল। তবে একথাও সত্য, মনন, যুক্তি এবং তথ্য থাকলেও রামমোহনের বিতর্করচনা সহজপাঠ্য হয়ে ওঠে নি,—সাহিত্যের প্রসন্নতাও সেখানে অনুপস্থিত। অবশ্য তার জন্যে রামমোহন যে সম্পূর্ণ দায়ী সে কথাও সত্য নয়।

সমকালীন বাংলা গদ্যের দুর্বলতা তাঁর গদ্যকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। হাতের কাছে যে গদ্য তিনি পেয়েছিলেন জড়তামুক্ত, সহজ-সরল শব্দের ব্যবহার তাতে ছিল না বললেই চলে। ক্রিয়াপদের ব্যবহারেও স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল। বাক্যগঠনে বা বাক্যপরাম্পরাতে ভাবের ঐক্যও বিঘ্নিত হতো। ভাষাবিজ্ঞানসম্মত যতিচিহ্নের ব্যবহারও সে গদ্যে ছিল না। এই সব ত্রুটি রামমোহনের গদ্যেও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একথাও সত্য, বাংলাগদ্যের দুর্বলতা এবং সংকীর্ণতার কথা মনে রেখেই তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন এবং বক্তব্য প্রকাশের জন্যে বাংলাগদ্যের সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠতেও তিনি অনেকখানি সফল হয়েছিলেন। এই কারণেই সমসাময়িক যুগের গদ্যের বিচারে তাঁর গদ্য ছিল প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। তাঁর বিতর্করচনার গদ্য সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। রামমোহনের ঐ বিতর্করচনার গদ্য তত্ত্ব ও তথ্যের ভারবহন করতে এবং অপরের বক্তব্যের বিরুদ্ধে যুক্তির হাত উঁচিয়ে সোচ্চার হতে অনেক শক্তিই সংগ্রহ করেছিল। তাঁর ঐ গদ্যেই দেখা দিয়েছিল সমৃদ্ধ তার্কিকতার সূচনা। প্রসঙ্গক্রমে তার্কিক রচয়িতা রামমোহনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যা' বলেছেন তার কিছু অংশ উদ্ধার করছি—" তিনি তার্কিকতার মূল সূত্রটি বাংলাগদ্যের মারফতে পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছিলেন। বিচার বিতর্কে প্রচুর পরিমাণে শাস্ত্র-সংহিতা উল্লেখ করিলেও আপ্তবাক্য অপেক্ষা স্বাধীন ও মুক্তবুদ্ধির প্রতি তাঁহার ছিল আন্তরিক আকর্ষণ।" [উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১ম সং। পৃঃ ৯৯]

সার্থক মননধর্মী সাহিত্যেও 'স্বাধীন মুক্তবুদ্ধির' প্রকাশ বাঞ্ছনীয়। এই কারণে বলা যায়, ঐ মুক্ত বুদ্ধি সমৃদ্ধ রামমোহনের বিতর্করচনা বাংলা মননধর্মী সাহিত্যকে প্রত্যক্ষ ভাবেই গড়ে উঠতে সহায়তা করেছিল।

রামমোহনের প্রথম রচনা 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫)। এই গ্রন্থকে কেন্দ্র করেও বিতর্ক উঠেছিল। 'বেদান্ত গ্রন্থে'র পরে 'বেদান্ত সার' (১৮১৫) এবং আরও ক'টি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল ; তবে যুদ্ধং দেহি ভাব নিয়ে প্রকৃত বিতর্কপুস্তক রচনা করেছিলেন তিনি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। পুস্তকটির নাম 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার'। এটি ধর্মসংক্রান্ত বিতর্কপুস্তক। সমাজসংস্কার বিষয়ক তাঁর প্রথম বিতর্কপুস্তক 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১৮১৮)। এই পুস্তকটিতে বিতর্কের রীতি ও ভাষা লক্ষ্য করবার মতো। তবে সহমরণ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকেই তার সমৃদ্ধি ঘটেছিল বেশি। মননধর্মী সাহিত্যের

লক্ষণও এখানে তাই স্পষ্ট। বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যে এবং যুক্তির কাঠিন্যে এখানে গভীর মননচর্চাই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—

"প্রবর্ত্তক।—যদিও এরূপ বন্ধনাদি করিয়া দাহ করা হারীতাদি বচনের দ্বারা প্রাপ্ত নহে তথাপি সংকল্পের পর সহমরণ না করিলে পাপ হয় এবং লোকত নিন্দা আছে এনিমিত্ত আমরা করিয়া থাকি।

নিবর্ত্তক।—পাপের ভয় যে কহিলে সে তোমাদের কথামাত্র যেহেতু ঐ স্মৃতিতেই কহিয়াছেন যে প্রাজাপত্য ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে সে পাপের ক্ষয় হয়। যথা। চিতিভ্রষ্টা চ যা নারী মোহাদ্ বিচলিতা ভবেৎ। প্রাজাপত্যেন শুদ্ধেত্তু তস্মাদি পাপকর্ম্মণঃ॥ প্রাজাপত্য ব্রতে অসমর্থ হইলে এক ধেনুমূল্য তিন কাহণ কড়ি উৎসর্গ করিলেই সিদ্ধ হয়। অতএব পাপের ভয় নাই"...

[রামমোহন রচনাবলী (হরফ প্রকাশনী) ; ১৩৮০। পৃঃ ১৭৩-৭৪]

উদ্ধৃত অংশে শাস্ত্রচর্চার নিষ্ঠা ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যবিন্যাস স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। রামমোহনের স্বাধীন মুক্তবুদ্ধির পরিচয়ও এখানে লক্ষ্য করবার মতো। মননশীল রচনার ভাষা হবে ঋজু—স্পষ্ট ; কোন শব্দই সেখানে একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হবে না। আবেগের বাষ্পচ্ছন্নতা কখনও ভাষাকে দুর্বল করে তুলবার চেষ্টা করবে না। বক্তব্যের গভীরতাকে যুক্তির কঠিন আবরণে তুলে ধরবার প্রয়াসই এখানে বড় হয়ে ওঠে। এইরকম ভাষাবৈশিষ্ট্যেরই কিছু পবিচয় পাওয়া যায় উদ্ধৃত অংশটিতে।

কাশীনাথ তর্কবাগীশ ছিলেন সতীদাহের বিষয়ে রামমোহনের প্রধান প্রতিপক্ষ। শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করে যুক্তির মাধ্যমে তিনিও তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর যুক্তি দুর্বল হতে পারে ; কিন্তু মননশীলতা তাঁর রচনাতেও রয়েছে। তাঁর চিন্তা ও যুক্তিনিষ্ঠার কিছু পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত অংশটিতে পাওয়া যায়। দেশাচারের পক্ষে বলতে গিয়ে কাশীনাথ বলে-ছিলেন—

"তুমি যে দৃষ্টান্ত দিতেছ এ সঙ্গত হয় না যেহেতু বনস্থাদির ব্যবহার সল্লোকের গ্রাহ্য নহে সহগমনের বিষয় যে আচার ইহা মহাপ্রামাণিক ধার্ম্মিক পণ্ডিত সকলে আদ্যোপান্ত গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন অতএব শিষ্টাচারেরি গ্রাহ্যতা দুষ্ট ব্যক্তির আচারের গ্রাহ্যতা নাই॥ ইহার প্রমাণ শিষ্য প্রতি গুরুর উপদেশ স্থলে তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ॥...যদি তাহারা ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করে কিম্বা বৃত্তি যে জীবিকা তাহা জিজ্ঞাসা করে তবে সে স্থানে শাস্ত্রজ্ঞ এবং যুক্তিশীল এবং যুক্তির অনুসারে

অনুষ্ঠানশীল এবং [২৩] ক্রোধরহিত এবং কর্ম্মে ঔদাসীন্য না করে যে ব্রাহ্মণ সকল তাহারা যেরূপ আচরণ করে তাহা করিবেক ॥" (তদেব ; পৃঃ ৬৩৯)

শাস্ত্রীয় যুক্তির অবতারণা এখানেও স্পষ্ট। কাশীনাথের এইযুক্তির বিরুদ্ধে রামমোহন যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার সবলতা নিশ্চয়ই বেশি ; কিন্তু তাহলেও বলতে হয়, কাশীনাথের বক্তব্যেও মননচর্চার ছাপ অস্পষ্ট নয়।

সতীপ্রথা নিষিদ্ধ হবার পর বিধবাবিবাহ আন্দোলনই সমাজকে আলোড়িত করেছিল সব চাইতে বেশি। বস্তুতঃপক্ষে, এই আন্দোলনের মত আর কোন আন্দোলন সে যুগে অত তীব্র ও ব্যাপক হতে পারে নি। এই কারণে বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে রচিত পুস্তক, পুস্তিকা ও প্রবন্ধাদির সংখ্যা ছিল বেশি (অবশ্য ধর্ম-সংক্রান্ত বিতর্করচনার কথা বাদ দিলে)। বাংলা মননধর্মী সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে তাই বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত বিতর্কমূলক পুস্তকাদির অবদানই অধিক।

বিদ্যাসাগর রচিত বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হবার পরেই ঐ বিষয়ে পুস্তকাদি রচনার জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত পুস্তক দুটিতে উন্নত মনন ও শুদ্ধ জ্ঞাননিষ্ঠার প্রকাশ ঘটেছিল। তার্কিকের চিন্তনশক্তি আর তথ্য পরিবেশন দক্ষতার প্রকাশ ঘটায় পুস্তক দুটিকে সে যুগের সার্থক মননধর্মী সাহিত্য রূপেই চিহ্নিত করা যায়। তাঁর বহুবিবাহ সংক্রান্ত পুস্তকদুটি এবং আরও দু'একটি বিতর্করচনা সম্পর্কেও একথা কমবেশি প্রযোজ্য।

বিদ্যাসাগরের সামাজিক অভিজ্ঞতা ছিল খুব বেশি। এজন্যে বক্তব্য উত্থাপনের সময় সমাজমনস্তত্ত্বের দিকেই তিনি নজর রেখেছিলেন অধিক। সামাজিক অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে সমাজমনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সজাগ থেকে বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছিলেন। বিষয়ানুগ ভাষা প্রয়োগেও তাঁর দক্ষতা কম ছিল না। মননধর্মী সাহিত্যের মনন ও সাহিত্য তাঁর রচনায় কতখানি প্রস্ফুট হয়ে উঠেছিল নিম্নে উদ্ধৃত অংশটিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়—

"......প্রতিবাদী মহাশয়েরা, এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না, ইহা দৃষ্টি করিয়া, স্ত্রীলোকের পুনর্বার বিবাহের বিধি বেদবিরুদ্ধ, এই যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা বেদের অভিপ্রায়ানুযায়িনী নহে। উল্লিখিত বেদের তাৎপর্য এই যে, যেমন এক যূপে দুই রজ্জু এক কালে বেষ্টন করা যায় ; সেইরূপ এক পুরুষ দুই বা তদধিক স্ত্রী এক কালে বিবাহ করিতে পারে। আর, যেমন

এক রজ্জু দুই যূপে এককালীন বেষ্টন করা যায় না ; সেইরূপ, এক স্ত্রী দুই পুরুষ এককালীন বিবাহ করিতে পারে না। নতুবা পতি মরিলেও স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে না, এরূপ তাৎপর্য নহে। এই তাৎপর্যব্যাখ্যা কেবল আমার কপোলকল্পিত নহে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ যে এক বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ঐ বেদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ঐরূপ তাৎপর্যই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।······

... ...

অতএব, প্রতিবাদী মহাশয়েরা, বিধবাবিবাহকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সফল হইতেছে না। প্রতিবাদী মহাশয়দিগের ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক ছিল, যদি বিধবাবিবাহ এককালেই বেদবিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগে বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকিত না।"

[বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ (২য়) ; সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭২। পৃঃ ৭৮]

উদ্ধৃত অংশটিতে ভাষা নিঃসন্দেহে যুক্তিধর্মী। বক্তব্যের গাম্ভীর্যও এখানে স্পষ্ট। বিতর্কের ভাষার বড় বৈশিষ্ট্য তার গতি। খুঁড়িয়ে চলা ভাষায় বিতর্কে তীব্রতা সঞ্চারিত হয় না। বিদ্যাসাগরের ভাষায় আমরা এই গতিময়তাও লক্ষ্য করে থাকি। পরমত খণ্ডনের শক্তিতে সমৃদ্ধ শব্দের কুশল ব্যবহারেই তিনি ভাষাকে গতিময় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রামমোহন ও তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের বিতর্করচনায় মনন ও বিষয়-গাম্ভীর্য থাকলেও ভাষামাধুর্য ও ভাষা লালিত্য ছিল না। তাঁদের পরবর্তী লেখকদের রচনাতেও তা খুব কম পাওয়া যায়। সে দিক থেকে বিদ্যাসাগরের বিতর্কপুস্তক এক বিরল ঐশ্বর্য। যুক্তি-মনন-ভাষা সব কিছুরই অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছিল তাঁর গ্রন্থে। তাই বলা যায়, আধুনিক মননশীল সাহিত্যের প্রকৃত পদক্ষেপ ঘটেছিল তাঁরই বিতর্করচনার মধ্যে।

মননধর্মী সাহিত্যে রচয়িতার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে থাকে। বিতর্ক-রচনাতেও এই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তার্কিক যে দৃঢ়তা দেখান তার মধ্যেই তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। বিদ্যাসাগরের গদ্য ও বক্তব্যে এই বৈশিষ্ট্য খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রয়োজনবোধে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকের অংশ বিশেষ উদ্ধার করছি—

"পরাশর যে বচনে বৈধব্যদশাকে দণ্ড বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং যে বচনে ক্ষেত্রজ শব্দ আছে, ঐ দুই বচনের সহিত বিবাহবিধায়ক বচনের বিরোধ ঘটাইয়া, এবং এক জনের গ্রন্থে পরস্পরবিরুদ্ধ বচন থাকা সম্ভব নহে, এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া, প্রতিবাদী মহাশয় বিবাহবিধায়ক বচনকে কৃত্রিম নির্ধারিত করিয়াছেন; এবং ঐ কৃত্রিম বচন, ভারতবর্ষের দুরবস্থাকালে, হিন্দু-রাজাদিগের ইচ্ছানুসারে, সংহিতামধ্যে নিবেশিত হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু, যখন ঐ তিন বচনের পরস্পর বিরোধ নাই, তখন পরস্পর বিরোধরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া, বিবাহবিধায়ক বচনকে কৃত্রিম বলিবার, এবং সময়বিশেষে, ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছানুসারে, সংহিতামধ্যে নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার, অধিকার নাই। মাধবাচার্য বহু কালের লোক, তিনি পরাশরসংহিতার ব্যাখ্যাকালে ঐ বচনের আভাস দিয়াছেন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি ঐ বচনকে কৃত্রিম বলিয়া জানিতেন না। অতএব প্রতিবাদী মহাশয়কে, অন্ততঃ, ইহা স্বীকার করিতে হইবেক, নিদানপক্ষে মাধবাচার্যের সময়ে ঐ বচন কৃত্রিম বলিয়া পরিগণিত ছিল না। আর, আপন মতের বিপরীত হইলেই, যদি কৃত্রিম বলিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে লোকের মত এত ভিন্ন ভিন্ন যে প্রায় সকল বচনই ক্রমে ক্রমে কৃত্রিম হইয়া উঠিবেক।" (তদেব ; পৃঃ ৮৬-৮৭)

এখানে বিদ্যাসাগরের যুক্তি-বিন্যাস-দক্ষতা, পাণ্ডিত্যের গভীরতা, আপন মত প্রতিষ্ঠা করবার দৃঢ়তা এবং ভাষা ব্যবহার নিপুণতা সব কিছুরই সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটেছে; এবং এই সব কিছুর মধ্যে দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের তেজও বিকীর্ণ হয়েছে। এ ভাষা থেমে থাকার ভাষা নয়। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ আপন মতের সত্যতায় দ্বিধাহীন থেকে যে ভাষায় কথা বলেন এ ভাষা সেই ভাষা। সত্যিকারের মননধর্মী সাহিত্যের ভাষা তাই বিদ্যাসাগরের পুস্তকেই প্রথম পাওয়া যায়। তাঁর বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত এবং বহুবিবাহ বিষয়ক উভয়শ্রেণীর পুস্তকেই মননধর্মী সাহিত্যের এই সব লক্ষণ বেশ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক অন্যান্য ব্যক্তির বিতর্কপুস্তকেও মননচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। পীতাম্বর সেনের 'বিধবাবিবাহ নিষেধঃ' পুস্তকের ভাষা সাধারণ-ভাবে অ-সাহিত্যিক, শ্রুতিকটু ও শিথিল। কিন্তু তাহলেও বলা যায়, নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় শাস্ত্র ব্যাখ্যায় তিনিও অগ্রসর হয়েছিলেন দ্বিধাহীন-ভাবে। তাঁর সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার চেষ্টার একটি নমুনা—

"সুতরাং বেদাভিপ্রায়ের ঐক্যবিধায় মনু এবং অন্যান্য স্মৃতি সাধারণ ও

পুরাণেতিহাস প্রভৃতিতে বিধবাবিবাহ নিষেধ করিয়াছেন; এখানে বিদ্যাসাগরের মত গ্রহণ করিলেই পরাশর সংহিতাকে একাকিনী হইয়া থাকিতে হয়; বেদ বিরোধিনী বলিয়া তাঁহাকে সকলেই ঘৃণা করিবে। অতএব এই যুক্তি সিদ্ধ করিতে হইবে যে পরাশর সংহিতার ঐ শ্লোকে বিধবাবিবাহের বিধি নহে।”

[বিধবাবিবাহ নিষেধ :—পীতাম্বর সেন; প্রকাশকাল বা সংস্করণ অজ্ঞাত; পৃঃ ৩৮]

এই বক্তব্য দুর্বলই হোক বা সবলই হোক এখানে মননচর্চার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

বিগত শতকের শেষ ভাগের তার্কিক লেখক দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মননচর্চা ও প্রকাশভঙ্গি বেশ সমৃদ্ধ। তাঁর মন ছিল অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ। শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় বিশুদ্ধ যুক্তিকেই তিনি আশ্রয় করেছিলেন। তাঁর ভাষাও বেশ প্রাঞ্জল। মননধর্মী সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর পুস্তকের গুরুত্ব তাই অনেক দেবেন্দ্রনাথের যুক্তিনিষ্ঠার একটু নমুনা—

“…ব্রহ্মের পরিচর্য্যার নামই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মের সেবাই যদি ব্রহ্মচর্য্য হয়, তবে বিধবা নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিলে কি তাহা হয় না?”

(বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; ১২৯২। পৃঃ ১৯)

বহুবিবাহ ও স্ত্রী-শিক্ষা সংক্রান্ত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত পুস্তক বা প্রবন্ধের অনেকগুলিতেও মননশীলতা ও সাহিত্যিক মধুরতা লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ সংক্রান্ত পুস্তকদুটিতে যে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও তথ্য সম্পদ রয়েছে তার মধ্যে মননধর্মী সাহিত্যের লক্ষণ স্পষ্ট। বহুবিবাহ বিষয়ে অন্য যে সব রচনা প্রকাশিত হয়েছিল তাদের মধ্যে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধ (দ্রঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা; চৈত্র, ১৭৭৭ শক এবং ভাদ্র, ১৭৭৮ শক), বঙ্কিমচন্দ্র রচিত ‘বহুবিবাহ’ এবং ভুবনেশ্বর মিত্র লিখিত ‘বহুবিবাহ’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সব রচনাতে প্রবন্ধ-রীতির বৈশিষ্ট্য কমবেশি সার্থকভাবে অনুসৃত হয়েছিল। ১৭৭৮ শকাব্দের ভাদ্রসংখ্যা ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’য় প্রকাশিত প্রবন্ধটির মান তো খুবই উন্নত। তীক্ষ্ণধী প্রাবন্ধিকের যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণে প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু সুব্যক্ত হয়ে উঠেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত প্রবন্ধটির মধ্যে কিন্তু মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় না। রচনাটি প্রধানতঃ বিদ্বেষমূলক ; ঠিক তর্কমূলক নয়।

তবে ভুবনেশ্বর মিত্রের 'বহুবিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে তথ্য, যুক্তি ও ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত ভাষার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বরের মন ও মননের নিয়ন্ত্রী-শক্তি ছিল ন্যায়বুদ্ধি ও কল্যাণবোধ। ঐ বুদ্ধি ও বোধ নিয়ে তিনি যে প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন বাংলা মননধর্মী সাহিত্যের ইতিহাসে তার মূল্য অপরিসীম।

আলোচ্য প্রসঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক যে রচনাটির নাম সর্বাগ্রে করতে হয় সেটি লিখেছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তাঁর 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধটিতে হৃদয় ও মনন উভয়েরই সার্থক প্রকাশ ঘটেছিল।

অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির রচিত 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষ রচিত 'নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব' এই গ্রন্থ দু'টিও খুব উল্লেখ-যোগ্য। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত জ্ঞানদানন্দিনীদেবীর 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধটিও মননঋদ্ধ রচনা। চিন্তার ঋদ্ধি, সাহিত্যের শ্রী এবং যুক্তির ঐশ্বর্য সব কিছুই প্রবন্ধটিতে পাওয়া যায়।

বাল্যবিবাহ, সুরাপান, কন্যাপণ. জাতিভেদ ও সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক দুচারটি রচনাতেও মননধর্মী সাহিত্যের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

বিতর্কমূলক রচনার মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের আরও একটি শাখা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল ;—সেটি অনুবাদসাহিত্য। সামাজিক তর্কবিতর্কে শাস্ত্রীয় আলোচনার প্রাধান্য থাকায় তার্কিক লেখকদের শাস্ত্রীয়বচন উদ্ধার না করে উপায় ছিলনা। আর সাধারণ পাঠকদের বোঝাবার জন্যে উদ্ধৃত বচনের বঙ্গানুবাদও করতে হতো। ইংরেজী রচনারও উদ্ধৃত অংশের বঙ্গানুবাদ কখনও কখনও করা হয়েছিল। ঐ সব অনুবাদের মধ্যে দিয়ে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ধারা পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। দেখা যায়, একই শাস্ত্রীয় বচনের অনুবাদ হয়েছিল একাধিক তার্কিক লেখকদের রচনায়। তার ফলে বাংলা অনুবাদ চর্চা নিখুঁত হবার পথেই এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে তাই বিতর্করচনার অবদান একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

[২]

বিতর্করচনার ভাষা যুক্তিবাদী জ্ঞাননিষ্ঠ মনের নিরপেক্ষতায় পিরামিডের মত মসৃণ-কঠোর। শুধু তাই-ই নয়, তার সৌন্দর্যও পিরামিডের সৌন্দর্যের

মত নিরলঙ্কৃত। উনিশ শতকীয় বিতর্করচনায় এমন ভাষারীতিই ধীরে ধীরে দেখা দিয়েছিল। রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর এবং বিদ্যাসাগর থেকে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদির ভাষারীতির ক্রমবিকাশ এই বক্তব্যেরই সত্যতাকে প্রমাণ করে।

কিন্তু একথা সত্য হলেও বলতে হয়, রক্ষণশীল তার্কিক রচয়িতাদের ভাষা-রীতি বা গদ্যভঙ্গি ছিল বেশ দুর্বল। উপযুক্ত তথ্য-সমাবেশের দীনতায় এবং রক্ষণশীল মনের একমুখী উগ্রতায় তাঁদের বক্তব্য প্রকাশের ভাষায় দেখা দিয়েছিল শিথিলতা। যুক্তি ও তথ্যের শক্ত ভূমিতে সে ভাষা দাঁড়াতে পারেনি। অথচ আশ্চর্য, রক্ষণশীল ব্যক্তিই যখন স্থানে স্থানে প্রগতিশীল প্রবল প্রতিপক্ষের বক্তব্য খণ্ডনে বলিষ্ঠ যুক্তি দেবার চেষ্টা করেছিলেন তখন সেইসব স্থানের গদ্য বেশ যুক্তি-নিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

যাইহোক, অযৌক্তিক বক্তব্য প্রকাশের জন্যে তথা রক্ষণশীল মত প্রতিষ্ঠা করবার বৃথা চেষ্টার ফলে গোঁড়া সংরক্ষণবাদী তার্কিক লেখকদের গদ্য যে কতখানি দুর্বল ও শিথিল হয়ে উঠেছিল তার কিছু নমুনা তুলে ধরা যাক—

"বিধবাও অদৃষ্টানুসারে হয়। বিনাশও অদৃষ্টানুসারেই হয়। সকল কার্য্যই সমান। বিধবাবিবাহ নিষেধাবলম্বনে ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যের ত্রুটি করা হয়। এমত বিবেচনা করিলে মনুষ্যাদি সকল প্রাণিহত্যাও করিতে হয় যেহেতুক হত্যা না করিলে ঈশ্বরের বিনাশ কার্য্যের ত্রুটি করা হয়।"

[বিধবাবেদন নিষেধক—রামধন দেবশর্মা ; প্রকাশ কাল বা সংস্করণ অজ্ঞাত ; পৃঃ ১৬৪]

স্পষ্টই বোঝা যায়, এখানে যুক্তির নামে কুযুক্তি দেওয়া হয়েছে। আর কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতার প্রকাশ ঘটার জন্যে ভাষারীতিও এখানে যুক্তির দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেছে।

বিতর্কমূলক রচনার মূলে সাহিত্যিক প্রেরণা থাকে না; কেননা তার উদ্দেশ্যই আলাদা। এই কারণে তার ভাষাও হয় স্বতন্ত্র। অবশ্য একথাও স্বীকার্য, উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, বক্তব্যের চারু-প্রকাশ সর্বত্রই বাঞ্ছনীয়। বিতর্কমূলক রচনাতেও তাই বক্তব্য প্রকাশের শ্রী থাকা প্রয়োজন। তবে এবিষয়ে তার্কিক লেখকদের মধ্যে কিছু মতভেদ ছিল। রক্ষণশীল গোষ্ঠীর লেখক শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ বলেছিলেন, "আমি বাল্যাবধি একাল পর্য্যন্ত কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছি, এক্ষণে অধ্যাপনা করাইতেছি, বঙ্গীয় ভাষায় অধিক

আলোচনা, করি না তজ্জন্য বোধ হয় আপনাদের শ্রবণসুখ বিশেষরূপে হইবে না, তবে ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিরা শ্রবণসুখের অপেক্ষা করেন না, এই সাহসেই লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"

(বিধবাবিবাহের নিষেধক—শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ ; ১২৮৪। পৃঃ ৫)

বক্তা এখানে শ্রুতি সুখকর গদ্যরচনার অক্ষমতা জানিয়েছেন। কিন্তু ঐ শ্রেণীর গদ্যরচনার প্রয়োজনীয়তাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। অবশ্য তিনি বলেছিলেন, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে যাঁরা চান শ্রবণসুখকর ভাষার অপেক্ষা তাঁরা করেন না ; কিন্তু অপেক্ষা যে একেবারেই করেন না তা' নয়। তিনিও তা জানতেন ; নইলে ঐ গদ্য রচনায় নিজের অক্ষমতার কথা তিনি বলতেন না।

এই বিষয়ে অপর একটি মতও পাওয়া যায়—"কখন কখন পুরাতন বিষয়েরও আলোচনা করিতে হয়। যাঁহারা বাহাদুরী নিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়া সমাসচ্ছটা পুরিত বাক্য যোজনা দ্বারা আপনাদের জয়ঢক্কা আপনারা বাদন করিতে ইচ্ছুক ; লিখিবার কষ্ট স্বীকার করিবার যাহাদের এতদপেক্ষা উন্নততর, নিঃসার্থতর বিশুদ্ধতর উদ্দেশ্য নাই, তাহারা নূতন কথা লিখিয়া নিজেদের প্রতিভার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চান, করুন। কিন্তু আমরা এইরূপ লেখাকে ঘৃণা করি। রূপের ব্যবসায় যেমন ঘৃণনীয় ; ভালবাসার ব্যবসায় যেরূপ ঘৃণনীয় ; সেইরূপ ব্যবসায়ী, পসার জঁাকান, বাগাড়াম্বর পূর্ণ লেখাও অতিশয় ঘৃণনীয়।" (প্রতিবাদ অক্ষয়বাবু ও বিধবাবিবাহ—প্রতিবাদ-কারীর নাম ও রচনাকাল অজ্ঞাত ; পৃঃ ১)

এখানে বোঝা যায়, বক্তা 'ব্যবসায়ী' পসার জঁাকান, বাগাড়ম্বরপূর্ণ' বিতর্ক-মূলক রচনার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন ; কিন্তু তিনি এ কথাও বলেছিলেন, "তাহাতে আবার যখন সুললিত ভাষার আড়ালে অসৎভাব বিদ্যমান থাকে ; কুৎসিৎ বিষয়কে যখন ভাষার সাজে সাজাইয়া, নানা অলঙ্কার পরাইয়া, মন ভুলানরূপ করিয়া, সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করা হয়, তখন সৎলোকের ধৈর্য্য রাখা দায় হইয়া উঠে।"··· (তদেব ; পৃঃ ১)

এ থেকে মনে হয়, 'সুললিত ভাষায়' অসৎ ভাবের পরিবর্তে সৎভাব পরিবেশিত হলে এবং সুন্দর বিষয়কে ভাষাসজ্জায় সজ্জিত করে তুলে ধরলে লেখকের খুব আপত্তি থাকবে না।

আসলে ভাষার চাতুরী খারাপ—কিন্তু ভাষার মাধুরীর প্রয়োজন সর্বত্র। এই দিক থেকে বলতে গেলে বিতর্কমূলক রচনাতেও ভাষার সৌন্দর্য্য বাঞ্ছিত ;

অনেক বিতার্কিক লেখকের রচনাতে ঐ সৌন্দর্যের সন্ধান পাওয়াও যায়। তাঁদের মসীচালনা তাই বাংলাগদ্যকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছিল।

রামমোহন থেকে যথার্থ বিতর্কপুস্তকাদি রচনার আরম্ভ—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেখা যাক, সে সময় বাংলা গদ্যের অবস্থা কেমন ছিল। বাংলা ভাষায় রচিত রামমোহনের প্রথম প্রকাশিত বই-এর নাম 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫)। ঐ গ্রন্থে তদানীন্তন বাংলা গদ্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা ছিল। রামমোহন সেখানে বলেছিলেন—

"প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কথকগুলিন শব্দ আছে এ ভাষা সংস্কৃতের জেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেণ না"…[রামমোহন রচনাবলী—হরফ প্রকাশনী; ১৩৮০। পৃঃ ৭]

রামমোহনের সামনে অনুসরণ করবার মতো কোন বলিষ্ঠ গদ্য ছিল না। কাজেই সমকালীন গদ্যের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সজাগ থেকেই তাঁকে শাস্ত্রীয় আলোচনায় অগ্রসর হতে হয়েছিল। কিন্তু ঐ গদ্যের ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন থাকা সত্ত্বেও, দেখা যায়, তাঁর গদ্যও ঐ ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি। অবশ্য এর জন্যে রামমোহনকে অক্ষমতার দোষে অপরাধী করা সঙ্গত নয়; কেননা প্রথম পদক্ষেপেই পথ প্রস্তুত হয় না। দুর্বল, অগঠিত গদ্যে গ্রন্থরচনা শুরু করে তাই তাকে সমৃদ্ধ করা রামমোহনের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তবে ধীরে ধীরে তাঁর গদ্যেও বলিষ্ঠতা দেখা দিয়েছিল। তাঁর গদ্যের জড়তা পরে অনেকখানি দূর হয়ে গিয়েছিল। রামমোহনের বিতর্করচনার গদ্যই আবার জড়তামুক্ত হয়েছিল সব চাইতে বেশি। এই কারণেই বলা যায়, রামমোহন ও অন্যান্য ব্যক্তির লেখা বিতর্করচনার মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্য ধীরে ধীরে বেশ সরল হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গক্রমে বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধি সাধনে বিতর্কমূলক রচনার গুরুত্ব সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকরে' যে মন্তব্য করা হয়েছিল তা' উদ্ধার করা যেতে পারে—

"রাজা রামমোহন রায় সমাচার পত্র প্রকাশ ও পুস্তক রচনা দ্বারা স্বাভিমত ব্যক্ত করণে প্রবৃত্ত হইলে মহানুভব বিদ্যাতৎপর ৺নন্দলাল ঠাকুর মহাশয়

তদ্বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন। তৎকালে উভয়দলে অনেক সাহায্যকারী পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। উভয়পক্ষের বিবাদে ভাষার বিস্তর উন্নতি হয়।"

শেষ ছত্রটির বক্তব্য এখানে খুব মূল্যবান। বিগত শতকে বাংলা দেশে নানা বিষয়ে যে তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠেছিল সেই ঝড়ে সত্যিই বাংলা গদ্যের দুর্বোধ্যতা ও দুর্বলতার জঞ্জাল অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। 'সংবাদ প্রভাকরে'র মন্তব্যটি যথার্থ ঐতিহাসিক।

তবে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করলে দেখা যায়, সকল তার্কিক লেখকের গদ্যই বাংলা গদ্যের ক্রমোন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে নি। আবার এও দেখা যায়, একই ব্যক্তির পুস্তকের গদ্য কোথাও হৃদ্য, কোথাও বা দুর্বোধ্য; কোথাও প্রাঞ্জল, কোথাও বা দুরূহ।

বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তক 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র প্রকাশকাল ছিল ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। এই গ্রন্থেই তাঁর গদ্যভঙ্গির অভিনবত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। জড়তা এই গদ্যে যে কিছু ছিল না তা নয়। সংস্কৃত অপ্রচলিত শব্দ ও ভারী ক্রিয়াপদের ব্যবহার এখানে একটু বেশি পরিমাণেই লক্ষ্য করা যায়। তবে তা থেকে তাঁর গদ্য অচিরে মুক্তিও পেয়েছিল। পুস্তকটির পরবর্তী সংস্করণেই তিনি ঐ গদ্যের সংস্কার করেছিলেন। বিতর্কমূলক গ্রন্থগুলিতেও তাঁর গদ্য খুব সাবলীল হয়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগরের বিতর্কমূলক রচনার গদ্যে যে লালিত্য ও মাধুর্য লক্ষিত হয় তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য তার্কিক লেখকের রচনায় তা কদাচিৎ দেখা যায়।

বিদ্যাসাগর সামাজিক বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে মানুষের হৃদয় ও বুদ্ধি উভয়ের কাছে কল্যাণকর কাজে এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছিলেন। এই কারণে তাঁর গদ্যে যেমন ছিল বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা তেমনি ছিল হৃদয়ের নমনীয়তা। বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তকে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্যঙ্গ ও পরিহাসের কঠিনতা। অবশ্য ছদ্ম নামে রচিত পুস্তকগুলিতে তাঁর রঙ্গব্যঙ্গের আঘাত হয়েছিল আরও তীব্র—আরও প্রবল। স্বনামে প্রকাশিত বহুবিবাহ সংক্রান্ত পুস্তক দুটিতেও এই সব বৈশিষ্ট্য দুর্নিরীক্ষ্য নয়। গভীর শাস্ত্রীয় যুক্তির বিন্যাসেও তাঁর গদ্যের সরলতা ছিল লক্ষ্য করবার মতো।

শাস্ত্রীয় বচনাদি ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করবার সময় তিনি যুক্তিধর্মী প্রাঞ্জল গদ্য কেমন ব্যবহার করতেন তার একটু নমুনা উদ্ধার করা যাক—

"এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, এই প্রকরণের আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিলে, ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধি-নিষেধ বোধ হয়, অথবা বিধবাবিবাহের বিধি-নিষেধ বোধ হয়। প্রথম বচনে সন্তানাভাবে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন উপক্রম করিয়া সর্বশেষ বচনে পুত্রোৎপাদন প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন। সুতরাং, যখন উপক্রমে ও উপসংহারে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধি ও নিষেধ দেখা যাইতেছে, এবং যখন তন্মধ্যবর্তী সকল বচনেই তৎসংক্রান্ত কথা লক্ষিত হইতেছে, তখন এই প্রকরণ যে কেবল ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনবিষয়ে, তাহাতে কোনও সংশয় হইতে পারে না। যে বচন অবলম্বন করিয়া, প্রতিবাদী মহাশয়েরা বিধবার বিবাহ মনুবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান, তাহার পূর্বার্ধেও ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনার্থ আদেশবোধক স্পষ্ট নিয়োগ শব্দ আছে; সুতরাং, অপরার্ধে যে অস্পষ্ট বেদন শব্দ আছে, তাহারও পাণিগ্রহণরূপ অর্থ না করিয়া, প্রকরণবশতঃ, ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণরূপ অর্থই করিতে হইবেক।"……

[বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (২য় খণ্ড) ; সাক্ষরতা প্রকাশন ; ১৯৭২। পৃঃ ৭৩]

এখানে উপযুক্ত শব্দের প্রয়োগে ও ছেদচিহ্নের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারে ভাষার ঋজুতা এবং শ্রুতি মধুরতা দুই-ই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তথ্যের সমাবেশ এবং যুক্তির গাম্ভীর্য ভাষাকে এখানে বক্তব্যের ভারবহনে অক্ষম করে তোলে নি।

আবেগধর্মী গদ্য সৃষ্টিতেও বিদ্যাসাগর বিতর্কপুস্তকগুলিতে নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন—

"হা শাস্ত্র! তোমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে! তুমি যে সকল কর্মকে ধর্মলোপকর, জাতিভ্রংশকর বলিয়া, ভূয়োভূয়ঃ নির্দেশ করিতেছ, যাহারা, সেই সকল কর্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া, কালাতিপাত করিতেছে, তাহারাও সর্বত্র সাধু ও ধর্মপরায়ণ বলিয়া আদরণীয় হইতেছে; আর, তুমি যে কর্মকে বিহিত ধর্ম বলিয়া উপদেশ দিতেছ, অনুষ্ঠান দূরে থাকুক, তাহার কথা উত্থাপন করিলেই, এককালে নাস্তিকের শেষ, অধার্মিকের শেষ, অর্বাচীনের শেষ… হইতেছে। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যে বহুবিধ দুর্নিবার পাপপ্রবাহে উচ্ছলিত হইতেছে, তাহার মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, তোমার প্রতি অনাদর ও লৌকিক-রক্ষায় একান্ত যত্ন ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না।" (তদেব ; পৃঃ ১৬৪)

বেদনাহত সহৃদয় বিদ্যাসাগরের এই গদ্য পাঠক হৃদয়কে বিস্ময়কর ভাবে

নাড়া দিয়ে থাকে। আবেগ প্রকাশের তীব্রতাতে এ গদ্য প্রবল স্রোতোস্বিনী পর্বতকন্যা মন্দাকিনীর গতির মতো।

প্রসঙ্গক্রমে বাংলা বিতর্করচনার গদ্যভঙ্গিতে বিদ্যাসাগরের লেখা একটি বিশেষ আবেগধর্মী গদ্যাংশের প্রভাব কত ব্যাপক হয়ে উঠেছিল তা আলোচনা করা যেতে পারে।

বিদ্যাসাগরের বিতর্করচনার গদ্য যুক্তিনিষ্ঠ হলেও হৃদয়বত্তার স্পর্শে স্থানে স্থানে তা' আবেগঋদ্ধও হয়ে উঠেছে। তবে আবেগ প্রকাশে পরিমিতি বোধ থাকায় সে গদ্য বিলাপধর্মী বা প্রলাপগন্ধী হয়ে ওঠেনি। আসলে যুক্তির বৃন্তেই তাঁর আবেগ গোলাপ হয়ে ফুটেছিল। বিদ্যাসাগরের আবেগধর্মী গদ্য তাই নিছক কাঁদুনি বা প্রগলভতা নয়। বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থের উপসংহার ভাগটিই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সংরক্ষণবাদী ও প্রগতিশীল উভয় শ্রেণীর লেখকের গ্রন্থেই ঐ অংশের ভাব ও ভাষার প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল। বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা কয়েকটি অংশ উদ্ধার করলেই বক্তব্য স্পষ্ট হবে—

(ক) "হা; পতিপরায়ণা অবলা বিধবারা সংপ্রতি এই দুরন্তকালে স্বেচ্ছাচারীগণেরা তোমার দিগের এক পতিত্ব ধর্ম্মবিনাশের নিমিত্ত যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে এই পুণ্য ক্ষেত্র ভারতবর্ষকে এককালে নিরয়াধার পাপ-ক্ষেত্র করিয়া তুলিলেন; আর তোমারদিগের এস্থান বাসোপযোগ্য হয় না। অভিনব সুপাত্র ছাত্রেরা রাজপুরুষ মাত্রের অভিপ্রায়ের সুযোগ বুঝিয়া যুক্তি বলে ভাক্তকারুণ্যছলে যেরূপ বিধবা পরিণয়ের কৌশল করিয়াও তুলিতেছেন, তাহাতে তোমারদিগের যে কি সর্ব্বনাশ হইবে ইহা বিচক্ষণ ধার্ম্মিকগণেরা আলোচনা করিয়া বেপমান হইতেছেন।"

[বৈধব্য ধর্ম্মোদয় (দ্বিতীয় পুস্তক)—নন্দকুমার কবিরত্ন ও হারাধন বিদ্যারত্ন সংগৃহীত; ১৭৭৮ শকাব্দ। পৃঃ ৬৭]

(খ) "হা ভারতবর্ষীয় কন্যাগণ! তোমরাই পাতিব্রতাগ্রগণ্য ধন্য সতী, তোমরাই কামিনীকুলের কীর্ত্তিপতাকা স্বরূপ, কেবল তোমাদিগের দেশস্থ লোকে বিধিমত চেষ্টা করিয়া তোমাদিগকে অধোগামিনী করিতেছে।"

[সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২য়)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত; ১৯৬৩। পৃঃ ১৭৭]

(গ) "হে বঙ্গীয় মহিলাগণ! না জানি জন্মান্তরে তোমরা কতই দুষ্কৃত সঞ্চয় করিয়াছিলে, তাই বিধাতা তোমাদিগকে এরূপ হীনাবস্থায় রাখিয়া দিয়াছেন।"...

[সমাজ-সংস্করণ ('স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধ দ্রঃ)—নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; ১২৭৬। পৃঃ ৪৭]

(ঘ) "হায়, আজ ভারতের কি দুর্দ্দিন! নরনারী সকলেই আত্মহারা হইয়া ইন্দ্রিয় সুখভোগ লালসায় পরিভ্রাম্যমাণ।...কিন্তু হায়, পূর্ব্বে ভারত রমণীরা যেরূপ শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভ করিয়া ভারতের গৌরববৃদ্ধি ও মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন তাহা এখন কোথায়?"...

[স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা ; রচয়িতার নাম অজ্ঞাত ; ১৮৯৩। দ্রঃ বিজ্ঞাপন অংশ]

দৃষ্টান্ত আর বাড়াবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থের পূর্বে উল্লিখিত অংশে বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের বহু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছিল। ভাবানুগ শব্দ প্রয়োগের নিপুণতা, বিজ্ঞানসম্মত যতিচিহ্ন ব্যবহারের কুশলতা, ভাবের উত্থান-পতনের পরিমিতি—সব কিছুই এই গদ্যাংশে দেখতে পাওয়া যায়। এই গদ্য প্রকৃত অর্থেই ব্যক্তিত্বচিহ্নিত সাহিত্যিক গদ্য। অতএব সে যুগের তার্কিক লেখকদের রচনায় এই গদ্যের প্রভাব পড়ায় বলা যায়, বাংলা গদ্য লাভবানই হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের গদ্য ছিল প্রাঞ্জল—সাহিত্যিক এ কথা ঠিক; কিন্তু তাঁর আগে যাঁরা বিতর্কপুস্তকাদি রচনা করেছিলেন তাঁদেরও কারও কারও রচনায় গদ্যের প্রাঞ্জলতা দেখা দিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের সহযোদ্ধা বা প্রতিপক্ষেরও কেও কেও প্রাঞ্জল গদ্য রচনা করেছিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা'য় 'বাল্যবিবাহ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটির গদ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করবার মতো—

"যাঁহাদিগের সন্তানেরা বাল্যকালে বিবাহ করিয়া, আজীব (?) মূঢ় হন, ও কামিনীর মনোরক্ষার্থে চৌর্য্যবৃত্তি প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া, লোকের দুর্ব্বিষহ নিন্দাবাদ সহ্য করত অতিকষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহারাই বিবেচনা করুন, বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকা উচিত কি না?"

[বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা ; ১২৬২, কার্ত্তিক ; পৃঃ ২৫]

পাঠককে আপন মতের সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ করবার উপযুক্ত বাগ্-বৈদগ্ধ্য এবং আবেগের উত্তপ্ত স্পর্শ এখানে লক্ষ্য করবার মতো। ছেদচিহ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যবহারও এখানে স্পষ্ট।

শ্যামাপদ দেবশর্মা ছিলেন বিদ্যাসাগরের অন্যতম প্রতিপক্ষ। বিদ্যাসাগরের

পুস্তকের বিরোধিতায় তাঁর জুড়ি খুব কমই ছিলেন। তাঁর গদ্যভঙ্গিও উল্লেখযোগ্য—

"বিদ্যাসাগর মহাশয় মনে করিয়াছেন আমি হতভাগ্য বিধবাদের হিত চেষ্টা করিতেছি কিন্তু হে বিধবাগণ তোমরা স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলেই জানিতে পারিবে যে ঐ চেষ্টা তোমাদের পক্ষে একান্তই অহিতকর।"

[ভ্রম নিরাকরণ। অর্থাৎ বিধবা ধর্ম্মরক্ষা—শ্যামাপদ দেবশর্ম্মা ; ১৯৩১ সম্বৎ। পৃঃ ৯৮]

শ্যামাপদের এই গদ্য জড়তামুক্ত একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পরবর্তী কালে বিভিন্ন তার্কিক লেখকের রচনার মধ্য দিয়ে এই গদ্য আরও বলিষ্ঠতা লাভ করেছিল। এই বক্তব্যের সমর্থনে শ্যামাপদের পরবর্তী এক লেখকের গদ্যভঙ্গির কিছু নমুনা তুলে ধরছি—

"প্রেমে ভক্তি উপজাত হয় ; মানুষকে ভালবাসিয়া হৃদয় ঈশ্বরকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে। ক্ষুদ্র ঝরণা হইতে ক্ষুদ্র নদী নিসৃত হইয়া বহু দেশ, বহু জনপদ, বহু নগর নগরী বিধৌত করিয়া, অবশেষে অগাধ জলধি জলে মিশিয়া যায়। প্রেমের গতিও তাহারই মত। প্রথমে প্রেম ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ, কেন্দ্রীভূত ; কিন্তু ক্রমে এই কেন্দ্র হইতে সমগ্র জগৎকে আলীঙ্গন করিয়া সর্ব্বশেষে প্রেমসাগর ভগবানে গিয়া লীন হইয়া পড়ে। এই জন্যই বিবাহ মুক্তির উপায়।"

[প্রতিবাদ নবজীবন-সম্পাদক ও বিধবা-বিবাহ ; রচয়িতার নাম ও প্রকাশকাল অজ্ঞাত ; পৃঃ ১৬]

এই গদ্যে শাব্দিক কার্কশ্য লুপ্ত হয়েছে ; ছেদচিহ্ন ব্যবহারেরও উন্নতি ঘটেছে। লেখকের ব্যক্তিত্বও এখানে মাধুর্য বিস্তার করেছে।

উনবিংশ শতকের শেষে বিতর্করচনার গদ্য কেমন প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছিল তার নিদর্শন পাই আমরা ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিপিন বিহারী ঘোষের বইটিতে। এই জন্যে ঐ বইটি থেকে একটি অংশ উদ্ধার করছি—

"প্রশ্ন। বিবাহের দ্বারা পতির যে স্বামিত্ব জন্মে সে স্বামিত্ব তিরোহিত না হইলে নারী কিরূপে অপরের ক্ষেত্রীভূতা হইতে পারে ?

উত্তর। বিবাহিতা নারীর দুই অবস্থা জন্মে। স্বামী হয় জীবিত আছেন না হয় মরিয়া গিয়াছেন।

১। যদি জীবিত থাকিয়া তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তবে

তাঁহার স্বামিত্ব তিনি নিজেই পরিহার করিয়াছেন। সেই অস্বামী অবস্থায় নারীর অপর স্বামী পাইতে আপত্তি কি ?"

(বিধবা দর্শনে ও পুনর্ভূ—বিপিনবিহারী ঘোষ ; ১৮৯৬। পৃঃ ৮৩)

এই গদ্যকে আধুনিক গদ্য বলতে আপত্তি কি ?

প্রসঙ্গক্রমে বিতর্করচনায় ব্যবহৃত ছেদচিহ্ন সম্পর্কে আলাদা ভাবে কিছু বলা প্রয়োজন।

বাংলা গদ্যে প্রথম সুষ্ঠু ছেদ চিহ্নের ব্যবহার ঘটেছিল বিদ্যাসাগরের হাতে। কণ্ঠস্বরের স্থিতিস্থাপকতার পরিমিতির দিকে দৃষ্টি রেখে এবং অর্থবোধের প্রতি সজাগ থেকে অর্থাৎ ভাষাতাত্ত্বিক ও শারীরতাত্ত্বিক রীতি অনুযায়ী বিরতি চিহ্নের প্রয়োগ করে বাংলা গদ্যকে শ্রুতিমধুর ও সুবোধগম্য করবার কৃতিত্ব বিদ্যাসাগরেরই। রামমোহনের রচনাতেও ছেদচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছিল ; কিন্তু তা নিতান্তই নগণ্য। বিরতিচিহ্নের বৈচিত্র্য তাঁর গদ্যে ছিল না। তাঁর সমসাময়িক যুগের অন্যান্য রচয়িতার গদ্যেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য এখানেই, বিদ্যাসাগরের গদ্যে এই চিহ্নের সুষ্ঠু ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও তাঁর সমসাময়িক রচয়িতাদের অনেকের লেখাতেই তার সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখা যায় না। অনেক সময় বরং তাঁদের লেখায় অসংলগ্ন ছেদচিহ্নের ব্যবহার অর্থকে দুর্বোধ্য করে তুলেছিল। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম পুস্তকের বিরুদ্ধে রচিত নন্দকুমারের 'বৈধব্য ধর্ম্মোদয়' গ্রন্থে যতিচিহ্নের এমন ব্যবহার অত্যন্ত স্পষ্ট—

"অসর্ব্বজ্ঞত্ব বিধায় ; নব্য হিন্দুরা কেবল পারাশর ধর্ম্ম কলিতে গ্রাহ্য ইহাই স্থির করিতেছে। তাহার কারণ ; অসৎ কর্ম্মশীলেরা মনে২ স্থির করিয়াছে যে আমরা যে সকল কদর্য্য কর্ম্ম সমাচরণ করিয়া থাকি পরাশরের মতে ইহাকেই যদি কলির সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় তবে আর কোন মতে অসৎ-কার্য্য করিয়াও আমরা অধার্ম্মিক হইবে না।"

[বৈধব্য ধর্ম্মোদয় (১ম)—নন্দকুমার কবিরত্ন ; প্রকাশ কাল অজ্ঞাত। পৃঃ ১৭]

এই অংশে সেমিকোলন দু'বার এবং পূর্ণচ্ছেদও দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে ; কিন্তু সেমিকোলনের ব্যবহার রীতিসম্মত হয় নি। ঐ ব্যবহার অনুযায়ী পড়তে গেলে অর্থবোধেরও অসুবিধা হয়।

কখনো কখনো দেখা যায়, ভাষাগত সরলতা থাকলেও বিতর্করচনায় ছেদ-চিহ্নের ব্যবহার নিয়মানুগ হয় নি।—

"কুলকালিমা মলিন বেশে নানা বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া লেখক সমাজে অবতীর্ণা হইল। যদি মনুষ্যের মন দুর্নিবারণীয় না হইত। যদি মনুষ্য বুদ্ধির অনুযায়ি হইয়া সকল কার্য্য করিত। যদি মনুষ্য ভবিষ্যৎ দর্শন করিতে পারিত। সংসার তবে অতি অল্প অনুতাপের বিষয় হইত।"

[কুলকালিমা—রচয়িতার নাম ও প্রকাশ কাল অজ্ঞাত; দ্রঃ অবতরণিকা']

এখানে মাত্র পূর্ণচ্ছেদ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু প্রথম ও শেষ চিহ্ন দুটি ছাড়া অন্যত্র ঐ চিহ্নের ব্যবহার ভাষাতাত্ত্বিক বা স্বরযান্ত্রিক কোন দিক থেকেই সঙ্গত হয় নি।

তবে, বলাবাহুল্য, বিতর্কমূলক রচনায় ছেদচিহ্ন ব্যবহার সম্পর্কে এই কথাই শেষ কথা নয়। সাধারণ ভাবে বলা যায়, অন্যান্য বাংলা রচনার মতো বিতর্কমূলক রচনার মধ্য দিয়েও বাংলাগদ্যে ছেদচিহ্ন ব্যবহারের ক্রমোন্নতি ঘটেছিল। রামমোহনের গদ্যে ছেদচিহ্ন ব্যবহারের যে প্রয়াস দেখা দিয়েছিল, বিদ্যাসাগরের লেখাতে সেই প্রয়াসই সার্থক হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে অনেকের বিতর্ক-রচনায় ছেদচিহ্ন ব্যবহারে ত্রুটি যে ছিল না তা নয়; কিন্তু তবুও বলা যায়, তার্কিক লেখকদের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যে সুষ্ঠু ছেদচিহ্ন ব্যবহারের পথ প্রশস্তই হয়েছিল।

[৩]

বিতর্কমূলক রচনাগুলিতে আঙ্গিক বৈচিত্র্যও কম ছিল না। তার্কিক লেখকদের কারও রচনায় সংস্কৃত নাট্যভঙ্গি, কারও রচনায় রূপকরীতি, কারও রচনায় বা আর কোন আঙ্গিকের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়।

প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করবার রীতিটি সে যুগের তার্কিক রচয়িতৃগণ পছন্দ করেছিলেন সব চাইতে বেশি। এই রীতিটি বাংলা গদ্যের প্রায় আদিযুগ থেকেই নানা উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্যে অনুসৃত হয়ে আস-ছিল। বৈষ্ণব সাধক ও মিশনারী পাদ্রীদের প্রচার মূলক পুস্তকাদিতে এই রীতি বহু আগেই অনুসৃত হয়েছিল। উনিশ শতকের তার্কিক লেখক-দেরও অনেকে ঐ আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম যে সার্থক বিতর্কপুস্তক রচয়িতার লেখায় এই গতানুগতিক রীতির অনুসরণ দেখা যায়, তিনি হলেন রামমোহন রায়। তাঁর প্রতিবাদী কাশীনাথও ঐ রীতিতে তাঁর প্রতিবাদ পুস্তক রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালেও এই ধারা প্রসৃত হয়েছিল। এই আঙ্গিকে লেখা রচনায় বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে পাঠকের বেশ সুবিধাই হয়ে থাকে।

কিন্তু এই আঙ্গিকে লেখা বিতর্করচনার বিষয়বস্তু বুঝতে সুবিধা হলেও সংলাপ মাধ্যমে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু ছিল বেশি উপভোগ্য। উদ্দেশ্য মূলকতার প্রাধান্য থাকায় কখনও কখনও সংলাপগুলি কানে বাজলেও নাট্যরসও তাতে অনেক সময় সৃষ্ট হয়েছিল।

বাংলা বিতর্কমূলক পুস্তকগুলির মধ্যে প্রথম যে পুস্তকটিতে সংলাপ ব্যবহারের নৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায় সেটির রচয়িতা গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' পুস্তকের শুরুতেই সার্থক নাটকীয় সংলাপ লক্ষ্য করা যায়—

"প্র। ওলো, এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখাপড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা! কালে কালে কতই হবে ইহা তোমার মনে কেমন লাগে?

উ। তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবেরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এতকালের পর আমাদের কপাল ফিরিয়াছে, এমন জ্ঞান হয়।"

[স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক—গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ; ১৮৫৯। পৃ : ৩]

বেশ বোঝা যায়, কথা এখানে মেয়েরাই বলছে। তবে ক্রিয়াপদের সাধু রূপের ব্যবহার না হলেই ভাল হতো। প্রসঙ্গক্রমে গৌরমোহন রচিত আরও একটি সংলাপ উদ্ধার করছি—

"উ। না বইন, সে কেবল কথার কথা, কারণ আমি আমার ঠাকুরাণী দিদীর ঠাঁই শুনিয়াছি যে কোন শাস্ত্রে এমত লেখা নাই, যে মেয়্যা মানুষ পড়িলে রাঁড় হয়; কেবল গতর শোসা মাগিরা একথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে। যদি তাহা হইত তবে কত স্ত্রীলোকের বিদ্যার কথা পুরাণে শুনিয়াছি, ও বড়বড় মানুষের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই লেখা পড়া করে, এমত শুনিতে পাই। সম্প্রতি সাক্ষাতে দেখ না কেন, বিবিরা তো সাহেবের মত লেখাপড়া জানে, তাহারা কেন রাঁড় হয় না?" (তদেব ; পৃঃ ৫)

এই সংলাপে বক্তার মানসিকতা ধরা পড়েছে এবং ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটায় নাট্যরসও এখানে স্ফুরিত হয়েছে। আলোচ্য পুস্তকটি নাটক নয়; কিন্তু সমসাময়িক সামাজিক নাটকপ্রহসনেও এমন সাবলীল সংলাপের ব্যবহার খুব কম দেখা যায়। গৌরমোহনের কৃতিত্ব এখানেই যে, নারীর মুখে সংলাপ ব্যবহার করতে গিয়ে তিনি তাদের ভাষার স্বাভাবিক আদিম রূপটিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। নিম্নে উদ্ধৃত সংলাপটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ—

"যদি ছোট ছোট কন্যারা বাটীর বালকের লেখাপড়া দেখিয়া সাধ করিয়া কিছু শেখে, ও পাততাড়ি হাতে করে, তবে তাহার অখ্যাতি জগৎ বেড়ে হয়। সকলে কহে যে এই মর্দ্দা ঢেঁটি ছুঁড়ি বেটা ছেল্যার মত লেখাপড়া শিখে। এ ছুঁড়ি বড় অসৎ হবে। যে গাছ বাড়ে তাহার অঙ্কুরে জানা যায়।"

(তদেব ; পৃঃ ৬)

এখানে গ্রাম্য শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ পাঠক মাত্রেরই মনোযোগ কেড়ে নেয়। গৌরমোহনের ভাষা ব্যবহারের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সংলাপে তিনি বহু গ্রাম্য প্রবাদবচন প্রয়োগ করেছিলেন। চরিত্রানুগ ও নাটকীয় সংলাপ রচনায় ঐ প্রয়োগ সার্থক হয়ে উঠেছিল। গৌরমোহন সৃষ্ট এহেন সংলাপ বাংলা গদ্যকে যথার্থ নাট্যগুণে মণ্ডিত করেছিল।

বর্তমান প্রসঙ্গে ১৮৪৯ সালের ২৮মে'র 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ে দুইজন স্ত্রীলোকের কথোপকথন' শীর্ষক রচনাটিরও আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমেই লেখাটির কিছু অংশ উদ্ধার করা যাক—

"প্রশ্ন। ওগো, ও দিদী, কি শুন্তেছি, মেয়েদের লেখাপড়া শেখ্‌বার তবে নাকি এক্‌টা স্কুল হয়েছে।

উত্তর। হাঁলো, কোন্, তুই কি এতদিন্ তা শুনিস্ নি? এক মাস হলো ছোট২ মেয়ে সকল সেখানে যেতেছে।

... ...

প্র: ওগো দিদী, আমাদের বাড়ির এই মেয়েগুলীকে সেই স্কুলে পাঠালে ভাল হয় না? বাছারা গুন শিখতে পাল্লে পরে ঘরকন্নার কত ভাল হ'বে।·····

(সংবাদ সাধুরঞ্জন ; ১৮৪৯, ২৮শে মে)

প্রশ্নকারিণী ও উত্তরদাত্রী ছিলেন বাড়ির বড়বৌ ও ছোটবৌ। তাঁদের এই সংলাপের মধ্যে অমার্জিত অথচ স্বাভাবিক ঘরোয়া ভাষার রূপটি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে।

উল্লিখিত রচনাটিতে সংলাপ কখনো কখনো দীর্ঘ হয়েছে; কিন্তু কথন-রীতির স্বাভাবিকতা তাতে ক্ষুন্ন হয় নি। প্রয়োজন বোধে এমন একটি সংলাপ উদ্ধার করছি—"···আমাদের সময় ভাল নয়, পুরুষেরা দিন্ আনে দিন্ খায়, কর্ত্তাটীর ইচ্ছা না আছে এমন নয়, সে দিনে (কোথাকার) মর ছাই, তার নাম আমার মনে পড়ে না, ঐ যে, অমুক ঘোষ, এসেছিল, তার সঙ্গে কে, একটী

রাঙ্গাপানা টুপি মাথায় সাহেব২ বাবু এসেছিল, তখন ঠাকুর পো কর্ত্তার কাছে বসে ছিলেন। তোর রাখালীকে ও আমার ত্রিপুরাকে স্কুলে দেবার কথা হোয়েছিল। আমাদের এই পাড়ার হাড়্হাবাতে ফোগ্লা বুড়ো, মর তার নাম করিলাম, অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বর, মহাভারত, কোন্ আজকের দিন্ কপালে অন্ন আছে কিনা বলতে পারিনে, সেই ড্যাকরা, আর বাড়ীর জামায়ের খুড়ো নাহুস্নুহুস্ ভুঁড়ো মিন্সে বোলে পাঠালে "তোমরা যদি মেয়ে পড়তে দেও তবে এক ঘোরে করব, জাত্ মারব, চাকরি ছাড়াব, তাদের কি, গুণ জ্ঞান নেই —*— ভাবরস "মেগের কাছে পেগের বড়াই" বড় লোকের কিছুই করতে পারে না, কেবল দুঃখিদের নিয়ে টানাটানি করে।"·· ···(তদেব ; ১৮৪৯, ২৮শে মে)

সংলাপটি নিঃসন্দেহে দীর্ঘ ; কিন্তু তবুও তা' মোটেই অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে নি। গ্রাম্য নারীর সংস্কার, ভাষা, কটাক্ষ-নিক্ষেপ-দক্ষতা ও অসহায়তার নিখুঁত রূপ এই সংলাপে ফুটে উঠেছে।

'নবজীবন' পত্রিকায় (১২৯৪) প্রকাশিত 'বাল্যবিবাহ' শীর্ষক রচনাটিতেও কথোপকথনের রীতি অনুসৃত হয়েছিল। তবে নাটকীয়তার লক্ষণ এখানে তেমন ফুটে ওঠে নি। রচনাটিতে বিজয়-বসন্ত ও অধ্যাপকের কথোপকথনের মধ্যে উদ্দেশ্যমূলকতাই প্রকট হয়ে উঠেছিল।

হাঁটি-হাঁটি-পা'র সময় থেকেই বাংলাগদ্যের ওপর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল। বিতর্করচনার ওপরও ঐ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত নাটকের প্রভাবও এক্ষেত্রে কম ছিল না। মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয় তাঁর 'বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ' গ্রন্থে সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক অনুসরণ করেছিলেন। অবশ্য গ্রন্থটির ভূমিকা অংশেই শুধু ঐ রীতি অবলম্বন করা হয়েছিল।

ঐ অংশে প্রথমেই ছিল 'নান্দীপাঠ'। তারপর যথারীতি প্রবেশ করেছিল সূত্রধর। প্রবেশ করেছিল সে বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গের সভায়। উপস্থিত ব্যক্তিদের দেখে মুগ্ধ হয়ে সে তার প্রেয়সীকেও সভা দেখাতে চেয়েছিল। তারপর সভাস্থ "শ্রীকণ্ঠবাবু কৃষ্ণবিহারীবাবু ও সদর আলা বাবু" এবং "শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও শিবনাথ বাচস্পতি প্রভৃতি সুধীগণ"-কে দেখে সে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। মধুসূদন তাঁর গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও বক্তব্যের আভাস দিয়েছিলেন এই আঙ্গিকে খুব সুন্দরভাবে—

"ধনি (স্বগত) আমার বহু দিনের একটি মানসিক সন্দেহ, তাহা এই সভাস্থলে ভঞ্জন করিতে হইবে,"······

[বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ—মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ; ১৯৪২ সম্বৎ। দ্রঃ 'ভূমিকা'—পৃঃ ১]

যাই হোক, সূত্রধরের সঙ্গে পথে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের দেখা হয়ে গেলো। স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে প্রশ্ন করা হলো—

"……মহাশয় সবিশেষ, বলিতে পারেন, সম্প্রতি কস্যচিৎ ভাইপোস্য বলিয়া যে একখানি পুস্তক প্রকাশ হয়েছে দেখে থাকিবেন ঐ উপযুক্ত ভাইপো কে ?"

(তদেব ; পৃঃ ২)

স্মৃতিরত্ন মহাশয় ব্যাপারটা জানতেন না; তবে পরে শুনেছিলেন, বিদ্যাসাগর ঐ পুস্তকের রচয়িতা বলে লোকমুখে প্রচারিত। কিন্তু তাতে তিনি সন্দেহ পোষণ করেছিলেন। যাই হোক, ঐ পুস্তকে নৈয়ায়িক পণ্ডিতদের নস্যাৎ করা হয়েছে জেনে তিনি ন্যায়শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে বলা হয়েছিল—

"আমরা ভাইপোর ব্রজবিলাস পুস্তক দেখিয়াছি এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহের দ্বিতীয় পুস্তকও দেখিয়াছি। তদ্বিষয়ে কোন কোন স্থানে সন্দিহান আছি···আমরা প্রশ্ন করি মহাশয় উত্তর করুন।" (তদেব ; পৃঃ ৬)

গ্রন্থটির ভূমিকাতে সংস্কৃত নাট্যরীতির আঙ্গিকে বক্তব্য উত্থাপনে মধুসূদন খুব সফল হয়েছিলেন। ঐ অংশে রীতিমত একটি নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছিল। রঙ্গে-ব্যঙ্গে-শ্লেষে মধুসূদন মাঝে মাঝে বেশ বলিষ্ঠ সংলাপও সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন—

"না না মহাশয় ও কথা কি বলিতেছেন সাগর তরঙ্গে রত্নই পাওয়া যায় সত্য বটে কিন্তু সামুক গোগ্‌লিও উৎপন্ন হয় দেখতে পাওয়া যায় তো।"

(তদেব) ;

এখানে 'মহাশয়' ও 'বলিতেছেন' শব্দ দুটির ব্যবহারে ভাষাগত স্বাচ্ছন্দ্য কিছু যে ক্ষুণ্ণ হয় নি তা নয় ; কিন্তু তবুও বলা যায়, সে যুগের বাংলা গদ্যে এমন সংলাপের মূল্য কম ছিল না।

কিছু কিছু বিতর্কমূলক রচনায় বক্তৃতার রীতিও অনুসৃত হয়েছিল। ঐ রচনাগুলি আসলে সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেবার জন্যে বা পাঠ করবার জন্যে রচিত হয়েছিল।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'বেথুন সমাজাধিবেশনে' হঠাৎ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন পরে তাই-ই ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে

লিখিত ও মুদ্রিত হয়েছিল, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। ঐ মুদ্রিত বক্তৃতাটির কিছু অংশ উদ্ধার করা হলো—

"মহাশয়! তবে কি জন্য আপনি আপন কন্যা প্রভৃতির শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগী হইতেছেন না? কেনই বা তাহাদিগকে বেথুন বা ডফ সাহেবের স্ত্রীশিক্ষালয়ে প্রেরণ করেন না?" তাহা হইলে, সেই চতুরচূড়ামণি মুক্ত কণ্ঠে বলিয়া থাকেন, "কেন, আমার কন্যারা তো আপন বাটীতেই শিক্ষা প্রাপ্তা হইতেছে।" হায়! ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়?" (বর্ত্তমান ইং ১৮৬২ সালের ১১ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারের বেথুন সমাজাধিবেশনে সাময়িক বাঙ্গালা বক্তৃতা—যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; ১২৬৯; পৃঃ ৩)

বক্তৃতা দেবার সময় শ্রোতাকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে বক্তা প্রয়োজনবোধে যুক্তি ছাড়াও আবেগের আশ্রয় নেন। অনেকে বক্তৃতা দিতে দিতে নিজেরাই আবেগবিহ্বল হয়ে পড়েন। এই কারণে বক্তৃতা বা বক্তৃতাধর্মী বিতর্করচনাগুলির স্থানে স্থানে আমরা আবেগধর্মী গদ্য লক্ষ্য করে থাকি। এই শ্রেণীর বিতর্করচনার আবেগধর্মী গদ্যের একটি দৃষ্টান্ত—

"হা ধিক্ কপটি বঙ্গবাসিগণ! শ্রেষ্ঠ উপাধী তোমাদের কি এতই প্রিয়তম হইয়াছে যে, তল্লাভ জন্য পশুবৎ আচরণ করিতেও লজ্জাজনক জ্ঞান করিতেছে না? মিথ্যা কথনকে সহচর করিয়া ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ পথ পরিভ্রমণে কিঞ্চিন্মাত্র ও ক্ষুণ্ণ চিত্ত হইতেছে না?" (তদেব; পৃঃ ১০)

পূর্বে আলোচিত 'মাদক সেবনের অবৈধতা ও অনিষ্টকারিতা' পুস্তকটিও একটি বক্তৃতা। বক্তা অবশ্য বলেছিলেন, "আমি অদ্য আপনাদিগের নিকট একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করিতে সাহস করিতেছি।" (মাদক সেবনের অবৈধতা ও অনিষ্টকারিতা; পৃঃ ১) অর্থাৎ তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন না, প্রবন্ধই পাঠ করছেন; কিন্তু তবুও বলতে হয়, প্রবন্ধ পাঠের সময় পাঠক নয়, শ্রোতাই ছিল তাঁর সামনে। একথা তিনিও ভুলে যান নি বলে স্থানে স্থানে তাঁর ভাষায় বক্তৃতাদানের বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছিল। তারাধন তর্কভূষণের 'সুরাপানের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক ফল কি এবং তন্নিবারণোপায়ই বা কি?' পুস্তিকাটিও বক্তৃতার সংকলন।

বিগত শতকে সামাজিক তর্ক-বিতর্কের বিষয় নিয়ে কিছু ব্যঙ্গাত্মক পুস্তক-পুস্তিকাও রচিত হয়েছিল। রচয়িতারা স্বনামে ঐ সব পুস্তক প্রকাশ করেন নি। ব্যক্তিগত আক্রমণ ঐ সব রচনায় খুব বেশি ছিল। ভাষাও স্থানে স্থানে স্থূল

হয়ে পড়েছিল। এই কারণেই রচয়িতারা বোধহয় অন্যনামের আড়াল নেবার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে দেখা যায়, তৎকালীন সমাজের খ্যাতনামা মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিও তখন মনের উষ্মা প্রকাশের জন্যে ছদ্মনামকে বর্মরূপে ব্যবহার করেছিলেন। সে যুগে রচিত ব্যঙ্গাত্মক রচনার আলোচনা করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। অবশ্য একথাও ঠিক, ঐ সব ব্যঙ্গাত্মক রচনায় ব্যক্তি-গত আক্রমণ বা অন্যবিধ স্থূলতা থাকলেও বিষয়গত গাম্ভীর্যও কিছু ছিল।

সমাজসংস্কার মূলক বিষয় নিয়ে রচিত ব্যঙ্গাত্মক রচনার শ্রেষ্ঠ রচয়িতা ছিলেন বিদ্যাসাগর। 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোষ্য', 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য' এবং 'কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ' এই তিন নামে প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে তাঁর 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস' ও 'বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা বিষয়িনী' (দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে 'বিনয় পত্রিকা') এই পুস্তক চারখানি।

আলোচ্য পুস্তকগুলিতে রঙ্গ বা ব্যঙ্গই বড়, লঘুতাই প্রধান; অবশ্য বেনামা এই সব গ্রন্থে বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য ও যুক্তি নিষ্ঠা যে একেবারেই লক্ষ্য করা যায় না তা নয়; কিন্তু তবুও বলতে হয়, বিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অস্ত্রনিক্ষেপই হলো ঐ সব পুস্তক রচনার মূল প্রেরণা। পুস্তক রচনার রীতিও তাই হয়েছে আলাদা।

এই সব রচনাতেও বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রঙ্গপ্রিয়তা ও কৌতুকরস সৃষ্টিদক্ষতা বিদ্যাসাগরের অসাধারণ ব্যক্তিত্বেরই একটি বিশেষ দিক। বৈঠকী গল্প বলবার ক্ষমতাও ছিল তাঁর অসাধারণ। জ্ঞাননিষ্ঠ, যুক্তিবাদী, মানবতায় মহান বিদ্যাসাগরের মহৎ ও উদার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর স্বনামে প্রকাশিত বিতর্করচনায়; আর ব্যঙ্গপ্রিয়, কৌতুকপ্রবণ, গল্পকথক বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর বেনামে লেখা পুস্তক-মালায়। তবে একথাও ঠিক, উভয় শ্রেণীর পুস্তকেই তাঁর পূর্ণ ব্যক্তিত্বের কমবেশি প্রকাশ দেখা যায়।

বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছে তাঁর বৈঠকী মেজাজের খুব সমাদর ছিল। বৈঠকখানায় গল্প জমে ওঠে নানা কারণে। শুধু-কাহিনীর চমৎকারিত্বই এক্ষেত্রে সব নয়, কাহিনী বা গল্প বলার ভঙ্গিটিও চমৎকার হওয়া চাই। সেই ভঙ্গিটি বিদ্যাসাগরের রপ্ত ছিল। 'অতি অল্প হইল' পুস্তকে তাঁর এই গল্পবলার ভঙ্গিটির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর যে কত নিপুণভাবে গল্প জমিয়ে তুলতেন তার একটি দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করছি—

"কোনও বিখ্যাত অধ্যাপকের চৌপাড়ীতে দশ বার বৎসর থাকিয়া, খুড়র মত বুদ্ধিমান এক ব্যক্তি সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি, পাঠ সমাপ্ত করিয়া, স্বগ্রামে আসিলে, গ্রামস্থ ভদ্র লোকে, অনেক ব্যয় করিয়া, চৌপাড়ী ঘর প্রস্তুত করিয়া দিলেন, এবং ছাত্রদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তাঁহাকে অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত করিলেন। তাঁহাদের এত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, গ্রামে অধ্যাপক রহিলেন, ব্যবস্থার জন্য অন্য স্থানে যাইতে হইবেক না। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর কাছে ব্যবস্থা চাহিলে তিনি, পুঁথি হাঁট্কাইয়া, হয় ব্যবস্থা বলিতে পারিতেন না, নয় উল্টা ব্যবস্থা বলিয়া দিতেন। গ্রামস্থ লোকে, বিরক্ত হইয়া, তাঁর অধ্যাপকের নিকটে গেলেন, এবং সবিশেষ সমস্ত জানাইয়া, এই অনুযোগ করিতে লাগিলেন; বিদ্যালঙ্কারকে আপনি কি পড়াইয়াছেন; তাঁর কিছুমাত্র বিদ্যা জন্মিয়াছে, এরূপ বোধ হয় না।" (তদেব; পৃঃ ৪৩৩-৪৩৪)

বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনাগুলিতে বাংলা গদ্য এক অভূতপূর্ব গতি লাভ করেছিল। এই বইগুলির ভাষার কাঠামোটি ছিল সাধু গদ্যের; কিন্তু ঐ কাঠামোর মধ্যেই তিনি স্বচ্ছন্দগতি চলিত ভাষার দ্রুততা সঞ্চারিত করেছিলেন; তার মেজাজটিকেও আনতে পেরেছিলেন। এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। মুখের ভাষার প্রবাদ-প্রবচন ও শব্দমালাকে তিনি সুন্দর ভাবে ব্যবহার করেছিলেন ঐ রচনাগুলিতে। বাংলাগদ্যের পক্ষে তা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপারই হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগরের এমন গদ্যরীতির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি -

"সত্য সত্যই খুড়র দফা রফা হয়েছে। আর তিনি ঘাড় তুলিবেন, তার পথ নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর বিদ্যার দৌড় কত, তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গেল। বলিতে কি, খুড় আমার বড় নির্বোধ; অকারণে, আপনার মান আপনি খোয়াইলেন। চালাকি করিয়া, বহি লিখিয়া, বাহাদুরি দেখাইতে না গেলে, এ ফেসাৎ ঘটিত না। ইহাকেই বলে, নালা কেটে রোগ আনা।"··· (তদেব; পৃঃ ৪১৯)

সাধু ভাষার কাঠামোয় মৌখিক ভাষার প্রাণ সঞ্চার করতে পেরেছিলেন বলেই ভাষা এখানে তীব্রগতি সম্পন্ন—প্রাণময়। বিদ্যাসাগরের এই শ্রেণীর রচনার গদ্যে প্রয়োজনবোধে দেশী ও বিদেশী উভয় শব্দেরই সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটেছে। খাঁটি সংস্কৃত শব্দ তো আছেই। এই বিচিত্র শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগে ও সহজ বাচনভঙ্গির ছন্দে সাধুভাষার মধ্যে তিনি চলিত ভাষার মেজাজ সঞ্চার করেছিলেন। ঐ গদ্য দেখে বলা যায়, ইচ্ছে করলেই তিনি স্বচ্ছন্দগতি চলিত-গদ্যের সৃষ্টি করতে পারতেন।

এবার আলোচ্য পুস্তকগুলির ব্যঙ্গবিদ্রূপের প্রসঙ্গে আসা যাক। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনায় মনের উষ্মা ও বিতৃষ্ণা প্রকাশে লেখক অনেকটা প্রগলভ হতে পারেন; তবে ঐ অনেকটাই;—সবটা নয়। তাহলেই ঘটবে অসংযমের প্রলয়;—রুচিহীনতার সর্বনাশা হোলি। সে যুগের এই শ্রেণীর রচনায় তা যে একেবারে ঘটেনি তাও নয়। বিদ্যাসাগরের রচনায় কিন্তু তেমনটি দেখা যায় না। দু'একটি স্থানে অবশ্য আরও একটু সংযত হলে ভাল হতো; কিন্তু সেই বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে বলা যায়, সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ ব্যঙ্গবিদ্রূপে তিনি নিপুণই ছিলেন।

'যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা'য় প্রদত্ত বিধবাবিবাহ বিষয়ক বক্তৃতার সমালোচনা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন—

"এরূপ চমৎকারিণী, চিত্তহারিণী বক্তৃতার সমুচিত সমালোচনা হওয়া, সর্বতোভাবে, উচিত ও আবশ্যক। কিন্তু, এই বিদকুটে সমালোচনা যার তার কর্ম নহে। যেমন গ্রন্থকর্তা, তেমনই সমালোচক চাই। যেমন বুনো ওল, তেমনই বাঘা তেঁতুল, অথবা, সাধুভাষায় বলিতে গেলে, যেমন কুকুর তেমনই মুগুর, না হইলে, বিশিষ্টরূপ ফলদায়ক হইয়া উঠে না। ফলকথা এই, আমার মত ফাজিল, চালাক, হুঁসিয়ার ছোকরা ভিন্ন, অন্য কোনও মহামহোপাধ্যায় এই গ্রন্থের, প্রকৃত প্রস্তাবে, সমালোচনা করিতে পারিবেন, ইহা কোনও মতে সম্ভব নহে। সুতরাং, অগত্যা, আমাকেই এই গ্রন্থের সমালোচনাব্রতে দীক্ষিত হইতে হইবেক। ইহাতে আমি কিছুমাত্র ক্লেশবোধ বা লোকসানজ্ঞান করিব না; কারণ, এই অপূর্ব গ্রন্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, যত মজা, যত আমোদ পাইব, বোধ হয়, এ জন্মে আর আমার ভাগ্যে সেরূপ ঘটা সম্ভব নহে।" (তদেব; পৃঃ ৪৬৮)

এখানে সমালোচ্য পুস্তক ও তার রচয়িতাকে খুব কঠোর বিদ্রূপ করা হয়েছে; কিন্তু ঐ বিদ্রূপের ভাষা কোথাও অশ্লীল হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া উদ্ধৃত অংশটি পাঠ করলে বোঝা যায়, বক্তা ওখানে অকপটে বলবার গতিতেই মনের ভাব প্রকাশ করে চলেছেন।

ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভাষা অদক্ষ ব্যক্তির মুখ ও কলম উভয়ক্ষেত্রেই স্থূল হয়ে পড়ে। কিন্তু স্থূল ভাষায় ব্যঙ্গবিদ্রূপ তীব্র জ্বালাময় হয়ে ওঠে না। ব্যঙ্গবিদ্রূপে নিপুণ ব্যক্তি তাই বলিষ্ঠ মার্জিত ভাষাতেই ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করে থাকেন। এই ব্যঙ্গবিদ্রূপ সৃষ্টির সার্থক দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগরের বিতর্করচনায় বহু পাওয়া যায়। তাদেরই একটি—

"খুড় মহাশয়ের এই অপূর্ব ব্যবস্থা দেখিয়া, কতকগুলি অবোধ, অর্বাচীন, বানরকল্প, অল্পদর্শী লোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে,

হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র পাত্র

যেমন পোড়ামুখ দেবতা তেমনি ঘুটের ছাই নৈবেদ্য।

অর্থাৎ, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা যেমন অপূর্ব বিচারালয়, শ্রীমান্ বিদ্যারত্ন খুড় তদুপযুক্ত ব্যবস্থাদাতা। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ, আহ্লাদ করিয়া, আমার কাছেও ঐরূপ নানা কথা, নানা রঙ্ চড়াইয়া, বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমি কিন্তু তাহাদিগকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। ইহাতে, শ্রীমান্ নদিয়ার চাঁদ খুড় মহাশয়, অক্লেশে বুঝিতে পারিবেন, উপযুক্ত ভাইপো খুড়র দরদের দরদী কি না।" (তদেব ; পৃঃ ৪৭৭)

এরকম মার্জিত বিদ্রূপের বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগরের গ্রন্থে পাওয়া গেলেও মাঝে মাঝে তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপ স্থূল হয়েও পড়েছিল। এমন একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা হলো:—

"...প্রামাণিক লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, ঘটকচূড়ামণি, প্রথম দশায়, "কচি পাঁঠা" এই অপূর্ব উপাধি পাইয়াছিলেন। বোকা পাঁঠা উপাধি হইলে, তিনি লোকালয়ে অধিকতর বলবিক্রমশালী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন, এই প্রবল যুক্তি দেখাইয়া, কেহ কেহ কচিশব্দ স্থলে বোকাশব্দ বসাইতে চাহিয়াছিলেন। এ বিষয়ে নানা তর্ক ও বিস্তর বাদানুবাদও হইয়াছিল। অবশেষে, "বোকা পাঁঠা" অপেক্ষা "কচি পাঁঠা" মোলায়ম, নিরবচ্ছিন্ন এই বিবেচনায়, "কচি পাঁঠা" উপাধিই সাব্যস্ত হয়।"... (তদেব ; পৃঃ ৪৮৭)

'কচি পাঁঠা' ও 'বোকা পাঁঠা' প্রসঙ্গটিকে নিঃসন্দেহে স্থূল বলা যায় ;— বিদ্যাসাগরের পক্ষে এরকম ব্যঙ্গবিদ্রূপ না করাই বাঞ্ছনীয় ছিল।

কিন্তু এই ব্যতিক্রম বাদ দিলে বলা যায়, বাংলা গদ্য ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের আলোচ্য রচনাগুলি এক বিশেষ মর্যাদালাভের যোগ্য। বিতর্ক রচনা তথা বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যসাধনে এদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। বাংলা রঙ্গব্যঙ্গাত্মক সাহিত্যও এই রচনাগুলির মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক বিতর্করচনার ধারায় আরও একটি দিক দেখা যায়। এই ধারায় এমন দু'একটি রচনা ছিল যেখানে ব্যঙ্গাত্মক রূপকধর্মী রীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। 'শ্রী গণ্ডূষজল সঞ্চারি সফরঃ' রচিত 'বিধবাবিবাহ বিধায়ক প্রবন্ধ সকলের সমালোচনা' গ্রন্থের শেষে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' নামে একটি

ব্যঙ্গাত্মক রচনা সংযোজিত হয়েছিল। এখানে ব্যঙ্গের লক্ষ্য ছিলেন বিদ্যাসাগর ও তাঁর মতামত। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, সাহিত্যের বিচারে ঐ ব্যঙ্গাত্মক রচনাংশটি অত্যন্ত উপভোগ্য। আলোচ্য গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য বিবেচনায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত উল্লিখিত অংশটির বিশেষ সাহিত্যিক মূল্য থাকায় আমরা তা থেকে দীর্ঘ অংশ উদ্ধার করছি।—

"হে অশ্মশ্রু, সশ্মশ্রু, বিশ্মশ্রু শ্রোতৃগণ! আপনারা সকলেই জানেন যে নারদ মুনি চিরকালই অত্যন্ত কলহপ্রিয়—তার নামোচ্চারণমাত্র আকাশ হইতে বিষম্বাদ উড়িয়া আসিয়া পড়ে ও স্বামীস্ত্রীতে, পিতাপুত্রে, ভায়ে ভায়ে বিবাদ বাধে। "নষ্টেমৃতে" ইত্যাদি বচন সেই নারদের ঢেঁকী (১)। সেই ঢেঁকীর খচখচি অদ্য ৩০ বৎসর আরম্ভ হইয়া অদ্যাপি তাহা হইতে তান-লয়-মিলিত সুস্বর নির্গত হইল না, লাভের মধ্যে এই "হুজ জ্জতে" বাঙ্গালায় আত্মবিচ্ছেদের একটী অভিনব কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রাক্ প্রতীচ্য পাণ্ডিত্যকে (২) গুরুচণ্ডালযোগ (৩) বলিলে হয়। সেই যোগে আরব্ধ হইলে কোন কর্ম্মই সুসম্পন্ন হয় না। বিধবাবিবাহের পালা সেই প্রাক্-প্রতীচ্য—পাণ্ডিত্য যোগ সম্ভূত। এতদিন ঐ পালার অভিনয় কালোয়াতি ধরণে হইয়া আসিতে ছিল এবার তাহার সুর ফিরিয়াছে।

অভিনেতাদের দল হইতেই এবার এমন খেউড় আরম্ভ হইয়াছে যেন নবমী পূজার শেষরাত্রি বিজয়া দশমী আগতাপ্রায়। রচক কি গায়ক, বাদক কি নর্ত্তক এতদিন পর্য্যন্ত ঐ পালার সকলই অন্ততঃ জন্মে ও নামে হিন্দু ছিলেন এবং গানের আসর ও হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ছিল। এবার দেখিতেছি সেই আসরে এক কাজী সাহেব আজন দেওয়ার সুরে (৪) গাইতেছেন "ইঁদুর পরব নাই সত্য কিন্তু রাঁড়ীর নিকা আছে।" এতদিনে আসর জাঁকিল, হটু ঠাকুরের দলের সঙ্গে আণ্টুনি সাহেবের দল মিশিল, কোরাণ ও আবেস্তা পুরাণের সাহায্য

(১) ঐ বচন বস্তুতঃ নারদ সংহিতার, পরাশরের নহে (ব বি ৩০, ৬৮ পৃঃ)

(২) প্রাক-পূর্ব্ব, প্রতীচ্য-পশ্চিম সংস্কৃত বিদ্যার সহিত ইউরোপীয় বিদ্যার অনুশীলন যেরূপ শিক্ষা সংস্কৃত কলেজে হইয়া থাকে।

(৩) বৃহস্পতি ও রাহুর এক রাশিতে অবস্থিতি যাহাতে কালাশুদ্ধি হয় ও যে সময়ে বিবাহাদি শুভগুরু রাহু শব্দে দ্রষ্টব্য।

(৪) মোল্লাজি নেমাজের পূর্ব্বে উচ্চৈস্বরে—"আল্লা আকবর" ইত্যাদি যে স্তুতি পাঠ করিয়া নেমাজের সময় হইয়াছে ইহাই ঘোষণা করেন।

করিতে চলিল। উপসর্গ বালী (৫) যাকে ত অনেক ঘরেই দেখা যায়, এবার যে উপসর্গ বলাবাবার (৬) সঙ্গেও অনেক স্থলে সাক্ষাৎকার লাভ হইবে তাহাতে আরকিছু মাত্র সন্দেহ নাই ! (হিস হিস শব্দ)

হে দলিলী-বেদলিলী-কুসংস্কারহারি-দেশসংস্কারকারি মহোদয়গণ ! আপনাদের যত্নে ও অধ্যবসায়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভারতবর্ষকে যে আর বিধবা মা, মাসী, খুড়ী, পিসী প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য ও গতাজী পরিবার পালনের ভার বহন করিতে হইবে না ইহা ত নিশ্চয়। অপিচ আপনাদের এবারকার আগ্রহ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে দুর্ভাগ্যবশতঃ যাঁহাদের ঐরূপ পৈতৃক পরিবার নাই তাঁহারা আপন আপন অকপটতা দেখাইবার জন্য আত্মপরিবারকেও যদি বিধবা করিতে হয় তাহাও করিয়া বিধবাবিবাহের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের পথ পরিস্কার করিয়া দিবেন, নতুবা সমস্ত বিলাতটা যে হাসিবে ও ধ্বনি সার নাম ঘুঁচিবে কেন ? (হিস !)"

*   *   *

"সস্তাদরে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড (১৪) জিনিস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কেতাব হইলে, অনেক স্থলে তাহা ঘ্যাঁস খাওয়া, কালী পড়া, পাতা ছেঁড়া, কালী চটা ; থালা ঘটী হইলে ফুটো ফাটা, তালি দেওয়া ; বস্ত্রাদি হইলে, রিপুকরা, দিস্তে পড়া, থসথসে হয়। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গৃহিনী কিরূপ হইবেন বলা যায় না কেননা এতকাল পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে স্ত্রীলোক মৃৎপাত্রের ন্যায় (১৫) গণ্য ছিলেন ; যে কোন প্রকারে একবার ব্যবহৃত হইলে ডোম কি মুর্দ্দাফরাশ ব্যতীত আর কেহ তাহা ব্যবহার করিত না ইংলণ্ডে বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও পিকউইক পেপারে (১৬) স্যাম ও বালারের পিতা অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ উপদেশের সঙ্গে তাহাকে বলিয়াছিলেন "Dont marry a widow." "বিধবাকে বিবাহ করিও না।" কিন্তু চর্ব্বিত-চর্ব্বণে, উচ্ছিষ্ট ভোজনে এখন আর তাদৃশ ঘৃণা হয় না— (এই পর্য্যন্ত বলা হইলে কোন প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা হিস হিস শব্দ করতালী ও শেষে ধুলোঢিলের দ্বারা সভা ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন)

(৫) বি—মাতা

(৬) বি—পিতা

(১৪) হাতফেরা, ব্যবহার করা

(১৫) মাটির পাত্র, হাঁড়ি, ভাঁড় ইত্যাদি।

(১৬) Pickwick papers. of Dikens হাস্যরসাত্মক নবেল বিশেষ।"

[বিধবাবিবাহ বিধায়ক প্রবন্ধ সকলের সমালোচনা—শ্রী গণ্ডূষজল সঞ্চারি সফরঃ ; ১৮৮৫। পৃঃ ১৬১—১৬৬]

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে সহজেই বোঝা যায়, বিদ্যাসাগরীয় ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলির সঙ্গে এর আঙ্গিকগত স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এখানেও ব্যঙ্গবিদ্রূপের প্রকাশরীতি সাহিত্যিক হয়ে উঠেছে। অবশ্য একথা সত্য, বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোক-রহস্যে' বিশুদ্ধ রূপকধর্মী ব্যঙ্গাত্মক রচনার উৎকৃষ্ট রূপ আগেই দেখা গিয়েছিল ; কিন্তু সামাজিক বিতর্কের বিষয় অবলম্বনে লেখা এই ধরণের রচনা হিসেবে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'-এর মূল্য অনেক। বাংলা ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনার ইতিহাসে এর মর্যাদা অস্বীকার করা যায় না।

এতক্ষণ বিতর্কমূলক বিষয় নিয়ে রচিত ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনার কথা আলোচনা করা গেল। কিন্তু যেগুলি যুক্তিনিষ্ঠ তথ্যভিত্তিক গুরু গম্ভীর বিতর্কপুস্তক সেগুলির মধ্যেও ব্যঙ্গবিদ্রূপ কম ছিল না। হিউমার বা পরিচ্ছন্ন হাস্যরস বলতে যা বোঝায় তার দৃষ্টান্ত আমরা বিতর্করচনায় পাইনা বললেই চলে ; অবশ্য যে মানসিকতায় এবং যে বিষয়ের আলোচনায় ঐ রস-সৃষ্টি সম্ভবপর, সামাজিক বিতর্কের ঝঞ্ঝামুখর পরিবেশে তা অনুপস্থিত ছিল। তবে বিদ্রূপের কশাঘাত সেখানে বেশ সশব্দ হয়েই উঠেছিল। পরমত খণ্ডন যেখানে বড় কথা সেখানে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করবার মনোভাবই অনেক সময় বড় হয়ে দেখা দেয়। ঐ ব্যঙ্গবিদ্রূপ বর্ষণে ভাষার শ্লীলতাও সব সময় বজায় থাকে না। বিতর্করচনায় এই কারণেই অনেক সময় বিপক্ষকে অশ্লীল ও স্থূলভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছিল। অবশ্য সংযত ভাষায় বর্ষিত মার্জিত মনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দৃষ্টান্তও কম ছিল না। তবে সে যাই হোক না কেন, এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সুশ্রীতা বা নগ্নতার মূলে কিন্তু তার্কিক লেখকদের বিশেষ সামাজিক ভাবনাই নিহিত ছিল। যে ব্যক্তি সমাজে প্রচলিত সংস্কারকে বিনা বিচারে মেনে চলেই আনন্দ পান তাঁর কাছে সেই সংস্কার-বিরোধী যুক্তিধর্মী বক্তব্য অসহ্য হয়ে ওঠে ; ঐ সংস্কার-বিরোধী ব্যক্তিকে তখন তিনি অশালীন ভাবে বিদ্রূপ করতে ছাড়েন না। এঁদের রচনায় তাই যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ দেখা যায় তাতে ভাষাগত স্থূলতা ও মানসিক দীনতাই প্রবল হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে, প্রগতিশীল যুক্তিবাদী তার্কিক লেখকদের রচনায় অশালীন ব্যঙ্গবিদ্রূপ তেমন একটা দেখা যায় না।

নন্দকুমার কবিরত্ন তাঁর 'বৈধব্যধর্ম্মোদয়' গ্রন্থে বিদ্যাসাগরকে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন—

"...যদি বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় মহত্ত্ব প্রকাশে বচনায়া সে চিরদুঃখিনাগণকে ব্রহ্মচর্য্য হইতে অবকাশ প্রদান করিতে পারেন ; তবে বিধবামণ্ডলে পরমাদরণীয় রূপে যে কিরূপ প্রশংসা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন তাহা আমি একমুখে কহিয়া পর্য্যাপ্তি করিতে পারি না এবং বহুতরা অধীরা অবীরা গণেরা সবীরা হইয়া চিরকাল পর্য্যন্ত স্বীয়২ সুখানুভবকালে লোমাঞ্চিত কলেবরে আশীর্ব্বাদ করিতে নিযুক্ত থাকিবেক। বুঝিয়া দেখিলে বিধবাদিগের শয়ন কালে (পদ্মনাভের ন্যায়) বিদ্যাসাগর স্মরণীয় হইবেন। (কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি)।"

[বৈধব্যধর্ম্মোদয় (১ম)—নন্দকুমার কবিরত্ন ; প্রকাশকাল অজ্ঞাত ; পৃঃ ২]

রক্ষণশীল নন্দকুমার প্রগতিশীল বিদ্যাসাগর ও তাঁর মতকে সহ্য করতে পারেন নি ; এই জন্যেই তাঁর বিদ্রূপ এখানে নগ্ন ব্যক্তিগত আক্রমণ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

আগেই বলা হয়েছে, প্রগতিবাদী উন্নতরুচির লেখকদের রচনায় আমরা এরকম অশালীন ব্যঙ্গবিদ্রূপ কদাচিৎ দেখতে পাই ; সেই বিরল অশালীন ব্যঙ্গবিদ্রূপের একটি নমুনাও তুলে ধরছি—

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থাতে কেবলমাত্র বিধবার উপকার, আপনার ব্যবস্থাতে সধবা, বিধবা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি অনেকেরই উপকার আছে দেখিতেছি। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে ঘরের কুলবধূকে অন্যের গৃহে পাঠাইয়া দিতে হয়, আপনার মতে তাহা নহে, ঘরের বৌ ঘরে থাকিবেক, দেবরের উপকার হইবে অথচ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পিণ্ডের সংস্থান হইবে। ইহার নাম "গঙ্গার জল গঙ্গায় থাকে পিতৃলোকের তৃপ্তি।" সুতরাং আপনার সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত হইলেও অনেকে বিশেষতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতারা উহা সাদরে গ্রহণ করিবেন। আপনি নিজে একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়াই বোধ হয় পরাশর বচনের এই সূক্ষ্ম অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।"

[মধুসূদন স্মৃতিরত্নকে লেখা মহেশচন্দ্রের পত্র। দ্রঃ বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (২য়)—সাক্ষরতা প্রকাশন ; ১৯৭২। পৃঃ ৫৫২]

কিন্তু বিতর্কমূলক রচনাগুলিতে ব্যঙ্গবিদ্রূপের এই রূপই সব নয়। পরিচ্ছন্ন ব্যঙ্গও সেখানে রয়েছে। রামমোহনের গদ্যেই আমরা এরকম ব্যঙ্গের বা স্যাটায়ারের নজীর প্রথম পেয়ে থাকি। তাঁর ব্যঙ্গের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা ও আপন বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা লক্ষ্য করা যায়। কাশীনাথের যুক্তির অসারতা দেখিয়ে রামমোহন ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—

"অধর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পণ্ডিত লোকেরও এ পর্য্যন্ত অনবধানতা হয়, যে জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে রজ্জু থাকিয়া দগ্ধ হয় না, এবং অন্যকে অগ্নি হইতে ইতস্তত পতনে নিবারণ করে, এরূপ বাক্য লোকের বিশ্বাসের নিমিত্ত লিখেন. অতএব বিজ্ঞলোকে বিবেচনা করিবেন. যে রজ্জু দিয়া বন্ধন করিবার হেতু যাহা আপনি লিখিয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে, কি না ?"

[রামমোহন গ্রন্থাবলী (৩য়) ; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত ; ৩য় সংস্করণ। পৃঃ ৪৩]

অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ এখানে নেই—নেই কোন অহেতুক বিদ্বেষও। কাশীনাথ নিজের মত প্রতিষ্ঠার জন্যে শাস্ত্রীয় বচনের অপব্যাখ্যা করেছেন বলেই রামমোহন তাঁকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। রামমোহনের পরিচ্ছন্ন ব্যঙ্গের আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কাশীনাথ মেয়েদের বিশ্বাসের অযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। রামমোহন কাশীনাথের ঐ মনোভাবের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, মেয়েরা সরল বিশ্বাসী, সরল বলেই পুরুষেরা তাদের প্রতারিত করতে পারে সহজে। এমন কি পুরুষের দ্বারা প্রতারিত হয়েই সদ্যবিধবা নারী সহমরণে গিয়ে থাকে। রামমোহন তাই ব্যঙ্গ করে কাশীনাথকে বলেছিলেন—

"স্ত্রীলোকের এই এক দোষ আমরা স্বীকার করি, যে আপনারদের ন্যায় অন্যকে সরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে, যাহার দ্বারা অনেকেই ক্লেশ পায়, এ পর্য্যন্ত যে কেহ২ প্রতারিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হয়।" (তদেব ; পৃঃ ৪৬)

ব্যঙ্গাস্ত্র এখানে খুবই সূক্ষ্ম—তীক্ষ্ণ ; কখন যে হৃদয়ে গিয়ে বিঁধে যায় তা বোঝা যায় না। কিন্তু আহত ব্যক্তির হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ ঠিকই ঘটে।

বিদ্যাসাগরের গুরুগম্ভীর তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ বিতর্করচনাগুলিতেও আমরা পরিচ্ছন্ন মার্জিত ব্যঙ্গ লক্ষ্য করে থাকি। তাঁর বেনামে প্রকাশিত রচনাগুলিতে ব্যঙ্গবিদ্রূপ স্থানে স্থানে স্থূল হয়ে উঠলেও এই ধরণের রচনাতে তেমনটি ঘটে নি। সেখানে ব্যঙ্গ শাণিত, তীক্ষ্ণধার হয়েছে ; কিন্তু ভাষা অসংযত হয় নি। বিদ্যাসাগরের এমন শালীনতাযুক্ত তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের বহু দৃষ্টান্তের একটি উদ্ধার করছি—

" · ···এই বর, বয়সে বৃদ্ধ ও সর্বত্র প্রধান বিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াও, উত্তরপুস্তকে মধ্যে মধ্যে উপহাস রসিকতা ও কটূক্তিপ্রিয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং, আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ধর্মশাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, বাদীর প্রতি উপহাসবাক্য ও কটূক্তি প্রয়োগ করা এদেশে বিজ্ঞের লক্ষণ।

অবিজ্ঞের লক্ষণ হইলে, যাঁহাকে দেশশুদ্ধ লোকে একবাক্য হইয়া, সর্বপ্রধান বিজ্ঞ বলিয়া, ব্যাখ্যা করে, সেই মহানুভব বৃদ্ধ মহাশয় কখনও ঐ প্রণালী অবলম্বন করিতেন না।"

[বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ (২য়) ; সাক্ষরতা প্রকাশন ; ১৯৭২। পৃঃ ৩৬]

বিদ্যাসাগর ছাড়া আরও অনেক তার্কিক রচয়িতা বলিষ্ঠ ও নির্মল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষণে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। রক্ষণশীল গোষ্ঠীর শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণের রচনায় এর নজীর পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর পরাশর সংহিতার কোন এক বচনের অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, শ্যামাপদের মতে তা ছিল বিকৃত। তাঁর মতে বিদ্যাসাগর ঐ বচন বিশেষের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করতে পারেন নি। সেইজন্যে তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—

"ইহাতে রথ নির্ম্মাণে--কৃতসংকল্প ব্যক্তি যেমন বৃক্ষচ্ছেদন করিয়া নিবর্ত্ত হইলে উপহাসাস্পদ হয়, কি বৃক্ষ ছেদনেও অশক্ত হইয়া মূল পর্য্যন্ত গমন করিয়া সমাপ্তি করিলে ততোধিক উপহাসাস্পদ হয়, উক্ত মহাশয়ের ব্যাখ্যানুসারে মহর্ষি বেদব্যাসও সেই সেই উপহাসের আস্পদ হইলেন।"

[বিধবাবিবাহের নিষেধক—শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ ; ১২৪৮। পৃঃ ৩৩]

এ ব্যঙ্গ নিঃসন্দেহে পণ্ডিত ব্যক্তির রুচিশুদ্ধ ব্যঙ্গ। বিদ্যাসাগরকে তিনি অশালীন ভাষায় কখনও আক্রমণ করেন নি।

প্রসন্নকুমার শর্মাও ছিলেন বিদ্যাসাগরবিরোধী। বিদ্যাসাগরকে তিনিও ব্যঙ্গ করেছিলেন ; একটু ঝাঁঝ থাকলেও সে ব্যঙ্গ উপভোগ্য—

"ম্লেচ্ছ সংসর্গে ধর্ম্মভাব বিলুপ্ত প্রায় এবং মন এত মলীন হইয়াছে যে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না। বুদ্ধি কেবল বিপরীত ভাবই গ্রহণ করে এই জন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ বন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।" নতুবা শূদ্রবংশধর রমেশ বাবুই বা বেদব্যাসের আসন প্রার্থী কেন? এবং ঋষি বংশধর বিদ্যাসাগরই বা স্ত্রীদিগের এক পতিত্ব ধর্ম্মের মূলচ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত কেন?"

(বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ—প্রসন্নকুমার শর্মা ; ১২৯৩। পৃঃ ৩২০)

বাংলা সাহিত্যের ভাবাবেগপূর্ণ গদ্যরূপের সমৃদ্ধিতেও বিতর্করচনার ভূমিকা কম নয়। বিভিন্ন ভাব ও সেই ভাবাশ্রিত আবেগের প্রকাশে বহু তার্কিক লেখকের রচনা ও ভাষা বেশ হৃদ্য হয়ে উঠেছিল। পরবর্তী কালের বাংলা ভাষায় তার প্রভাবও খুব স্পষ্ট হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের হৃদয়বত্তা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। সামাজিক কুসংস্কারের নিগড়ে বন্দী নারীর বেদনায় অধীর বিদ্যাসাগরের বিতর্কমূলক পুস্তকে ভাষা তাই কখনো কখনো ভাবাবেগ পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহার ভাগের অনেক অংশে তাঁর বেদনাবিদ্ধ কোমল হৃদয়ের যে প্রকাশ ঘটেছিল তার কথা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই জানা আছে।

কিন্তু শুধু বিদ্যাসাগরই নন, আরও অনেকের লেখাতে আমরা তাঁদের হৃদয়-ভাবের স্বতোৎসার দেখে থাকি। প্রসঙ্গক্রমে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে একটি অংশ উদ্ধার করছি—

"যেমন নিষাদেরা পশুপক্ষী হিংসা করিয়া তন্মূল্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে বলিয়া তাহাদের পশুপক্ষী হিংসাতে কখনও দয়া হয় না, তদ্রূপ মহাশয়-দিগেরও এই নিষ্ঠুর কার্য্যে অশ্রুপাত হয় না।......যেমন ছিন্নমূল পদ্মিনীগুলি শুষ্কতা লাভ করিয়া সরোবরে ভাসিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ কুলীনদিগের পদ্মিনীর ন্যায় স্ত্রীরাও শীর্ণতা লাভ করিয়া দুঃখার্ণবে ভাসিতেছে।"...

(কৌলীন্য সংশোধিনী—রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ; ১৮৭১। পৃঃ ২)

কিন্তু শুধু হৃদয়ের কোমল বা করুণ ভাবই নয়, রচয়িতাদের অন্য হৃদয়ভাবও বিতর্কপুস্তকে প্রকাশ পেয়েছিল। সতীপ্রথা চালু থাকায় অনিচ্ছুক নারীকে স্বামীর জ্বলচ্চিতায় অনেক সময় পুড়িয়ে মারা হতো ; তার বর্ণনায় বীভৎসতা ফুটে উঠেছিল কারও কারও রচনায়। বহুবিবাহের ফলে এবং বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকার জন্যে সমাজে ব্যভিচার যে ভয়ানক অনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল তার চিত্র তুলে ধরবার সময়ও ঐ বীভৎসতা ফুটে উঠেছিল।

বীররসাত্মক বর্ণনাও অনেকের রচনাতে দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন রচয়িতা তাঁদের পুস্তকাদিতে জনসাধারণকে সামাজিক কুপ্রথা দূরীকরণের জন্যে যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন তারই মধ্যে বীররসাত্মক গদ্যের ওজোস্বিতা ফুটে উঠেছিল। নিম্নে উদ্ধৃত অংশটিতে আমরা এই বক্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাবো—

"পাঠক! আমি কি দেখিতেছি দেখিয়া নয়ন মন তৃপ্তিকর। দেখিতেছি স্বপ্তোক্ষিত (স্বপ্তোত্থিত ?) সমুদায় বঙ্গবাসী উৎসবানন্দে মত্ত হইয়া মহারাষ্ট্র খাত শোভিত বিস্তীর্ণ শ্যামলক্ষেত্রে আসিয়া আচ্ছন্ন করিয়াছে। কতকগুলি যুবক কি বলিতে বলিতে যেন সমুদায়কে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাইল অমনি জয়ঘোষণা হইল ; আকাশে পক্ষী আকুল হইল ; কতিপয় প্রশান্ত মূর্ত্তি

আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন বৎসগণ তোমরা একান্ত দুর্ব্বল হইলেও পদ্মাকুল্যা পরিবেষ্টিত কৌলীন্যের দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করিতে তোমাদিগকেই প্রেরণ করিব ; দেখিব সত্যের কত বল—ঈশ্বর কত দয়াল দুর্ব্বলের (!) কত সহায়—স্বর্গীয় বলে বলীয়ান হইয়া আমরা অবিলম্বে দু (দুর্গ ?) মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম ……কিন্তু আমাদের রোধ করিতে বা আঘাত করিতে কেহই সাহসী হইল না আমাদের বিনয়াস্ত্রে কঠিন হৃদয় দ্বিধা হইল অশ্রুনীরে হৃদয় (!) সিক্ত হইল। অবশেষে সফল মনোরথ হইয়া কৌলীন্য পিশাচিনীকে রণবন্দিনী করিলাম অন্যান্য প্রচারকগণও জয় পতাকা উড্ডীন করিতে২ ক্ষেত্র মধ্যে উপস্থিত হইলেন। হিন্দুকুল সু (!) র্য্যরাজগণ নানা দেশ হইতে মহারাষ্ট্রখাত ধন্য করিলেন।…… হে ভ্রাতৃগণ চিত্রপুত্তলিকার ভাব পরিত্যাগ কর। নির্জ্জড় হও নতুবা সংসার হইতে অবসৃত হও। যদি তোমরা উজ্জল (!) আর্য্যনামের নিষ্কলঙ্ক যশঃশশীরক্ষা করিতে না পার ; তবে তোমাদের অসার ভূমিপিণ্ড দ্বারা বঙ্গীয় ভূমি ভারাক্রান্ত করিও না কোন সভ্য শ্রেণী ঐ উর্ব্বরা ভূমি বাসস্থান করিয়া জগদীশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করুক।"

[কুলকালিমা ; রচয়িতার নাম ও প্রকাশকাল অজ্ঞাত ; পৃঃ ১০৩—১০৫]

বঙ্গবাসীকে সমাজসংস্কারে উৎসাহিত করবার এই ভাষা নিঃসন্দেহে ওজোস্বিতাপূর্ণ।

বস্তুতঃপক্ষে দেখা যায়, বিতর্কমূলক রচনার রচয়িতারা হৃদয়ের নানা ভাব প্রকাশের জন্যে যে অলঙ্কারপূর্ণ, আবেগদীপ্ত ভাষা ব্যবহার করেছিলেন বাংলা আবেগধর্মী গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারাকে তা অনেকখানিই সমৃদ্ধ করেছিল।

অনেক তার্কিক লেখক নিজেদের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে উদাহরণ হিসেবে কখনও কখনও গল্প বলেছিলেন;—ঐ কারণে তাঁদের রচনায় স্থানে স্থানে বেশ গল্পরস জমে উঠেছিল। তাতে ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীব্রতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। একটি দৃষ্টান্ত—

"…এক গোস্বামী প্রভু তাহার একজন বৈষ্ণব শিষ্যের নিকট বৃত্তি সাধিত গমন করেন প্রভুর কিছুমাত্র সংস্কৃত জ্ঞান নাই, পরন্তু শিষ্যের নিকট এরূপ জানাইয়া থাকেন, আমি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা (যেরূপ বিষয়ী লোকের নিকট ভাইপো) একসময় শিষ্য একটী শ্লোক পাঠ করিয়া বলিলেন, প্রভু এই শ্লোকটীর অর্থ বুঝাইয়া দিন। শ্লোক, "নমোনলিননেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে রাধাধর সুধাপানশালিনে বনমালিনে।" প্রভু, ভাইপোসহচরের একজন সহোদর, বিদ্যা

থাকুক বা না থাকুক, চতুরতায় কোন অংশে ত্রুটি যায় না। বাবাজিকে বলিলেন, শুন বাবাজি, নমোনলিননেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদিনে ইহার অর্থ আবৃত্তি মাত্রে যদি না বুঝিয়া থাক তবে তোমার ইহকালও নাই পরকালও নাই। এক্ষণে শেষ অর্দ্ধের নিগূঢ় অর্থ শ্রবণ কর, একদা বৃন্দাবনবিহারী রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ একটী পান হস্তে লইয়া শ্রীমতীকে বলিলেন, রাধা ধর ; শ্রীমতী বলিলেন এটী যে সুধা পান, অমনি প্রভু কিঞ্চিৎ ক্রোধ হইল তিনি বলিলেন বনমালি তুই নে। বাবাজী গদ্‌গদ স্বরে প্রভুর চরণে পতিত, কহিলেন, প্রভু এরূপ নিগূঢ়ার্থ আমি কখন শুনি নাই।"…

[রত্ন পরীক্ষার প্রতিবাদ—কেষাঞ্চিৎ মধ্যস্থীনাম্ (!) ; প্রকাশকাল অজ্ঞাত ; পৃঃ ২৪—২৫]

বিদ্যাসাগরও তাঁর গ্রন্থে বক্তব্য প্রতিষ্ঠার সময় এমন অনেক গল্প বলেছিলেন। এই গল্প বলায় প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল উভয়শ্রেণীর রচয়িতাই কমবেশি দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। তাঁদের কথিত গল্পের ভাষা বাংলা গদ্যকে অনেকটা প্রাঞ্জল করে তুলেছিল। শুধু তাই নয়, এই গল্পগুলির পরিবেশনায় বিতর্ক-রচনার সাহিত্যিক মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

অবলাবান্ধব—শরচ্চন্দ্রধর। ১৯৪৯ সম্বৎ

অ্যারিওপ্যাগিটিকা—শশিভূষণ দাসগুপ্ত অনূদিত। ১৯৬৩

আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী। সিগনেট সংস্করণ। ১৩৫৯

আর্য্যমহিলাদের দুইবার বিবাহ কিরূপে ?—যোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি। ১৮৮৯

আর্য্যসমাজ সংস্করণ—সুরেন্দ্রদেব গুপ্ত মজুমদার। ১৮০৬ শকাব্দ

ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনী—ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত। প্রথম সংস্করণ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম সংস্করণ

ঋগ্বেদ সংহিতা (২য় খণ্ড)—রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত। অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৯৭৭

করুণাসাগর-বিদ্যাসাগর—ইন্দ্রমিত্র। প্রথম সংস্করণ

কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার—রামমোহন রায় [দ্রঃ রামমোহন-গ্রন্থাবলী (৬ষ্ঠ); ব. সা. প; ১৩৬২]

কুলকালিমা—রচয়িতার নাম ও প্রকাশকাল অজ্ঞাত।

কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ—সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। ১৩৪৬

কৌলীন্য সংশোধিনী—রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। ১৮৭১

চর্যাগীতি পদাবলী—ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত। ১৯৬৬

চারিপ্রশ্নের উত্তর—রামমোহন রায় [দ্রঃ রামমোহন-গ্রন্থাবলী (৬ষ্ঠ); ব. সা. প; ১৩৬২]

জাতিভেদ—শিবনাথ শাস্ত্রী। শ্রীদিলীপ কুমার বিশ্বাস সম্পাদিত। ১৩৭০

দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবন চরিত—কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়। আই, এ, পি সংস্করণ। ১৩৬৩

নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব—কালীপ্রসন্ন ঘোষ। ১৯৬২ সম্বৎ

পথ্যপ্রদান—রামমোহন রায় [দ্রঃ রামমোহন-গ্রন্থাবলী (৬ষ্ঠ); ব. সা. প; ১৩৬২]

পদ্মাপুরাণ মনসামঙ্গল (বিজয়গুপ্ত)—বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য সংকলিত। চতুর্থ সংস্করণ

পাষণ্ড পীড়ন—রামমোহন রায় [দ্রঃ রামমোহন-গ্রন্থাবলী (৬ষ্ঠ) ; ব. সা. প ; ১৩৬২]

প্যারীচরণ সরকার—নবকৃষ্ণ ঘোষ। ১৮৭৯

প্রতিবাদ নবজীবন-সম্পাদক ও বিধবাবিবাহ—রচয়িতার নাম ও প্রকাশকাল অজ্ঞাত।

প্রবোধচন্দ্রিকা—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার [দ্রঃ মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৩৪৬]

প্রাকৃত পৈঙ্গল - চন্দ্রমোহন ঘোষ সম্পাদিত।

প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার—অক্ষয়কুমার দত্ত, রজনীনাথ দত্ত। ১৯০১

বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খণ্ড)—সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত। ৩য় মুদ্রণ ; ১৩৭১

বঙ্গদর্শন ও বহুবিবাহ—রচয়িতার নাম ও প্রকাশকাল অজ্ঞাত।

বরকন্যা বিক্রয়—রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। ১৮৮৩

বর্ত্তমান ইং ১৮৬২ সালের ১১ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারের বেথুন সমাজাধিবেশনে সাময়িক বাঙ্গালা বক্তৃতা—যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১২৬৯

বাংলার নব্যসংস্কৃতি - যোগেশচন্দ্র বাগল। ১৯৫৮

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় পর্যায়)—ভূদেব চৌধুরী। ১৯৬০

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম ; পূর্বার্ধ)—ডঃ সুকুমার সেন। পঞ্চম সংস্করণ।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম ; অপরার্ধ)—ঐ ; দ্বিতীয় সংস্করণ।

বাঙালীর ইতিহাস-আদিপর্ব্ব—ডঃ নীহার রঞ্জন রায়। প্রথম সংস্করণ।

বামারচনাবলী (১ম খণ্ড)—সংকলন। ১৮৭২

বাল্যবিবাহ—রামচন্দ্র দত্ত। ১২৯৪

বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (১ম খণ্ড)—বিনয় ঘোষ। প্রথম সংস্করণ।

বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ—শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন। বুকল্যাণ্ড সংস্করণ। ১৯৬২

বিদ্যাসাগর—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৯৫ ; গ্রন্থটির প্রথম আনন্দধারা সংস্করণ (১৩৭৬)-ও ব্যবহৃত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর—বিহারীলাল সরকার। ১৩০২

বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (২য় ও ৩য় খণ্ড)—সাক্ষরতা প্রকাশন। ১৯৭২

বিধবা দর্শনে ও পুনর্ভূঃ—বিপিনবিহারী ঘোষ। ১৮৯৬

বিধবাবিবাহবাদ—দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন (প্রকাশকাল বা সংস্করণ অজ্ঞাত)

বিধবাবিবাহ নিষেধঃ—পীতাম্বর সেন (প্রকাশকাল বা সংস্করণ অজ্ঞাত)

বিধবাবিবাহের নিষেধক—শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ। ১২৮৪

বিধবাবিবাহ-সমালোচনা অর্থাৎ হিন্দুবিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্র, যুক্তি এবং বিজ্ঞানের অননুমোদিত বিধায় তন্নিষেধ বিষয়ক প্রস্তাব—ভুবনেশ্বর মিত্র। ১৩১৮

বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী সভা বিষয়িনী—বিদ্যাসাগর [দ্রঃ বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ (২য় খণ্ড); সাক্ষরতা প্রকাশন। ১৯৭২]

বিধবাবিবাহ বিধায়ক প্রবন্ধসকলের সমালোচনা—শ্রী গণ্ডূষজল সঞ্চারি সফরঃ। ১৮৮৫

বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ—মধুসূদন স্মৃতিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রথম সংস্করণ। ১৯৪২ সম্বৎ

বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১২৯২

বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ—প্রসন্নকুমার শর্ম্মা। ১২৯৩

বিধবাবেদন নিষেধক—রামধন দেবশর্ম্মা (প্রকাশকাল বা সংস্করণ অজ্ঞাত)

বিনয় পত্রিকা—বিদ্যাসাগর [দ্রঃ বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (২য় খণ্ড); সাক্ষরতা প্রকাশন; ১৯৭২]

বিবিধ প্রবন্ধ (২য় খণ্ড)—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [দ্রঃ বঙ্কিমরচনাবলী (২য় খণ্ড); সাহিত্য সংসদ। ৩য় মুদ্রণ; ১৩৭১]

বৈধব্য ধর্ম্মোদয় (১ম)—নন্দকুমার কবিরত্ন; প্রকাশকাল বা সংস্করণ অজ্ঞাত।

বৈধব্য ধর্ম্মোদয় (দ্বিতীয় পুস্তক)—নন্দকুমার কবিরত্ন ও হারাধন বিদ্যারত্ন সংগৃহীত। ১৭৭৮ শকাব্দ

ব্রজবিলাস—বিদ্যাসাগর [দ্রঃ বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (২য় খণ্ড); সাক্ষরতা প্রকাশন। ১৯৭২]

ব্রহ্মসূত্র, শংকর ভাষ্যানুবাদ—দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ।

ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ—সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত। ১৯৩৭

ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩৬০

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—বসুমতী সাহিত্য মন্দির

ভারতচন্দ্র—শঙ্করীপ্রসাদ বসু। প্রথম সংস্করণ

ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা—তারাশঙ্কর তর্করত্ন। ১৮৫১

ভ্রমনিরাকরণ। অর্থাৎ বিধবাধর্ম্মরক্ষা—শ্যামাপদ দেবশর্ম্মা। ১৯৩১ সম্বৎ

মদিরা—ভুবনেশ্বর মিত্র। ১২৮৭

মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী—ডঃ সুকুমার সেন। ১৩৬৯

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী—প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত।

মহাভারত (১ম)—কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত। সাক্ষরতা প্রকাশন। প্রথম সংস্করণ

মহারাষ্ট্র পুরাণ বা ভাস্কর পরাভব—গঙ্গারাম দাস। চিন্তয়সি প্রকাশন। ১৩৭৩।

মাদক দ্রব্যের বিষয়ে প্রশ্নোত্তর—রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। ১৮৯৯

মাদক সেবনের অবৈধতা ও অনিষ্টকারিতা—রচয়িতার নাম ও প্রকাশকাল অজ্ঞাত।

মাধব মুকুন্দ দেবাচার্য্য বিরচিতম্ অধ্যাস (পরপক্ষ) গিরিবজ্রম্—পণ্ডিত শ্রীবিনোদবিহারী পঞ্চতীর্থ অনূদিত। কলিকাতা সংস্করণম্; চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী এ্যাণ্ড কোং লিঃ।

রত্নপরীক্ষা—বিদ্যাসাগর [দ্রঃ বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ (২য় খণ্ড); সাক্ষরতা প্রকাশন। ১৯৭২]

রত্নপরীক্ষার প্রতিবাদ—কেষাঞ্চিৎ মধ্যস্থীনীম্। প্রকাশকাল বা সংস্করণ অজ্ঞাত।

রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু। ১৩১৫

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী। নিউ এজ সংস্করণ।

রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী—বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ৬ষ্ঠ সংস্করণ

রামমোহন-গ্রন্থাবলী (৩য়)—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। তৃতীয় সংস্করণ

ঐ (৪র্থ)—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। ১৩৬৬

রামমোহন রচনাবলী—হরফ প্রকাশনী। ১৩৮০

রামায়ণ (কৃত্তিবাস)—সাহিত্যসংসদ।

শাক্ত পদাবলী—অমরেন্দ্র নাথ রায় সম্পাদিত। পঞ্চম সংস্করণ

শূন্যপুরাণ (রমাইপণ্ডিত)—নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। ১৩১৪

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত (১ম ও ২য় খণ্ড)—রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৮৮১

শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত (বৃন্দাবনদাস)—গৌরাঙ্গহরি পাল প্রকাশিত ও প্রচারিত। ১৩৭৮

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (কৃষ্ণদাস কবিরাজ)—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। প্রথম প্রকাশ

সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। তৃতীয় সংস্করণ

ঐ (২য়)— ঐ। ঐ

সতীদাহ আবেদন, ১৮৩০ — —

সমাজ সংস্করণ—নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১২৭৬

সাংখ্যসূত্রম্ —দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ অনূদিত।

সাবিত্রী—গোবিন্দলাল দত্ত প্রকাশিত। ১২৯৩

সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১ম)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত। ১৯৬২

ঐ (২য়)— ঐ। ১৯৬৩

ঐ (৩য়)— ঐ। ১৯৬৪

ঐ (৪র্থ) — ঐ। ১৯৬৬

সামাজিক প্রবন্ধ—ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ৬ষ্ঠ সংস্করণ। ১৩৪৪

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—(১ম) [দ্রঃ 'গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার' এবং 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার']; ব. সা প.

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা (৯ম) [দ্রঃ 'কেশবচন্দ্র সেন']; ব. সা. প.

সুরাপান না বিষপান—জ্ঞানচন্দ্র বসাক। ১৮৮৮

সুরাপানের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক ফল কি এবং তন্নিবারণোপায়ই বা কি ?—তারাধন তর্কভূষণ। ১২৯৯

স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক—গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। ১৮৫৯

স্ত্রীশিক্ষা বিধান—দ্বারকানাথ রায়। ১৮৫৭

স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রী শিক্ষা—আর্য্যমিশন ইনষ্টিটিউশন প্রকাশিত। ১৮৯৩

হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি—কৈলাসকামিনী দেবী। ১৭৮৭ শকাব্দ

হিন্দুবিবাহ ও কন্যাবিক্রয়—রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮০৭ শক

হিন্দুবিবাহ সমালোচনা (২য়)—ভুবনেশ্বর মিত্র। ১৯৩৫ সম্বৎ

হিন্দুর সমুদ্র যাত্রা—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১২৯১

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৭৭২ শক, শ্রাবণ, ৮৪ সংখ্যা ; ১৭৭৪ শক, কার্ত্তিক ; ১৭৭৬ শক, ফাল্গুন, ১৩৯ সংখ্যা ; ১৭৭৬ শক, চৈত্র, ১৪০ সংখ্যা ; ১৭৭৭ শক, চৈত্র, ১৫২ সংখ্যা ; ১৭৭৮ শক, ভাদ্র, ১৫৭ সংখ্যা ; ১৭৯৬ শক, আষাঢ়

দেশ (সাপ্তাহিক)—১৩৭৪ বঙ্গাব্দ ; ১৫ বৈশাখ

নবজীবন—১২৯২, ফাল্গুন, ৮ম সংখ্যা, ২য় ভাগ ; ১২৯৪ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ, ৪র্থ ভাগ, ১ম সংখ্যা ; ১২৯৪ বঙ্গাব্দ, কার্ত্তিক, ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা

বঙ্গদর্শন—১২৮০, ২য় খণ্ড ; ১২৮১, ৩য় খণ্ড ; ১২৮৪, আষাঢ় ; ১২৮৪, কার্ত্তিক ; ১২৮৭, জ্যৈষ্ঠ

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা—১২৬২ বঙ্গাব্দ ; কার্ত্তিক

বিদ্যাদর্শন—১৭৬৪ শকাব্দ ; ভাদ্র, ৩য় সংখ্যা

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা—১৭৭৬ শক ; ১০ মাঘ, ২য় সংখ্যা

ভারতসংস্কারক—১২৮০ বঙ্গাব্দ, ৪ শ্রাবণ ; ১৮৭৩, ১৮ জুলাই

ভারতী—১২৮৮ বঙ্গাব্দ ; আযাঢ

সংবাদ প্রভাকর—১৮৪২, ২৬ এপ্রিল ; ১৮৫২, ১১ নভেম্বর ; ১৮৫৫, ৭ মার্চ্চ ; ১৮৫৫, ১৪ ডিসেম্বর ; ১৮৫৬, ১৩ ফেব্রুয়ারী

সংবাদ সাধুরঞ্জন—১২৫৬ বঙ্গাব্দ ; সোমবার, .৬ জ্যৈষ্ঠ, ৯২ সংখ্যা ; ২৮ মে, ১৮৪৯

সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী—১৮৭১, জুন

সমাচার চন্দ্রিকা—১২৩৮ বঙ্গাব্দ, ৯ বৈশাখ

সমাচারদর্পণ—১৮২১, ১৮ আগষ্ট ; ১৮২৯, ৮ আগষ্ট ; ১৮৩১, ২০ আগষ্ট ; ১৮৩৪, ১০ মে

সমাজদীপিকা—১২৯২ বঙ্গাব্দ ; ১ম খণ্ড ; ১ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ

১২৯২ ,, ; ,, ; ২য় ,, আষাঢ়

১২৯২ ,, , ,, ; ৩য় সংখ্যা

১২৯২ ,, ; কার্ত্তিক ; ৬ষ্ঠ সংখ্যা

১২৯২ ,, ; ১ম খণ্ড ; ৭ম সংখ্যা

সম্বাদ ভাস্কর—১৮৪৯ ; ২৯ মে

১৮৫৬ ; ১৬ ফেব্রুয়ারী

১৮৫৬ ; ২ আগষ্ট

সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা—১৭৭২ শক , ভাদ্র

সাধারণী—১৮৭৪ ; ২য় ভাগ ২ আগষ্ট

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা— ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ; ৩য় সংখ্যা

সুলভ পত্রিকা—১২৬১ বঙ্গাব্দ ; পৌষ

সোমপ্রকাশ—১২৭৭ বঙ্গাব্দ ; ১৬ ফাল্গুন

১২৭৮ বঙ্গাব্দ ; ৩০ শ্রাবণ

১২৯১ বঙ্গাব্দ ; ১০ আষাঢ়, ৩২ সংখ্যা

হালিসহর পত্রিকা—১৮৫২, ৮ ডিসেম্বর ; ১২৭৮ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ; ১৮৭২, আষাঢ়

হিতসাধক—১২৭৩ বঙ্গাব্দ ; ফাল্গুন, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা

১২৭৪ বঙ্গাব্দ ; কার্ত্তিক

১২৭৫ বঙ্গাব্দ ; বৈশাখ, ১ম খণ্ড

১২৯৪ বঙ্গাব্দ ; ৩য় সংখ্যা, ৪র্থ ভাগ

॥ ইংরেজী গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ॥

॥ নির্দেশিকা ॥